উৎসর্গ পত্র

রাজশ্রী রাজকুমার শ্রীমৎ গোকুল চন্দ্র লাহা
মহোদয়ের পতিব্রতা ভক্তিময়ী সহধর্ম্মিণী
শ্রীমতী রাধারাণী দাসী স্নেহময়ী মাতার
—শ্রীকর কমলে—

স্নেহময়ী ভক্তিময়ী পুণ্যের আধার—
সাক্ষাৎ শ্রীদেবীমূর্ত্তি তুমি মা আমার!
চৈতন্য চরিতামৃত—অমৃত ভাণ্ডার,
তব নিত্য প্রিয়পাঠ্য—ধর্ম্মগ্রন্থ-সার;
শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষা তার মাঝে
তত্ত্ব-উপদেশরাজ—রাজপ্রায় রাজে,
আপনার প্রিয়পাঠ্য সেই উপদেশ,—
এই গ্রন্থ তার ব্যাখ্যা-বিবৃতি-বিশেষ।
শ্রীগৌর-চরণ-চিন্তা করি অনুক্ষণ
রচিল যতনে গ্রন্থ এ অযোগ্য জন।
আপনার অর্থব্যয়ে, যত্নে আপনার
হইল এ গ্রন্থখানি,—বাঞ্ছিত সদা
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হয় যে প্রকার—
অর্পিনু এ গ্রন্থ মাগো শ্রীকরে তোমার।
পতি পুত্রাদির সহ সুদীর্ঘ জীবন
সুখ শান্তি রাজভোগ লভ চিরদিন।

২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
১৩৩৯ সাল
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

শুভাশীর্ব্বাদক
শ্রীরসিক মোহন শর্ম্মা।

অতি সংক্ষিপ্ত চরিত কথা

এই গ্রন্থে শ্রীপাদরূপ ও শ্রীপাদ সনাতনের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, অনেকেই তাহা করিয়াছেন, আরও অনেকে তাহা করিবেন। আমার উদ্দেশ্য,—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রেমভক্তি সাধনের যে মহাশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করা। এই মহাকারুণিক ভ্রাতৃযুগলের কর্ম্মময়, ধর্ম্মময়, প্রেমভক্তিময় জীবনের বিবিধ ঘটনা সঙ্কলন করার সৌভাগ্য আমার পক্ষে দুর্ঘট। কিন্তু পাঠক মহোদয়গণের তাহাতে সবিশেষ লাভের কারণ হইবে না। কেননা, ইতঃপূর্ব্বে উঁহাদের জীবন বৃত্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশানুরূপ না হইলেও উহাতে কিয়ৎপরিমাণে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান-লাভ হইবে। কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই দুই প্রিয় পার্ষদকে যে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন এবং সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মানব সমাজের হিতার্থ ইঁহারা বড় বড় গ্রন্থের আকারে যে সকল শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা বা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির ধারাবাহিক সার সঙ্কলনপূর্ণ সরল গ্রন্থ এখনকার কালের উপযোগি ভাবে বঙ্গভাষায় বিশেষরূপে বিরচিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই। প্রধানতঃ শ্রীচরিতামৃত-অবলম্বনে সেই সকল উপদেশের ব্যাখ্যা আমার প্রিয়জনগণের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও উপকারজনক হইবে, এই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

কিন্তু তথাপি প্রেম-ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্ত্তক শ্রীপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ভ্রাতৃযুগলের ভক্তিময় চরিতের দুই একটী কথা এখানে উল্লেখ না করিলে

হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে না, এই নিমিত্ত নিম্নে অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইল।

১। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বহু স্থানেই শ্রীপাদ সনাতন নিজকে নীচজাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া অনেকেই মনে করেন ইঁহারা নীচবংশে জাত। বাস্তবিক তাহা নহে, উহা বিনয়ভূষণ সনাতনের দৈন্য ও বিনয়ের উক্তি। উহাতে যৎকিঞ্চিৎ সত্য যাহা আছে, তাহা এইযে ইঁহারা মুসলমান শাসন-কর্ত্তার অধীনতায়, তাহারই গৃহে তাঁহারই সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন। ইহাতে তৎসাময়িক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নেতৃবর্গের নিকট ইঁহারা অপদস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ইঁহাদের জাতিপাত হইয়াছিল, ইঁহারা সমাজ-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, ম্লেচ্ছ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশেরও অধিকার ইঁহাদের ছিল না। ইঁহারা পিরালীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইঁহারা জগৎগুরু বংশজাত কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। শ্রীমদ্ভাগবতের লঘু তোষণী টীকার উপসংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীব স্বীয় বংশের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই সেই সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব বারাণসিতে বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মণ বংশজাত না হইলে পুণ্যভূমি কাশীর বিদ্যাপীঠে সেই সময়ে শ্রীজীব কখনও প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন না। ইঁহারা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, তথাপি বলিতে হইবে যে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি,—দৈন্য ও বিনয়ের সীমা হইতে আরও নিম্নতর হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইঁহাদের পিতৃদেবও মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদের অধীন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। নচেৎ রাজকার্য্যে সহসা ইঁহারা হয়তো এত দক্ষতা লাভ করিতে পারিতেন না।

২। ইঁহাদের সংস্কৃত ভাষা-লিখিত শাস্ত্রাদির চর্চ্চা যে অতীব অসাধারণ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইঁহাদের রচিত

গ্রন্থ পাঠ করিলেই সেই পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রভাবের ও শাস্ত্রানুশীলন গৌরবের বিপুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভ্রাতৃযুগল সম্ভবতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী টীকার উপক্রমে শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন :—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যরসালয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥

এই সার্ব্বভৌম কি বাসুদেব সার্ব্বভৌম? বিদ্যা-বাচস্পতি, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে আরও কতিপয় পণ্ডিত নবদ্বীপে ছিলেন। পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়কেই সভাপণ্ডিত পদেপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বোপদেব বিরচিত কবিকল্পদ্রুমনামে একখানি প্রসিদ্ধ ধাতুপাঠ গ্রন্থ আছে। নবদ্বীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ধাতুদীপিকা নামে এই গ্রন্থের এক টীকা করেন। এই দুর্গাদাস শক নরপতির পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি নিজের পিতৃ-পরিচয় দিয়া যে পদ্যটী লিখিয়াছেন তাহা এই :—

গাঙ্গোলীয়কুল সর্ব্বদেশবিদিত শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো
দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি।
টীকেয়ং বিমলাত্মনাং প্রতিপদং সম্পাদয়ন্তি মুদং
শিষ্যাণাং বিদধাতু ধাতুগহনে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥

ইতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-বিরচিতা ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রুম টীকা সমাপ্তা।"

শুনা যায় বিদ্যাবাচস্পতি ও সার্ব্বভৌম মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে:—

সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস॥

সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতন এবং রূপ ইঁহাদের নিকট ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাভূষণ উপাধি বিশিষ্ট আরও একটী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ইঁহাদের উপদেষ্টা ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন তদীয় তোষণী টীকায় ইঁহাকে "গৌরদেশ-বিভূষণ" বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝাযায় তৎকালীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও তিনজন উপদেষ্টার নাম তিনি এই টীকার প্রারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—রামভদ্র, বাণীবিলাস ও রসালয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। সম্ভবতঃ পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রসালঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ ব্যাকরণে, কাব্যে, অলঙ্কারে, ন্যায়ে, স্মৃতিতে, সাংখ্যে, বৈশেষিকে, উত্তর মীমাংসায় ও পূর্ব্ব মীমাংসায়, পুরাণে, যোগে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি নিখিল বিদ্যার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত আরবী, পারশী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষাতেও ইঁহাদের সবিশেষ জ্ঞান ছিল। জমিদারী কার্য্যে ইঁহাদের অভিজ্ঞতা কৌলিকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়েশ্বর, হোসেন শাহ ইঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া একবারেই একজনকে মন্ত্রী ও অপরকে উপমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাদের প্রাণে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকী সুদৃঢ়া ভক্তি তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যে কতদিন আবদ্ধ রাখা যাইতে পারে? হোসেন শাহ বেশী দিন এই সুযোগ্যতম রাজকর্ম্মচারী দ্বয়ের দ্বারা রাজকার্য্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভগবদন্মুখ চিত্ত যমুনা-জাহ্নবী-প্রবাহের ন্যায় উদ্দাম ভাবে ভগবানের অভিমুখে অভিসার করিয়াছিল।

কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ যোগ জ্যোতিষ, ন্যায়, মীমাংসা সাংখ্য বৈশেষিক ও বেদ বেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রে ইহারা যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ইঁহাদের গ্রন্থে তাহার ভূয়োভূয়ঃ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের কৃত গ্রন্থ সমূহের আলোচনায় এবং মূলগ্রন্থে ইঁহাদের নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান-পারদর্শিতার কিছু কিছু প্রমাণ ও পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

৩। ১৪০৭ শকে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর চন্দ্রের উদয় হয়, তাহার ও বহুপূর্ব্বে নৈহাটিতে, যশোহরের ফতেপুর পরগণায় কিম্বা বাকলা চন্দ্রদ্বীপে ইঁহাদের জন্ম হয়। বঙ্গদেশই ইঁহাদের জন্মভূমি কিন্তু উল্লিখিত স্থানের কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে ইঁহাদের জন্ম হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। ত্রয়োদশ শকাব্দের শেষ ভাগেই যে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীগৌরাঙ্গের শৈশব সময়ে সম্ভবতঃ ইহারা যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

৪। ইঁহাদের পিতার নাম ছিল,—কুমার দেব। কুমারদেবের তিন পুত্রের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখ আছে সনাতন, শ্রীরূপ ও বল্লভ। এই বল্লভই শ্রীজীবের পিতা কিন্তু সনাতনেরও যে অগ্রজ ছিলেন, চরিতামৃত-পাঠে তাহা জানা যায়। লঘু তোষণী টীকার শেষে বংশপরিচয়েও লিখিত আছে যে কুমার দেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন, বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন :—

"তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়োজজ্ঞিরে।"

ইহাতে বুঝাগেল কুমার দেবের আরও পুত্র ছিল তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন না। হুসেনশাহ সনাতনকে বলেন :—

তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার।
পশু পাখী মারি কৈল চাকলা উজার॥

৫। মুসলমান শাসন কর্ত্তৃ-প্রদত্ত ইহাদের উপাধি-দবীরখাস ও সাকর মল্লিক। সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীরূপ তাঁহারই সহকারী ছিলেন।

৬। রাজকার্য্যে শ্রীপাদ সনাতনের নিরতিশয় দক্ষতা ছিল। এই-জন্যই হুসেনশাহ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন, হুসেনশাহ তখন মহাবিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যভার ইঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। সনাতন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে রাজকার্য্যের শোচনীয় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া হুসেনশাহ কোনও ক্রমে তাঁহাকে কার্য্যত্যাগের অনুমতি প্রদান করেন নাই। তিনি রাজকার্য্যে সনাতনের শৈথিল্য ঔদাসীন্য ও একান্ত অমনোযোগিতা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সনাতন কার্য্যত্যাগ করিবেন। হুসেনশাহের শত অনুনয়েও যখন সনাতন বশীভূত হইলেন না, তখন তিনি উঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে যে বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে সনাতনের কি অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

৭। কেহ কেহ বলেন গৌড়ের নিকটে মাধাইপুর গ্রামে ভ্রাতৃযুগল বাস করিতেন। তখন এই দুই ভ্রাতার বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজকার্য্যের দক্ষতা জানিতে পারিয়া হুসেন শাহ, ইঁহাদিগকে উচ্চতম রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইঁহারা ক্রমশঃ এই কার্য্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হন। সনাতন প্রধান মন্ত্রী (দবীর খাস)। শ্রীরূপ উপমন্ত্রী (সাকর মল্লিক) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাধাইপুরের বাটীর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল।

এইজন্য উহার অনতিদূরে উহারা তুই পৃথক্ বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল,—বড় বাড়ী ; এই বাড়ীর সম্মুখে যে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন, তাহার নাম সনাতন-সাগর। মাণাইপুরের নিকটে যে নগর নির্ম্মাণ করেন—তাহার নাম, সাকর মল্লিক-পুর। তাঁহার আবাস বাড়ীর নাম—গিদ্দাবাড়ী।

৮। মালদহ জেলায় প্রাচীন গৌড় নগরে শ্রীরূপ সনাতনের যে শ্রীপাট আছে, তাহা শ্রীরাম-কেলি নামে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবগণ ইহাকে গুপ্ত বৃন্দাবন নামেও অভিহিত করেন। মালদহের বর্ত্তমান সহর ইংরাজ বাজার হইতে এই স্থান সাড়ে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বৈষ্ণবগণের নিম্ন লিখিত দ্রষ্টব্য বিষয় আছে,—

(ক) শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ।

(খ) শ্রীকেলিকদম্ব বৃক্ষ। এই বৃক্ষতলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহ নিশীথে শ্রীরূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং ভক্ত সমাগম হয়।

(গ) শ্রীরূপ-সাগর শ্রীরূপগোস্বামিমহোদয়-প্রতিষ্ঠিত। ইহারই পূর্ব্ব পার্শ্বে গোয়েদা নামক স্থানে শ্রীপাদ রূপের বাসাবাড়ী ছিল।

(ঘ) শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড।

(ঙ) শ্রীযোগমায়া মন্দির।

শ্রীবৃন্দাবন-রস-ভজনানন্দ গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগল শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি-উদ্দীপনার জন্য এই সকল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈষ্ণব জনসাধারণ এখানে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন-স্মরণানন্দে মগ্ন হইতেন, এবং এই স্থানটীকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলিয়া অভিহিত করিতেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রথমবার যখন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন তখন শ্রীরূপ সনাতনের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগকে দর্শন দেওয়ার জন্য রাম-কেলিধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি এই :—

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এই মোর মন, ইহা কে নাহি জানে।
সবে কহে কেন আইলা রামকেলিগ্রামে॥

এই সম্বন্ধে একটুকু বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ ঘটনা শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে, তাহা একদিকে যেমন কাব্যভাব্-বিভাবিত, অপর দিকে তেমনই অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যথা :—

বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্প শয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্ন বাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী কোলাহল, সুধা-সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইর নাটশালা হইতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাতে; কহিল নিশ্চয় করিয়া।

নৃসিংহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মনঃকল্পিত পথ বাঁধা কার্য্য যখন

কানাইর নাটশালার অধিক আর অগ্রসর হইল না, তখন প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমন এখানেই স্থগিত হইবে। তিনি ভক্তগণের নিকটে স্পষ্টতঃই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে শ্রীপাদ সনাতনের পরামর্শে তাহাই ঘটিয়াছিল।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথে পথে তাঁহাকে দর্শন করার জন্ম বিপুল লোক সংঘট্ট হইতে লাগিল। যখন তিনি কুলিয়া গ্রামে আসিলেন তখন অতি বিশাল জনতা উপস্থিত হইল ;

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥

*　　*　　*　　*　　*

গোসাঞী কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥
যাহা যায় প্রভু তাহা কোটি সংখ্যা লোক
দেখিতে আইসে ;—দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম॥

শ্রীরামকেলিগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে যে মহা পুণ্যপীঠ, তাহা বলাই বাহুল্য। পরম দয়াময় শ্রীভগবান্ এই স্থানে শুভাগমন করিয়া তাঁহার সুচিহ্নিত পার্ষদ ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন দান করেন। ভক্ত ও ভগবানের এই প্রেমমাধুর্য্যময় মিলন-স্থান, ভক্তমাত্রেরই অতীব সমাদরণীয় ও পূজনীয়। সুবিজ্ঞ প্রেমিকভক্ত পার্ষদ ভ্রাতৃযুগল বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইতেছিলেন। এজন্য ইঁহারা

পুনঃপুনঃ আবেদন পত্রও প্রেরণ করিতেছিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ যে ভক্তবাঞ্ছা-পূরণের জন্যই রামকেলিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রীমুখোক্তিতেই জানা যায়।

শ্রীরামকেলি গ্রামের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এই সৌভাগ্যের প্রকৃত কারণ এই যে এই স্থান শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের ভজন-বিলাস স্থল। যে স্থানে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন, সে স্থান যেমন মহাতীর্থ, সেইরূপ যে স্থানে ভগবৎপার্ষদ ও ভগবদ্ভক্তের আবাস স্থলী, সে স্থানও সেইরূপ মহাপীঠ স্থান। যাঁহারা এই তাপ-দগ্ধ সংসারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুময়ী লীলা-পীযূষের অফুরন্ত প্রস্রবণ-স্বরূপ সুধামধুর লীলা-গ্রন্থনিচয় বিরচন করিয়া মানবসমাজে শ্রীবৃন্দাবন-কাব্য-মধুরিমার বিশাল ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বিবিধ প্রকার ভক্তির অনন্ত বৈভব, বিবিধ গ্রন্থাকারে মানবসমাজে সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ও ভক্তিতত্ত্বের সুরধুনি-ধারায় এই বিশুষ্ক জগৎকে সরস ও সজীব করার জন্য অফুরন্ত অক্ষয় উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ তাঁহার সেই নিত্যপার্ষদ ভ্রাতৃযুগলের অধ্যুষিত স্থানটীর মাহাত্ম্য-সম্বর্দ্ধনার্থ এই স্থলে যে অদ্ভুত অলৌকিক বিপুল বিশাল লীলা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃতের দুই এক ছত্রেই তাহা পূর্ণ-পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তাহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ॥

নীলাচলে কাশীমিশ্রের নিকেতন, শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের মিলন-স্থলী। এই মিলনের বহু পরে রামকেলিতে এই দুই পার্ষদের সহিত প্রভুর মিলন্ হয়। সে মিলনের কাল-দীর্ঘতার সহিত এইমিলনের তুলনা হয় না। তুলনা না হইলেও এখানে যে আনন্দোচ্ছ্বাসের কল্লোল-কোলাহল হইয়াছিল, তাহাও চিরস্মরণীয়। বৈদ্যুতিক সংঘর্ষে

তুমুল শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহাতে সর্ব্বংসহা ভূতধাত্রী ধরিত্রীও বিকম্পিত হইয়া পড়েন। ভক্তগণের সহিত শ্রীভগবানের মিলনের প্রভাব তাহা অপেক্ষাও অধিকতর চিত্তাকর্ষক! এখানে প্রভুর আগমন-বার্ত্তা বিদ্যুদ্-বেগে প্রচারিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন জন্য ভক্তিভূমি শ্রীরামকেলিতে কোটি কোটি লোকের সমাগম হইল।* সে যে কি বিপুল ব্যাপার, তাহার ধারণা করাও অসম্ভব। প্রিয় পাঠক, আপনি দামোদর-বন্যা-প্রবাহের দেশ-বিপ্লাবী তরঙ্গ-তুফানের লীলা-বৈভব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? সে তরঙ্গে যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রলয়-পয়োধির সৃষ্টি হয়, গ্রামদেশ ভাসিয়া যায়, শ্রীরামকেলিতেও সেইরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহসা আগমনে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশাল জনতার সমুদ্র-তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। গৌড়েশ্বর যবনরাজ হুশেন শাহ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন—একি ব্যাপার, একটি সন্ন্যাসীর সন্দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম! কোন দর্শনীয় ক্রীড়ার কৌতুক নয়, কাহারও কোনও স্বার্থ নাই অথচ এই বিশাল বিপুল লোক সংঘট্ট! মানুষের পক্ষে এই অলৌকিক অদ্ভুত আকর্ষণ একবারেই অসম্ভব। তিনি বলিলেন :—

বিনিদানে এতলোক যার পাছে হয়।
সেই-তো গোসাঞিঃ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন॥

গৌড়েশ্বর কেশব ছত্রীকে ডাকিয়া ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ছত্রী হিন্দু, বিশেষতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্ত। যবন শাসনকর্ত্তা পাছে কি মনে করেন,—পাছে কোন্ বিপৎ সংঘটন করিয়া তোলেন,—এই আশঙ্কায় প্রভুর গৌরব-বৈভব একবারেই উড়াইয়া দিয়া বলিলেন :—

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন॥
যবনে তোমার ঠাঁঞি করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি ; আরো হয় হানি॥

হুসেন শাহের চরিত্র কেশব ছত্রীর উত্তমরূপেই জানা ছিল। হুসেন শাহ হিন্দুর দেবদেবী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেন। বঙ্গদেশ যখন মুসলমানের ভয়ে থরহরি কম্পান্বিত, উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি তখনও নির্ভীকভাবে হিন্দুগৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহ একাধিকবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও দেবপ্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিয়া হিন্দুদের মনে অশেষ যাতনা প্রদান করিতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :—

স্বভাবতঃ রাজা মহা কাল যবন।
মহা তমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘন ঘন॥
উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত শত করিল প্রমাদ॥

শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীপাদ সনাতনের মুখে প্রকাশ :—

হেন কালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তিঁহো কহেন যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

এই কথায় হুসেন শাহ সনাতনকে বান্ধিয়া রাখিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া যান। হুসেন শাহার বুদ্ধিতো এইরূপ! যদিও তিনি মহাপ্রভুর প্রতিসদয়ভাব বা ভক্তিভাব দেখাইলেন কিন্তু ইহাতে হিন্দু কর্ম্মচারীদের আশঙ্কা দূর হইল না। তাঁহারা মনে করিলেন হোসেন শাহের যেরূপ হিন্দুবিদ্বেষ, তাহাতে তাঁহার এই ক্ষণিক ভক্তিতে কোন বিশ্বাস নাই ;

কোতোয়ালের মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-চন্দ্রের-সৌন্দর্য্য, চরিত্র-মাধুর্য্য, তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়া ক্ষণেকের তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন কিন্তু ইহা কতক্ষণ থাকিবে ?

দৈবে আসি সত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥

এইরূপ ঘটিলে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে সুতরাং প্রভুকে এস্থান ত্যাগ করিতে বলাই ভাল এবং উহার বৈভব ও মহিমা যবন শাসন কর্ত্তাকে না বলাই ভাল ;—এই ভাবিয়া বুদ্ধিমান্ হিন্দুগণ মহা-প্রভুর মহিমা হোসেন শাহের নিকট একেবারেই উড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু হোসেন শাহ্ অতি বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন "এই সাধুকে বৃক্ষতলবাসী গরীব বলা চলেনা। সে কথা শুনিলেও মহাদোষ হয়। তিনি আমাপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন। আমার আদেশ আমার এই দেশে প্রজারা মাত্র পালন করিবে। কিন্তু তাঁহার আদেশ সর্ব্বদেশের সকল লোকেই প্রতিপালন করিবে। আমার রাজ্যে আমার প্রজারাই আমার কত অনিষ্টের চিন্তা করে কিন্তু সকল দেশের সকল লোকেরই তাঁহার প্রতি মহাভক্তি। ঈশ্বর না হইলে লোকেরা এরূপ মানিবে কেন। আমি যদি ছয়মাস কাল আমার ভৃত্যদিগকে বেতন না দেই, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইবে কিন্তু জনসাধারণ ঘরের অন্ন খাইয়া এই মহাপুরুষের একান্ত ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি এই রাজ্যে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করুন এবং স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করুন।"

কিন্তু এত কথাতেও হিন্দু কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা প্রভুর মহিমা অধিকতর রূপে গোপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে শ্রীরূপ-সনাতনের নাম উল্লেখ নাই। শ্রীচরিতামৃতে এ স্থলে রূপ-সনাতনের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। হোসেন শাহের প্রশ্নে শ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুর মহিমা গোপন না করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত যথাযথরূপে বর্ণনা করেন।

দবীর খাস সনাতন বলিলেন—যে ভগবান্ তোমায় এই রাজ্য দান করিয়াছেন, সেই ভগবান্ তোমার ভাগ্যে তোমার দেশেই আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তোমার রাজধানীতেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন। ইনি যাহা বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়। ইঁহার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্রই তোমার জয় হইবে। উঁহার কথা আমাকেই বা জিজ্ঞাসা কর কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমার মন তোমায় ইঁহার সম্বন্ধে কি বলে। তুমি ত রাজা; আমাদের শাস্ত্রানুসারে তুমি বিষ্ণুর অংশ। ইঁহার সম্বন্ধে তোমার নিজের কি জ্ঞান হয়? তোমার মনের কথাই ঐ বিষয়ে ভাল প্রমাণ। হোসেন শাহ বলিলেন—"আমার মনে হয় ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর"।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে হোসেন শাহের প্রেরিত লোক আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাও অতি সুন্দর। শ্রীগৌর-সুন্দরের রূপের স্বাভাবিক বর্ণনা, তাঁহার কীর্ত্তন-বিলাস, তাঁহার প্রতি লক্ষ লক্ষ লোকের তীব্র অনুরাগ প্রভৃতির সুবিস্তৃত সুন্দর বর্ণনা শুনিয়া হোসেন শাহ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোতোয়াল উপসংহারে বলেন :—

> কহিলাম এই মহারাজ তোমা স্থানে।
> দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে॥
> না খায় না লয় কার; কারে না করে সম্ভাষ।
> সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস॥

কোতোয়ালের কথায় ও দবীর খাসের কথায় হোসেন শাহের প্রকৃত পক্ষেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-চরণে পরমাভক্তির উদয় হইল; তিনি বলিলেন :—

—এই মুঞি বলিহু সবারে।
কেহ যেন উপদ্রব না করে তাঁহারে॥
যে স্থানে তাঁহার ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লয়ে সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন কিম্বা যেন লয় মন॥
কাজী বা কোটাল কিম্বা হউ যেইজন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥
এই আজ্ঞা করি রাজা গেল অভ্যন্তর।

শ্রীচরিতামৃতেও যবনরাজের উক্তি এইরূপই দৃষ্ট হয়। উহাতে দবীরখাসের কথার উত্তর প্রদান করিয়া রাজা অভ্যন্তরে গেলেন এইরূপ লিখিত হইয়াছে যথা :—

এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে॥

যদিও যবনশাসন-কর্ত্তা প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি হিন্দু কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা জানাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন;—শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিতে হইল না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্তগণের ভীতির কথা নিজেই বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বকীয় তত্ত্ব

কথার উপদেশ দিয়া নির্ভীক হইতে বলিলেন এবং কিছুদিন রামকেলি গ্রামে থাকিয়া মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন সহ মিলনের ঘটনাটি চৈতন্য ভাগবতে একবারেই অব্যক্ত রহিয়াছে কিন্তু উহাতে রামকেলিতে মহাপ্রভুর কিয়দ্দিন অবস্থান ও মহাসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বচিত্তে ভক্তি-রস সঞ্চারের বিপুল বর্ণনা আছে।

শ্রীচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়, দবীরখাস হুসেন শাহের নিকট হইতে নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, দুইভাই বেশ লুকাইয়া প্রভুর চরণ দর্শনার্থ গমন করিলেন, নিত্যানন্দ ও হরিদাস, শ্রীরূপ-সনাতনের আগমনের কথা প্রভুকে জানাইলেন—

"রূপ-সাকর-মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।"

দুইভাই দুইগুচ্ছ তৃণ দশনে ধরিয়া গল-লগ্নী-কৃত-বাসে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৈন্য-রোদন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ধরিয়া তুলিলেন, তখন উঁহারা স্তব করিতে লাগিলেন :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভো তোমার অবতার।
আমা বহি পতিত জগতে নাহি আর॥

"তুমি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে বড় বেশী কথা নহে। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে গঙ্গাতটে নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান, শ্রীধাম-নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ সজ্জনের স্থান। তাহারা

নীচের সেবা করে নাই, নীচের অধীনও হইয়াও থাকিত না। তাহাদের দোষের মধ্যে দোষ এই যে, তাহারা অতি পাপাচারী, সে পাপ নাশ হইতে আর কত সময় লাগে? তোমার নামাভাসেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তাহারা তোমার নাম লইয়া তোমার নিন্দা করিত, সেই নাম-গ্রহণেই তাহাদের পাপ নষ্ট হইত কিন্তু আমাদের কথা অতি স্বতন্ত্র, জগাই মাধাই হইতে আমরা কোটিগুণে পাপী।"

"ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গো-ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥"

"হে দয়াময় পতিত পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজের পরিত্রাণ-বল জগতে প্রকাশ কর। যদি এহেন পতিত-পামরকে উদ্ধার কর, তবেই পতিত-পাবন নাম সফল হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনগণ তোমার পতিত-পাবনত্ব শক্তির বৈভব দেখিবে। আমাকে যদি দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্রই জগতে দুর্ল্লভ হইবে।"

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস।*
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥

---

* শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলায় প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই ঘটনার আলোচনা করা হইতেছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমতঃ পাইয়াছি :—

১। "দবীর খাসের রাজা পুছিলা নিভৃতে" ইহার কতিপয় ছত্র পরে লিখিত আছে :—

২। "রূপ শাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।" আবার ইহার কতিপয় ছত্র পরে :—

৩। শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।

উদ্ধৃত স্থল-পাঠে এই আশঙ্কা হয় যে শ্রীপাদরূপকেই একবার দবীরখাস এবং অন্যত্র শাকর মল্লিক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ রূপের কার্য্যোপাধি,—শাকর মল্লিক এবং সনাতনের রাজদত্ত উপাধি,—দবীরখাস।

আজি হৈতে দুহার নাম রূপ-সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে।
শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইলুঁ তোমারে॥
"পর ব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ-রসায়নম্॥"

অর্থাৎ উপপতিতে আসক্তা রমণী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পূর্ব্বনিষ্পন্ন উপপতি-সঙ্গসুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয়, ভক্তজনও এইরূপ গৃহকর্ম্মাসক্ত হইয়াও মনে মনে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা রসাস্বাদন করিয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।

প্রভু কেন যে শ্রীরামকেলি গ্রামে আসিয়াছিলেন, এখন তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন :—

গৌড় নিকটে আসিতে মম নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলুঁ রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল দুইভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে॥

ইহাতে জানা গেল শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; এমন কি অনেকবার দর্শন প্রার্থনাপূর্ণ পত্রালাপও করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রসিক ভাবুক ও প্রেমিক ভক্তদ্বয়কে রস-মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্যপূর্ণসারগর্ভ

সংক্ষিপ্ত উপদেশও পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এই যে, "তোমরা অন্তরে অন্তরে প্রেমভক্তি-লাভের জন্য ব্যাকুল হইও, কিন্তু রাজকার্য্য সহসা ত্যাগ করিও না।" তিনি শ্রীপাদ দাস রঘুনাথকেও এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন :—

স্থির হইঞা ঘরে রহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভব-সিন্ধুকূল॥
না কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-লোকাচার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

কিন্তু উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল চিত্তে এই উপদেশ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। শ্রীমৎরঘুনাথ অতি অল্প কালের জন্য এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগলও বেশী দিন ভাব-গোপন করিয়া রাজকার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই শ্রীরূপের বন্ধন মোচন হইয়াছিল, শ্রীপাদ সনাতনকে প্রকৃত পক্ষেই কারাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। অচিরেই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-মুকুন্দের কৃপায় তিনিও কারামুক্ত হইয়া বারাণসিতে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকেলিতে প্রভু তাঁহার এই দুই প্রাচীন কিঙ্করকে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন :—

জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

এই বলিয়া উভয়ের মস্তকে শ্রীহস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উঁহারা প্রভুর রাতুলচরণ-কমল মাথায় তুলিয়া লইলেন। তখন প্রভু

ভক্তগণকে বলিলেন, তোমরা সকলে কৃপা করিয়া এই ভ্রাতৃযুগলকে বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কর।

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত ইঁহাদের পত্রালাপ চলিতেছিল, এই প্রথম সাক্ষাৎ-দর্শন হইল। কিন্তু তথাপি ইহা নূতন পরিচয় নহে। জন্মান্তরের সম্বন্ধ আত্মায় নিবদ্ধ থাকে, সময়ে প্রথম সাক্ষাৎকারেই পূর্ব্ব স্মৃতি, প্রাচীন সম্পর্ক জাগাইয়া দেয়। শ্রীরূপ সনাতন যে মহাপ্রভুর প্রাচীন পার্ষদ, তাহা তিনি আপন শ্রীমুখেই ইঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন।

শ্রীপাদ সনাতন যেমন বিনয়ী, তেমনি বুদ্ধিমান্। তিনি ভাবিলেন যবন-রাজের বুদ্ধির স্থিরতা নাই। এখন শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি আছে, কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের কথায় বিশ্বাস করা অকর্ত্তব্য; এই যবন রাজ্যে প্রভুর অধিক দিন থাকা ভাল নহে। এই পথে এত লোক-সংঘট্ট লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াও নিরাপদ্ নহে, এই ভাবিয়া শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—

ইহা হৈতে চল প্রভু, ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়-রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট,—ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনে যাওয়ার এ নহে পরিপাটি॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে কোনও ব্রাহ্মণ প্রভুকে এই সাবধানতাসূচক বাক্য বলিলে তিনি নির্ভীক ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর করিয়া তুমুল হরি-সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন এবং আরও কতিপয় দিবস রাম-কেলিগ্রামে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের পর হইতেই নবানুরাগিণীর চিত্তের ন্যায় দুই ভ্রাতার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; রাজকার্য্য করা, সামাজিক

কার্য্য করা, এমন কি ঘরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে ক্লেশজনক হইয়া উঠিল। ভগবৎ কৃপায় যাঁহাদের গৃহ-বন্ধন কাটিয়া যায়, তাদৃশ বিরাগীরাই ঘরে থাকিতে পারে না; ইঁহারা তো সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পাইয়াছেন? শ্রুতি বলেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"পরাৎপর ভগবানের দর্শন পাইলে হৃদয়ের গ্রন্থি কাটিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্ম সকলও ক্ষয় হইয়া যায়।" ইঁহাদের গৃহত্যাগের পক্ষে কেবল বৈরাগ্যই যথেষ্ট, কিন্তু তাহার উপরে ইঁহাদের ভগবদ্দর্শন হইল, তাহারও উপরে ইঁহারা সেই ভগবানে অনুরাগী হইলেন। ব্রজবালাদের ন্যায় অনুরাগে ইঁহাদের হৃদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গ-লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। ইঁহারা গৌড়েশ্বরের রাজকার্য্যে আবদ্ধ;—তাহাতে আবার অতিসুনিপুণ কর্ম্মচারী। গৌড়েশ্বর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে রাজকার্য্য অচল হইয়া পড়িবে, সুতরাং তিনি সহসা ইঁহাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। ইঁহারাও আর গৃহে থাকিতে পারেন না; অতএব মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইঁহারা মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ সনাতনের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও বিনয়নম্রতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরও প্রশংসনীয়। মহাপ্রভু যখন কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রায় রামানন্দ, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম প্রদ্যুম্নমিশ্র, শিখী মাইতি ও পণ্ডিত গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীপাদ সনাতনের পরামর্শের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি গৌড়-দেশ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, মনে করিয়াছিলাম জাহ্নবী ও জননীর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইব। যখন গৌড়দেশে উপনীত হইলাম, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আমায় দেখিতে উপস্থিত হইল,—আমি

যেন কৌতুকের বস্তু হইয়া পড়িলাম। পথে পথে লোকের বিশাল, বিপুলজনতা,—সেই জনতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া মহা দুষ্কর। যদি কোথাও অবস্থান করি, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়; বাড়ী, ঘর, প্রাচীর, ঘরের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এমন কি গাছের শাখায় শাখায় লোক অধিরূঢ় অবস্থায় রহে। চারিদিকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত মানুষের জনতা!

যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নৃত্য করি তথা লোক দেখি পূর্ণ॥

অনেক কষ্ট স্বষ্ট করিয়া রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সেখানে রাজমন্ত্রী সনাতন ও তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ আমাকে দেখিতে আসিলেন।

দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয়, রাজপাত্র॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হতে হীন।

ইহাদের দৈন্য-বিনয়ের কথা কি বলিব? এমন সরলতা পূর্ণ দীনতা এমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিব মুখে আর কোথাও শুনিতে পাই নাই। ইঁহাদের দৈন্য শুনিয়া এবং দীনতার ভাব দেখিয়া পাষাণও বিদীর্ণ হয়। ইহাদের ব্যবহার আদর্শস্বরূপ। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম, বলিলাম:—

উত্তম হইয়া হীন, করি মান আপনারে।
অচিরে করিবেন কৃষ্ণ উদ্ধার তোমারে॥

এই বলিয়া যখন তাঁহাদিগকে বিদায় দিলাম, তখন সনাতন আমাকে একটী প্রহেলী বলিলেন:—

যাঁহার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী॥

তখন আমি ইহাতে কোন অবধান করিলাম না। প্রাতঃকালে কানাইর নাটশালা গ্রামে আসিলাম; রাত্রিতে সনাতনের প্রহেলী মনে পড়িল। ভাবিলাম এত লোক সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে যাওয়া ভাল নহে। লোকে বলিবে, 'এই এক ঢঙ্গে।' বৃন্দাবন দুর্লভ নির্জ্জন স্থান।

দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে।
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে॥
বাদিয়ার বাজিপাতি চলিলাম তথারে।
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥
একা যাইব কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥

যাঁহার কথার আভাসে স্বয়ং লীলাময় মহাপ্রভুরও মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল, শ্রীবৃন্দাবন গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া গেল, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা কত অধিক, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপের নাম সর্ব্বত্রই সুবিখ্যাত। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্ব হইতে এই ভ্রাতৃযুগলের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। বিপুল ও

বিশাল ভোগ বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ইঁহাদের চিত্তে বৈরাগ্যের হোমানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দলীলা রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যমাখা প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনে সেই বৈরাগ্য, ভক্তিময় নবানুরাগে পরিণত হইল, বিষয়-লালসা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। নবানুরাগিণী ব্রজবালার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রের শ্রীচরণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল।

তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা আপন ভবনে চলিয়া গেলেন, গৌড় রাজধানী হইতে বহু ধন লইয়া স্বগ্রামে আসিলেন। অনেক ধন ও দ্রব্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে দান করিলেন। আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য কিয়ৎপরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রাখিলেন। ভাল ভাল ব্রাহ্মণের নিকট কিছু স্থাপ্য রাখিলেন। তখনও সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করেন নাই, সহসা রাজকার্য্য ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী, কার্য্য অতি দায়িত্বপূর্ণ। হোসেন শাহ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িলেন না। শ্রীরূপ তাঁহার জন্য দশহাজার মুদ্রা এক বিশ্বস্ত মুদীর নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া শ্রীরূপ নিজের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সময় জানিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইলেন। লোক সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। শ্রীরূপ তখন সমস্ত বিষয়-ঝঞ্ঝাট পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ সংব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রের দুই পুরশ্চরণ করিলেন। অতি সত্বরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের চরণ লাভই ইঁহার উদ্দেশ্য। পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে পুরশ্চরণ কি এবং ইহাতে কি প্রকারেই বা সত্বরে ইষ্টবস্তু লাভ হয় তাহাও বলা যাইতেছে। মন্ত্রশুদ্ধির জন্য পুরক্রিয়াকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্র জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণ-ভোজন পুরশ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন।

স্নিগ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বপ্রাণি-হিতরত ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। যোগিনী হৃদয় তন্ত্রে লিখিত আছে পুণ্যক্ষেত্রে নদী-তীরে, পর্ব্বতমস্তকে বা পর্ব্বত গুহায়, বনে, উদ্যানে, বিল্বমূলে, তুলসীকাননে, দেবতা-আয়াতনে, সমুদ্রতটে পুরশ্চরণ প্রশস্ত। অবশেষে লিখিত হইয়াছে "অথবা নিবসেৎ "তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি।" ভক্তজন স্থানে ও গুরু-সন্নিধানে পুরশ্চরণ হইতে পারে। পুরশ্চরণে ভক্ষ্য দ্রব্যেরও বিধান আছে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক জপ-অর্চ্চনাদির বিধান তন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। মলিন বস্ত্রে জপ ফলপ্রদ হয়না। আলস্য, জৃম্ভণ (হাইতোলা), নিদ্রা, হাঁচি দেওয়া, থুথু ফেলা, ভীত-ভীত ভাবে থাকা, ক্রোধ করা, নীচাঙ্গ স্পর্শ করা জপকালে ত্যাগ করিবে। জপ কালে মন্ত্রোচ্চারণে বিলম্ব বা দ্রুততা উভয়ই নিষিদ্ধ। দেবতা গুরু এবং মন্ত্র এক করিয়া একমন হইয়া প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে।

জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যং দিনাবধি।
যৎ সংখ্যয়া সমারব্ধং তৎকর্ত্তব্যং দিনে দিনে॥

জপের একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেকদিন জপ করিতে হইবে। মূল সংখ্যা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ করিতে হইবে।

"ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ।"

মুণ্ডমালা তন্ত্রে ও কুলার্ণবতন্ত্রে ইহা লিখিত আছে। জপের নিষ্ঠা দ্বাদশটী, তাহাও প্রতিপাল্য, যথা :—

ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বং মৌনমাচার্য্যসেবিতা।
নিত্য পূজা নিত্য দানং দেবতাস্তুতিকীর্ত্তনম্॥
নিত্যং ত্রিবসনং স্নানং ক্ষৌরকর্ম্মবিবর্জ্জনং।
নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ।
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃস্যুর্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ॥

এইরূপ বহুবিধ নিয়ম পুরশ্চরণে প্রয়োজন, হোমাদিও করিতে হয়।

• শ্রীপাদরূপ গোস্বামী মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য এবং শীঘ্র শ্রীগৌরাঙ্গচরন-লাভের জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্রের দুইবার পুরশ্চরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। ত্যাগ, হিন্দুগণের চরিত্রের এক বিশিষ্টতা। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিষয়-লালসা-ত্যাগের পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। ত্যাগেই শান্তি, শান্তিতেই আনন্দ, নিখিল শাস্ত্রদর্শী শ্রীরূপ তাহা জানিতেন। ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিলাস ও বিপুল বৈভব-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজন-সাধন করাই যে মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সহস্র সহস্র ভারতবাসী তাহা স্বীয় স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপের বিপুল-বিষয়-ত্যাগ ঠিক সে ধরণের নহে, শুষ্ক বৈরাগ্য শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে। তাঁহার বৈরাগ্য সন্ন্যাসের একটা অঙ্গ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী কৃষ্ণানুরাগিণী-ব্রজবালারা যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহের সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন কি সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের পদান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন,শ্রীরূপের বৈরাগ্য ঠিক সেইরূপ। ইঁহার বৈরাগ্য, বিষয়-বিরাগ জনিত বৈরাগ্য নহে। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার,—প্রেমানন্দ বিগ্রহ নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরহরির প্রেমমাধুর্য্যময় আকর্ষণে তাঁহারই সঙ্গ-সুখ-লাভের জন্য শ্রীরূপ বিপুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাণারাম হৃদয়বন্ধু শ্রীগৌর-গোবিন্দ-চরণ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর বৃন্দাবন হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন,সেই সময়ে শ্রীরূপ ও তাঁহার অনুজ বল্লভ (অনুপম) তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

তবে সেই দুইচর রূপ ঠাঞি আইলা।
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞি॥

আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈসে তৈসে ছুটিয়া আইস তাহা হইতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা আছে মুদী স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥

শ্রীরূপ-মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সেই ব্যাকুলতায় তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। নানা প্রকারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলন। ভক্তির ব্যাকুলতাতেও যে কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি নষ্ট হয় না স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীরূপের কার্য্য-প্রণালী তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের এই বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় যে একদিকে যেমন তাঁহাদের জগৎ-বিপ্লাবী প্রেম,—অপরদিকে তেমনি সূক্ষ্ম দূরদর্শিতাপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি,—এই উভয়ের সামঞ্জস্য-সংরক্ষণ করা কঠোর ব্যাপার কিন্তু প্রেমিক ভক্ত শ্রীরূপ তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নখ-চন্দ্রিকা-চ্ছটা প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ব্বক গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে লইয়া অচিরে প্রয়াগে আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন।

অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তারে লইয়া শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা॥

শ্রীরূপ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। তাহার উপরে তিনি দীনাতিদীন ও বিনয়ী। এদিকে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা! সেই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া অতি বড় পালোয়ানের ও দুঃসাধ্য। শান্ত, নিরীহ, লাজুক, বিনয়ী ভ্রাতৃযুগল নির্জ্জনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রয়াগে মাধব-দর্শনে মহাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট

তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া হরি-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক সেই হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছে। প্রিয় পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন সেখানকার ব্যাপার কি বিপুল ও বিশাল!

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনিকরি।
উর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি॥

হরিনামের প্রলয়-তুফান বহাইয়া প্রেমাবিষ্ট গৌর হরি জনসাধারণের হৃদয়ে রাধারাণীর প্রেমভাণ্ডারের অফুরন্ত প্রেম ও ভুবনপাবন মধুমাখা হরিনাম অবাধভাবে মুক্তকণ্ঠে ঢালিয়া দিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক সেই প্রেমমাখা নামসুধা পান করিয়া প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
প্রভু চলিয়াছেন মাধব দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥

অনেকক্ষণ পরে এই সাগর-তরঙ্গ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। মহাপ্রভুর পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, শ্রীরূপ ও বল্লভ দুই ভাই তখন মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে আসিয়া দুই ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধরিয়া দূরে থাকিয়াই দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন।

চিত্তের আবেগে নানাপ্রকার ভক্তিময় শ্লোক পাঠ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, প্রেমে আবিষ্ট হইয়া নিস্পন্দ ভাবে প্রভুর চরণে পড়িয়া রহিলেন। প্রভু তখন রূপকে অতীব কোমল কণ্ঠে বলিলেন :—

উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন।
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন॥
বিষয়-কূপ হৈতে তোমায় কাড়িলা দুইজন।
"ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃপ্রিয়ঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যম্।

মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। শ্রীরূপ ও বল্লভ মহাপ্রভুর কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে দৈন্য-বিনয়ের সহিত স্তুতি করিয়া বলিলেন :—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায়তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌর-ত্বিষে নমঃ॥

অতঃপরে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে স্নেহের সহিত নিজের নিকটে টানিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ বলিলেন, তিনি রাজঘরে বন্দী আছেন। আপনি যদি তাঁহাকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই তাঁহার উদ্ধার। মহাপ্রভু ইহাতে হাসিয়া বলিলেন "সনাতনের উদ্ধার হইয়াছে। অচিরেই আমার সহিত তাঁহার মিলন হইবে।"

শ্রীরূপ ও বল্লভ সেই দিবস সেইখানেই থাকিলেন, মহাপ্রভুর পাত্র-শেষ প্রসাদ পাইলেন। ত্রিবেণীর উপরে প্রভুর বাসস্থান ঠিক হইল। দুই ভ্রাতা প্রভুর চরণান্তেই আশ্রয় পাইলেন। মহাপ্রভু এই ভ্রাতৃযুগলকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচিত করিয়াদিলেন। ইঁহারা দূর হইতে ভূমিতে পড়িয়া অতি দীন ভাবে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। ভট্ট উহাদিগকে

আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু উঁহারা দূরে সরিয়া পড়িলেন।

শ্রীরূপ বলিলেন, "আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।" কিন্তু শ্রীরূপের এই ব্যবহার দেখিয়া বল্লভ ভট্ট বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, ইহারা অতি হীন জাতি, আপনি বৈদিক যাজ্ঞিক, কুলীন ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ। আপনি উঁহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। বল্লভ ভট্ট বলিলেন, সে কি কথা? যাঁহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন, তাঁহারা কি কখনও অস্পৃশ্য হন?

যেষাং কৃষ্ণস্য মননং তথা নামপ্রজল্পনম্।
সদৈব স্মরণং ভাগবতানাং সাধুসেবনম্॥
ভক্তি প্রধৌতমনসাং গোবিন্দার্পিত-কর্ম্মণাম্।
বাহ্যান্তঃ-কৃষ্ণচিত্তানাং শুচিতা তদহর্নিশম্॥

ইহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান। ইহারা কখনও অধম নহেন। এই বলিয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের:—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যা
ব্রহ্মান্ চু নাম গৃণন্তি যেতে॥

(৩য় স্কন্দ ৩৩ অধ্যায় ৭ শ্লোক)

মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজে আরও দুইটী শ্লোক বলিলেন যথা:—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥

জাত্যভিমান-গর্ব্বিত হিন্দু সমাজে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কার্য্যতও সমাজে যাহারা নিরতিশয় অনাদৃত ও অবজ্ঞাত তাহাদের মধ্যেও ভক্তির উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদিগকে সমাজপূজ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

যাহাহউক, শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণে একান্ত ভাবে শরণ লইলেন। মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধে একটী নির্জ্জন স্থানে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব শিখাইল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল॥

কবি কর্ণপুর-কৃত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঙ্কেও ইঁহাদের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর কৃপার কথা লিখিত আছে, যথা :—

কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেবঃ
তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ।
যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো।
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরোমূর্ত্তএবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তর পরিষঙ্গ-রঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥

অর্থাৎ বৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা কালে বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব পুনর্ব্বার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, রূপ এবং সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

যিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ গুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়তরাবদ্ধ, গোরাবেশ হইতে বিমুক্ত, এবং অমূর্ত্ত শৃঙ্গার-রসই যেন মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক যে শ্রীরূপাকারে প্রকাশিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবল্লভের সহিত সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কৃপামৃতে অভিষেক করিয়াছিলেন।

প্রিয়স্বরূপে দয়িত-স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

শ্রীশ্রীপ্রভু যাঁহাকে আত্ম-দান করিয়াছেন, যিনি ভক্ত, তদীয় অভিন্ন কলেবরবিশেষ এবং বিভূতিস্বরূপ, সেই রূপগোস্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম মধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই মিলনের পরে শ্রীরূপকে মহাপ্রভু দশদিন নিজের নিকটে রাখিয়া ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক শিক্ষাদিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

শ্রীরূপের শিক্ষাদানের পর মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বারাণসি যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শ্রীরূপ তখন কাতরকণ্ঠে বলিলেন, দয়ানয়, আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি আপনাকে ছাড়া হইয়া ক্ষণার্দ্ধও থাকিতে পারিব না। আপনার শ্রীচরণান্তে বাস করিয়া আপনার সেবা করিব,—এই উদ্দেশ্যেই ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি।

আজ্ঞা হয়, আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥

প্রিয় পাঠক, যিনি ব্রজ-রসলীলা-রচনার অধিকারী, তাঁহার হৃদয় যে

ব্রজরসে পরিষিক্ত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শ্রীরূপের সেই ব্রজরস সেই ভাব, সেই বিরহের অবস্থা। মহাপ্রভু বলিলেন, "আমার বাক্য প্রতিপালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, এবং ভক্তি-শাস্ত্র-প্রচার তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। তুমি এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে যাও, পরে গৌড়দেশ দিয়া সময় মত নীলাচলে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।" এই বলিয়া প্রভু বারাণসি-অভিমুখে গমন করার জন্য নৌকাতে আরোহণ করিলেন। শ্রীরূপ সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এক দাক্ষিণাত্য বিপ্র রূপ ও বল্লভকে নিজ ঘরে লইয়া গেলেন। অতঃপরে দুই ভ্রাতা মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু বারাণসি আসিয়া চন্দ্রশেখরের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এখানে সনাতনের পক্ষে সহসা রাজকর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি যবনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজস্ব-সচিবতা, সমর-সচিবতাও রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার সনাতনের উপর ন্যস্ত ছিল। সনাতন রাজকার্য্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি যবনরাজের প্রীতির পাত্র, কিন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে ঘোরতর বন্ধন। যদি প্রীতির বদলে যবনরাজ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে তাহাই তাঁহার লাভ। সংসারে এমনই এক চমৎকারভাব,—একজনের পক্ষে যাহা অত্যন্ত আদরণীয়, অপরের পক্ষে তাহা অতি জঘন্য ঘৃণার্হ বিষয়। গৌড়েশ্বরের প্রীতির ইঙ্গিত মাত্রলাভ করিতে পারিলেও সহস্র সহস্র লোক পরম অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিত কিন্তু সনাতনের পক্ষে সেই গৌড়েশ্বরের প্রীতি নিরতিশয় বন্ধনের কারণ হইয়া উঠিল। যে পাখী কৃষ্ণ নাম করে, মানুষের ঘরে সে পাখীর বন্ধন অতীব দৃঢ় হয়। তাহার পায়ের শিকলের প্রতি গৃহস্থের সর্ব্বদাই যেমন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়, সনাতনের পক্ষেও ঠিক তাহাই

ঘটিল। তাঁহার কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি, রাজকার্য্য-পরিচালন-পটুতা এবং ব্যাবহারিক জ্ঞান-গৌরব যবনরাজের পক্ষে অত্যন্ত আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে রাজার অপ্রিয়-ভাজন হইয়া তিনি রাজ-সংসার হইতে চিরবিদায় লইতে পারেন, দিবানিশি কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে :—

এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয়, করিল নিশ্চয়।
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম ধরি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্যে ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে॥
লোভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া॥

এই সময়ে সনাতনের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, সহজেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। তাঁহারই প্রাণাধিক প্রিয়তম অনুজ শ্রীরূপ ও বল্লভ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মনের কথা বলিবার উপযুক্ত মনের মত সঙ্গী নাই, রাজমন্ত্রিত্ব তাঁহার নিকট কারাক্লেশের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি অস্বাস্থ্যের ভাণ করিয়া রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ঘরে আসিলেন, ঘরেতেও মন স্থির নাই। দিবানিশি তাঁহার প্রাণে ব্যাকুলতা কিন্তু অত্যাচারী ও উৎপীড়ক যবনরাজের ভয়ে পালাইবারও উপায় নাই। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, বহুবিধ রাজকার্য্যে নিপুণ প্রধানতম কর্ম্মচারী, রাজসংসারে আর কেহ ছিল না।

কাজেই সনাতনের উপর রাজার সতত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ব্যাকুল মন ঘরে রহিয়াও শান্তিলাভ করে না, পালাইবারও পথ পায় না। সনাতন তখন ঘরে বসিয়া শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন, ধনের আশায় বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক পণ্ডিত লইয়া ভাগবতাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যবনেশ্বর দেখিলেন, তাঁহার কার্য্যে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। সনাতন অস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া রাজকার্য্য ছাড়িয়া গৃহে রহিয়াছেন। তাঁহার রোগটা কি তাহা জানিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইলেন। বৈদ্য দেখিলেন সনাতনের শারীরিক কোন ব্যাধি নাই, প্রত্যুত বহু বহু পণ্ডিতের সহিত তিনি শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন। তিনি যবন রাজের নিকট যথাযথ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে যবন-রাজ অসন্তুষ্ট হইয়া সহসা নিজেই একদিন একজন লোক সঙ্গে করিয়া সনাতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৌড়েশ্বরকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। গৌড়েশ্বর অসন্তুষ্ট ভাবে ও ক্রুদ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন,—আমি তোমাকে দেখিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তোমাকে সুস্থ দেখিয়া গিয়াছেন। তুমি সুস্থ দেহে আপন গৃহে মনের আহ্লাদে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেছ, আর ওদিকে আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

আমারও যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥

এবার সনাতন আর মনের ভাব গোপন করিলেন না। তিনি স্পষ্টতঃ ও নির্ভীকভাবে বলিলেন,—আমা হইতে আপনার কার্য্য সম্পন্ন

হওয়ার আর উপায় নাই। আমার শরীর অসুস্থ না হইলেও মন অত্যন্ত অসুস্থ।" আমাদ্বারা আর কোন কাজই চলিবে না। আপনি আমার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করুন। ইহাতে রাজার ক্রোধ হওয়ারই কথা। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে অনেক কটু কথা শুনাইলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার।
তোমার বড়ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য-নাশ॥

সনাতন বলিলেন অন্যের দোষের কথা আমায় বলিয়া ফল কি? আপনি স্বাধীন শাসন-কর্ত্তা। যদি কেহ কোন দোষ করিয়া থাকে আপনি তাহার দোষানুরূপ শাস্তি তাহাকে দিবেন। আমার কথা এই যে, আমি কিছুতেই আপনার কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব না। যবন-রাজ ইহাতে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন, মুখে কোন কথা না বলিয়া ক্রোধভরে সহসা উঠিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ-বাটী হইতে সিপাহীরা আসিয়া সনাতনকে গ্রেপ্তারকরিয়া কারারুদ্ধ করিল। সনাতন অম্লান চিত্তে মহাপ্রভুর চরণ চিন্তা করিয়া কারাগারে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময় উড়িষ্যায় গোলযোগ বাঁধিল। হোসেন শাহ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া উড়িষ্যায় অভিযান করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন সকল বিষয়েই সুমন্ত্রী, যুদ্ধ-বিষয়েও সনাতনের মন্ত্রণা অতি কার্য্যকরী, সুতরাং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই সুসঙ্গত. বিশেষতঃ তাঁহার অনুপস্থিতিতে সনাতন পলাইয়া যাইতে পারেন, অতএব তাঁহাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখাই ভাল,—এই ভাবিয়া তিনি সনাতনকে বলিলেন "তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় চল।" সনাতন নির্ভীক, সনাতন স্পষ্টবাদী। তিনি কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া স্পষ্টতঃই বলিলেন :—

—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গেতে যাইতে॥

সেইদিন হইতে সনাতনের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। কারাগার উত্তম প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হইল। যবনরাজ সৈন্যগণ সহ উড়িষ্যা-অত্যাচারে চলিয়া গেলেন। সনাতন কারাগারে থাকিয়া দিবানিশি শ্রীচৈতন্যের চরণ এবং অগ্রজের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন সহসা শ্রীরূপের এক পত্র পাইয়া মহাআনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি যবনরক্ষকের নিকট গিয়া মৃদুমধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—ভাই, তুমি জীন্দাপীর—সিদ্ধপুরুষ মহাপুণ্যবান্। কেতাব-কোরানাদিতে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তুমিতো কোরাণের কথা জান। যদি নিজের ধনব্যয় করিয়াও একজন বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ভগবান্ তাঁহাকে সংসার হইতে মুক্ত করেন। পূর্ব্বে আমি তোমার বহু উপকার করিয়াছি, এখন তুমি আমায় কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার কর। আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব। ইহাতে তোমার পুণ্য ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে।

ইহার উত্তরে কারারক্ষক বলিল, আমি এই প্রস্তাবে রাজারভয়ে সম্মত হইতে পারি না। সনাতন বলিলেন, এখন তোমার পক্ষে রাজভয়ের কোন কারণ নাই। যবনরাজ উড়িষ্যায় গিয়াছেন। সেখানে তাঁহার জীবনের বহু আশঙ্কা আছে। তিনি ফিরিয়া আসিবেন কিনা তাহাই সন্দেহ; যদি বা আসেন, তবে তাঁহাকে বলিও "সনাতন বাহ্য করিতে গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল; আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাহাকে পাইলাম না। তাহার পায়ে বেড়ী ছিল, বেড়ী সহিতেই সে ডুবিয়া গিয়াছে।" তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি এদেশে থাকিব না; দরবেশে হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।

• সনাতন, যবন-প্রহরীকে এমন ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, যেন তিনি একজন মুসলমান সাধু হইবেন। তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, যদি ইহাতেও কারারক্ষকের মনে স্বজাতীয় ধর্ম্মের উদ্রেক হয় এবং একজনকে দরবেশ ভাবে মক্কা-গমনের সুবিধা করিয়া দিলে যদি কোন ধর্ম্মলাভের কারণ হয়, তবে এই ছলনাতেও ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লোকে কথায় বলে "অর্থলোভী সন্ন্যাসী বচনে তুষ্ট নয়।" সনাতন অতি বুদ্ধিমান্, তিনি দেখিলেন ধর্ম্মের কথায় যবন ভুলিবার নয়, তখন মুদীর নিকট হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া কারাগার-রক্ষকের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মের প্রলোভনে যাহা না হইল, টাকার প্রলোভনে তাহা হইল। যবন রক্ষক সযত্নে তাঁহার পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিয়া রাত্রিতেই গঙ্গা পার করিয়া দিল।

সনাতন দিনরাত্রি অবিরাম অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে পাতড়া পর্ব্বত প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ঈশান নামক একটী ভৃত্য ছিল। পাতড়া পর্ব্বত অতিক্রম না করিলে গম্যস্থানের পথ-প্রাপ্তির উপায় নাই কিন্তু পর্ব্বত পার হইয়া যাওয়ার পথ যে কোথায়, তাহাও তিনি জানিতেন না। এই পর্ব্বত-প্রান্ত-বাসী এক ভূমিকের নিকট যাইয়া পথের বিষয় জানিতে চাহিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই পর্ব্বত পার করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। সনাতনের এই কথায় ভূমিক প্রথমতঃ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার নিকটে একজন হাতগণিতা ছিল। সে ভূঞার কাণে কাণে বলিল, ইহার নিকট আটটী স্বর্ণ মোহর আছে। ভূঞা মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এখন রন্ধন করিয়া আহার করুন, আমি রন্ধনের জন্য তণ্ডুলাদি দিতেছি। রাত্রিতে আপনাকে নিজ লোক দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব।"

আদর ও সম্মানের আর সীমা নাই। সনাতন স্নান করিলেন, দুইদিন

উপবাসের পরে রন্ধনান্তে ভোজন করিলেন। ভূমিকের অত্যধিক আদর সম্মান দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, "পাহাড়ীয়া লোকটা আমাকে এত সম্মান করে কেন? অবশ্যই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে।" এই ভাবিয়া ঈশানকে বলিলেন, ঈশান তোমার কাছে কিছু টাকা কড়ি আছে কি? ঈশান বলিল, আজ্ঞে হাঁ, দুর্গম পথে চলিতে হইবে, সাতটী স্বর্ণ মোহর পথ-সম্বলের জন্য আনিয়াছি। সনাতন ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—নির্ব্বোধ, একি করিয়াছ? এমন কাল-যমও কি সঙ্গে আনিতে হয়? আমরা দস্যু তস্করাদির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি; উহা কি হাতে রাখিতে হয়?

সনাতন তখন সেই সাতটী মোহর ভূমিকের হাতে দিয়া বিনয়-মধুর স্বরে বলিলেন, আমার নিকটে এই সাতটী মাত্র স্বুবর্ণ মোহর ছিল। আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আমাকে পারকরিয়া দিন। আমি রাজবন্দী, প্রশস্ত গড়িদ্বার পথে আমার যাইবার যো নাই। আপনি পুণ্যের জন্য আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিন। ভূঞা হাসিয়া বলিলেন তোমার ভৃত্যের অঞ্চলে যে আট মোহর আছে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। আজ রাত্রিতেই তোমায় বধ করিয়া আমি ঐ মোহর লইতাম। তুমি আমায় বলিয়া ভালই করিয়াছ। নচেৎ আমি মহাপাপ কার্য্য করিতাম। সেই পাপ হইতে রক্ষা পাইলাম, আমি তোমার মোহর লইব না। পুণ্যের জন্যই তোমায় পর্ব্বত পার করিয়া দিব, ভাবনা করিও না।

সনাতন বলিলেন, সে কি কথা? "আমি এই অনর্থের আকর অর্থ দিয়া কি করিব? ইহার লোভে কেহ আমায় বধ করিতে পারে। আপনি এই মোহর লইয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন।" সনাতনের বিনয়-মধুর যুক্তিযুক্ত কথায় ভূমিক অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। চারিটী পাইক সঙ্গে দিয়া রাত্রিতেই সনাতনকে বন-পথের ভিতর দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিলেন। তখন তিনি ঈশানকে বলিলেন, বোধ হয় তোমার কাছে

আরও কিছু অবশেষে আছে। ঈশান বলিল, আর একটী মোহর আছে। সনাতন বলিলেন, এই মোহরটী লইয়া দেশে যাও; আমার আর সঙ্গীর প্রয়োজন হইবে না। এই বলিয়া তিনি ঈশানকে বিদায় দিলেন।

তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোঁয়া, ছেঁড়াকান্থা, নির্ভয় হইলা॥

এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এক উদ্যান-ভিতরে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

হাজিপুরে শ্রীকান্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর ভগিনীপতি, সন্ধ্যার পর তিনি সনাতনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। সনাতন কিপ্রকারে কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন, সেকথা ইহাকে বলিলেন। শ্রীকান্ত সনাতনকে সেখানে দুইদিন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বলিলেন, আপনি এখানে দুইদিন থাকুন আমি ভাল বস্ত্র দিতেছি তাহা পরিধান করিয়া ভদ্রবেশ ধারণ করুন। সনাতন বলিলেন, আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমাকে গঙ্গাপার করিয়া দাও।"

প্রভুকে দর্শন করার জন্য তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। প্রতি মুহূর্ত্তই তাঁহার নিকট যুগের মত বোধ হইতেছিল। শ্রীকান্ত একখানি ভোট-কম্বল তাহার শরীরে জড়াইয়া দিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে কিয়দ্দিন পরে সনাতন বারাণসিতে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যভূমি বারাণসি সর্ব্বদাই সাধুসজ্জনের অধ্যুষিত, ভারতের প্রধানতম ধর্ম্মসহর, এখানে সর্ব্বত্রই লোক কোলাহল, ও শাস্ত্রচর্চ্চা। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে মহাপ্রভুর সন্ধান পাওয়া সনাতনের পক্ষে কঠিন হইল না। সেই সুবর্ণবর্ণ সমুজ্জ্বল নবীন সন্ন্যাসী যখন যেখানে গমন করেন, সেইখানেই লক্ষ লক্ষ লোক-সংঘট্ট এবং হরিনামের বন্যারোল! সনাতন অতি সহজেই জানিতে

পারিলেন এই আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ, প্রেমের পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে উদিত হইয়াছেন এবং সেইখানে দিবানিশি নিরন্তর জনতা-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছে। সনাতন যেমনি চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, এখানে তাহাকে লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর বহির্দ্বারে গিয়া দেখিলেন, মালা-তিলকধারী বৈষ্ণবচিহ্নবিশিষ্ট কোন লোক সেখানে উপস্থিত নাই। প্রভুর নিকটে গিয়া তিনি বলিলেন, কই? আমিত কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না। প্রভু বলিলেন, আবার যাও, সেখানে কে আছে, দেখ। চন্দ্রশেখর বলিলেলেন একজন দরবেশ উপস্থিত আছে। প্রভু তাহাকেই তাঁহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাবহ চন্দ্রশেখর বহির্দ্বারে গিয়া বলিলেন,—দরবেশ, প্রভু তোমায় ডেকেছেন, এস। সনাতন যেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি দয়াময় প্রভু ধাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সনাতনেরও সেইদশা। তিনি বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, দীনতার সহিত অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, প্রভো, আপনি আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, অধম; আপনার স্পর্শের 'অযোগ্য;' ইহাই বলিতে বলিতে সনাতনের ভাষা গদ্‌গদ হইয়া পড়িল। তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর বাহুপাশ হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর ও দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভু সনাতনের হাত ধরিয়া তাহাকে পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলেন। দীর্ঘকাল কারাগারে থাকায় সনাতনের শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রভু মায়ের মত স্নেহে নিজ শ্রীহস্তে তাঁহার

শ্রীঅঙ্গ সংমার্জ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সনাতন আবার অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো, এই অধম অপরাধীর অপরাধ আর বাড়াইবেন না, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। তখন :—

প্রভু কহে তোমাস্পর্শী আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শুধিতে॥
"ভবদ্বিধা ভাগবত্ তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"

শ্রীভাগবত ১ম স্কন্ধ, ১৩অ, ৮ শ্লোক।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

শ্রীভাগ ৭ম স্কন্ধ, ৯ম অঃ, ৯ম শ্লোক।

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, অদ্বেষ, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি এবং বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে পরাঙ্মুখ হয়,তবে তাহার অপেক্ষা যেজন,—বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিয়াছে,—তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সেই চণ্ডাল কুল, পবিত্র করে, কিন্তু গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ফল,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥
অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।

জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,

সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

হরিভক্তি-সুধোদয়ে ১৩অ, ২য় শ্লোক।

ভবাদৃশ হরিভক্ত দর্শনই চক্ষুর ফল, ভবাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসঙ্গই দেহ ধারণের ফল, এবং ভবাদৃশ ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল, অতএব এতাদৃশ ভক্তগণ সংসারে সুদুর্ল্লভ।

এত কহি কহে প্রভু, শুন সনাতন।

কৃষ্ণ বড় দয়াময়,—পতিত পাবন॥

মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার।

কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।

আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥

অতঃপরে মহাপ্রভুর প্রশ্নে সনাতন কারা হইতে বিমুক্তির সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, প্রয়াগে শ্রীরূপ ও বল্লভের সহিত আমি কিছু দিন একত্র ছিলাম। তাহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছি। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, সনাতনকে স্নান করাও এবং তাহার বেশাদি দূর করাইয়া ভদ্রভাব ধারণ করাও। সনাতন কারাগারে ছিলেন, কেশশ্মশ্রু প্রভৃতি নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকিয়া সনাতনের ক্ষৌরকার্য্য করাইলেন, গঙ্গায় স্নান করাইলেন, পরিধানের জন্য একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন সেই নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে প্রভুর আনন্দ হইল। তপন মিশ্র ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিলেন। মিশ্র ও সনাতন প্রভুর শেষ-পাত্র প্রার্থী হইলেন। সনাতনের জীর্ণ মলিন বসন দেখিয়া মিশ্র একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন

বলিলেন, 'আমি এই নূতন বস্ত্র লইব না। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমায় একখানা পুরাতন ধুতি দিন।' মিশ্র তাহাই দিলেন। সনাতন তাহা দ্বারা দুইখানি বহির্বাস ও কৌপীন করিয়া লইলেন। অতঃপরে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভু সনাতনের মিলন করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, যত দিন আপনি কাশীতে থাকিবেন ততদিন আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা করিবেন। সনাতন বলিলেন, 'আপনার অনুগ্রহ-বাক্যে আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের ঘরে দীর্ঘকাল ভিক্ষা লইব না। মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিব।' নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এক বাড়ী হইতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাদ্বারাই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। মধুকর ভ্রমর যেমন নানা স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করে, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণও গৃহস্থ-গণের গলগ্রহ না হইয়া পাঁচ, সাত বা ততোধিক গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করেন। ইহারই নাম,—মাধুকরী বৃত্তি।

সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব॥

সনাতনের এইরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইল। সনাতন কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, বহির্বাস ব্যবহার করিতেছেন, মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, লক্ষপতি সনাতন আজ নিষ্কিঞ্চনের বেশে পথের ভিখারী হইয়াছেন, মহামহোপাধ্যায়কল্প পরম পণ্ডিত আজ সরল নিরক্ষর লোকের ন্যায় দীনাতিদীন হইয়াছেন— ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ; কিন্তু তাঁহার দেহে শ্রীকান্ত-প্রদত্ত সেই মূল্যবান ভোট কম্বলখানি দেখিয়া, প্রভু কিছু না বলিয়া ভোট কম্বলের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন। সুচতুর সনাতন প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিয়া ভোট কম্বল ত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সনাতন ভোট কম্বল খানি লইয়া গঙ্গাতটে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী গৌড়ীয়া তাহার জীর্ণ শীর্ণ কন্থাখানি গঙ্গায় ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতেছে। তাহাকে বলিলেন,—ভাই, তুমি আমার একটু উপকার কর, আমার এই ভোট কম্বল তুমি লও আর তোমার ঐ কন্থাখানি আমাকে দেও। ইহাতে গৌড়ীয়া বলিল, আপনি ভাল লোক হইয়া এইরূপ উপহাসের কথা বলিতেছেন কেন? কোথায় মূল্যবান ভোট কম্বল আর কোথায় জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাঁথা। ইহা-তো উপহাসের কথা! সনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—উপহাসের কোন কথা নয়। আমি সত্য কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভোট কম্বলের আমার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ কাঁথাই আমার প্রয়োজন।" পরিশেষে গৌড়ীয়া বুঝিতে পারিল, সনাতন সত্য সত্যই কম্বলের বদলে কাঁথা চাহিতেছেন। সে কাঁথা খানি দিয়া ভোট কম্বল খানি লইল। সনাতন ছেঁড়া কাঁথা গলায় দিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল?" সনাতন ভোট কম্বল ত্যাগের কথা প্রভুকে জানাইলেন।

"প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ-রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥

সনাতন বলিলেন, সকলই আপনার ইচ্ছা,—আপনারই কৃপা।

অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীপাদসনাতনের শিক্ষাবিষয়ক, বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে তাহার সবিস্তার আলোচনা করা হইবে। শ্রীচরিতামৃতে অন্তলীলায় আবার শ্রীরূপ সনাতনের

চরিত -সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তাহাও আলোচিত হইতেছে।

মহাপ্রভুর আদেশ মত শ্রীরূপ বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হরিদাসের ভজন-কুটিরে আশ্রয় পাইলেন। মহাপ্রভু যথাসময়ে আসিয়া দেখা দিলেন এবং কুশল-প্রশ্ন ও ইষ্ট-গোষ্ঠী করিয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ কহিলেন, আমার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই। প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম, তিনি শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমন করিয়াছেন। আমার কনিষ্ঠ অনু-পমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। এই সকল বার্ত্তা বলিয়া রূপ নীরব হইলেন।

মহাপ্রভু অন্যান্য ভক্তের সহিত এখানে শ্রীরূপের মিলন করিয়া দিলেন। উড়িয়া এবং গৌড়ীয়া ভক্তগণ রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রতি দিন হরিদাসের ভজন-কুটিরে আসিয়া মহাপ্রভু হরিদাস ও রূপকে দেখা দিতেন এবং অনেক প্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। হরিদাসের ভজন-কুটির ভক্তগণের পরমানন্দের কেন্দ্রস্থলী হইয়া উঠিল।

কিয়দ্দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। একদিবস মহাপ্রভু শ্রীপাদ-রূপ বিরচিত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুইখানি নাটকের সূচনা আলোচনা করিয়া ভক্তবৃন্দকে তাহার সুধাস্বাদ পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ, রামানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ইহার আস্বাদনে ব্রতী হইলেন। এই দুইনাটক আলোচনায় হরিদাসের কুটিরে প্রেমানন্দের যে অফুরন্ত বিপুল উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সময় ও সুবিধা হইলে মূলগ্রন্থে এই সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

সেই নাটকীয় ঘটনা-শ্রবণান্তে সুবিজ্ঞ সুরসিক, প্রেমিক ভক্ত, রায় রামানন্দ সহস্রমুখে রূপের কবিত্ব প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে নিবেদন করেন :—

"কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥"
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥
তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, প্রয়াগে ইঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, আমি ইঁহার গুণমুগ্ধ। ইঁহার সালঙ্কার কাব্য মধুর-প্রসঙ্গে বিরচিত। এইরূপ কাব্য ভিন্ন রস প্রচার হয় না।

"সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজ-লীলা-প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাঁহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তি-শাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥"

হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্ত সকলেই রূপকে আলিঙ্গন করিলেন, পরস্পর রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন, শ্রীরূপ ঠাকুর তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি যাহা বর্ণনা করিয়াছ, কয়জন ইহার

মৰ্ম্ম বুঝিতে পারে? শ্রীরূপ, লজ্জিত ভাবে বলিলেন, আমি অত্যন্ত অজ্ঞ, কিছুই জানিনা, যাহা কিছু লিখিয়াছি, সকলই মহাপ্রভুর কৃপায়।

"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্য॥"

দোল-যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণান্তে গিয়া অবস্থান করিলেন; মহাপ্রভু রূপের প্রতি বহুল কৃপা ও বহুল শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার সময়ে বলিলেন:— ·

বৃন্দাবনে যাও তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে॥
ব্রজে যাই রস-শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তথা করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥

শ্রীরূপ অশ্রুজলে মহাপ্রভুর চরণ পরিসিক্ত করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। রূপের নয়নজল তখনও থামিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরূপ বিবশের ন্যায় ভক্তগণের চরণে পড়িয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-নখচ্ছটা নয়নে লইয়া শ্রীরূপ গৌড়ের পথে আবার বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে গৌড়দেশে শ্রীপাদ রূপের প্রায় এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। যেহেতু শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃযুগল উন্মত্তের ন্যায় মহাপ্রভুর অনুরাগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন কিন্তু, বিষয়াদির, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তখনও করেন নাই, তখনও বল্লভ জীবিত

ছিলেন,—শ্রীজীবের মতিগতি কোন্ দিকে যাইবে, তখনও তাহা স্থির হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়দেশে বল্লভের মৃত্যু হইল। শ্রীজীবও গার্হস্থ্য লইবেন না। তখন বিষয়াদির শেষ-ব্যবস্থা করা—শ্রীরূপের একটা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল, যথা—চৈতন্য চরিতামৃতে :—

এক বৎসর রূপ গোঁসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁট করি দিল॥
সব মনকথা গোঁসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা প্রকাশ করিলা॥

শ্রীরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্তগণের সহিত ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বোপরি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণের সঙ্গে ভজন সাধনে এবং শ্রীগৌরগোবিন্দ ও রাধা-গোবিন্দ-লীলারস-আস্বাদনে ও লীলারসময়ী ইষ্টগোষ্ঠীতে সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে অতঃপরে তিনি আর কোথাও গমন করেন নাই। কেননা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি বৃন্দাবন হইতে আর কোথাও যাইও না।

শ্রীরূপের গৌড়ে অবস্থান কালে মথুরা হইতে সনাতন ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। এই নির্জ্জন বনপথ অতি ভীষণ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে খাদ্যাদির অভাব। সনাতন

কখনও উপবাস করিয়া কখনও শুষ্ক চানাদি চর্ব্বণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ঝাড়িখণ্ডের জল ভাল নয়, তাহার উপরে উপবাস,—ইহার বিষময় ফলে সনাতনের দেহে কণ্ডু, ব্রণ, চুলকান প্রভৃতি রোগ দেখা দিল। কণ্ডুয়নে কণ্ডুয়নে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া দেহ হইতে রক্তরস পড়িতে লাগিল। দেহের দুরবস্থা দেখিয়া সনাতনের মনে নির্ব্বেদ আসিল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একেত আমি নীচ জাতি,—তাহার উপরে দেহের আবার এই দুরবস্থা,—নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দেবের দর্শন পাওয়া আমার পক্ষে বড়ই অসম্ভব। কেননা আমার তুল্য নীচ জাতীয় ব্যক্তির পক্ষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নাই। প্রভুর দর্শন ও সর্ব্বদা পাইব না। শুনিয়াছি প্রভুর বাসা জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট। জগন্নাথের সেবকগণ সর্ব্বদা ঐ পথে যাতায়ত করেন। তাঁহাদের শরীরে আমার এই অপবিত্র অধম দেহ যদি দৈবাৎ সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার অপরাধের সীমা থাকিবে না। এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য? যখন আসিয়াছি তখন একবার প্রভুর চরণ দর্শন করিব। রথের সময় জগন্নাথদেবও বাহির হইবেন; সেই সময়ে রথের সম্মুখে প্রভুকে এবং রথের উপরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া রথচক্রের তলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ইহাতে আমার দুঃখ-শান্তি হইবে ও সদ্গতি হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সনাতন পুরীতে আসিলেন, হরিদাসের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য সনাতনের প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইল। এমন সময়ে মহাপ্রভু আসিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুকে দেখামাত্রই দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িয়াছিলেন; মহাপ্রভু তাহা দেখিতে পান নাই। হরিদাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সনাতনকে দেখাইয়া দিলেন,— ঐ দেখুন, সনাতন আপনার চরণে প্রণত হইয়া রহিয়াছে। সনাতনকে দেখিয়া তিনি চমৎ-

কৃত হইলেন, আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ দিকে সরিতে লাগিলেন, যথা,—

মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়ি তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আর কণ্ডু-রসাগায়॥

কিন্তু প্রভু সে কথা কাণেই করিলেন না। বলপূর্ব্বক সনাতনকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের কণ্ডু-রস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। তাহাতে সনাতন মর্ম্মাহত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন করিয়া দিলেন এবং পিণ্ডার উপরে উপবেশন করিলেন। সনাতন ও হরিদাস পিণ্ডাতলে বসিলেন। প্রভু সনাতনকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার চরণ দেখিবার সৌভাগ্য পাইলাম, ইহা হইতে কুশল আর কি হইতে পারে? প্রভু বলিলেন, রূপ এখানে দশমাস কাল ছিলেন। দশদিন হইল গৌড়ে চলিয়া গিয়াছেন। তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হইয়াছে। আহা! অনুপম লোকটী বড়ই ভাল ছিলেন। রঘুনাথে তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল।"

এ কথা শুনিয়া সনাতনের মনে অনুপমের গুণের কথা উদিত হইল। তিনি শোকজড়িত করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, প্রভু দয়াময়, আপনার নিকট আর কি বলিব? অতি নীচ বংশে আমার জন্ম, অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্য করাই আমার কুলধর্ম্ম। কিন্তু আপনি পরম কৃপাময়, ঘৃণা না করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমার অনুপম ভাই শিশুকাল হইতে দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসনা করিত, রাত্রিদিন রঘুনাথের নাম করিত ও ধ্যান করিত, নিরবধি রামায়ণ শুনিত এবং রামায়ণের গান করিত। আমি আর রূপ তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। সে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে থাকিত, আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও ভাগবত শুনিত। আমি একবার তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলাম,:—

—শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম-বিলাস প্রচুর ॥
কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব প্রভু-কথা-রঙ্গে ॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥

বল্লভ আমাদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই স্বীকার করিল। কিন্তু রাত্রিকালে তাহার মনে চিন্তা হইল, আমি কি করিয়া রঘুনাথের চরণ ছাড়িব? এই ভাবিয়া দীনহীন সরল শিশুর ন্যায় সারা-রজনী রোদন করিয়া জাগরণ করিল, প্রাতঃকালে আসিয়া আমাদিগকে বলিল :—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হ'লে প্রাণ ফাটি যায় ॥

অনুপমের এই কথা শুনিয়া আমরা উহার নিষ্ঠাময়ী ভক্তির মহিমা বুঝিলাম,—বলিলাম, তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। ইহাতে অনুপম সন্তুষ্ট হইল। দয়াময়, অনুপমের এই নিষ্ঠাময়ী-ভক্তি, তোমারই কৃপার ফল। মহাপ্রভু বলিলেন, সে যাহা হউক,—সনাতন, তুমি এখানে আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। তুমি এই ঘরে হরিদাসের সহিত একত্র অবস্থান কর।

"কৃষ্ণভক্তি-রসে দোঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণ-রসাস্বাদ কর, লহ কৃষ্ণ নাম ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া গেলেন, গোবিন্দ দাসের দ্বারা প্রসাদ পাঠাইলেন।

সনাতন জগন্নাথ মন্দিরে যাইতেন না, মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিতেন। প্রভু এখানেই আসিয়া হরিদাস ও সনাতনের সহিত দেখা করিতেন, ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণকথা কহিতেন এবং জগন্নাথমন্দিরে যে সকল প্রসাদ পাইতেন, তাহা এই উভয়কে প্রদান করিতেন।

একদিন প্রভু সহসা সনাতনের নিকট আসিয়া বলিলেন, সনাতন, তুমি কি মনে কর,—দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়? তাহা হইলে কোটি দেহ ছাড়িতেই বা বাধা কি? দেহত্যাগেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। ভজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণ প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। দেহ-ত্যাগাদি, তামস ধর্ম্ম। তমো-রজ ধর্ম্মে কৃষ্ণকে পাওয়াযায় না।

"ভক্তি বিনে কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥"
দেহ ত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম, পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, তেঁহো না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম-ধন॥

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন্ ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব বিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

এস্থলে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রসঙ্গ ক্রমে ভগবৎ-প্রাপ্তির যে প্রকৃষ্ট সাধনার কথা বলিলেন, তাহা সর্ব্বসাধনার শ্রেষ্ঠ। সনাতন চমৎকৃত হইলেন এবং বুঝিলেন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার মনের কথা জানিয়া আমায় বুঝাইলেন যে দেহত্যাগ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তখন তিনি কাতরকণ্ঠে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, আপনি পরম কৃপালু ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আমি অধম ও পামর। আমার এই অপবিত্র অযোগ্য দেহে আপনার কোন কাজ সাধিত হইবে?" ইহার প্রত্যুত্তরে—

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥

কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥
নিজ প্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহা রহি ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে ॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব ॥

সনাতন বলিলেন, আপনাকে শত কোটী নমস্কার, আপনার গম্ভীর হৃদয়ের ভাব বুঝিবার শক্তি আমার নাই। কুহক যেমন কাষ্ঠ-পুত্তলীকে নৃত্য করায়, আপনি আমাকে সেইরূপ পরিচালিত করিতেছেন।

হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমার ভাগ্যমহিমার সীমা নাই। তোমার দেহকে প্রভু নিজধন বলিয়া মনে করিয়াছেন। প্রভুর শ্রীমুখের উক্তিতে বুঝা গেল, তোমা দ্বারা তিনি ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্র, আচার নির্ণয়াদিতত্ত্ব জনসমাজে প্রচার করিবেন। কিন্তু আমার এই দেহ বৃথা। ইহা দ্বারা প্রভুর কোন কার্য্য সম্পন্ন হইল না। সনাতন বলিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে তোমার মত মহাভাগ্যবান্ লোক কয়টী আছে? শ্রীনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর এই অবতার, প্রভু সেই মহাকার্য্য তোমা দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছ, সকলের সমক্ষে নাম-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছ :—

"আপনি আচারে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥
আচার প্রচার নামে কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥

হরিদাস ও সনাতন এইরূপে একত্র অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথার রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। আবার রথযাত্রার সময় আসিল, গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ষার চারিমাস তাঁহারা পুরীধামে অবস্থান করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভক্তগণের সহিত প্রভু সনাতনের মিলন করিয়া দিলেন। সনাতন সকলেরই প্রিয় :—

সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপামৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥

বর্ষার চারিমাস অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। সনাতন মহাপ্রভুর চরণান্তে পড়িয়া রহিলেন। বৈশাখ মাসে তিনি মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়াছিলেন ; জ্যৈষ্ঠ মাসে মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্য-বিনয় ও তৃণাদপি নীচতার যে একটী নিদর্শন ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত :—

মহাপ্রভুর গম্ভীর লীলা,—সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে। বৈশাখ অতিবাহিত হইল, জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত। ভীষণ গ্রীষ্ম বেলা এক প্রহর হইতে না হইতেই বালুকা অগ্নিবৎ প্রতপ্ত হইয়া উঠে, তখন পথে চলা ভয়ানক ক্লেশকর। প্রভু সকাল বেলায় যমেশ্বর টোটায় আসিলেন। ভক্তগণের অনুরোধে সেইখানে ভিক্ষাকার্য্য সমাধান করিতে হইবে। মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনকে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বানে সনাতনের বড় আনন্দ হইল। জ্যৈষ্ঠের ভয়ঙ্কর নিদাঘে সমুদ্র তটের বালুকা আগুণের মত প্রতপ্ত হইয়াছে। সনাতন প্রভুর আহ্বান-জনিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই অগ্নিসম প্রতপ্ত বালুকা পথে প্রভুর নিকটে আসিলেন। "তপ্ত" বালুকাতে তাঁহার পা পুড়িতে লাগিল, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ

করিলেন না। পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়া গেল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ভিক্ষান্তে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতে ছিলেন, তখন সনাতনের সঙ্গে দেখা হইল না। গোবিন্দ সনাতনকে প্রভুর ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রদান করিলেন, প্রসাদ-প্রাপ্তির পরে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রভু বলিলেন,—কোন পথে আসিয়াছ?

সনাতন বলিলেন, সমুদ্র-পথে আসিয়াছি। মহাপ্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সমুদ্র পথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আসিলে কেন? সিংহদ্বারের শীতল পথে কেন আসিলে না? আহা! তপ্ত বালুকায় তোমার পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে। তুমি ভালরূপ চলিতে পারিতেছ না।

সনাতন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন বেশী কষ্ট পাই নাই। পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে তাহাও বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই। আমি অস্পৃশ্য পামর, সিংহদ্বারের পথে চলিতে আমার অধিকার নাই। জগন্নাথদেবের সেবকগণ সর্ব্বদা ঐ পথে যাতায়াত করেন। কাহারও সহিত এই জঘন্য দেহের স্পর্শ হইলে আমার অপরাধের সীমা থাকিবে না। ভয়ানক সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল। তিনি তুষ্ট হইয়া সনাতনকে বলিতে লাগিলেন:—

——যদ্যপিও হও তুমি জগৎ পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক,—দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈলা মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?

এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার দেহের কণ্ডুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। ইহাতে সনাতনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইত। তিনি সরিয়া গেলেও প্রভু জোড়পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেন। সনাতনের এই দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। প্রভুর প্রিয়পাত্র জগদানন্দ কোন সময়ে সনাতনের নিকট আসিলেন, কিয়ৎক্ষণ কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। এই সময়ে জগদানন্দের নিকট সনাতন তাঁহার মনদুঃখ জানাইয়া বলিলেন :—এখানে আসিয়া প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া চিত্তের চিরদুঃখ খণ্ডন করিব ইহাই মনে করিয়া আসিলাম কিন্তু যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, প্রভু সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না। এখন দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি জোড় করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কণ্ডুরসা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লাগে, বোধ হয় এই অপরাধ হইতে আমি কোটী জন্মেও নিস্তার পাইব না। পুরীধামে আসিলাম বটে, কিন্তু আমি যবনতুল্য বলিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনেও আমার অধিকার নাই,—ইহাও এক অপার দুঃখ। হিতের জন্য আসিলাম বিপরীত হইয়া গেল, কি করিলে যে হিত হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। পণ্ডিত, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, বলুন। জগদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমার মনে হয়, শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাওয়াই আপনার কর্ত্তব্য।

আর একদিন মহাপ্রভু সনাতনের নিকট আসিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবার সনাতন নির্ভীকভাবে নিজের মর্ম্ম-দুঃখের কথা প্রভুর পদে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—একেত আমি অস্পৃশ্য, পামর, নীচজাতি—তাহার উপরে আমার গায়ে রক্তরসা। উহা আপনার শ্রীঅঙ্গে লাগে, উহাতে আমার ভীষণ অপরাধ হইতেছে। এ অবস্থায় আমার এখানে থাকা অত্যন্ত অনুচিত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাশয়কে এই দুঃখের কথা জানাইয়াছিলাম, তিনিও আমাকে রথযাত্রার পরে

শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ করিলেন। তাঁহার উপদেশই আমার শিরোধার্য্য।

মহাপ্রভুর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন,— সেদিনকার জগা,—সেও তোমাকে উপদেশ দেয়?

কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হইল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেশ্টা তুমি, প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালক, করেঐছে কার্য্য॥

সনাতন মহাপ্রভুর রোষ-ভাব দেখিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, আজ আমি জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় বুঝিতে পারিলাম :—

——"জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়-সুধারস।
মোরে পীয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা-রস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য,—তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥

মহাপ্রভু ইহাতে কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তোমা হইতে জগদানন্দ আমার কোন প্রকারেই প্রিয় নহে। আমি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিনা।

কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্র প্রবীণ।
কাঁহা জাগা কালিকার বটুকা নবীন॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাইছ ব্যবহারভক্তি॥

জগদানন্দ তোমাকে উপদেশ করে, ইহা আমি আদৌ সহিতে পারিব না।

সরলচিত্তেই আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছি। তোমাকে আমি বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্তুতি করি না, তোমার গুণেই তোমার প্রশংসা হৃদয় হইতে স্বতঃই মুখ ফুটিয়া বাহির হয়। তুমি তোমার দেহকে বিভৎস বলিয়া জ্ঞান কর কিন্তু আমার নিকট তোমার দেহ অমৃত বলিয়া মনে হয় তোমার দেহ অপ্রাকৃত,—কখনও প্রাকৃত নয়,—তথাপি তুমি উহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি কর। ধরিয়া লইলাম, তোমার দেহ যেন প্রাকৃতদেহ,—কিন্তু তাহা হইলেও অমি কি উহা উপেক্ষা করিতে পারি? সন্ন্যাসীর প্রাকৃত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান রাখিতে নাই।

"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোচিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ॥
শ্রীভাগ ১১ স্কন্ধ ২৮ অঃ ৪র্থ শ্লোকঃ।

দ্বৈত পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু ভাল কোন বস্তু মন্দ তাহার নির্ণয় করা যায়না, কেননা চক্ষে যাহা দেখা যায় কাণে যাহা শুনা যায় সংক্ষেপতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার সকলই মিথ্যা। মিথ্যা জ্ঞানের আবার ভাল মন্দ কি আছে।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

"বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"
শ্রীভগবদ্গীতা ৫ম অঃ, ১৮ শ্লোক।

যিনি, বিদ্যা-বিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ-গো-হস্তি-কুকুর এবং চণ্ডাল সকলেই—পরম কারণরূপে সমানভাবে বিদ্যমান পরমাত্মাকেই অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥
শ্রীভগবদ্গীতা ৬ অঃ, ৮ম শ্লোকঃ।

যাঁহার চিত্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী এবং যিনি মৃৎশিলায় ও সুবর্ণে ভালমন্দ-বুদ্ধি রহিত,—সেই নিষ্কামকর্ম্মযোগীই আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য।

"সনাতন, তুমিত জান, আমি সন্ন্যাসী, চন্দনে ও পঙ্কেতে সমান-জ্ঞান করাই আমার ধর্ম্ম। যদি আমার সেরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আমার সন্ন্যাস লওয়াই বৃথা হইয়াছে; এইরূপ হইলে আমার সংসার ছাড়িয়া কি লাভ হইল? তোমার শরীরে ব্রণ হইয়াছে, রক্তরসা নিসৃত হইতেছে, তাই বলিয়া কি আমি তোমায় ঘৃণা করিব? ঘৃনা-বুদ্ধি করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না কি?

হরিদাস বলিলেন, প্রভু, আমি তোমার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এইগুলি তোমার বাহ্য প্রতারণা মাত্র। তুমি যে আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহাতেই আমরা তোমার অশেষ দয়ার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার আবার সন্ন্যাস কিসের,—আর সন্ন্যাসোচিত সমজ্ঞানই বা কি? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মত অধম অস্পৃশ্য পামরদিগকে তুমি আপন করিয়া লইয়া কেবল দয়ারই পরিচয় দিয়াছ।

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা ভাল তাহাই হউক, তাহা হইলেও আমি তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমরা আমার সন্তানের মত লাল্য এবং আমি তোমাদের পিতামাতার ন্যায় লালক। পিতামাতা কি কখনও সন্তানের দেহকে ঘৃণা করেন? কিম্বা সন্তানের মলমূত্রকে ঘৃণা করেন? কোলের সন্তানের মল মায়ের শরীরে লাগিলে কখনও কি মায়ের ঘৃণার উদয় হয়? বরং মাতা সন্তানের লালনে এবং পালনে মল-মূত্র পরিষ্কারাদি কার্য্যে মহাসুখই প্রাপ্ত হন।

মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আরও মহাসুখ পায়॥

লাল্য-মেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥

হরিদাস বলিলেন, তোমার গম্ভীর হৃদয়ের ভাব কে বুঝিতে পারে? গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া তুমি তাহার দেহকে কন্দর্প তুল্য করিয়া দিয়াছিলে। তোমার কৃপা-তরঙ্গ বুঝিতে পারে, জগতে এমন কে আছে? মহাপ্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, হরিদাস, আমি পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত নয়, তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত,। ভক্তদেহ চির দিনই চিদানন্দময়।

দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্ম
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্ম ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

শ্রীভাগ ১১ স্কন্দ, ২৯ অঃ, ৩২ শ্লোক।

"মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভের যোগ্য হয়।"

মহাপ্রভুর এই সকল মহাবাক্য মহামূল্যবান্। দীক্ষা-ব্যাপারটা একটী গুরুতর কার্য্য। বিষ্ণু-যামলে লিখিত আছে—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ স্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ॥

অর্থাৎ যে কার্য্যেতে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়, এবং পাপ-ক্ষয় হয়, মন্ত্র-বিদ্গণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন। চিত্তের সবিশেষ পরিবর্ত্তন-সাধনের

উদ্দেশ্যে দীক্ষার প্রয়োজন। দীক্ষা নবজীবন দান করে। তত্ত্ব-সাগর গ্রন্থে লিখিত আছে :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

যেমন রসযোগে কাঁসা স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দীক্ষা-বিধানে শূদ্রাদি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কারণে দীক্ষা-প্রভাব জনিত বৈষ্ণবদেহকে অপ্রাকৃত বলিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু।"

ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহ অপ্রাকৃত হয়। নামের প্রভাবে ও ভক্তি-প্রভাবে দেহে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। তাই মহাপ্রভু বলিলেন,—ভক্তের দেহ চিদানন্দময়। হরিদাস, সনাতনের দেহে কণ্ডু-সৃষ্টি করিয়া দয়াময় ভগবান্ আমার পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। আমি যদি ঘৃণা করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম।' এই বলিয়া আবার মহাপ্রভু সনাতনকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাহার দেহ হইতে চন্দনের সুগন্ধ উদ্গত হইল, দেহের কণ্ডু তিরোহিত হইল, সনাতন স্বর্ণকান্তি ধারণ করিলেন। প্রভুর আশ্চর্য্য করুণা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। দোলযাত্রা-অন্তে মহাপ্রভুর স্নেহময় শ্রীচরণ নিকট হইতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সনাতন বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন শ্রীপাদ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ভক্তিগ্রন্থ-আনয়ন, ভক্তি-শাস্ত্র-প্রণয়ন লুপ্ততীর্থ, উদ্ধারণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তি-গ্রন্থ-সার।
মূঢ় অধম জনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার॥
প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার॥

দ্বাপর-যুগান্তে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অবসানে শ্রীবৃন্দাবন নীরব ও নির্জ্জন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এই জগতে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে বৃন্দাবনের বর্ত্তমান্ বৈভব প্রকাশিত হইল। তিনি শ্রীমৎ লোকনাথ, ভূগর্ভ ও শ্রীসনাতনাদি প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী দ্বারা ব্রজভূমির বর্ত্তমান্ অবস্থা ও পূর্ব্বগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শত শত নিষ্ঠাবান্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের পদাশ্রয় করিলেন। রূপ সনাতন শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ। ইঁহারা ভগবৎশক্তি লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নানাপ্রকারে বৃন্দাবনের উন্নতি-সাধনই ইঁহাদের জীবনের মহাব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ইঁহারা বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন ইঁহাদের হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিলনা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে একদিকে যেমন ইঁহাদের পারমার্থিক কার্য্য-শক্তি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে লুপ্ততীর্থ সমূহের সমুদ্ধার, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অশেষ কারুকার্য্যময় বৃহৎ বৃহৎ শ্রীমন্দিরাদি বিনির্ম্মাণ প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনের বহিঃশোভা-সম্পাদনাদি এবং আরও নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্য এই ভ্রাতৃযুগলের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই রূপাদেশ, শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিন্তু উহার আকর স্থান মুরারি গুপ্তের কড়চা। তাহাতে লিখিত আছে :—

বৃন্দাবনায় গন্তব্যং ভক্তিশাস্ত্র-নিরূপণম্।
লুপ্ততীর্থ-প্রকাশশ্চ তন্মাহাত্ম্যমপি স্ফুটম্॥
কর্ত্তব্যং ভবতা যেন ভক্তিরেব স্থিরা ভবেৎ।
যামাশ্রিত্য সুখেনৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমাধুরীং॥
পিবন্তি রসিকা নিত্যং সারাসার-বিচক্ষণঃ।
স আহ ত্বং কৃপা সর্ব্বফলদা মম পাবনী॥

এই আদেশ মহামন্ত্রের ন্যায় উভয় ভ্রাতার হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। ইঁহারাও ইহা দয়াময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মহাকৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে কালিয়া-দহেরঅদূরবর্ত্তী যমুনা-তটে আদিত্যটীলায় প্রথমতঃ কুটির বাঁধিয়া অবস্থান করেন। প্রাচীন সময়ে এই স্থানটী প্রস্কন্দনতীর্থ নামে অভিহিত হইত। ভগবৎ-অনুরাগজনিত বৈরাগ্য উভয় ভ্রাতাকে আহার-নিদ্রা-চিন্তা হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছিল। মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেন এবং শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদনে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শাস্ত্রগ্রন্থ-সংগ্রহ, ভক্তিশাস্ত্র-বিরচন ইঁহাদের জীবনের প্রধানতম সাধনা হইয়াছিল।

সনাতন মথুরার এক চৌবে-ঠাকুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনগোপাল-মূর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হন। তিনি মাধুকরী উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই এই শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া আসিতেন। চৌবে ঠাকুরের বিধবা পত্নীর সেবায় মদনগোপালের মন উঠিল না। এদিকে তাঁহার প্রতি সনাতনের গাঢ় অনুরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। চৌবে-পত্নীর প্রতি স্বপ্নে আদেশ হইল "আমার সেবা তোমার পক্ষে কষ্টকর, বিশেষতঃ সাধু সনাতন আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তুমি অনুমতি দাও, আমি তাহার নিকটে যাই।"

পর দিবস চৌবে-পত্নীর বাড়ীতে সনাতনের আগমন মাত্রই

চৌবে-পত্নী বলিলেন, ঠাকুর তোমার নিকট থাকিবেন। তুমি উহাকে ভালবাস, ইনিও তোমাকে ভালবাসেন। আমি তোমাদের নিত্য প্রণয়ে বাঁধা দিব না। আমার সাধের ধন তুমি লইয়া যাও। আমার ভাগ্যে যাহা হয়, হইবে।" সনাতনের মনের সাধ পূর্ণ হইল। সনাতন তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে লইয়া আসিয়া আদিত্য-টীলায় ভজন-কুটিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যে প্রতি দিন কোন প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

জনশ্রুতি এই যে এই শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ দ্বারা ব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত অষ্টশ্রীমূর্ত্তির মধ্যে একতম। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও সেই অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম। এই শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সম্বন্ধে অনেক প্রকার জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। অনেক গ্রন্থকার বিস্তৃতরূপে তাহা লিখিয়াছেন। শুনাযায়, এই পার্ষদগণের পরবর্ত্তী সময় হইতে এই শ্রীমদন গোপাল, শ্রীমদনমোহন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার-ভয়ে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণ স্থানান্তরে নীত হন। এখন মদনমোহনের প্রতিভূ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিভূ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন সহরে পূজিত হইতেছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপ আরও অনেক শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন ও বহুল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়া সেই সকল স্থানে শ্রীমূর্ত্তির সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নিজেদের ভজনসাধন ও গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য, কখনও বা গোবর্দ্ধন-তটে, কখনও বা রাধাকুণ্ড-তীরে, কখনও বা গোকুলের নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রথমতঃ একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিতেন না। শ্রীরূপ ব্রজধামের সর্ব্বেসর্ব্ব কর্ত্তা হইয়াছিলেন; শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর ধ্যানে থাকিতেন, সেই ধ্যান-অবস্থায় বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত যোগপীঠস্থ শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তির সন্ধান পান।

তিনি ধ্যানে দেখিলেন গোমাটীলানামক পুরাতন যোগপীঠের-ভগ্নাবশেষের উচ্চস্তূপের মৃত্তিকাভ্যন্তরে নয়নানন্দ শ্রীগোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুলোক সহকারে উক্তস্থানে যাইয়া আবর্জ্জনাময় মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিতে করিতে সহসা শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

এই বিগ্রহ প্রাপ্তি মাত্র শ্রীরূপ পত্রসহ কোন এক ব্যক্তিকে মহাপ্রভুর নিকটে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় অনুচর কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। জনশ্রুতি এই যে, কাশীশ্বর মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতে অনিচ্ছা-প্রকাশ করায় কাশীশ্বরের বিরহ-বেদনা-প্রশমনের জন্য প্রভু স্বস্বরূপ শ্রীগৌর-গোবিন্দ-বিগ্রহ কাশীশ্বরকে প্রদান করেন। এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের নিকট স্থাপিত করা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে পর্ণকুটীরগুলি মহামূল্যবান্ প্রাসাদতুল্য ইষ্টকমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। গোস্বামিগণ ও ভক্তগণ এই সময় বহু শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

রঘুনাথ ভট্ট নিজের শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের একটী ইষ্টক মন্দির নির্ম্মিত করান। তৎপরে অম্বররাজ মহারাজ মানসিংহ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বর্ত্তমান্ বিবিধ কারুকার্য্যপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের অশেষ নিদর্শন-স্বরূপ সুবৃহৎ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজধামে ভগবৎপার্ষদগণ ও তদনুচর ভক্তগণের দ্বারা যে সকল শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। মথুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার মথুরা সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে।

শ্রীপাদরূপ-সনাতনের ভজন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা উপসংহারে অল্পকথায় প্রকাশ করা যাইবে। সংক্ষেপত ইহাই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীভগবানের একান্ত অনুধ্যান ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি-বিরচণ একেবারেই অসম্ভব সুতরাং ইহাদের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ ও লীলাগ্রন্থ সমূহ,

—অশেষঅনুধ্যান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, দৈহিক শ্রম ও সুদীর্ঘকাল শাস্ত্র পরিচিন্তন, নিরন্তর নিষ্ঠাময়ী মহাসাধনার অমৃতময় ফল। আমার মনে হয় অর্থব্যয়ের নিদর্শনস্বরূপ শ্রীমন্দির-সমূহের স্থাপত্যশিল্প-প্রকর্ষ-বর্ণনাপেক্ষা শ্রীপাদ গোস্বামি দ্বয়ের প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময়, জ্ঞানময় ও আত্মময় অনবচ্ছিন্ন অনুধ্যানজনিত গ্রন্থসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের জীবন-বৃত্ত-গ্রন্থ গুলিতে এসম্বন্ধে আশানুরূপ আলোচনা দেখিতে পাই না। আমার ন্যায় অযোগ্যের দ্বারাও তাহা একেবারেই সম্ভাবিত নহে; তথাপি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইঁহাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে চিত্তে স্বতঃই বিস্ময়ের উদয় হয়। অধুনা ভারতবর্ষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানেও গ্রন্থাগার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এক্ষণে সংরক্ষিত হইতেছে। যে সময়ে শ্রীপাদ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ মথুরায় গমন করেন, তখন তৎতৎস্থানের শাস্ত্রচর্চ্চার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইঁহারা অন্য কোথাও না যাইয়া কেবল মথুরামণ্ডলে অবস্থান করিয়া কি প্রকারে অশেষ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সেই সকল গ্রন্থের বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বৃহদাকার বহুল গ্রন্থ রচনা করিলেন। যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ইঁহাদের গ্রন্থে আলোচিত গ্রন্থগুলির একটী তালিকা (Bibliography) প্রস্তুত করা; তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অনক্ষরপ্রায় ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিয়া ইঁহাদিগকে শাস্ত্রগ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য কত শ্রমযত্ন ও প্রয়াস করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যাইত না; সুতরাং গ্রন্থ-প্রাপ্তিও অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের গ্রন্থরাজিতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের নাম ও প্রমাণ বচন পাওয়া যায়, এখনকার অনেক বহুদর্শী সুপণ্ডিতেরও সেই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত জানা নাই। এমন কি আমরা এখন যে অষ্টাদশ পুরাণ

দেখিতে পাই, তাঁহার মধ্যে অনেকগুলি পুরাণই অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা অভিনবকল্পনা-সমুদ্ভূত। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি শাস্ত্রীয় বচনে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে যেসকল পুরাণবচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোন কোন বচন, বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদিও ভারতবর্ষের বহু স্থানে এক্ষণে প্রাচীন শাস্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে কিন্তু ইহাদের আলোচিত অনেক গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

এস্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীবের রচিত কোন গ্রন্থের আলোচনা করা হইবে না। কেবল শ্রীপাদসনাতনের ও শ্রীপাদরূপের গ্রন্থসমূহের কথাই বলা হইবে। শ্রীভাগবত-টীকা লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীজীব শ্রীপাদ সনাতনকৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শনী।
লীলাস্তবষ্টীপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণব তোষণী॥"

ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে ভাগবতামৃত দুই খণ্ড, হরিভক্তিবিলাস ও উহার দিগ্‌দর্শনী নাম্নী টীকা, লীলাস্তব এবং বৈষ্ণব-তোষণী নাম্নী ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনী, সনাতনকৃত। বর্ত্তমান্ সময়ে আমরা যে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাই, উহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-বিলিখিত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতি বিরচণ করিতে আদেশ করেন, যথা :—

"প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবার॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানোঁ আচার।
আমা হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥

তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ-হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে॥

এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন, প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতি আমাদ্বারা প্রকাশ কর তবেই উহা সম্ভবপর হইতে পারে, নচেৎ আমি নীচজাতি, তাহাতে অতি অধম, আমাদ্বারা এই কার্য্য সম্ভবপর নহে।

প্রভু ইহাতে সম্মত হইলেন, সনাতনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; সনাতন হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শেষ করিয়া ঊনবিংশ বিলাসের প্রারম্ভে লিখিলেন :—

শ্রীচৈতন্য-প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং স্বস্থ যেন হি।
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্॥

সনাতনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তিনি যে শক্তিরূপে সনাতনের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন, সনাতনের শ্রীমুখোক্তিই তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন "হরিভক্তিবিলাসে" লিখিত আছে, রূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থের সংগ্রহ করেন এবং ইহা তাঁহারই বিলিখিত সুতরাং সনাতন ইহার কর্ত্তা নহেন। আপত্তিকারীদের যুক্তিদ্বয় সকলেরই স্বীকার্য্য কিন্তু সনাতন যে এই গ্রন্থের কর্ত্তা নহেন,—এই উক্তি নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ অগ্রাহ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা* যায়, সত্যসঙ্কল্প মহাপ্রভু সনাতনকে হরিভক্তিবিলাস লিখিতে আদেশ করেন। তিনি যদি তাঁহার সেই সঙ্কল্প-অনুসারে কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার 'সত্য-সঙ্কল্পতা' গুণের লোপাপত্তি হয়।

২। শ্রীপাদ সনাতনের বিরুদ্ধেও ভীষণ দোষ-প্রসক্তির হেতু হয়। প্রভুর আজ্ঞা-অপালন-নিমিত্ত তাঁহারেই বা মহাঅপরাধ না ঘটিবে কেন?

৩। শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় "লঘু-তোষণী টীকার" উপসংহারে সনাতনকৃত যে সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার সে বাক্যও অসত্য হইয়া যায়।

৪। হরিভক্তি বিলাসের উনবিং বিলাসের মঙ্গলাচরণে সনাতনের হৃদয়ে প্রভুর প্রবিষ্টতা-সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি আছে এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও সনাতনের বৈষ্ণব-স্মৃতি-রচনা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর চরণে যে প্রার্থনা আছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতগুলি প্রমাণ উড়াইয়া দেওয়া সুবিচারকের পক্ষে সহজ ও সুসঙ্গত নহে।

এই গ্রন্থ যে গোপালভট্টের বিলিখিত এবং প্রমাণ-বচনগুলির-অনেক অংশ যে গোপালভট্ট দ্বারা সঙ্কলিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।"

বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী, প্রবীণ গোপালভট্ট গোস্বামী দ্বারা প্রমাণগুলি সংগৃহীত করিয়া লইয়াছিলেন। শাস্ত্র-মন্থনের কার্য্যভার এবং তৎসকল লিপি করার ভার, ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক।

অপর কথা এই যে সনাতন স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনয়ী, তাহার উপর তিনি যবনরাজের ভৃত্য ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রচারিত না হয় এবং সদাচারসম্পন্ন অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী ভট্ট গোস্বামীর নামে তখনকার হিন্দুসমাজে অতীব সম্মানের সহিত এই স্মৃতি প্রচারিত হয়, ইহাই শ্রীপাদ সনাতনের ইচ্ছা ছিল। সেজন্য এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট গোস্বামির বিলিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ অনুরাগ-বল্লীকারেরও এই অভিপ্রায়। আপত্তিকারীদের আপত্তির এইরূপ সুমীমাংসা সাধু-সজ্জন-সম্মত, যুক্তি সঙ্গত এবং প্রমাণ-প্রতিপন্ন।

ইহার টীকা দিগ্‌দর্শনীও সনাতনের লিখিত। এই টীকা না থাকিলে এই গ্রন্থোক্ত বৈষ্ণব ব্রততিথি-নির্ণয়ের মর্ম্মে প্রবেশ করা অতীব কঠিন

ব্যাপার হইত। যাঁহারা হরিভক্তি-বিলাসের ব্রততিথির নির্ণয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি প্রদান করেন তাঁহারাই মূলগ্রন্থের দুর্গম্যত্ব ও দুষ্প্রবেশ্যত্ব অনুভব করেন। অনেক স্থলেই এই দিগ্দর্শনী টীকা,—শাস্ত্রব্যবস্থারূপ ঘোর অন্ধকারে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় কার্য্য করে, অস্ফুট বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। অন্যান্যঅংশের সম্বন্ধে যাহাই হউক কিন্তু ব্রত-তিথি নির্ণয়াদি স্থলে দিগ্দর্শনী প্রকৃতপক্ষেই শাস্ত্রব্যবস্থা পথের পথহারা পথিককে প্রকৃত দিক্ দেখাইয়া দেয়। আমরা এই টীকাখানির অত্যন্ত পক্ষপাতী। শাস্ত্রের মীমাংসা ও দর্শনের প্রণালীবদ্ধ বিচার এই টীকায় পরিস্ফুট হয়। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি বৈধীভক্তি-আচরণের অতি সুন্দর সুনিয়ামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অনুসারে জীবনের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারিলে সে জীবন যে শান্তিময়, সুখময় ও আনন্দময় হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল বিধান নৈতিক মানসিক ও পারমার্থিক জীবনের পক্ষে পরম হিতকর।

ইহার প্রথমে গুরু-করনের আবশ্যকতা, গুরুর লক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, গুরু-শিষ্য পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রপ্রমাণসহ লিখিত হইয়াছে। জগতে কোন কার্য্য, বা কোন শিক্ষাই গুরু ভিন্ন হয় না। অতীন্দ্রিয় চিন্ময় অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে গুরুদেবই তাহার সহায় ও পথপ্রদর্শক। এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে গুরুর প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপরে মন্ত্রমাহাত্ম্য, দীক্ষাবিধি, সদাচারমাহাত্ম্য, প্রাতঃকৃত্য, শৌচবিধি, আচমনবিধি, সদাচারবিধি, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যাবিধি প্রভৃতির শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভগবন্মন্দির সংস্কার, স্নান-বিধি, তিলক-বিধি, মাল্যধারণ-বিধি, সুবিস্তৃত পূজাদির বিধান, শাস্ত্রপ্রমাণাদি সহকারে লিখিত হইয়াছে। নবম বিলাস পর্য্যন্ত নিত্যকর্ম্মের পরিপাটি-বিবরণ অতি সুবিস্তৃত।

এই সকল বৈধীভক্তির বিধান কর্ম্মাঙ্গ হইলেও নরনারীগণ এই সকল

কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের চিত্ত সুমার্জ্জিত ও ভগ অধিষ্ঠান ক্ষেত্ররূপে নিশ্চয়ই পরিণত হইতে পারে। হরিভক্তি বিলাসের বিধান মানিয়া চলিলে অতীব ঘৃণিত জীবও সমাজের পূজনীয় হয়। আমি অন্য কোন শাস্ত্রেই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মের এমন সুচারু বাহুল্য দেখিতে পাই নাই। সেবার এমনি পরিপাট্য আর কোথাও দেখা যায় না।

দশম অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ, ভগবৎ-শাস্ত্রপারতা, ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্য, ভক্তসঙ্গ-মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব-নিন্দাদোষ, বৈষ্ণব-সম্মান-নিত্যতা, বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবৎ-মাহাত্ম্য, ভগবৎশাস্ত্র-বক্তৃ-মাহাত্ম্য, ভগবৎ কথা ত্যাগাদিতে দোষ, তৎকথা শ্রবণে আসক্তির-গুণ, ভগবৎনাম মাহাত্ম্য, ভগবৎ লীলা-কথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি রুচি-উৎপাদক বিষয়ের সুবিস্তৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

একাদশ বিলাসেও সায়ান্তন-কৃত্য, অহোরাত্র অখিল কর্ম্মার্পণবিধি, ভগবৎ অর্চ্চনা মাহাত্ম্য, ভগবান্ নাম-কীর্ত্তন ও নাম জপ, ভগবদ্ভক্তি মাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ, শরণাপত্তির মাহাত্ম্য ও লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের এমন সুবিস্তৃত, শ্রেণীবদ্ধ, সুশৃঙ্খলাসমন্বিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় পাঠ করিলে চিত্তে স্বভাবতই অতি সহজে ভগবৎ-উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে। স্বয়ং ভগবান্ প্রকৃত পক্ষেই যে শ্রীপাদ সনাতনের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়া এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিরচিত করাইয়াছিলেন, মনে সহজেই সেই বিশ্বাস জন্মে।

দ্বাদশ হইতে ষোড়শ বিলাস পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের ব্রত-তিথি-কৃত্য ও মাসকৃত্য প্রভৃতি অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই কয়েকটী বিলাস দিগ্-দর্শনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে পাঠকগণের চিত্তে প্রকৃত তথ্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। আমি দেখিতে পাইতেছি আমার সমসাময়িক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই

দিগ্‌দর্শনী টীকার প্রতি মনোযোগ করেন না; টীকার অর্থবোধ করিতেও চেষ্টা করেন না। তাহার ফলে ব্রত তিথি-নির্ণয়ে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। সূক্ষ্মবুদ্ধি সুমাজ্জিত প্রতিভা ও সরলতাময়ী শ্রীশ্রীগৌরভক্তির অভাবে মীমাংসা-দর্শন ও বিচার-প্রণালী অনুসারে লিখিত এই বৈষ্ণবস্মৃতির বিচারে সঙ্কবপর হয় না। দিগ্‌দর্শনী টীকা এই কয়েক বিলাসের পঠন ও পাঠন কার্য্যে অতীব প্রয়োজনীয়। সপ্তদশ বিলাসে পুরশ্চরণ, অষ্টাদশ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তিনির্ম্মাণাদি-ব্যাপার, উনবিংশ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এবং বিংশ বিলাসে ভগবন্মন্দির-নির্ম্মাণ, বাস্তুপূজাদি, বৃক্ষরোপণ তুলসী বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাবিধি, উপসংহারে সংক্ষেপতঃ ঐকান্তিকী ভক্তির লক্ষণাদি লিখিত হইয়াছে। বিংশ-বিলাস-ময় এই মহাপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিন্দুজন-সমাজের পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে মহাপ্রভুর অনুগ্রহে শ্রীপাদ সনাতনের এক অক্ষয় অমৃতময় বিপুল দান। কেবল এই গ্রন্থের জন্যই বৈষ্ণবগণ সনাতনের নিকট চিরঋণী।

ইহার পরে "শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত",—ইহা প্রকৃতই অমৃত। পুরাণে লিখিতআছে দেবতা ও দানবগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃতের উদ্গম হইয়াছিল, তেমনি হলাহলও উদ্গত হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া শ্রীপাদ সনাতন এই যে ভাগবতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রাকৃত অমৃত অপেক্ষাও কোটী গুণে আদরের বস্তু। প্রাকৃত অমৃত প্রাকৃত দেহের পক্ষে উপকারী। নিত্য আত্মার সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই কিন্তু এই ভাগবাতামৃত মানুষকে বেদেরও দুর্লক্ষ্য বস্তুর সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া তুলে; ইহাতে মানুষ নিত্যানন্দের সন্ধান পায় এবং সেই আনন্দে আত্মা সমগ্র জগৎ ভুলিয়া, জগতের সুখ দুঃখ ভুলিয়া, অনুক্ষণ অনুভব করেন,—

"আনন্দমমৃতরূপং যদ্বিভাতি।"

বৃহৎ ভাগবতামৃত দুইভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থ খানি ভগবদ্ভক্তি-শাস্ত্রসমূহের সারস্য-সংগ্রহ—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে :—

"ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্য-সংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্য-দেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ॥

ইহা হইতে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পরা যায়। গ্রন্থকার নিজেই নিজের গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন, সেই টীকার নামও দিগ্‌দর্শনী,—দিগ্‌দর্শনী টীকায় স্বয়ং গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে ব্যখা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ : ভক্তি-গ্রন্থ সমূহের সারস্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সারস্য শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, তত্ত্ব বা হেয়রহিত অংশ। সুতরাং এই গ্রন্থখানি,—ভক্তিশাস্ত্র সমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ। বিনয়ভূষণ সনাতন নিজে এই গ্রন্থের প্রণয়ন-গৌরব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন এ খানি সংগ্রহ গ্রন্থ, আমার নিজের নহে। আমি কোথাও শাস্ত্রীয় প্রমাণের শ্লোকার্দ্ধ, কোথাও উহাদের পদাক্ষর, কোথাও বা উহাদের ভাব অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি সুতরাং এই গ্রন্থ যে প্রামাণ্য-মূলক তাহাও বলা যাইতে পারে। "একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে,—বহুভক্তিশাস্ত্রের একত্র সংঘোটন অতি দুর্ল্লভ; উহাদের রহস্যও দুর্জ্ঞেয়। তাহা হইলে এই সংগ্রহ-ব্যাপার কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? তজ্জন্য বলা যাইতেছে, বহিরন্তঃকরণ দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠাতৃ বাসুদেবের আত্ম-সাক্ষাৎ-কার হইলে তাঁহার ত্রিভঙ্গিম সুন্দর, বেণুবাদনকারী শ্রীনন্দকিশোর রূপের ধ্যানাদি-জনিত সেবাদ্বারা এই অসম্ভবও সম্ভাবিত হইতে পারে। যিনি অন্তর্য্যামী নিরুপাধি-সর্ব্ব-কৃপাকারী, যিনি ভগবান্, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রসাদে ধ্যানাদিদ্বারা হৃদয়ে স্বতঃই তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইলে সকল বিষয়েই স্ফূর্ত্তি সম্ভবপর হয়।

ইহার আর একটী অর্থ হইতে পারে তাহা এই :—শচীনন্দন চৈতন্যদেবের প্রিয় স্বীয় সন্ন্যাসবেশের পরিচিন্তনেও হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্বের স্ফুরণ হয়; অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় মদনুজ শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুভবরূপ অনুগ্রহেও এই দুর্ঘট ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে। ফলতঃ ভগবানের অনুগ্রহ-বিশেষের দ্বারা তাঁহার যে সাক্ষাৎ-অনুভব হয় তাহা হইতে সকল বিষয়েরই স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হয়, সুতরাং ইহাতে দুর্ঘটত্বের কোন আশঙ্কা নাই। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সূচী এইরূপ:—প্রথম খণ্ডে ভৌমনামধেয় প্রথম অধ্যায়, দিব্যনামধেয় দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রপঞ্চাতীত নামধেয় তৃতীয় অধ্যায়, ভক্তনাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রিয়নাম পঞ্চম অধ্যায়, প্রিয়তম নাম ষষ্ঠ অধ্যায়, পূর্ণনাম সপ্তম অধ্যায়, এই সাত অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরাগ্য নাম প্রথম অধ্যায়, জ্ঞান নাম দ্বিতীয় অধ্যায়, ভজন নাম তৃতীয় অধ্যায়, বৈকুণ্ঠ নাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রেম নাম পঞ্চম অধ্যায়, অভীষ্ট লাভ নাম ষষ্ঠ অধ্যায়, জগদানন্দ নাম সপ্তম অধ্যায় এই সাত অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি স্থূল সূচী। প্রত্যেক অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন, সুসিদ্ধান্তের মুক্তা-মালা গাঁথিয়া পাঠকগণকে স্নেহ উপহার প্রদান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী-ভক্তির বিবিধ তথ্য বর্ণন করা হইয়াছে। প্রথমে বন্দনাচ্ছলে গোপীমহিমা, শ্রীচৈতন্য বন্দনা, মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, গোবর্দ্ধন এবং ভগবানের নাম প্রভৃতির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রয়াগ তীর্থে মুনি সমাজ, ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-ভক্তি, দাক্ষিণাত্য রাজার বিষ্ণু-ভক্তি, ইন্দ্র ব্রহ্মা ও শিবের বিষ্ণু-ভক্তি, বৈকুণ্ঠ মহিমা, প্রহ্লাদের মহিমা ও বিষ্ণু-ভক্তি, হনুমানের বিষ্ণুভক্তি, উদ্ধব মহিমা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের মায়াবৃন্দাবন দর্শন, গোপবেশধারী

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে দ্বারকাবাসীর অধীরতা, নন্দ-যশোদার কৃষ্ণভক্তি, গোপীপ্রেম, প্রেমরোদন, শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার নাম উল্লেখ না থাকার কারণ প্রভৃতি বিষয় প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ধামপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধনা কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতি কামাখ্যাদেবীর উপদেশ, কাশীবাসী ও প্রয়াগবাসীর আচার-সাধনাদির তত্ত্বকথা, শ্রীক্ষেত্র, স্বর্গ, মহর্লোক, জন-লোক, তপলোক প্রভৃতির বিবরণ, ইন্দ্রিয়-মনঃসংযম, সমাধি, স্মরণ, প্রেম-ভক্তি, মুক্তি ও ভক্তি, নির্গুণ ও স্বগুণ, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, কর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য, শিব ও শিবলোক-মাহাত্ম্য, বৈকুণ্ঠ-মহিমা স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যানের অপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা, ব্রজ ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির সাধন, অবতারের কথা, ভগবন্মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময়ী, ভগবংশক্তি-বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীবিগ্রহমাহাত্ম্য, অযোধ্যা দ্বারকা গোলোক ও বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের করুণা ও ব্রজলীলা-বর্ণন, গোলোকপ্রাপ্তির উপায়, প্রেম প্রাপ্তির সাধন, মদনগোপাল দর্শন, গোলোকধাম দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গোলোক নাথ দর্শন ও গোলোক মাহাত্ম্য প্রভৃতি সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং টীকায় এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয় দিগ-দর্শনী টীকায় তালিকার আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী যে প্রকার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীপাদ সনাতনও দিগ্‌দর্শনী টীকায় সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। এস্থলে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম শ্রীপাদ সনাতনকৃত তালিকার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে, যথা :—

প্রথম অধ্যায়ে-শ্রীকৃষ্ণের পরম-শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়

অধ্যায়ে—ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে—শিবলোক হইতে বৈকুণ্ঠবাসীদের প্রতি ভাগবৎ-কৃপাধিক্য এবং বৈকুণ্ঠ-বাসী হইতে প্রহ্লাদের প্রতি ভগবৎ-কৃপাধিক্য শিবদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রহ্লাদ নিজমাহাত্ম্য হইতে হনুমানের মাহাত্ম্যাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। হনুমান্ আবার পাণ্ডবদিগের প্রতি ভগবৎ-কৃপাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের স্বকীয় মাহাত্ম্য অপেক্ষা যদুগণের প্রতি ভগবৎ-কৃপাধিক্য বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং যদুগণের মধ্যে উদ্ধবই যে ভক্ততম ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠে ব্রজ গোপীদিগের কৃষ্ণের প্রতি বিচিত্র প্রেম-বৈভব দেখিয়া উদ্ধবেরও যে মোহ হইয়াছিল, শ্রীনারদ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তমে গোকুলের মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম খণ্ড সপ্ত অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে গোলো-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বর্গাদি অপেক্ষা গোলোকমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমাধি ও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ স্বীয় সমক্ষে অষ্টাবরণ অপেক্ষা মুক্তির শ্রেষ্ঠতা উৎপাদনান্তর ভক্তিলক্ষণ বিবৃত করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে চিদ্বিগ্রহ-নিত্যত্বাদি, বর্ণন। পঞ্চম অধ্যায়ে গোকুল ও গোলক-মহিমা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠে গোলোকবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ বর্ণন এবং গোলোক-লীলা বর্ণন। সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের প্রসঙ্গাদি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে এবং ইহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতন, ভক্ত ভক্তি ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রীবিগ্রহ-নিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, সরল সরস ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বিষয়-পাঠে কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জনগণের যে উপকার হইবে তাহা নহে, এতদ্দ্বারা সর্ব্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই পরম উপকৃত হইবেন। ভগবৎ-

প্রাণ ভজন-নিষ্ঠ-সাধু-সজ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেশের একান্ত ও অত্যন্ত প্রয়োজন, এই গ্রন্থে সেই সকল উপদেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে মহাভারত ও পুরাণের নিয়মানুসারে বক্তা ও শ্রোতার সম্বাদরূপের প্রণালী বিশেষ অবলম্বিত হইয়াছে। জৈমিনি ইহার বক্তা, পরীক্ষিৎ-নন্দন জনমেজয় ইহার শ্রোতা। জনমেজয় জৈমিনির নিকট মহাভারতীয়াখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখেও ভারতাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন কিন্তু জৈমিনির নিকট জৈমিনি-প্রোক্ত ভারত-শ্রবণ করিয়া জনমেজয় বলিলেন :—

"ন বৈশম্পায়ন-প্রোক্তো ব্রহ্মন্ যো ভারতে রসঃ।
ত্বত্তো লব্ধঃ স তচ্ছেষং মধুরেণ সমাপয়॥"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্ আপনি স্বয়ং বেদমূর্ত্তি, আমি বৈশম্পায়নের নিকট হইতে ভারতাখ্যান শ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলাম। যেহেতু আপনি উহা ভক্তিরস-মিশ্রিত করিয়া বলিয়াছেন, এখন উহার শেষ অংশ মধুর ভাবে সমাপন করুন। ইহার কথারম্ভে প্রথমতঃ উত্তরা-পরীক্ষিৎ সংবাদ আছে। পরীক্ষিৎ তাঁহার মাতা উত্তরার অনুরোধে, মায়ের নিকটে এই শ্রীভাগবতামৃত বর্ণন করেন। বর্ণনীয় বিষয়ের স্থান,—তীর্থ,-মূর্দ্ধমণি প্রয়াগ; সময়,—মাঘমাস। শ্রোতৃবর্গ মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সমক্ষে ভাগবতোত্তম দ্বারা কথিত শ্রীভাগবতামৃত বর্ণিত হয়। এইরূপে বক্তা ও শ্রোতৃসম্বাদরূপে শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সটীক বৃহদ্ভাগবতামৃত পঠন-পাঠন শ্রবণাদি না করিলে অজ্ঞের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীরূপ-লিখিত আর একখানি ভাগবতামৃত আছে, তাহা শ্রীভগবানের অবতারসমূহের এবং ধাম সমূহের বর্ণনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; যথাস্থানে

উহার আলোচনা করা হইবে। সেই গ্রন্থখানি ইহা অপেক্ষা লঘু, সেইজন্য উহার নাম হইয়াছে "লঘু ভাগবতামৃত"। ইহার আকার বৃহৎ তজ্জন্য এই গ্রন্থ "বৃহৎ ভাগবতামৃত" নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ হরিভক্তি বিলাসের পূর্ব্বে রচিত হয়। হরিভক্তি বিলাসের টীকার স্থানে স্থানে শ্রীপাদ সনাতন স্বীয় গ্রন্থ ভাগবতামৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সনাতনকৃত ভাগবতের তোষণী টীকাতেও বৃহদ্ভাগবতামৃতের ও হরিভক্তি-বিলাসের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত টীকায় হরিভক্তি-বিলাস, "ভগবদ্ভক্তি বিলাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। বৃহৎ তোষণী ও লঘু তোষণী সনাতনকৃত; উভয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক বিভিন্নতা আছে। এই তোষণী টীকা ১৪৭৬ শকে সমাপ্ত হয় এবং শ্রীজীব ১৫০৪ শকে উহাকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করেন। তোষণী-টীকার অন্তে লিখিত আছে:—

"শকসপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনি-স্বকা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপক্ষৈক গণিতে ত্বং।"

শ্রীমদ্ভাগবতের সনাতনকৃত তোষণী টীকা অতি প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তি-সময়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ-দর্শিনী নাম্নী যে টীকা করেন, তাহাতে শ্রীমৎ বিশ্বনাথের প্রগাঢ় ভাষার লালিত্য, ভাবের রস-মাধুর্য্য এবং সমুজ্জ্বল প্রতিভাবিশিষ্টত্ব যথেষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সারার্থ-দর্শিনী টীকার মৌলিকতা এবং সব নব ভাবোন্মেষক প্রতিভায় ভাগবতের টীকাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল, বিচার-প্রিয় ও কাব্য-রসানন্দ প্রিয়-পাঠকমাত্রেরই প্রীতিবর্দ্ধক ও আনন্দজনক কিন্তু দশম স্কন্ধের সারার্থ-দর্শিনী টীকা পাঠে দেখা যায় যে, উহা সনাতনের প্রতিভা-কিরণে অনেকস্থলেই উদ্ভাসিত, সেই কিরণে উজ্জ্বলীকৃত এবং তাহাদ্বারাই পরিপুষ্ট। বিশ্বনাথ শ্রীপাদ সনাতনের ভাবমাধুর্য্য ও রসমাধুর্য্য দ্বারা স্বীয় টীকাটীকে সমুজ্জ্বল করার লোভ-সম্বরণ করিতে

পারেন নাই। তিনি অনেকস্থলে সনাতনের ভাব ও ভাষা স্পষ্টরূপেই গ্রহণ করিয়া স্বীয় টিপ্পনীর পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছেন। তোষণী টীকা-শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক-নিদর্শন ইহা হইতে স্পষ্টতর আর কি হইতে পারে? শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীরাসলীলা-ব্যাখ্যা প্রকৃতই মহামাধুর্য্য-সিন্ধু। সুরসিক পাঠক মাত্রই সেই মহাসিন্ধুর মাধুর্য্যামৃতে চিরমগ্ন,—দিনরজনী তাঁহারা সেই ব্যাখ্যাসুধা-আস্বাদনে বিভোর ও বিহ্বল থাকেন।

শ্রীপাদ সনাতনের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল প্রতিভা এই তোষণী টীকার সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রত্যেক শ্লোকব্যাখ্যানে প্রকটিত, তাঁহার প্রেমভক্তির উজ্জ্বলভাব প্রত্যেক কথাতেই উদ্দীপ্ত। সনাতনের বিশাল বিপুল সূক্ষ্ম প্রতিভা ভাগবতীয় টীকায় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-সিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিতেন। দশম স্কন্ধই শ্রীমদ্ভাগবতের সার সর্ব্বস্য। এই জন্য শ্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধের টীকা না করিয়া কেবল দশম স্কন্ধের টীকাতেই তাঁহার মূল্যবান্ জীবনের মহামূল্যবান্ সময় যাপিত করিয়াছেন। ইহাতেই তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং ইহা পাঠে তাঁহার প্রিয় পাঠকগণও অনুক্ষণ ধন্য হইতেছেন।

শ্রীভাগবতের একশত ত্রিশ সংখ্যার অধিক টীকা টিপ্পনী আছে বলিয়া শুনা যায়। অতি অল্প সংখ্যক টীকা-সন্দর্শনের সৌভাগ্য আমার পক্ষে ঘটিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন-দেবকীনন্দন প্রেস হইতে মুদ্রিত চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণববর্গের প্রণীত টীকা কয়েকখানির দর্শন আমি পাইয়াছি, তন্মধ্যে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-মুকুটমণি শ্রীমৎ আনন্দতীর্থকৃত শ্রীভাগবত তাৎপর্য্য টীকা প্রদত্ত হয় নাই কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সুপণ্ডিত বিজয়ধ্বজ তীর্থকৃত পদরত্নাবলী, শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত সুদর্শন-সূরিকৃত টীকা, রাঘবাচার্য্য কৃত ভাগবতচন্দ্র চন্দ্রিকা টীকা, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শুকদেবকৃত

টীকা, শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা আমি দেখিয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীজীবকৃত ক্রম সন্দর্ভ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত সারার্থ-দর্শনী এবং বৈষ্ণবানন্দিনী নামে বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত (?) বলিয়া একখানি টীকা অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি। শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরাধারমণ গোস্বামি মহাশয় একখানি টীকা বিরচন করেন তাহাও বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীনাথ পণ্ডিত-কৃত শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা নামে একখানি টীকা আমার নিকটে আছে, ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীরাস-লীলার আরও অনেক টীকা উক্ত ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, রসমাধুর্য্যাদিতে, ভাবোৎকর্ষে এবং নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় সনাতনের তোষণী ও বিশ্বনাথের সারার্থদর্শনীর সমক্ষে কেহই অগ্রসর হইতে পারে না; সনাতনের টীকার রস-মাধুর্য্য প্রতিভাব্যঞ্জকত্ব, ভাবোৎকর্ষ, সুপাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্ব একেবারেই অবিসম্বাদিত।

এক্ষণে দশম চরিত বা লীলাস্তব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার মনে অনেক দিন হইতে গুরুতর সন্দেহ আছে। সনাতনকৃত দশম-চরিত গ্রন্থখানি যে লীলাস্তব নামেও অভিহিত হয়, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাহা জানা যায়। আমার দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এতৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানিতে পারি নাই। মুর্শিদাবাদ রাধারমণ যন্ত্রে শ্রীপাদরূপ কৃত স্তবাবলী বহুদিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে; উহার সম্পাদক ছিলেন,—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। তিনি বিজ্ঞাপনে ও উৎসর্গ পত্রে প্রকাশ করেন যে, ইহার টীকা শ্রীপাদ শ্রীজীব-কৃত। তিনি সেই টীকা এবং তাঁহার কৃত বঙ্গানুবাদসহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি স্তব এবং গীত আছে। যখন এই মুদ্রিত গ্রন্থ প্রথমতঃ আমার হস্তে পতিত হইল,—সে অনেক দিনের কথা,—তখন

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিজ্ঞাপন ও উৎসর্গের লিখিত টীকার প্রতি আমার প্রথমতঃই দৃষ্টি পড়িল। দেখা মাত্রই বুঝিলাম, এই টীকা শ্রীপাদ শ্রীজীবের কৃত নহে এবং আমার অজানাও নহে, ইহা আমার পূর্ব্ব-পঠিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টীকা। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনবধানতা বশতঃই এইরূপ ভ্রম করিয়াছেন। ইহার আরও পরে দেখিলাম এই ভ্রম বোম্বাই পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে, সম্ভবতঃ নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে যে স্তবমালা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ভ্রম প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীপাদ শ্রীরূপ-কৃত স্তবগুলিকে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের আদিতেই তাহা উক্ত হইয়াছে :—

"শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥"

এইটুকুই শ্রীজীবের কার্য্য। টীকাকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীজীবেন স্তবমালা সংগৃহ্যত"—সংগৃহীতা পৃথক্ পৃথক্ স্থিতাঃ স্তবাঃ ক্রমাৎ পঙক্তিকৃতাঃ ইত্যর্থঃ।" ব্যাখ্যাকার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই টীকার নাম ভূষণ-ভাষ্য। তিনি স্বীয় নামের আংশিক পরিচয় দিবার জন্য "ভূষণ" পদের ব্যবহার করিয়াছেন। টীকার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যাভূষণ-রচিতে স্তবমালাভূষণ-ভাষ্যে
পরিতুষ্যতু বনমালী" ইত্যাদি —

অপিচ, গোবিন্দ-বিরুদাবলী ব্যাখ্যাতে লিখিত হইয়াছে,—

"গোবিন্দভক্তাস্তশুস্তু ময়ি বিদ্যাবিভূষণে।"

নন্দোৎসবাদি চরিতের ব্যাখ্যান্তে লিখিত হইয়াছে,—

"যদ্বিদ্যাভূষণোহয়ং হরি-চরিত-ভৃতান্ ইত্যাদি।

* 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিটী শ্রীজীবের বলিয়া কেহ কখনও জানেন না। শ্রীজীবের বিদ্যাভূষণ উপাধির কথা কোথাও প্রকাশ নাই। অপর পক্ষে প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই উপাধিটী সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার গীতাভাষ্যও ভূষণভাষ্য নামে অভিহিত। উহার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং
যত্নাদ্বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণম্॥ ইত্যাদি।

স্তবমালার এই ভাষ্যটী যে বলদেব বিদ্যাভূষণের রচিত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের অভ্যন্তর হইতে এ বিষয়ে আরও বহুল প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আর একটী কথা এই যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীরূপকৃত "স্তবমালা" বলিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্তবই শ্রীরূপকৃত কি না। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশ্বাস এই যে,— এই সংগৃহীত গ্রন্থে আদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-স্তোত্র পর্যান্ত যতগুলি স্তব আছে সকলই রূপকৃত। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :—

"শ্রীরূপদেবঃ করুণৈকসিন্ধু স্তবালিমেতং যদি নাকরিষ্যৎ" ইত্যাদি—

কিন্তু তাঁহার এই ধারণায় আমার সন্দেহ আছে।

এই স্তবমালায় যে গীতাবলী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সেই গীতাবলীর প্রত্যেকটী গানে সনাতনের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সকলেরই জানা আছে যে, গানগুলি শ্রীপাদ সনাতন কৃত। ভাষ্যকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"গাথা চত্বারিংশদেকাধিকা যো ব্যচষ্টে শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রযত্নাৎ" ইত্যাদি। ইহা এক মহা সন্দেহের বিষয়। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, দশম চরিত বা লীলা-স্তব, সনাতন কৃত বলিয়া শ্রীজীব লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থ কোথায়? এই স্তবা-

বলীতে যে নন্দোৎসবাদি চরিত আছে তাহা হইতে ইহা পৃথক গ্রন্থ কি না ? আমি উক্ত দশম চরিত গ্রন্থের জন্য বহুকাল পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে আমার ধারণা হইল যে, স্তবমালায় লিখিত এই নন্দোৎসবাদি-চরিতই সনাতন-কৃত দশমচরিত বা লীলাস্তব। এই লীলাস্তবে বাস্তবিকই দশম স্কন্ধে বর্ণিত নন্দোৎসব, শকট-তৃণাবর্ত্ত-বধাদি, নাম-করণ-সংস্কার, মৃৎ-ভক্ষণলীলা, দধিহরণ, যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ, বৃন্দাবনে গোবৎস-চারণাদি-লীলা, বস্ত্র হরণাদি চরিত, তালবন চরিত, কালিয় দমন, ভাণ্ডীর-ক্রীড়নাদি, বর্ষাশরদ্বিহার-চরিত, যজ্ঞ-পত্নী-প্রসাদ, গোবর্দ্ধনোর্দ্ধরণ, রাস-ক্রীড়া, সুদর্শনাদি-মোচন, শঙ্খাসুরবধ, গোপীকাগীত, অরিষ্ট-বধাদি, রঙ্গস্থল-ক্রীড়া এই সকল দশম স্কন্ধোক্ত কৃষ্ণ-চরিত বা কৃষ্ণলীলা স্তবাকারে বর্ণিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত গীতাবলীও যেমন শ্রীরূপ-কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, হরিভক্তিবিলাস যেমন গোপাল ভট্ট-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই লীলাস্তব বা দশম চরিত প্রকৃত পক্ষে সনাতন-কৃত হইলেও স্তবাবলীতে উহা শ্রীরূপকৃত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সনাতনকৃত দশমচরিত নামে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ যদি থাকে, তবে ভালই কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাদৃশ গ্রন্থ আমি অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই এবং যে সকল প্রাচীন বিজ্ঞ বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের নিকট এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারাও আমাকে এই গ্রন্থের অন্য কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহারাও আমার অভিমতে এই স্তবগুলিকে লীলাস্তব বা দশমচরিত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি গোপালভট্ট বিলিখিত হইলেও নানাপ্রমাণ বলে অনেকেই যেমন উহা সনাতন প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমিও সেইরূপ গীতাবলী ও এই দশমচরিত স্তবা গুলিকে

সেইরূপ সনাতন-কৃত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। যদি ইহা আমার ভ্রম হয়, তবে কোন মহাত্মা কৃপা করিয়া আমার সেই ভ্রম অপনোদন করিলে কৃতার্থ হইব। এই স্তবগুলি অতি সরস, উচ্চকবিত্বের পরিচায়ক এবং প্রেমভক্তি-প্রবর্দ্ধক।

শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত বহু গ্রন্থ আছে। আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম জানিতে পারিয়াছি,—

১। হংসদূত-খণ্ডকাব্য। ২। উদ্ধবসন্দেশখণ্ডকাব্য। ৩। বিদগ্ধমাধব-নাটক ৪। ললিতমাধব-নাটক ৫। দানকেলি-কৌমুদীনাটক (ভাণিকা) ৬। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু ৭। উজ্জ্বল-নীলমণি ৮। শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য ৯। পদ্যাবলী। ১০। নাটক-চন্দ্রিকা। ১১। লঘুভাগবতামৃত ও স্তবাবলী।

শ্রীচরিতামৃতে এবং লঘু-তোষণী-টীকার উপসংহারে সনাতনাদি গোস্বামি-পরিচয়ে ইঁহাদের গ্রন্থের তালিকা লিখিত আছে। শ্রীচরিতামৃতে মধ্য লীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে:—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম-চরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপ গোঁসাঞি কৈল যতেক কে করু গণন॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষগ্রন্থে কৈল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন॥
রসামৃত সিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বল নীলমণি আর ললিত মাধব॥
দানকেলি কৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দ বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন॥

১। হংসদূত—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও ইঁহাদের গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা আরও অসম্পূর্ণ। যদিও চরিতামৃতে হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি এই দুইখানি গ্রন্থ যে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা এই দুই গ্রন্থ মহাপ্রভুর নিকট কৃপা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই দুই গ্রন্থে শ্রীগৌর-গোবিন্দের নমস্কার পত্র দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই দুই গ্রন্থও ব্রজরসের সুধা-মাধুর্য্যে পরিপূরিত। কালিদাস-কৃত মেঘদূত নামক খণ্ড কাব্যের পর হইতে এদেশের অনেক সংস্কৃত কবি, বিরহ-কাব্য-রচনায় দূত প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনেক খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন। হংসদূত এই ধরণের খণ্ডকাব্য। পদাঙ্কদূত, কোকিল দূত এইরূপ আরও এই জাতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যে শ্রীরাধিকার বিরহ-প্রশমনার্থ হংস দূত রূপে-প্রেরিত হইয়াছে। সমগ্র কাব্য মেঘদূতের ন্যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ১১২টী পদ্য আছে। পদ্যগুলি অতি মধুর। চণ্ডীর টীকাকার শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তি মহাশয় ইহার একখানি টীকা করিয়াছেন। হংসদূত মুদ্রিত হইয়াছে, টীকাটী মুদ্রিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারিনা। আমি অমুদ্রিত টীকাটী পড়িয়া দেখিয়াছি এবং উহা আমার নিকটেও আছে। টীকাটী সরল ও সুলিখিত।

২। উদ্ধবসন্দেশ—শ্রীরূপের অপর গ্রন্থ উদ্ধব-সন্দেশ। এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ১৩১টী পদ্য আছে, ইহাও মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত এবং একখানি খণ্ড কাব্য। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গোপীগণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া গোপীগণের বিরহ-যাতনার কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগের সান্ত্বনার জন্য তদীয় প্রিয় সখা উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ

করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে, ৪৬ অধ্যায়ে এই ঘটনা লিখিত আছে। বিবরণটী নিম্নলিখিতরূপে আরম্ভ হইয়াছে, শুকদেব বলিলেন :—

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধি-সত্তমঃ॥
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তি-হরোহরিঃ॥

উদ্ধব যে দৌত্য কার্য্যের (embassy) প্রকৃত উপযুক্ত লোক, ইহাতে তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইনি বৃষ্ণিগণের প্রবর মন্ত্রী, বৃহস্পতির শিষ্য, অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং কৃষ্ণের অতি প্রিয় সখা, সুতরাং গোপী-বিরহ-সান্ত্বনায় ইনি উপযুক্ত পাত্র। বিশেষতঃ ইনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ভক্ত, সুতরাং অতি শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাবহ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিধুর। যিনি স্বীয় প্রেমে সকলকে আকর্ষণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ। গোপীরা ইঁহার প্রেমাকর্ষণে ইঁহার প্রতি আকৃষ্টা, তাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, কৃষ্ণই তাঁহাদের মন, কৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাণ। এতাদৃশী গোপীদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে অক্রূরের আমন্ত্রণে মথুরায় আসিতে হইল। এমতাবস্থায় গোপীদিগের কি দুঃখ ও যাতনা—তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসুহৃদ কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা জানেন এবং তিনি জীবের দুঃখ-যাতনাও হরণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম—"হরি"। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—তিনি শরণাগত জনের দুঃখহারী সুতরাং গোপীদিগের দুঃখ দূর করা তাঁহার একটা প্রধান কার্য্য। মথুরায় গিয়াও তিনি গোপীদিগকে ভুলেন নাই, গোপীদের বিরহ-রোদন-ধ্বনি স্বভাবতঃ ও সততই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; গোপীদের জন্য তাঁহার প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তেই ব্যাকুলিত হইতেছিল। তাই তিনি নিজহাতে নিজের সখা উদ্ধবের হাত ধরিয়া বলিতেছেন :—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥

হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, সেখানে আমার পিতামাতাকে আমার সংবাদ দিয়া সুখী করিও। গোপীরা আমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার সংবাদে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিও।॰

ইহাই হইতেছে উদ্ধব-সন্দেশ গ্রন্থের মূল-সূত্র। গোবিন্দ-বিরহে গোপীদিগের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা হয় তাহা গোবিন্দ ভিন্ন আর কেহ জানে না এবং আর কেহ বুঝিতে পারে না। শ্রীগোবিন্দ বলিতেছেন:—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্য-বিহ্বলাঃ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥

প্রাণের দরদী না হইলে কেহ দরদ বুঝে না। গোপীদের জীবন যে কি প্রকার, শ্রীগোবিন্দ শ্রীমুখেই জগৎকে তাহা জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"ভাই উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, সেখানে গিয়া দেখিবে,—গোপীদিগের অবস্থা কি শোচনীয়! তাঁহাদের মন প্রাণ আমাতেই ন্যস্ত। আমার জন্য তাহারা দৈহিক সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ ও মানসিক সুখ সকলই ত্যাগ করিয়াছেন। আমিই তাহাদিগের একমাত্র দয়িত। আমার জন্য তাহারা পতি-পুত্রাদি আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাহাদের আত্মার আত্মা। তাহারা আমার জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা দিনরজনী কেবল

আমাকেই স্মরণ করিতেছেন, আমার বিরহে, উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় তাহারা বিহ্বল হন, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এখন কোন প্রকারে অতি-কষ্টে আমার প্রত্যাগমন-আশায় জীবনধারণ করিতেছেন।"

ইহাই উদ্ধব-সন্দর্শের বা শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-প্রেরণের হেতু। এই বিরহ-বেদনার বিবরণ আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় আপনার তেজে আপনি গরীয়ান্। ইহা পাঠক মাত্রকেই ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তোলে।

ইহাকে উদ্ধবদূত না বলিয়া, ইহার নাম উদ্ধবসন্দেশ করা হইল কেন? কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন কিন্তু আমার মনে হয়, উদ্ধবদূত নামে একখানি এই-রূপ প্রাচীনতর খণ্ডকাব্য আছে, উহা তালিত নগর-নিবাসী শ্রীমাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত। এই মাধব কবীন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় আমি জানিনা কিন্তু ইহার কাব্যখানিও সরস, সরল এবং অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ তরল; শ্রীরূপের উদ্ধব সন্দেশের ন্যায় প্রসন্নগম্ভীর নহে, শব্দ-চ্ছটাও তদ্রূপ সমুজ্জ্বল নহে। তথাপি ইহার সারল্যে, তারল্যে এবং সহৃদতায় এই কাব্যখানিও সাধারণ পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক কিন্তু শ্রীপাদ শ্রীরূপের উদ্ধব সন্দেশ অপ্রাকৃত অমৃত-রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

৩। স্তবাবলী—এ সম্বন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে কি কি আছে, উপক্রমে সংক্ষেপতঃ তাহা লিখিত হইয়াছে, যথা :—

পূর্ব্বং চৈতন্য-দেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরং।
শ্রীরাধায়াস্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ॥
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ।
ততশ্চিত্র-কবিত্বানি ততো গীতাবলী ততঃ।
ললিতাযমুনা কৃষ্ণপুরী শ্রীহরিভূভৃতাং।
বৃন্দাটবী কৃষ্ণনাম্নোঃ ক্রমেণ স্তবপদ্ধতিঃ॥

ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তব, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব, তৎপরে শ্রীরাধিকার স্তব, তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির স্তব লিখিত হইয়াছে। তৎপরে বিরুদাবলীছন্দে (যাহার প্রত্যেক চরণে নবাক্ষর আছে) তৎপরে নানাবিধ ছন্দে নন্দোৎসবাদি কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তার, তৎপরে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ললিতা, যমুনা, মথুরাপুরী, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণনাম এই সমূহের স্তবাবলী যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে। স্তবগুলি ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য। শ্রীরূপের কাব্য স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়; তাহার উপরে উহা ভক্তি-রসের পূর্ণমাত্রায় বিভাবিত। এই সকল স্তব শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে পাঠ করিলে মানুষের মন পবিত্র হয়, বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ হয়, চিত্ত ভগবদ্‌ভাবে সুমার্জ্জিত, সমুচ্চ ও বিষয়-বিষ বিবর্জ্জিত হইয়া পরম স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, আত্মা প্রেমময় ও রসময় শ্রীভগবানের প্রীতি-রসে আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থ ভক্তগণের কণ্ঠহার।

৪। পদ্যাবলী—এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বরচিত নহে। বহুল প্রাচীন ভক্ত-কবিগণের লীলা-ভক্তি-রসময় পদ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিমহোদয় সেই সকল পদ্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকারেরও কতিপয় শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদ্য সংগ্রহ করার রীতি এদেশে অতি প্রাচীন। সুভাষিতাবলী প্রভৃতি বৃহদায়তন-বিশিষ্ট গ্রন্থ ঠিক এই জাতীয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইনস্পেক্টার, মিঃ পীটার পিটার্সন সাহেব বল্লভদেব-সঙ্কলিত সুভাষিতাবলীর একখানি অতি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে সকল কবির পদ্য এই পদ্যাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে; সারঙ্গ, শুভাঙ্গ, হর, বিষ্ণুপুরী রামানন্দ, শ্রীধর, ঈশ্বরপুরী, আনন্দাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীধর, গোপাল

ভট্ট, যাদবেন্দ্র পুরী, শঙ্কর, নারদ, পুরুষোত্তম, সর্ব্বানন্দ, সর্ব্বজ্ঞ, মাধব-সরস্বতী, জগন্নাথ সেন, ধনঞ্জয়, মাধবেন্দ্রপুরী, মাধব, রঘুপতি উপাধ্যায়, সুরোত্তম আচার্য্য গর্ভ-কবীন্দ্র, কবিরাজমিশ্র, শ্রীকরাচার্য্য, গোবিন্দ, ভবানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, হরিদাস, সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ, শিরমৌলী, আগম, রামানুজ, কবিশেখর, গোবিন্দমিশ্র, রঘুনাথ দাস, দিবাকর, দীপক, ময়ূর, বসুদেব, উমাপতি-ধর, অভিনন্দ, যোগেশ্বর, কেশবছত্রী, চিরঞ্জীব, কবিচন্দ্র, জয়ন্ত, সঞ্জয় কবিশেখর, শরণ, পুষ্করাক্ষ, গোবিন্দভট্ট, হরিহর, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, দৈত্যারি পণ্ডিত, সাম্বাধিক, লক্ষ্মণসেন, রাঙ্ক, রুদ্র, বিশ্বনাথ, অমরু, অঙ্গদ, সনাতন, দামোদ, নাথোক, শৌদ্ধোদক, সুবন্ধু, সূর্য্যদাস, মনোহর, মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য, চক্রপাণি, ভট্টনারায়ণ, রামচন্দ্র দাস, দাক্ষিণাত্য, গৌড়, উৎকল, দামোদর, কর্ণপুর, বাণী-বিলাস তৈরভুক্ত কবি, কুমার, বাহিনী-পতি, ষষ্ঠীবর দাস, ধন্য, ভবভূতি, হরিভট্ট, দশরথ, সর্ব্বানন্দ, মোটক, ত্রিবিক্রম, ক্ষেমেন্দ্র, ভীমভট্ট, শাস্তিকব, আনন্দ, শম্ভু, শচীপতি, অপরাজিত, নীল, পঞ্চতন্ত্রকার, হরি, শুভ্র, ইত্যাদি এবং আরও অনেকের পদ্য আছে। তাঁহাদের নাম নাই কেবল "কস্যচিৎ" বলিয়া লিখিত আছে। সনাতন শ্রীরূপেরও অনেকগুলি পদ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু-কৃত সাধারণের অবিদিত অনেক শ্লোক এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে যে সকল কবির নাম জানা যায় তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি থাকিলে, সে সকল গ্রন্থের নাম প্রকাশ করিতে পারিলে এই আলোচনাটী এতদপেক্ষা সুন্দর হইত কিন্তু আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সেই অনুসন্ধানশ্রম বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নহে, তথাপি দুই চারিজনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। বল্লভদেব-কৃত সুভাষিতাবলী, সদুক্তিকর্ণামৃত, সূক্তিমুক্তাবলী এবং শার্ঙ্গধর পদ্ধতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা অনেক কবির

নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ (Anthology) নামে অভিহিত। পীটার-পীটারাসর্ন্ সাহেব স্থভাষিতাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় কবির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, কিন্তু তাহার তালিকা অতিক্ষুদ্র ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। যাহা হউক, এস্থলে দুইচারিটী সুপ্রসিদ্ধ কবির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

১। অমরু—এই অমরু একজন বিখ্যাত কবি। অমরু-শতক ইহারই কৃত। অনেকের ধারণা এই যে, অমরু-শতকে অপরাপরের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে কবি অমরুর নামে পাঁচটী শ্লোক দেখা গেল কিন্তু এই পাঁচটী শ্লোকের একটীও অমরু-শতকে নাই। অমরুর অন্য কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক পাঁচটী উদ্ধৃত হইল, বলিতে পারিনা। বল্লভদেবের স্থভাষিতাবলীতে ইহার পাঁচটীর মধ্যে চারিটী শ্লোক আছে। তন্মধ্যে "ভ্রূভঙ্গাহ্গুণিত" ইত্যাদি শ্লোকটী উভয় গ্রন্থেই অমরুরচিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অপর তিনটী শ্লোকের মধ্যে দুইটী 'কেষামপি' বলিয়া এবং অপরটী 'ভদন্ত ধর্ম্মকীর্ত্তির' রচিত বলিয়া স্থভাষিতাবলীতে লিখিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন পদ্যে, পাঠের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। পাঠকগণ, এই অনুসন্ধানটুকুর প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করিলে স্থভাষিতাবলীর ১৬১৭, ১১৭০, ১৫৭৮ ও ১১৫১ নম্বরের শ্লোক দেখিতে পারেন।

জহ্লান্ সঙ্কলিত স্থক্তিমুক্তাবলীতে অর্জ্জুনদেব-কৃত একটী পদ্য আছে। সেই পদ্যটীতে অমরুর প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অর্জ্জুন-দেব সুভটবর্ম্ম নরেন্দ্রের পুত্র। ইনি অমরু-শতকের একখানি টীকা করেন। টীকার প্রারম্ভে লিখিত আছে :—

"অমরুককবিত্বডমরুকনাদেন বিনিহ্নুতা ন সংচরতি।
শৃঙ্গারভণিতিরন্যা ধন্যানাং শ্রবণবিবরেষু॥

ইহার পরের শ্লোকটী এই :—

ক্ষিপ্তাশুভঃ শুভটবর্ম্ম-নরেন্দ্রসূনু-
বীরব্রতী জগতি ভোজকুলপ্রদীপঃ।
প্রজ্ঞানবানমরুকস্য কবেঃ প্রসারঃ
শ্লোকান্‌শতং বিবৃণুতেঽর্জ্জুনবর্ম্মদেবঃ ॥

২। অপরাজিত ভট্ট—মৃগাঙ্কলেখা-কথা নামে ইঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ইনি কবি রাজশেখরের সম-সাময়িক লোক। ইনি বাল-ভারত ও বাল-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে জয়াদিত্য রাজত্ব করেন। ইনি তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

৩। আনন্দ—সুভাষিতাবলীতে কয়েকটী আনন্দের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—রুদ্রানন্দ, আনন্দক বা ভট্টানন্দক, রাজানকানন্দক, আনন্দবর্দ্ধন এবং আনন্দ স্বামী। পদ্যাবলীতে যে আনন্দের পদ্যটী আছে তিনি ইহার মধ্যে কোন্ আনন্দ, তাহা অনুসন্ধেয়।

৪। গোবিন্দ ভট্ট—ইঁহার অপর নাম গোবিন্দ-রাজ। সুভাষিতাবলীগ্রন্থে এই গোবিন্দ রাজের অনেক কবিতা আছে। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতির একটী পদ্যে গোবিন্দরাজের উল্লেখ আছে, যথা :—

ইন্দু-প্রভা-রসবিদং বিহগং বিহায়
কীরাননে স্ফুরসি ভারতি কা রতিস্তে।
আস্তং যদি শ্রয়সি জল্পতু কৌমুদীনাং
গোবিন্দরাজবচসাংশ্চ বিশেষমেষঃ ॥

পদ্যাবলীতে যে সকল কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপভাবে আলোচনা করিলে জনসাধারণের অজ্ঞাতনামা অনেক ভাল ভাল কবির বিবরণ জানা যাইতে পারে। এস্থলে কেবল নমুনার জন্য দুইএকটী কবির বিবরণ উল্লিখিত হইল। এতদ্দ্বারা পাঠকমহোদয়গণ ইহাই বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তদীয় গ্রন্থে যে সকল পদ্য উদ্ধৃত

করিয়াছেন সেই সকল পদ্যের রচয়িতা সম্বন্ধে সুভাষিতাবলীতে মত-ভেদ আছে। কোন্ গ্রন্থের নামোল্লেখ বিশুদ্ধ তাহা অনুসন্ধেয়।

পদ্যাবলী গ্রন্থখানি বড় নয় কিন্তু ভক্তগণের অতি প্রিয়, সুখপাঠ্য এবং প্রেম-ভক্তি-বিবর্দ্ধক। শ্রীরূপ পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় আছে, যথা:—শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-মাহাত্ম্য, ধ্যান, ভজন-বাৎসল্য, কৃষ্ণভক্ত-মাহাত্ম্য, ভক্তের দৈন্যোক্তি, ভক্তের নিষ্ঠা, ভক্তের ঔৎসুক্য-প্রার্থনা, ভক্তোৎকণ্ঠা, মূর্খে অনাদর, ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব, নৈবেদ্যার্পণ-বিজ্ঞপ্তি, মথুরা-মহিমা, নন্দ-যশোদা-বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও তারুণ্য, গব্য-হরণ, কৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন, পিতা-মাতার বিস্ময়, গোরক্ষণ-লীলা, গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধার প্রশ্ন, সখীর উত্তর, রাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীরাধার ও সখীর কথোপকথন, রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, শ্রীরাধার অভিসার, নির্জ্জনে ক্রীড়া, সখীদের পরিহাস, মুগ্ধ বালকগণের বাক্য, দিনান্ত কেলি, বাসক শয্যা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, সখীর শিক্ষা, মানিনী, কৃষ্ণের দূতি প্রতি রাধার বাক্য কলহান্তরিতা, শ্রীকৃষ্ণের-বিরহ, শ্রীরাধার প্রসন্নতা, স্বাধীনভর্তৃকা, বংশীচৌর্য্য, মুরলীর প্রতি শ্রীরাধা, গোদোহন, নৌকাক্রীড়া, রাস, জলক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও সখীদের কথোপকথন, নিত্য-লীলা, শ্রীরাধার বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, উদ্ধব-প্রেষণ, শ্রীরাধার ঔৎসুক্য, রাধার বিরহ-গীতি, সুদামা ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে দুই একটী করিয়া পদ্য এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ এই পদ্যাবলী ভক্তগণের কণ্ঠহার। ভক্তগণ এই সকল পদ্য কণ্ঠস্থ করিতেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বহু অনুসন্ধান করিয়া এই সকল পদ্যের প্রেম-ভক্তিময় কাব্য-রস নিজে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য কোন টীকা আছে কিনা জানিনা, কিন্তু বর্দ্ধমানান্তর্গত গাড়গ্রামনিবাসী

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীমৎ কিশোরী মোহন গোস্বামীর তনয় শ্রীমৎ বীরচন্দ্র গোস্বামিমহোদয় "রসিকরঙ্গদা"নামে এই গ্রন্থের এক টীকা করেন। টীকাখানি আধুনিক হইলেও আদরণীয়।

৫। নাটক-চন্দ্রিকা—এই গ্রন্থে নাটকের লক্ষণ পরিস্ফুটরূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র এবং রস-সুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণে নাটকের যে লক্ষণাদি দেখা হইয়াছে তাহা ভরতমুনির মতের বিরুদ্ধ এবং তত্তটা সুসঙ্গত নহে বলিয়াই গ্রন্থকার সে মত অবলম্বন করেন নাই। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় প্রেম-রস-পূর্ণ তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন,—বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব ও দানকেলি-কৌমুদী। যিনি তিনখানি নাটক গ্রন্থের কর্ত্তা, তৎপ্রণীত নাটক-চন্দ্রিকা যে নাটক-সম্বন্ধে বহুল তথ্য জ্ঞাপক হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

সংস্কৃত ভাষার নাটকগুলিতে নানাপ্রকার কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়; তাহা যে অনাবশ্যক ইহা মনেকরা উচিত নহে। প্রধানতঃ নাটকীয় চরিত্র-বিরচন মহাকঠিন। কোন ব্যাপারে, উহাতে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ চরিত্র, কোন্ অবস্থায় থাকিয়া কোন ভাবের অধীন হয় এবং সেই ভাবাবেশে কোন্ চরিত্রের মুখে স্বভাবতঃ কিরূপ ভাব। প্রকাশ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। এতজ্জন্য অন্যান্য গ্রন্থ-রচনা অপেক্ষা নাটক-বিরচন অতীব কঠিন। ইহার উপরে বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চরিত্র-বৈচিত্র্য আঁকিয়া তোলা অসাধারণ কলা-কৌশলের পরিচায়ক।

এতদ্ব্যতীত নায়ক-বিচার, নায়িকা-বিচার, ইতিবৃত্ত প্রস্তবনা, নান্দী, আমুখ, কথোদ্ঘাত, প্রবর্ত্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, সন্ধি, বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য্য তদ্ভেদ, অবস্থা, সন্ধির অঙ্গ ও তদ্ভেদ মুখ, দ্বাদশাদি বীজভেদ, প্রতিমুখ, সন্ধি, বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, সম,

নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস, বর্ণসংহার এই ত্রয়োদশটী, প্রতিমুখের অঙ্গ। গ্রন্থকার মহোদয় মূলগ্রন্থে ইহার প্রত্যেকটীর উদাহরণ সহ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপে নায়কাদির ক্রিয়াবশতঃ কার্য্যের অবস্থাও পাঁচ প্রকার,—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশী নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম। ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ বলা হইয়াছে। সন্ধির অঙ্গ পাঁচ প্রকার,—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, এবং উপসংহৃতি। বীজভেদ বারপ্রকার,—উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, ভেদ ও করণ।

গর্ভ-সন্ধি দ্বাদশটী যথা :—অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম-সংগ্রহ, অনুমান তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্ভ্রম ও আক্ষেপ।

নিমর্শ-সন্ধি ত্রয়োদশ প্রকার যথা :—অপবাদ, সংখেট, বিদ্রব, দ্রব, শক্তি, দ্যুতি, প্রশঙ্গা, ছলনা, ব্যবসায়, বিরোধন, প্ররোচনা বিচলন ও আদান।

নির্ব্বহণ-সন্ধি চতুর্দ্দশটী যথা :—সন্ধি, বিরোধ, গ্রহন, নির্ণয়, পরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, প্রীতি, ভাষা, উপ-গূহণ, পূর্ব্বভাব, উপসংহার ও প্রশস্তি।

সন্ধ্যান্তর যথা :—সাম, দাম, ভেদ, দন্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বধ, গোত্র-স্খলন, ওজঃ, ধীর, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মায়া, সংবৃতি, ভ্রান্তি, যুক্ত, হেত্ববধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ ও চিত্র।

বিভূষণ নাট্যকাব্যের শোভা তাহার শরীররূপ বস্তুটী পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ ও উপঅঙ্গদ্বারা সুন্দররূপে বিরচিত। ইহা ছত্রিশ প্রকার যথা :—ভূষণ, অক্ষর-সংঘাত, হেতু, প্রাপ্তি, উদাহৃতি, শোভা, সংশয়, দৃষ্টান্ত, অভিপ্রায়, নিদর্শন, সিদ্ধি, প্রসিদ্ধি, দাক্ষিণ্য, অর্থাপত্তি, বিশেষণ, পদোচ্চয়, তুল্যতর্ক, বিচার, অবিচার, গুণাতিপাত, অতিশয়, নিরুক্তর, গুণ-কীর্ত্তন, গর্হণা,

অনুনয়, ভ্রংশ, ক্লেশ, ক্ষোভ, মনোরথ, অনুক্তসিদ্ধি, সারূপ্য, মালা, মধুর-ভাষণ, পৃচ্ছা, উপদিষ্ট এবং দৃষ্ট।

পতাকা-স্থান প্রথমতঃ দুই প্রকার তুল্য সম্বিধান ও তুল্য বিশেষণ। ইহার মধ্যে প্রথমটী তিনপ্রকার, দ্বিতীয়টীর প্রকার নাই, উহা একপ্রকার মাত্র। অর্থোপেক্ষ—নাটকীয় বস্তুসকল দুইপ্রকার সূচ্য এবং অসূচ্য। সূচ্য পাঁচ প্রকার যথা:—বিষ্কম্ভক, চূলিকা, অঙ্কমুখ, অঙ্কাবতার এবং প্রবেশক।

নাট্যোক্তিসমূহ—স্বগতঃ প্রকাশ, সর্ব্বপ্রকাশ, নিয়ত প্রকাশ, জ্ঞানান্বিক প্রকাশ ও অপবারিত। অঙ্কস্বরূপ যথা,—গর্ভাঙ্কাদি। লাস্যাঙ্গ দশপ্রকার,—বীথ্যঙ্গ ত্রয়োদশ প্রকার। ভাষাভিধান,—ভাষা প্রথমতঃ দ্বিবিধ, ভাষা ও বিভাষা। বিভাষা—চৌদ্দ প্রকার।

সংস্কৃত-ভাষা,—নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি যে রকম ভাষা ব্যবহার করিবেন, তাহার বিবরণ,—প্রাকৃত ভাষা সাধারণতঃ ছয় প্রকার,—শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা, শাবরি এবং অপভ্রংশ। এই সকল ভাষা ব্যবহারে ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নির্দ্দেশ বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপরে বৃত্তি যথা,—ভারতী আরভটী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ইহাদেরও অনেকপ্রকার ভেদ আছে।

অতঃপর সংক্ষিপ্তিত অবপাতন, বস্তুত্থাপন, সংখেট্ প্রভৃতি। এই চারিটী আরভটীর ভেদ। সাত্ত্বতী,—সংলাপ, উত্থাপক, সঙ্ঘাত্য ও পরিবর্ত্তক। কৈশিকী,—নর্ম্ম (এই নর্ম্ম আবার তিন প্রকার) নর্ম্মস্ফঞ্জ, নর্ম্মস্ফোটও নর্ম্মগর্ভ। নর্ম্ম সর্ব্বসাকুল্যে ১৮ প্রকার। প্রথমতঃ তিন প্রকার,—শৃঙ্গারহাস্যজ, শুদ্ধহাস্যজ এবং ভয়হাস্যজ। শৃঙ্গার হাস্যজ নর্ম্ম তিন প্রকার,—সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটন, অনুরাগ-নিবেদন এবং কৃতাপরাধ প্রিয়ের ভেদসাধন। সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটন আবার তিন প্রকার যথা,—বাক্যজ, বেশজ ও চেষ্টাজ। অতঃপরে ভারতী বৃত্তির লক্ষণ এবং

কোন্ কোন্ রসে কোন্ কোন্ বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল বিষয়ের নামগুলি নামমাত্র লিখিত হইল। মূলগ্রন্থে প্রত্যেক বিষয়ের এবং উহাদের নানাপ্রকার ভেদের লক্ষণ অতি সরল অথচ পরিস্ফুট ভাষায় উদাহরণের সহিত লিখিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অধিকাংশ উদাহরণই তৎকৃত ললিত মাধব নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ললিত মাধব নাটকখানিতে নাটকীয় সর্ব্বলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যদিও নাটক-চন্দ্রিকা গ্রন্থখানি আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু সুনিপুণ সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী গ্রন্থকার মহোদয় এইগ্রন্থে যে সকল শৃঙ্খলা-পারিপাট্য (order and method) প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয় কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে সুতুর্লভ। এই গ্রন্থে রসসুধাকর গ্রন্থ হইতে লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যালঙ্কারের গ্রন্থের সংখ্যা অনেক অধিক। প্রায় পঞ্চাশখানি মুদ্রিতামুদ্রিত গ্রন্থ এই লেখকেরও দৃষ্টি গোচর হইয়াছে কিন্তু নাটক-চন্দ্রিকার ন্যায় নাটকীয় বস্তুর প্রগাঢ়-আলোচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি যেমন নাটকীয় লক্ষণে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থও সেইরূপ রসতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ সাধন করিয়াছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহাশয়ের গ্রন্থের বিশিষ্টতা এইযে, উহা ভগবদ্ভক্তিরসের মহাসিন্ধু। ইনি বিদগ্ধ-মাধব, ললিতামাধব, দানকেলি-কৌমুদী, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি ও নাটক-চন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বারা পূর্ণপূর্ণরূপে ব্রজরসতত্ত্ব-প্রচারের পরম উপায় প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের সে মহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র সংস্পর্শনেরও যোগ্যতা নাই,—নিকটে আগুয়ান হইতেও অধিকার নাই, তথাপি বিষয়-মাধুর্য্যে এই অযোগ্য ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইতে হয় এবং

লোভে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া সে রস-সুধা-সিন্ধু-তীর্থ, স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা হয়,—তাই এইরূপ বাতুল-প্রয়াস। জানিনা,—এজন্য ভক্ত ও ভগবানের নিকট ক্ষমার্হ হইব কি না?

৬। লঘুভাগবতামৃত—বেদবেদান্ত দর্শন পুরাণ মহাভারত রামায়ণ ও তন্ত্রাদি নিখিল-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য —এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভাগবত বলেন, এই অদ্বয় সচ্চিদানন্দময়-তত্ত্ব সাধক-বিশেষের সাধনা-বিশেষে সাধক-চিত্তে ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবান্ এই তিন আবির্ভাবের কোন এক রূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। ভগবৎ-রূপই পরতত্ত্বাবির্ভাবের পরম উৎকর্ষ। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা,—ভগবদাবির্ভাবেরই পরিকর; তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত। যেমন শতের মধ্যে নব্বই অন্তর্ভুক্ত, তেমনই ভগবৎতত্ত্বে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। মায়াবাদী বেদান্তী ব্রহ্মকে জ্ঞানমাত্র বলিয়া জানেন। এই জ্ঞান-তত্ত্বটী ষড়ৈশ্বর্য্যের একতম যথা :—

— ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনাঃ॥

সুতরাং জ্ঞানতত্ত্ব, ভগবতত্ত্বের অন্তর্ভাবিত, অতএব ব্রহ্মতত্ত্বাদি সকল তত্ত্বই ভগবতত্ত্বের পরিকর, শ্রীভাগবত বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্মআত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ আনন্দ পরম মহত্ত্ব॥
কোটী কোটী ব্রহ্মানন্দে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গ-কান্তি॥

আত্মা অন্তর্য্যামী যারে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সেও গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বশাস্ত্র-বিচারে মহাসিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভে, ভগবৎ-সন্দর্ভে, পরমাত্ম-সন্দর্ভে অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম-শাস্ত্রযুক্তির বিচারে এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারের বীজ। অসংখ্য অবতার তাঁহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থ-শক্তিস্বরূপ এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ-স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ হইতে বহুল কার্য্য-সাধনের জন্য অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হন।

শ্রীপাদ রূপ শ্রীলঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে এই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। সেই শ্রেণীবিভাগ অতীব সুপ্রণালী-নিবদ্ধ। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব্ব খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে, যথা :—ভাগবতামৃত দ্বিবিধ :—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধস্বরূপনিরূপণ। স্বয়ংরূপও তদেকাত্মরূপ। তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ :—বিলাস ও স্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, অবতারতত্ত্ব, অবতারের লক্ষণ, শ্রীভগবান্ তদেকাত্মরূপে ও ভক্তরূপে জীবদের পরম উপকার-সাধনের জন্য প্রপঞ্চে যে অবতরণ করেন তাহাই অবতার। এই অবতারে প্রকারভেদ সাধারণতঃ ত্রিবিধ :—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার ত্রিবিধ—প্রথম পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতার ও তৃতীয় পুরুষ অবতার। গুণাবতার তিনটী—ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু।

অতঃপরে লীলাবতারের সবিস্তৃত বিবরণে পচিশটী লীলাবতারের অতি বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। মন্বন্তর অবতারের (সংখ্যা যদিও চৌদ্দটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি লীলাবতারের যজ্ঞ বামন ছাড়া

দ্বাদশটী ও যুগাবতার চারিটী। অতীত ও বর্ত্তমান কল্প, ব্রহ্মকল্পের অবতার। অন্যপ্রকার বিচারে চতুর্ব্বিধ অবতার পরিদৃষ্ট হন, যথা :— আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ। প্রাভব আবার দ্বিবিধ, যথা :— অল্পকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত কীর্ত্তি-বৈভবান্বিত, যেমন মোহিনী ও হংস ; আর চারিটী যুগাবতার। দ্বিতীয় প্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল ব্যক্ত, শাস্ত্রকর্ত্তা ও মুনিজনবৎ চেষ্টাও কার্য্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার অবতার এগারটী, বৈভবাবস্থার অবতার একুশটী, অবতারগণের পরব্যোমস্থধাম, পরাবস্থ অবতার তিনটী,—নৃসিংহ, দাশরথী-রাম ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ধাম ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক এবং মাধুর্য্যসম্পন্ন—এই নিমিত্ত রাঘবেন্দ্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যাধিক্য, শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যা-ধিক্য, ভগবদবতার মাত্রেরই পূর্ণতা, ভগবৎ-শক্তিতত্ত্ব-বিচার, অংশিত্ব, ভগবানে বিরুদ্ধ বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তির আশ্রয়ত্ব ও ইহার বিস্তৃত বিচার, কেশের অবতারত্ব-খণ্ডন, ব্যূহ-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার নহেন, ইনি স্বয়ং ভগবান্, এতৎ সম্বন্ধে বিচার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা, ভগবৎ-গুণের অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও পরমব্যোমাধিপতি নারায়ণ সম্বন্ধে বিচার, রামানুজীয় মত খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অতুল্যত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবানে দেহ-দেহি ভেদ নাই এই সম্বন্ধে বিচার, লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণ-স্পৃহা, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার, নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট লীলা, লীলা-বিচার, সঙ্গতিতত্ত্ব, আবির্ভাবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মথুরা দ্বারকা, গোকুল গোলোক ইত্যাদির তথ্য, গোলোকে মাধুর্য্যের আধিক্য, শ্রীকৃষ্ণের বয়স সম্বন্ধে তথ্য, শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী,—ঐশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়া-মাধুরী, বেণু-মাধুরী ও শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী, ভক্তপূজার আবশ্যকতা, ভক্তের

শ্রেণীবিভাগ, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজগোপীগণ, ব্রজদেবীগণের মহিমাধিক্য, শ্রীরাধিকার ব্রজ-দেবীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত অবতার সমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থে সেইরূপ সুপ্রণালী-বদ্ধ অবতার-শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়না, অপিচ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বই যে চরমতত্ত্ব এবং গোলক-বৃন্দাবন ধামই যে সর্ব্বোচ্চতম ধাম এবং শ্রীশ্রীরাধারাণীই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা মহাভাবময়ী মহাশক্তি,—এই সকল তথ্য অতীব অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীজীবকৃত সমগ্র ভাগবত-সন্দর্ভ এতৎসহ ভক্ত পণ্ডিতমাত্রেরই পঠিতব্য। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের যে টীকা করিয়াছেন তাহাও সুবিচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা পাইয়াই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ বিরচন করেন। রসময় বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপায়-প্রদর্শক। এই একখানি গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে জীবনের কার্য্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দ-বৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যের সীমায় সমুপস্থিত হইতে পারেন। এই গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিবিধ প্রকারে ভক্তিরূপিণী উচ্চতমা চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তিরূপিণী চিত্তবৃত্তির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস আমরা আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই। বিষয়-বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কবিত্ব, সূক্ষ্মদার্শনিকত্ব শ্রেষ্ঠতম সাধন ভজনের উপায়-প্রদর্শকত্ব প্রভৃতি বিষয় যদি একাধারে দেখিতে হয়, তবে সুপণ্ডিত পাঠকগণ এই গ্রন্থানুশীলন করিলে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। যাহারা বৈষ্ণব ভজনের

বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্যই নিত্য পাঠ্য।

বৈষ্ণব-সাধন যে অতীব সরস এবং পবিত্রতার সুদৃঢ়তম ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সাধনার প্রথমে কি প্রকার অসংযত চিত্তবৃত্তি গুলিকে সংযত করিয়া বৈধি ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভিমুখে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কি প্রকারে চিত্ত সুনির্ম্মল হয়, শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতি কি প্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার সুখে অবহেলা জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই একমাত্র সুখকর বলিয়া প্রতিভাত করাইয়া তোলে এই গ্রন্থের প্রথমেই তাহার বিবৃতি আছে। রাগানুগা ভক্তি-বিকাশের পরে কি প্রকারে ভাবভক্ত্যাদির সঞ্চার হয়, কি প্রকারে সাধক ব্রজভাব লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়, ভাব, অনুভাব ও বিভাবাদির স্বরূপ কি প্রকার, এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও যিনি স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসশাস্ত্রের এই সকল বিষয় লইয়া কি প্রকারে আমরা তাঁহার ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারি। সেই রসময় বিগ্রহের স্বরূপ কি প্রকার, তাহার গুণাদিই বা কি, ইত্যাদি বহুল বিষয় আমরা শ্রীপাদ শ্রীরূপের এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হইতে পারি। ভক্ত ও ভক্তি, রসের লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ এবং তাহাদের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান বিবিধ শাস্ত্র হইতে উদাহরণের সহিত বিবৃত হইয়াছে। নরনারী সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য। এই গ্রন্থ-পাঠে চিত্তের অশেষ উন্নতি এবং আত্মার পরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভক্তিরস-বিষয়ে সুদীর্ঘ সাধনার পরে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। এই গ্রন্থ-বিরচনের পূর্ব্বেই হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, নাটক তিনখানি, পদ্যাবলী ও নাটক-চন্দ্রিকা বিরচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের পদ্য, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি মানব সমাজের

জন্য শ্রীভগবানের অমৃতময় কৃপা-নির্ম্মাল্য। শ্রীপাদ শ্রীজীব এই গ্রন্থের একখানি টীকা করিয়াছেন। উহার নাম দুর্গম-সঙ্গমনী। শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি শ্রীপাদ গ্রন্থকার গোকুলে অবস্থান করিয়া ১৪৬২ শকে রচনা করিয়াছেন। নাটক চন্দ্রিকা এই গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

ভারতাখ্যাশ্চতস্রস্তু রসাবস্থান-সূচিকাঃ।
বৃত্তয়ো নাট্যমাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে॥

এই গ্রন্থ-রচনার সময়েও উপসংহার লিখিত হইয়াছে যথা :—

"রামাঙ্গ শক্র গণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু র্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ॥

শালিবাহনের সম্বৎসর গণনায় ১৪৬৩ শাকে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। অতঃপর মূলগ্রন্থে এই গ্রন্থনিহিত উপদেশগুলির সবিস্তার আলোচনা করিব।

৮। উজ্জ্বল নীলমণি :—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী রসশাস্ত্র সম্বন্ধে যে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম উজ্জ্বলনীলমণি। ইহার দুইখানি অত্যুত্তম টীকা আছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিত টীকার নাম "লোচন-রোচনী"। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আনন্দচন্দ্রিকা নাম্নী অপর টীকার রচয়িতা। বিশ্বনাথের টীকা১৬১৮ সালে আশ্বিন মাসের শুক্লপঞ্চমীতে টীকাকারের শ্রীবৃন্দাবন-অবস্থানকালে পরিসমাপ্ত হয়। এই দুইখানি টীকায় পাণ্ডিত্যের এবং ব্যাখ্যান-বৈভবের পরম প্রকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠার্থিগণ এই দুই টীকার সাহায্যে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এবং তদীয় পার্ষদগণের চরণ চিন্তা করিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ব্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হৃদ্গম্য করিতে পারেন। এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর উত্তরাংশ, এবং গোপী-ভজনের বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ। শ্রীভগবান্

প্রেমরসময়, তাঁহার ভজনা করিতে হইলে গোপীদের ন্যায় আদর লইয়া, গোপীদের ন্যায় সোহাগ লইয়া, গোপীদের ন্যায় মাধুর্য্য লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। গোপীদিগের প্রেমানুরাগ, তাঁহাদের সেই বৃন্দাবনীয় প্রেমমাধুর্য্য ইহজগতে একেবারেই অসম্ভব। যাহাদের প্রেম-কটাক্ষে ত্রিভুবনের ঈশ্বর বাধ্য ও বশীভূত, তাঁহাদের সেই প্রেমমাধুর্য্যের ভাব ইহজগতে একবারেই অসম্ভব। এই গ্রন্থে তাঁহাদের অনুরাগের মাধুর্য্য, প্রণয়ের প্রিয় সম্ভাষণ, মানের সুধামাখা বঙ্কিম ভাব-বিরহের হৃদয়শোধি তীব্র উচ্ছ্বাস,—এ জগতে প্রেমের কোন অভিনয়ের সহিতই তুলিত হইবার নহে।

শ্রীগোবিন্দ-বল্লভাগণের মাধুর্য্যময়ী প্রীতির কথা ভাষায় প্রস্ফুট করিয়া তোলা অসম্ভব। বসন্ত কাননের কুসুমের ন্যায় তাঁহাদের সেই স্মিত-সুধামাখা হাসির রেখা ভগবৎ প্রেমের এবং ভগবদনুরাগের যে আদর্শ প্রকাশ করে, মানুষের ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সেই ব্রজরসের যে আভাসচ্ছায়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়াও চরিতার্থ হইতে পারি। দয়াময় মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় নারকীয় জীবের জন্য শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামীর দ্বারা যে অতুল অমূল্য সুধাভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পীযুষ-সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও এই মোহময় সংসারের গরল-ভক্ষণের অনন্ত ও অসীম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। যে ভক্তিসুধা প্রেমিক ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাহারই সবিস্তার বিবৃতি ও উদাহরণ রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমপুত্তলী গোপিকাগণের হৃদয়ের কেমন ভীষণ বেগ, তাঁহার প্রতি তাহাদের কেমন গাঢ় প্রবল আকর্ষণ, এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অতি স্পষ্টরূপে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-

লালসায় তাঁহাদের হৃদয়ে অনুরাগের স্রোত কি প্রকারে শত তরঙ্গ তুলিয়া উদাওভাবে প্রবাহিত হয়, আমরা এই গ্রন্থে, সেই আনন্দ সুধাতরঙ্গের সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বিশদরূপে দেখিতে পাই। তাঁহাদের হাব ভাব, হেলা শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত, মুগ্ধ, চকিত, উদ্ভাস্বর, আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ, ব্যপদেশ, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়, ধুমায়িত, জ্বলিতা, উদ্দীপ্তা, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্র, অমর্ষ, অসূয়া চাপল, নিদ্রা, সুপ্তি, প্রবোধ, সন্ধি, শাবল্য, নিমেষাসহিষ্ণুতা, আসন্ন-জনতাহৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ়, মাদন, মোদন, মোহন, দিব্যোন্মাদ, উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, সুজল্প, মাদন, বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, অভিলাষ, চিন্তা, গুণকীর্ত্তন, মান, শ্রবণ, স্বপ্ন, নতি, উপেক্ষা, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, সম্ভোগ, রাস, জলকেলি প্রভৃতি শ্রীরাধা-প্রেমের অনন্তভাব এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন। যাহারা কামদেবের দুর্ব্বার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী, শ্রীভগবানের এই সমুজ্জ্বল রসসুধার বিন্দুমাত্র-পানে তাঁহারা অমেয় শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ভগবানের লীলা-রসে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে অপর রস উদ্বান্ত পদার্থের ন্যায় ঘৃণিত

ও অধন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহাদেব স্বীয় কোপানলে মদনদেবকে ভস্মীকৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু উজ্জ্বল-রসময় বিগ্রহ প্রেমানন্দঘন মোহনমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন নামে অভিহিত। যাঁহার মধুর মোহন মাধুর্য্যসার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি সে রূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিস্তম্ভিত হইয়া পড়ে, যাঁহার অঙ্গকান্তিতে কাননের লতিকাদেহেও বিপুল পুলকের সঞ্চার হয়, যাঁহার বংশীরবে যমুনা উজানে বহে,—সেই সর্ব্বমাধুর্য্যসার শ্রীকৃষ্ণরূপের এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিগণের ভাবলহরী এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে।

ভাগ্যবান্ পাঠকগণ এই গ্রন্থের রসাস্বাদ করিয়া ব্রজরসের এবং ব্রজোপাসনার বিশুদ্ধ তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন। মূল গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে এই গ্রন্থের সার-মর্ম্ম ও উপদেশগুলি বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে। পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীবগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপগোস্বামি দ্বারা জগতে যে প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মানব সমাজের পক্ষে তাহা পরম সুধাস্বরূপ। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে যে অমৃতোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ- সাধক। শ্রীকৃষ্ণ, রসময় বিগ্রহ। শ্রীবৃন্দাবনের রসময় কুঞ্জবনে বাস করিয়া শ্রীপাদ সনাতনরূপ সেই অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য অনুভব ও আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি অতি সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহার সাধনা-প্রণালীও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও হরিভক্তি বিলাসে অতীব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরম কারুণিক গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বলবতী দয়া গোস্বামিগণের হৃদয়ে স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকল বিষয়েই শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিল। মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারিত না হইলে এইরূপ মহাভাবের

ভাষায় অভিব্যক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রেম-ভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভজন-রসের মাধুর্য্য সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব উপদেশ-রত্নমালা লাভ করিয়াছেন, উহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই কৃপা-প্রসাদ। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী এমন সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র জগতের ধর্ম্মপিপাসু, ভগবৎতত্ত্ব-পিপাসু এবং ভজনরস-মাধুর্য্য-পিপাসু ব্যক্তি-মাত্রই ঐ সকল গ্রন্থের মর্ম্মাস্বাদনে কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস শ্রীচরিতামৃত, ভক্তি-রস-পিপাসু ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় গ্রন্থ,—তাঁহাদের এই ধারণা বাস্তবিক এবং অতীব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু চরিতামৃত গ্রন্থ-বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে উহা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিখিল রসময় গ্রন্থসমূহের সুধাময় প্রবাহেই পরিষিক্ত। শ্রীপাদরূপের গ্রন্থে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী সেই সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রন্থখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি,—কবিরাজ গোস্বামী প্রকৃত পক্ষেই খাটি জহরী। গ্রন্থ-সাগরের অতল-তলে কোথায় কি রত্ন কিরূপভাবে লুক্কায়িত থাকে এবং কি প্রকারে সেই সকল রত্ন সংগ্রহ করিতে হয়, কবিরাজ গোস্বামী সে সম্বন্ধে অতীব অভিজ্ঞ, ইহার উপরে তাঁহার নিজের লোকাতীত ভক্তির অনুভব, তাঁহার সেই সিদ্ধাবস্থার বিশুদ্ধ ভক্তির অমিয়-প্রবাহ শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীচরিতামৃত শ্রীপাদ গোস্বামিদ্বয়ের উপদেশ-রত্নেরই আধার; আধারই বা বলি কেন,—মহাভাণ্ডার! যাহারা সংক্ষেপতঃ গোস্বামি-শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-পাঠেও এই সকল গ্রন্থের যথেষ্ট আভাস পাইবেন। বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব ও দানকেলি কৌমুদী নাটকের আলোচনা মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

পরম কারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পরমার্থ ও ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীরূপের গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজিত। সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, শমদম, বৈরাগ্য ও ভজনের প্রণালী ব্যতিরেকে অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে যে সহজেই ভজন-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। এই দুই ভ্রাতার বৈরাগ্যাদির কথা স্মরণ করিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদরূপের ভক্তিময় চরিত্র কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

—মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র।
রূপ সনাতন হয়, সবার গৌরব-পাত্র॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পার্ষদগণ॥
কহ তাহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন॥
কৈছে অষ্ট প্রহর করে কৃষ্ণের ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেত দোঁহে রয় যথা বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে॥

কভু ভক্তি রসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণের মধ্যে শ্রীপাদ রূপ-সনাতন সকলেরই অসীম গৌরবের পাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত জানিতে হইলে এই দুই ভ্রাতার প্রণীত গ্রন্থই একমাত্র আলোচ্য এবং ইঁহাদের চরিত্রই অনুকরণীয়।

পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে আরও দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

(১)

রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে
বিষাদে ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥
মোর কর্ম্ম দোষে ফাঁদে হাতে পায়ে গলে বান্ধে
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপন করুণা-পাশে জোর করি ধরি কেশে
চরণে নিকটে লেহ তুলি ॥
পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এইবার কর পরিত্রাণ ॥
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেবে অজামিলে
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এদুঃখ সমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনে নাহি হেন আর ॥

হেনকালে একজনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে মনে হৈল আশ্বাসে
পত্রী পড়ি করিলা গোপন ॥

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞী
পাতশার উজীর হৈয়াছিল।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥
ছিড়া বস্ত্র, অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িল গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু প্রসারিয়া আইলা ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পর্শ্য পামর দীন দুরাচার, মন্দ, হীন
নীচ-সঙ্গ, নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায় তবু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছিড়া এক কান্থা লৈয়া
প্রভু স্থানে পুন আগমন॥

গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণের মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥

কভু কান্দে, কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেড়া কাঁথা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা
পরিধান,—ছেড়া বহির্ব্বাস ॥

গিয়া গোসাঞী সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে ঝরে সনাতনের পদ ধ'রে
কহে রূপ গদ্‌গদ বচন ॥

গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এইরূপ কতদিন থাকে ॥

তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফলমূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে থাকে কতদিন ॥

কত দিন অন্তর্দ্ধনা ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে ॥

কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগবিলাস তরুতলে কৈল বাস
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লুটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

শ্রীপাদপার্ষদ-গোস্বামিদ্বয় এইরূপে দীর্ঘকাল এ জগতের বিবেক-বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তিময় ভজননিষ্ঠার আচার ও প্রচার করিতে করিতে কালের নিয়মে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা অধিক সময়ই অন্তর্দ্দশায় শ্রীভগবানের লীলা-রস-সুধাস্বাদনে নিমগ্ন থাকিতেন। বহির্বিষয়ে জ্ঞান ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহাদের শ্রীচরণ-দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রীচরণ-রেণু উত্তরীয় বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু ভক্তগণের এই সৌভাগ্য আর বেশীদিন রহিল না। এই তৃণাদপি নম্রতার মূর্ত্তি, এই সৌজন্য-বিনয়ের আদর্শ-মূর্ত্তি—এই সরলতা-দীনতা-বিবেক ও বৈরাগ্যের শ্রীবিগ্রহ,—এই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় ভজন-নিষ্ঠাময় শ্রীমূর্ত্তি-যুগল স্বধামে গমনোন্মুখ হইলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৬ শকের আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় শ্রীপাদ সনাতন যথাবস্থিত এই জাগতিক দেহ পরিহার করিয়া মঞ্জরীদেহে স্বীয় লীলা-বিলাসের ধামে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এই সংবাদে দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ সমাগত হইয়া শোকোচ্ছ্বাসে যোগদান করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের স্নেহালিঙ্গন-বিলসিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাধার সেই শ্রীঅঙ্গ, ব্রজের ধূলায় নিস্পন্দভাবে নিপতিত রহিলেন। যথাসময়ে ভক্তগণ তাঁহার শেষ-সংস্কার করিয়া শ্রীশ্রীমদন-

মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গনে তাঁহার পুষ্প-সমাধি সযত্নে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখনও আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় মদনমোহন-প্রাঙ্গনে সনাতনের সনাতনী স্মৃতি-মহোৎসব সম্পন্ন হয়। জানিনা, কয়টী সহৃদয় সজ্জনের কয়ফোটা নয়ন-জল,—এই সমাধিস্থলকে পরিষিক্ত করে?

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাদগোস্বামিগণের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীপাদ শ্রীরূপ মহাশোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। শ্রীপাদ সনাতন, সাংসারিক গণনায় তাঁহার মহাবাৎসল্যময় অগ্রজ ছিলেন কিন্তু পারমার্থিক গণনায় তিনি তাঁহার গুরু, প্রভু, সহায়, শরণ, সখা ও অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার পক্ষে এই নিদারুণ ব্যাপারে মনে হইল যেন প্রেমের হিমালয়-শিখর ভাঙ্গিয়া পড়িল,—যেন প্রীতির প্রশান্ত মহাসাগর শুকাইয়া গেল,—যেন ভাল-বাসার চন্দ্র সূর্য্য আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল! সেই দিন হইতে শ্রীরূপ অধিকতর নীরব হইয়া পড়িলেন। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী, শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি সহচর ও অনুচরগণের হৃদয় ভাবি বিপদের বিষাদ-কালিমায় অধিকতর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীরূপ-মঞ্জরীও ব্রজের ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বীয় লীলা-বিলাস-ধামে প্রবেশ করিলেন। এই জগৎ যেন প্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, নিত্য বৃন্দাবনের সমুজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় সমুজ্জ্বলভাবে স্বীয় গগনে সমুদিত হইলেন!

কৃপাময় ভজননিষ্ঠ পাঠক মহোদয়গণ,—যাহা হইবার তাহাতো হইল। এক্ষণে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের কৃপায় এবং শ্রীভগবানের দয়ায় এই পুণ্যপবিত্রতার শ্রীমূর্ত্তির,—বিবেক-বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠার এই শ্রীবিগ্রহের,—প্রেমভক্তির মহাসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় এই শ্রীমূর্ত্তি-যুগলের প্রতিচ্ছবি এই অধম লেখকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে যেন নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং এই আদর্শযুগল যেন এই ক্ষুদ্রজীবের দুর্ভাগ্যময় জীবনের নিরন্তর নিয়ামকরূপে বিরাজিত হন।

ভূমিকা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। আমি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সততই আনন্দলাভ করি, ইহার প্রতি পত্রেই ভজন-সাধনের সদুপদেশে পরিপূরিত। এই গ্রন্থখানি অবলম্বনে শ্রীরায়রামানন্দ, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমৎস্বরূপ-দামোদর, শ্রীপাদদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদ্বারা বিরচিত হইয়াছে, শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ও সংসাহিত্যিক সমাজেও সেই সকল গ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছে; তজ্জন্য অপরাপর সাধারণ নরনারীগণও আমাকে আশাতিরিক্ত সমুৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয়দ্বয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি-সঞ্চারে নিখিল বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও ভক্তি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সূত্র রূপে তাহারও উল্লেখ আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপিয়া আলোচনা করিয়াও সেই সিদ্ধান্ত-সিন্ধু স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অনন্ত উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল দিগন্তপ্রসারী জল-নিধির ন্যায় সেই সকল সিদ্ধান্ত-সাগরের কল্লোল-কোলাহলময় তরঙ্গ,—আমাকে দূর হইতেই একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

মানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এই যে নিজের নিকট যাহা মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ হয়, আত্মীয় স্বজনকেও তাহার আস্বাদ অনুভব করা-ইতে ইচ্ছা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদদ্বয়ের হৃদয়ে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা মানবসমাজের হিতের জন্য ভজন-সাধন

সম্বন্ধীয় যে সকল সিদ্ধান্তরত্ন বিতরিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার পরিস্ফুট জ্ঞান কি প্রকারে বহুলরূপে প্রচারিত হইবে—সকলেই তাহার সুধাস্বাদে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন, পঞ্চাশ বর্ষকাল ব্যাপিয়া এই এক চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বিরাজ করিয়াছিল।

আমি যদিও এই সময়ে অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু কখনও এই বাসনার বিরাম হয় নাই। সময়ে সময়ে সাময়িক বৈষ্ণব পত্রাদিতে এই বিষয়ে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছি। শ্রীচরিতামৃত-পাঠ-সভায় অতীব যত্ন ও শ্রম চিন্তার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভবানীপুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় প্রায় একবর্ষ কাল শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়াছি। সকল সময়েই মনে হইত, এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের প্রচুর উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অর্থাভাবে এতদিন মনের বাসনা মনেই বিলীন হইতেছিল।

অধুনা ভগবৎ-কৃপায় কলিকাতা কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট-নিবাসী সদাশয় সদ্‌গ্রন্থ-অধ্যয়ন-নিপুণ সরলচেতা ধর্ম্মপ্রাণ রাজকুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র সাহা মহোদয়ের ধর্ম্মপ্রাণা, পতিব্রতা, ভক্তিময়ী, সাধ্বী সতী প্রণয়িনী পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী মা-জননী এই শ্রীগ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশ করার জন্য আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তাঁহার সৌজন্যে, তাঁহারই আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে আমি এই গুরুতর অথচ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এই শুভানুষ্ঠান-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছি। ইহার সাফল্য, দয়াময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ও সাধুভক্তগণের কৃপাপেক্ষ। তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুই আমার পক্ষে চিরদিন সঞ্জীবন-রসায়ন; তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুই আমার হৃদয়ে শক্তিপ্রদায়ক, শক্তির উন্মেষক এবং সমুত্তেজক—এই শ্রীচরণরেণু হইতেই আমি কার্য্য-শক্তি প্রাপ্ত হই। সুতরাং দয়াময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এবং সাধুসজ্জনগণের চরণরেণু মস্তকের

ভূষণ করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সকলেই কৃপা করিয়া শক্তি প্রদান করুন যেন চিরবাঞ্ছিত অভিলাষটী সাধু সজ্জনগণের কৃপা-দৃষ্টির উপযুক্ত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গদেশ নানা প্রকারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সকল দিকেই কর্ম্মঠতার নবজাগরণ অনুভূত হইতেছিল; যখন যে দেশ ধর্ম্মের নবউদ্যমে জাগিয়া উঠে, তখন সমাজ-প্রাণে বিবিধ উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়ে কিছু বলা হইবে না। বঙ্গদেশ মহাপ্রভুর-শিক্ষা-প্রভাবে যে অভিনব ধর্ম্মের, অভিনব সাহিত্যের এবং ধর্ম্ম-সংস্কারের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাহাই বক্তব্য। ষড়্‌গোস্বামী যে প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে সেই প্রতিভার সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের চরণ-নখচ্ছটার প্রভাবে শ্রীপাদরূপ-সনাতনগোস্বামি-ভ্রাতৃযুগল ভগবদ্ভক্তি-রসের যে সাগর-তরঙ্গ বঙ্গদেশে বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাও প্রচুর শক্তি-সাপেক্ষ। এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের উপদেশ ষড়্‌গোস্বামিগ্রন্থে বিশেষতঃ শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা করিলে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের সামাজিক ব্যাবহারিক স্মার্ত্ত সদাচারের এবং প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক দর্শন শাস্ত্রের বহুল সুস্পষ্ট সংস্কার সাধন করিয়াছেন। এস্থলে সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা বেশী কিছু বলিব না, সাধারণ ভাবে কেবল এইটুকু বলিতেছি যে, তাঁহার নিকট জাত্যভিমান অপেক্ষা বাস্তবিক গুণেরই আদর ছিল। তিনি শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছিলেন:—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিকদয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

জগতের প্রত্যেক দেশের নীতিবাদিগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ এই উক্তির মর্ম্ম অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বহুস্থানে 'তৃণাদপিনীচ হওয়ার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদরূপ-সনাতন এই উপদেশটীর মূর্ত্তিমান্ অবতার। যীশু বলেন, "Blessed are the poor in spirit for theirs is the Kingdom of heaven "—Matt. V. 3. বাইবেলের এই উক্তি এবং সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-বাক্য একই ভাবাত্মক। মহাপ্রভুর ধর্ম্মোপদেশের প্রাথমিক সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত কথা এই যে—

"উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মরে, কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
গ্রীষ্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ-নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

মহাপ্রভু সনাতনের শিক্ষায় যে দীনতার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এমন নয় যে অর্থবিহীন, অন্ন বস্ত্র বিবর্জ্জিত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিই ভগবানের দয়ার পাত্র। ফলতঃ পাপিয়সী দারিদ্র্য-দশাই যে ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুকূল, তাহানহে,—প্রত্যুত, তাদৃশ অবস্থায় লোকেরা পেটের জ্বালায় অনেক পাপকার্য্য করে। এই সংসারে প্রায়শই দেখা যায় অতি দরিদ্র—অথচ অত্যন্ত উদ্ধত, ক্রোধী লোভী এবং নানাপ্রকার পাপাচারী।

অতএব মহাপ্রভু যে দীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন কিম্বা বাইবেল গ্রন্থে যে "poor" বা দীন ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, সে দীনতা, অর্থসম্বন্ধীয় দীনতা নহে, উহা মানসিক দীনতা। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা রাজরাজেশ্বর হইয়াও এই সংসারে নিজকে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ও অতি দীনহীন বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা সরল ও ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করেন, 'হে গোবিন্দ, এ সংসারে তোমার চরণরেণু ভিন্ন আমার আর কোন সম্বল নাই।' তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এ ভব-জ্বালা হইতে নিস্তার কর।'

এই প্রকারের দীনতাই শ্রীপাদরূপ-সনাতন-ভ্রাতৃযুগলকে ভগবানের রাজ্যের অধিবাসী করিয়াছিল। বাইবেলের কথার অর্থও ঠিক এইরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্য "তৃণাদপি" শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—'উত্তম হইয়া নিজকে মানে তৃণসম।' নচেৎ দিন-ভিকারী, পথের কাঙ্গাল, অন্ন-বস্ত্র-হীন আধিক দরিদ্র কেবল তাহার শোচনীয় দরিদ্র্যদশার প্রভাবেই ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না।

বাইবেলের বহুস্থানে দীন-হীনতার প্রশংসা করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে সে দীনতার অর্থ আধিক দরিদ্রতা নয়। তবে ইহা সত্য যে ধনও এক প্রকার মত্ততা জন্মায়। উহা ধনমদ নামে অভিহিত হয়। মূঢ়েরাই ধন-মদে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে এইরূপ ধনমদের নিন্দা লিখিত আছে। যে স্থলে ধনই মত্ততার সৃষ্টি করে,

মানুষের যাবতীয় কর্ত্তব্যতা হইতে মানুষকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাদৃশ ধন না থাকাই শ্রেয়স্কর। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে :—

"দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥
নিত্যংক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্ন-কাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥

ইহা নারদের উপদেশ। ইহার অর্থ এই যে,—দরিদ্রব্যক্তির অহঙ্কার থাকে না, কোন প্রকার মত্ততা থাকে না, দারিদ্র্য-দুঃখজন্য তাহার যে ক্লেশ হয়, তাহাই পরম তপস্যার ন্যায় ফলপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি অন্নাভাবে প্রতিদিন কষ্ট পায়, ক্ষুধায় ক্ষুধায় যাহার দেহ অনবরত জীর্ণ-শীর্ণ হয়, এবং আহারাভাবে ইন্দ্রিয়গুলি শুষ্ক হইয়া যায়, সেজন্য মনে হিংসা প্রভৃতি বৃত্তি থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় সমদর্শী সাধুর ন্যায় দরিদ্রেরও ধীরে ধীরে ভোগ-তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়া যায়। সমচিত্ততাশালী মুকুন্দ চরণ-সেবী সাধুবৃন্দের ন্যায় দরিদ্রগণেরও সকল বাসনা তিরোহিত হয়। অপিচ ধনমদান্ধ অসৎলোকের পক্ষে দারিদ্র্যই নয়নাঞ্জনের কাজ করে। দরিদ্র নিজে দুঃখ পায় সুতরাং পরের দুঃখ বুঝিতে পারে। যাহার শরীরে কণ্টকবিদ্ধ হয়, সে পরের কণ্টক-ব্যথা স্বভাবতঃই অনুভব করে। চিরসুখী পরের ব্যথা বুঝিতে পারে না।

এই প্রকারে দারিদ্র্য হইতেও মানুষ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়, শ্রীনারদ তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, অভাব-জনিত দারিদ্র্য যদি মানুষের হৃদয়ে নির্ব্বেদ জন্মায়, তাহা হইলে সে দারিদ্র্য মন্দ নহে। মনের গর্ব্ব দূর করাই প্রয়োজনীয়। অর্থহীন জনেরও অত্যন্ত গর্ব্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং দারিদ্র্যই যে অভিবাঞ্ছিত, তাহা নহে। আত্মার কল্যাণের জন্য গর্ব্ব-হীনতাও নিরহঙ্কারত্ব বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপাদরূপ ও সনাতন ইচ্ছা পূর্ব্বক দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া ছিলেন। তাই কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ সনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্তক্ত্বা য ঋদ্ধিং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তি-রসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতঃ মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥

যিনি গৌড়াধিপতি যবনরাজ হোশেন শাহের সভায় সভাবিভূষণ সমুজ্জ্বল মণির ন্যায় বিরাজমান ছিলেন, রূপের অগ্রজ সেই সনাতন সমগ্র রাজ-সমৃদ্ধি ও রাজশ্রী সহসা ত্যাগ করিয়া তরুণ বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশে পথের ভিকারী সাজিলেন; ভক্তিরসে তাহার হৃদয় পূর্ণ ও সরস কিন্তু তিনি বাহ্যে অবধূতের আকার ধারণ করিলেন। তিনি শৈবালসমাচ্ছন্ন, স্বচ্ছ প্রসন্নসলিলপূর্ণ, মহাসরোবরের ন্যায় তাঁহার তত্ত্ববিদ্ প্রিয়জনগণের নিকট মহাপ্রীতির বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল বৈরাগ্যই দীনতার ন্যায় সাধুগণের চরিত্রের ভূষণ নহে। জগতে এমনও দেখা যায় যে, বিষয়-ভোগ, ইন্দ্রিয়-লালসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যিনি কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন,—দর্প দম্ভ, গর্ব্ব, অহঙ্কার, অসূয়া প্রভৃতি অশেষ নীচ প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে সমানভাবে অবস্থান করিতেছে। এরূপ বৈরাগ্য সাধুতার অনুকূল নহে, ভগবদ্ভজনেরও অনুকূল নহে। ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ হইলে চিত্তের সর্ব্বপ্রকার কদর্য্যভাব দূরীভূত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ সহজেই হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া যায়। বৌদ্ধসাধুগণ ও সাংখ্য-মতের সাধুগণ, সাধুত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই সাধুত্ব এবং বৈরাগ্য দৃঢ়ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেও

পারে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এ সম্বন্ধে একটী প্রমাণ আছে। সে প্রমাণটী এই :—

"তেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ।
ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ।
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ হে অরবিন্দনয়ন গোবিন্দ, একশ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা তোমাতে ভক্তিহীন হইয়া সাধন করেন এবং সেই সাধনার ফলে নিজ-দিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা বাস্তবিকই বুদ্ধিহীন। কেননা তোমাতে ভক্তি না থাকিলে বুদ্ধি বিশুদ্ধা হয় না। এই শ্রেণীর সাধকেরা জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধনে বহু উচ্চে অধিরূঢ় হইলেও তোমার শ্রীচরণ-অবলম্বন না করায় অধঃপতিত হন। ফলতঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ সাধনও ভক্তি-সম্বন্ধ-হীন হইলে সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি উপদেশে শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথভক্তির্মমোর্জ্জিতাঃ॥

হে উদ্ধব, যোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, বেদ বিহিত বিবিধ ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, কঠোর-তপস্যা, ইন্দ্রিয়-লালসা-সংযমপূর্ব্বক বৈরাগ্য ও ত্যাগাদি-সাধন, মানবাত্মার কিয়ৎপরিমাণে কল্যাণকর বটে কিন্তু আমার প্রতি সুদৃঢ়াভক্তি দ্বারা জীবের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এই সকল সাধনা দ্বারা তদ্রূপ ফল হয় না।

উপনিষদে স্থানে স্থানে নৈষ্কর্ম্ম্য ও নিরুপাধি উপনিষদ্-জ্ঞানের প্রচুর প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীভাগবত বলেন :—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং।
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্॥"

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য এবং নিরুপাধিজ্ঞানেরও ফল-সিদ্ধি-বিষয়ে ন্যূনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভব-ভয়-ভঞ্জন ভগবানে ভক্তি ব্যতীত ভব-ভ্রমণ-পরিশ্রমের অত্যন্ত নিবৃত্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই।

শ্রীপাদরূপ-সনাতনের যে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, সে বৈরাগ্য তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ দীনতায় সাধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। দীনতা-মিশ্র বৈরাগ্যই সাধুত্বের নিদর্শন। কেবল বৈরাগ্য অবলম্বনে প্রকৃত সাধুত্ব সম্ভবপর নহে, অথচ বাহ্যবৈরাগ্য ব্যতীরেকেও বিশুদ্ধ দীনতায় মানুষ সাধু হইতে পারে। কিন্তু কেবল সেই সাধুত্বই জীবের পূর্ণতম কল্যাণকর নহে। জ্ঞান-বৈরাগ্য-দীনতা-সাধুত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ, সদ্ভক্তির সুধা-মধুর সুস্বাদু ফল। এই সদ্ভক্তিতে জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা;—শ্রীরূপ সনাতন এই শিক্ষারই সজীব বিগ্রহ।

কিন্তু তথাপি এই ভ্রাতৃযুগলের চরিত্রে দীনতাই সমুজ্জ্বল বিশিষ্টতা। ইঁহাদের নাম করিলেই দীনতা-মিশ্র ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হয়। ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়, উহার নাম,—"Imitation of Christ" এই গ্রন্থখানি বাইবেল-অবলম্বনে প্রথমতঃ ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হয়। তৎপরে ইউরোপীয় প্রত্যেক ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম-নীতিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে :—

"God protects the humble and delivers him; He loves the humble and comforts him; he inclines his car to the humble; he bestows great grace upon the humble, and after his humiliation he raises him to glory. He reveals his secrets to the humble, and sweetly attracts and calls him to himself."

ইহার অর্থ এই যে,—শ্রীভগবান দীনকে রক্ষা করেন ও পরিত্রাণ করেন, তাহাকে ভালবাসেন এবং শান্তি দান করেন, তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত করেন, তাহার উপরে করুণা-বর্ষণ করেন এবং তাহার অভাব বিমোচন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করেন। তিনি দীনের নিকট সাধনা-সঙ্কেত প্রকাশ করেন এবং মধুরভাবে তাহাকে স্বীয় চরণ-প্রান্তে আকৃষ্ট করেন।

এই সকল কথা মহাপ্রভুর উপদেশরই প্রতিধ্বনি এবং শ্রীরূপ-সনাতনের জীবনের মহামন্ত্র। যাঁহারা শ্রীরূপ-সনাতনের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম-জীবন-গঠনের প্রয়াসী, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে তৃণাদপিনীচতা স্বীয়জীবনে প্রতিফলিত করিতে যেন প্রয়াস পান। এই দীনতাই ভক্তি-রাণীর এক প্রধান পরিচারিকা। সাধক মাত্রকেই সর্ব্ব প্রথমে ইহার সেবা করিতে হইবে। ইনি সাধককে ভক্তি-রাণীর অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন। রূপ-সনাতনের শিক্ষায় ও চরিতে সর্ব্বপ্রথমেই ইনি দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন।

শ্রীচরিতামৃত-পাঠে একটী কথা জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের আচার ব্যবহার ভাল ছিল না। মুসলমান শাসন-প্রভাবে হিন্দু-সদাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার প্রভাব দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চিম ভারতেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইত। দক্ষিণ প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু-সদাচার অনেক পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়াছিল কিন্তু দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে হিন্দু-আচার-ব্যবহার অধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দু-সদাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি যে সবিশেষ আদেশ প্রদান করেন, তাহাতে পশ্চিম অঞ্চলের লোকের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভু উঁহাদের অধঃপতনের কথা বিশেষরূপেই বলিয়াছেন।

বিলুপ্ত-প্রায় হিন্দু-সদাচারের পুনরুত্থান ও পুনঃপ্রচার শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের কার্য্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ গণনীয়। সমগ্র হিন্দুসমাজ এইজন্ত এই ভ্রাতৃযুগলের নিকট চিরদিনই ঋণী থাকিবেন। হরিভক্তি-বিলাস হিন্দু-সদাচার-রক্ষণের এক মহাদুর্গ। এই গ্রন্থে সদাচার-প্রকরণে গ্রন্থকারের হৃদ্গত উপদেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অতি পরিস্ফুট ভাবে সদাচারের সমুজ্জ্বল বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মন্বাদি ঊনবিংশ সংহিতায় এবং অষ্টাদশ পুরাণে হিন্দু-সদাচারের যে সকল উপদেশ বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, হরিভক্তি-বিলাসে তাহারই সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত অথচ অতি বলবৎ ও তেজস্বি বচন প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি বুঝাইয়াছেন,—

"আচার-প্রভবো ধর্ম্মঃ"

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি; "আচার-হীনং ন পুনন্তি বেদাঃ",—আচার বিহীনকে বেদ সকলও পবিত্র করিতে পারেন না,—সনাতনের এই সকল উপদেশ ভারতবাসী হিন্দুদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহারা হরিভক্তি-বিলাসে সদাচারের শত শত উপদেশ দেখিতে পাইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সিংহ-পরাক্রমে হিন্দু-সদাচার-রক্ষার্থ ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, সদাচারের সুগমপথে ভক্তি-রাণীর সমুজ্জ্বল ও সুস্নিগ্ধ সুখ-শান্তিময় রাজ্যের অভিমুখে অভিসার করিলেন; সম্মুখে নববৃন্দাবনের শ্যমল-সজীব বনশোভার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, সুনীল যমুনার সুস্নিগ্ধ মৃদুল তরঙ্গ, তটস্থ তরু-বল্লরীর শাখা-পত্রান্তরালে কলকণ্ঠ বিহগ-বিহগীর সুধামাখা সুস্বর গান এবং অদূরে কুঞ্জ-কুটিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মনপ্রাণোন্মাদিনী মধুময়ী লীলা,—শ্রীপাদরূপ-সনাতনের গ্রন্থে কাব্যরসের এই আনন্দবৃন্দাবন,—প্রেমিক ও ভাবুক পাঠকগণের চিত্ত-অধিকার করিয়া বসিল; তাহারা ভ্রাতৃযুগল-কৃত শ্রীবৃন্দাবনীয় রস-কাব্যের ভক্তি-রস-সিন্ধুর কর্ণানন্দি কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং সেই আনন্দেই

চরিতরে চিত্ত নিমজ্জিত রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবৎ-পার্ষদ ভ্রাতৃ-যুগলের কাব্যশক্তি-প্রভাবে, বঙ্গেও বৃন্দাবনে,—তাই বা বলি কেন,—সমগ্র ভারতে এক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় নবভাব জাগিয়া উঠিল। ইহা হইতেই মহাপ্রভুর মহাশক্তি-সঞ্চারের সুমহান্ প্রভাবের লেশাভাস বুঝা যাইতে পারে। কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতে মধুময় বৈষ্ণব-বেদান্তের যে মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, এখনও তাহার পরিচয়-চিহ্ন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

এই ভ্রাতৃযুগলের লিখিত গ্রন্থগুলিকে কাব্য বলিতে হয় বলুন, ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিতে হয় বলুন, অথবা বেদান্ত বলিতে হয় বলুন, আমি কিন্তু এই সকল গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের অতীন্দ্রিয় মহালক্ষ্য সেই "রসোবৈ সঃ" ইতি অভিহিত পরম তত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হই। তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যে, অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এই প্রপঞ্চে, এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দময় অপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সততই সুধাময়ী লীলা-বিলাসে ও স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে পরমমহান্ হিমালয় পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম শৈবাল-বিন্দু (vegetable protoplasm) হইতে মহামহীরুহ অশ্বথাদি বনস্পতি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদাদি পর্য্যন্ত নিখিল সৃষ্ট-পদার্থে সেই "রসোবৈসঃ" ইতি অভিহিত পরম বস্তুর শক্তি-বিভূতির শাশ্বতী-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত, বিস্মিত ও বিস্তম্ভিত হইয়া থাকি,—কি মহান্ সেই ভূমাপুরুষ! কি সুন্দর, কি মধুর সেই বিশ্বরূপের রূপ! কি মহাব্যাপিনী, কি মহামহিমা তাঁহার সেই মহাশক্তির লীলা!—কেবল এই প্রপঞ্চের বিশ্বভুবনে নয়, প্রপঞ্চাতীত আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে,—সেই রসময় রসিকশেখরের চিদানন্দময়ী, সর্ব্বজন মুগ্ধময়ী, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা!! সর্ব্বত্রই তাঁহার শক্তির প্রভাব, জলে স্থলে, অনলে-অনিলে, ভূধরে-ভূস্তরে,

প্রাঙ্গনে গগনে, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্রে সর্ব্বোপরি প্রপঞ্চাতীত তাঁহার স্বকীয় নিত্যধামে,—সর্ব্বত্রই তাঁহার এক মহাশক্তির লীলা ! কিন্তু এই এক অদ্বয় মহাশক্তি কার্য্যভেদে, দেশ কাল-পাত্র-ভেদে অনন্ত নামে, অনন্ত ভাবে বিজ্ঞানে, দর্শনে কাব্যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রসশাস্ত্র প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই ভ্রাতৃযুগলের গ্রন্থাবলীতে নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্ব হেয় বলিয়া অনাদৃত হইয়াছে। সগুণ-সশক্তিক অনন্ত-লীলা-বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়, লীলাময়, রসময়, প্রেমময়, আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই পরমতত্ত্বরূপে নিখিল শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, উপাস্য ও আস্বাদ্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

মহাপ্রভু সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ করেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

> "কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
> অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে, ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
> কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার।
> চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
> বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
> স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের, কৃষ্ণ-সমাশ্রয়॥
> সর্ব্বআদি অর্ব্বঅংশী কিশোর শেখর।
> চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
> স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
> সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥

এ স্থলে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে গিয়া কৃষ্ণের শক্তি-বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে। এই উপদেশ মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। ঐ বিংশ পরিচ্ছেদেই ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করার উদ্দেশ্যে ভগবানের শক্তিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্বের জ্ঞান না হইলে জীবতত্ত্ব বুঝা যায় না। সুতরাং প্রথমেই কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব বলা প্রয়োজনীয়। সেইজন্ত শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন :—

"সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥"

ভগবৎ-শক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণব-বেদান্তের সবিশেষ আলোচ্য-বিষয়। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবতের তোষণী-টীকায় এবং শ্রীজীব শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশেরই বিস্তৃতি। শ্রীচরিতামৃতে এই সকল স্থলে বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে সেই সকল বচন প্রমাণের ব্যাখ্যা-বিন্যাস করা হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পরম ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব-বেদান্ত শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভগবৎ-শক্তিতত্ত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-বেদান্ত-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শক্তিবাদের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে হয়। সেইজন্ত এই ভূমিকাতে শক্তি-তত্ত্বসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। চরিতামৃতে আদিলীলা-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
"চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত"।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥"

এইরূপ চরিতামৃতে বহুস্থানে কৃষ্ণশক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই স্থলেই বহুদর্শী প্রত্যাদিষ্ট পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ভগবৎ-শক্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য তিনি দ্বিরুক্তির আশঙ্কা করেন নাই। প্রয়োজন মত স্থল বিশেষে পূর্ব্ব কথার পুনরুল্লেখ হইলে দ্বিরুক্তি হয় না। আদি লীলার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীরাধা-তত্ত্ববর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতাপিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান, সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার, ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

যেমন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বটী শাস্ত্রসম্মত শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধা-তত্ত্বও সেইরূপ শক্তিবাদের উপর সংস্থাপিত। শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব হ্লাদিনী শক্তির সার-স্বরূপ, মহাভাবের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। শক্তি, প্রত্যক্ষের বস্তু নহে। জড়ীয় শক্তিই (Physical force) আমাদের প্রত্যক্ষের বস্তু নহে। বিশ্ব-প্রসবিনী মহাশক্তি মহামায়া জড়ীয় বিশ্ব-শক্তি (Cosmo-physical force) অপেক্ষা সূক্ষ্মতরা। তটস্থাশক্তি (Psychical force) এই জড়ীয়-বিশ্ব-শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। জগৎ-প্রসবিনী মহামায়া আবার এই শ্রেণীর শক্তি হইতেও সূক্ষ্মতরা। ইহাকে আমরা (Psyco-spiritual Force) নামে অভিহিত করিতে পারি।

এইরূপে মায়ার বহিরঙ্গা অংশকে আমরা Physical force) নামে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু চিন্ময়ী মায়া জড়ীয়া নহেন। সন্ধিনী-শক্তির বহিরঙ্গ অংশ জড়ীয়া শক্তির অন্তর্গত, উহার সার (quint-essance) চিন্ময়। সন্ধিনীর এই সারাংশে ভগবানের ধামাদি প্রতিষ্ঠিত। সংবিতের প্রাপঞ্চিক অংশ আমাদের বিষয়-জ্ঞানের সাধক। ইহাদ্বারা আমাদের জাগতিক জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মে। আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহাকিছু শুনি ইত্যাদি যে কিছু ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-লাভ করি, সংবিতের বাহ্যাংশ দ্বারা সে সকল জ্ঞান সাধিত হয়। ইহাকে (Conciousness) বলা যাইতে পারে। (Cerebral substance Nervous system অর্থাৎ মাস্তিষ্ক-পদার্থ এবং বায়ুবহানাড়ী-প্রণালীকার সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিন্তু সম্বিতের যাহা সার তাহার সহিত প্রপঞ্চের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান এবং ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান

সাধিত হয়। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় (Super-sensuous Concious-ness) বলা যাইতে পারে।

অতঃপরে হ্লাদিনী-শক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা আমাদের জাগতিক আহ্লাদ অনুভূত হয়, তাহা হ্লাদিনী শক্তির কার্য্য। আমাদের প্রাপঞ্চিক হর্ষোৎপাদনের বস্তুতে এই শক্তির লেশাভাস বিদ্যমান থাকে। ইহারই পরম-চরমতম উৎকর্ষাবস্থা,—শ্রীরাধা-তত্ত্ব। এই সকল বিষয় অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত হইবে। শ্রীচরিতামৃতের আরও বহুস্থানে শক্তি-তত্ত্বের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। মধ্য-লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-স্থলে পুনরপি শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, যথা :—

স্বাভাবিক তিনশক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়॥
সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয়ে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদাংশে সন্ধিনী।
চিদংসে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেনশক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

শ্রীচরিতামৃতে এতৎ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোক প্রমাণরূপে গৃহীত

হইয়াছে। এস্থলে সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না। মূলগ্রন্থে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রামাণ দেওয়া হইবে। উপনিষদেও ভগবৎ-শক্তির প্রমাণ আছে,—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে,—"পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। অর্থাৎ সেই পরাৎপর পরমতত্ত্বের বিবিধ শক্তি আছে, ইহা শ্রুতিতে জানা যায়। পরব্রহ্মে শক্তি নাই, মায়াবাদিদের এই সিদ্ধান্ত যে বেদ-সম্মত নহে, বৈষ্ণব-দর্শনকারগণ বহু বিচার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে যাদব, টঙ্ক, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বেদান্ত-বিদ্‌গণ ভগবৎ-শক্তির প্রামাণিকতা শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এবং শ্রীমৎ বিষ্ণু স্বামি-প্রভৃতি আচার্যাগণ ভগবৎ-শক্তিত্বের সমর্থক। সমগ্র বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই তৎসাময়িক শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ স্বীকার করিতেন। তিনি এবং তাঁহার সহচর অনুচর পণ্ডিতগণ ভগবৎ-শক্তিবাদের সমর্থক। শ্রীরূপ-সনাতন এবং তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব বহুল গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বহুল শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন। মূলগ্রন্থে এই গুরুতর ও কঠোর দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা না করিয়া এই ভূমিকাতেই এতৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই আলোচনা বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই লেখকের দ্বারা আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে প্রতি সপ্তাহে শক্তিবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর পরিচিন্তন ও গবেষণা-পরিশ্রম লব্ধ প্রবন্ধটী পুনঃ প্রকাশিত হইল।

শক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহার পরিস্ফুট ধারণা না হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তির উপাদান বুঝা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভগবৎশক্তির বিভাগই আদ্য আলোচ্য বিষয়। জীব শ্রীভগবানেরই

শক্তি, জগৎও ভগবৎশক্তি। সুতরাং শক্তি কি, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে হয়। সামর্থ্যবাচী শক্ ধাতুর উক্ত ক্তিন্ প্রত্যয়ে শক্তিপদ গঠিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, এবং যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, তাহাই শক্তি। যোগ্যতাবিশিষ্ট কোন ধর্ম্মীকেও শক্তি বলা যায়। আবার দ্রব্যের ধর্ম্মও শক্তি নামে অভিহিত হয়। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি, এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহাই কার্য্য। "শক্যতে কর্ত্তুং শক্যতে বানয়া,—শক্তিঃ।" এতদ্দ্বারা কিছু সাধিত হয় বা নিষ্পন্ন হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম শক্তি। পাশ্চাত্য বলবিজ্ঞান (Dynamics) শাস্ত্র বলেন—দ্রব্য সকল যদ্দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, তাহাই শক্তি (Energy)। সামর্থ্য মাত্রই শক্তি। ভগবান্ অনন্ত শক্তির আধার। এই জগতে অনুক্ষণই আমরা শক্তির খেলা দেখিতে পাইতেছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশ খণ্ডে নারায়ণ বলিতেছেন : —

সর্ব্বে শক্ত্যালয়া বিশ্বে শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ।
ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।
শক্তিযুক্তং তথানিত্যং নয়া শক্তিঃ প্রকাশিতা॥

জীবগণ শক্তিমন্ত, এই বিশ্বের সকলই শক্তির আলয়-স্বরূপ। অর্থাৎ সকল পদার্থেই শক্তি (Energy) সঞ্চিত ভাবে অবস্থান করিতেছে। কোথাও এই শক্তি শান্ত বা লুক্কায়িত ভাবে (Potential state) অবস্থান করে, আবার কোথাও উহা উদিত বা ক্রিয়মানরূপে (Kinetic) প্রকাশ পায়। শান্ত ও উদিত শব্দদ্বয় পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। শক্তির উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার কথা অতঃপর আলোচিত হইবে। উক্ত পুরাণে আরও লিখিত আছে :—

আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদীচ্ছয়া।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টিসংহরণে ময়ি॥
সৃষ্টি কর্ত্রীচ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা॥

বিশ্ব-সৃষ্টিতে শক্তির উদিত অবস্থা (Kinetic force) পরিলক্ষিত হয়, আবার বিশ্ব-বিলয়ে এই এই শক্তি শান্ত ভাবে (Qunisecent state) নারায়ণে বর্ত্তমানা থাকে। নারায়ণই সর্ব্বশক্তির আধার, তজ্জন্য এই শক্তি নারায়ণী নামে প্রসিদ্ধা। মায়া বা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিই এই বিশ্ব প্রপঞ্চের নিদান। ইহাই হারবার্ট স্পেন্সারের বর্ণিত Cosmo-physical Energy।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আরেও লিখিত আছে :—

মৃদা বিনা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং যথাক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্বসৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
শক্তিপ্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্বদর্শন-সম্মতা।
অহমাত্মাচ নির্লিপ্তোঽহদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা ভিন্ন কুলাল যেমন ঘট গড়িতে পারে না, স্বর্ণ বিনা যেমন স্বর্ণকার কুণ্ডল গড়িতে পারে না, সেইরূপ শক্তি ভিন্ন আমি সৃষ্টি করিতে পারি না। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্তিকায় যেমন ঘট-জননী শক্তি আছে, স্বর্ণে যেমন কুণ্ডল-জননী শক্তি আছে, কুলাল ও স্বর্ণকার সেই শক্তির ব্যবহার করিয়া অভীষ্ট দ্রব্য গঠন করে, জগৎ-স্রষ্টাও সেই প্রকার আত্মশক্তিকেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ করিয়া এই জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শক্তিমাহাত্ম্যসূচক উল্লিখিত প্রমাণগুলি গৃহীত হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের ভগবৎশক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক

গুলিই প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে বেদ বেদান্তে ও দর্শন শাস্ত্রে শক্তি সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি ও সিদ্ধান্তাদি পরিলক্ষিত হয়, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় লিখিত আছে :—

স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভিরোদসি প্রাম্। তমু অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কংসওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ।

এস্থলে শক্তি শব্দের অর্থ কর্ম্ম। বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাতা শাকপুনি লিখিয়াছেন :—"স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভিঃ কর্ম্মভিঃ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্ব্বন্ ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যা-মন্তরীক্ষে দিবি।"

অর্থাৎ দেবতাগণ স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা ত্রিভুবন ব্যাপক অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর। সমগ্র জগৎ ও জগতীত ক্রিয়া এই কর্ম্ম শব্দের অন্তর্ভূত।

অথর্ব্ব বেদেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

অপকামং স্যন্দমানা অবীবরত বো হি কম্
ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবী স্তথাম্বার্ণমতো হিতম্।

অর্থাৎ হে অনাভিমানিদেবতাগণ ইন্দ্র বিনা স্বচ্ছন্দ ভাবে ইতস্ততঃ স্যন্দমনা তোমাদিগকে তোমাদের শক্তি-হেতু তোমাদের কর্ম্মবশতঃ বরণ করিয়াছিলেন। তোমরা ইন্দ্রবৃত হইয়াছ তাই তোমাদিগের "বার" নাম হইয়াছে।

বেদভাষ্যকার সায়ন এস্থলে "শক্তিভিঃ" পদের ব্যাখ্যায় "হেতুভিঃ" লিখিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—

তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই শক্তি। প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবস্থিতা, এবং এই শক্তি পুরমেশ্বর হইতে অপৃথগ্ভূতা। ইনিই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। আমাদের শাস্ত্রে শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। সেই সকল বিবরণ সাধারণ জ্ঞানের অগম্য। তাই শ্রীচণ্ডীতেও মহাশক্তি দুর্জ্ঞেয়া বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতে এখন ক্রমশঃই দেখিতে পাইবেন অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের ভিত্তি কত দৃঢ়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আমরা শক্তি-তত্ত্বের সমুল্লেখ দেখিতে পাই যথাঃ—

ইচ্ছা-সত্তা ব্যোম-সত্তা কাল-সত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তি-সত্তাচ মহাসত্তা চ সুব্রত॥
জ্ঞান-শক্তিঃ ক্রিয়া-শক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ॥

নির্ব্বাণ প্রকরণ—যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ শক্তি অনন্ত—ইচ্ছা সত্তা, ব্যোমসত্তা, কাল-সত্তা, নিয়তি সত্তা, মহাসত্তা, জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কর্ত্তৃতা ও অকর্ত্তৃতা প্রভৃতি মুখ্য শক্তির মধ্যে গণনীয়। টীকাকার বলেন কর্ত্তৃতা অর্থে প্রকৃতি শক্তি এবং অকর্ত্তৃতা শব্দের অর্থ নিবৃত্তিশক্তি,—এই দুই শক্তি ক্রিয়া-শক্তিরই অবান্তর যথাঃ—"কর্ত্তৃতা প্রবৃত্তিশক্তিরকর্ত্তৃতা নিবৃত্তি শক্তিশ্চ ক্রিয়াশক্তেরেবাবান্তরভেদৌ।"

এই শক্তিসমূহ যে মূলকারণ হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, যোগবাশিষ্ঠ ও উহার টীকাপাঠে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যথা :—

শিবস্যানন্তরূপস্য শুদ্ধচিন্মাত্রতাত্মনঃ।
এষাহি শক্তিরিত্যুক্ত তস্মাদ্ভিন্নামনাগপি॥

অর্থাৎ চিন্মাত্রাত্ম অনন্তরূপ শিবের এই শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহা হইতে উহা ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। টীকাকার লিখিয়াছেন :—মায়াহি স্বরূপতোঽনন্তং শিবং গুণতঃ শক্তিতঃ কাষ্যত শ্চানন্ত্যং কুর্ব্বাণা তস্যানন্ত্যং বন্ধয়তীব নতু বিহন্তীতি ভাবঃ। মনাগপি-র্বিকল্পনাদ্ ভিন্না ন বস্তুতঃ ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান্ হইতে বিকল্পনা দ্বারা ভিন্ন অথচ বস্তুতঃ অভিন্ন।

বৈষ্ণব দর্শনের ভেদাভেদ বাদের বীজ যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্টের মতে সত্তামত্রই শক্তি, সুতরাং পদার্থ ও শক্তি ; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, প্রভৃতিও শক্তি। কাজেই আকাশ দেশ কাল মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ক্রিয়াদি সকলেই শক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত।

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদস্থাপনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের মহাবিশিষ্টতা। সেই বিশিষ্টতা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। এস্থলে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অভিমত সঙ্কলন করিয়া শক্তি তত্ত্বের আলোচনা করাই প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়। সাংখ্যদর্শনে লিখিত হইয়াছে :—

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ।

অর্থাৎ শক্তির উদ্ভব ও তিরোভাব হইতে পারে, কিন্তু উহার অত্যন্ত বিনাশের প্রমাণ নাই। যেমন কোন বর্ণ দ্বারা বস্ত্রের শুক্লতার স্থানে অপর বর্ণের উৎপাদন করা যাইতে পারে ; দগ্ধ করিয়া বীজের উৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত করা যাইতে পারে কিন্তু উহাদের একেবারে বিলুপ্তি অসম্ভব। সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যকার উক্ত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"নতু শৌক্লাঙ্কুর-শক্ত্যোরভাবো ভবতি। রজকব্যাপারৈর্যোগিসঙ্কল্পাদিভিশ্চ রক্ত-পট ভৃষ্টবীজয়োঃ পুনঃ শৌক্লাঙ্কুর শক্ত্যাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ বস্ত্রের শুক্লতা ও বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির অভাব হয় না। রজক দ্বারা বস্ত্রের নূতন রঙ তুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, যোগীর সঙ্কল্প দ্বারা ভ্রষ্ট বীজেও আবার অঙ্কুরুৎপাদিকা শক্তি আসিতে পারে।

সুতরাং শক্তির বিনাশ নাই, উহা সত্য ও সনাতনী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও যেন এই ঋষি-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া অধুনা Conservation of Energy এবং Persistence of Force প্রভৃতি বিবিধ শক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং যাহা নিত্যা, তাহা মূল-কারণ হইতে অভিন্না হইয়াও পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ পৃথক্ জ্ঞান নিত্য ও শ্রুতিসিদ্ধ।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন কার্য্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি:—কার্য্য-শক্তিমত্ত্বমেব উপাদানকারণত্বম্ সা শক্তিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈব॥"

অর্থাৎ উৎপাদনকারণত্বই কার্য্যশক্তি। এই শক্তি কার্য্যের অনাগত অবস্থা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ শক্তি কারণের আত্মভূতা এবং কার্য্য শক্তিরই আত্মভূতা।

পাতঞ্জল দর্শনে কোথাও সামর্থ্যার্থে, কোথাও যোগ্যতার্থে, কোথাও গুণ বা ধর্ম্মার্থে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব মীমাংসাতেও সামর্থ্য ও অসামর্থ্য অর্থে শক্তি শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, যথা:—"তদশক্তিশ্চানুরূপত্বাৎ।"

অর্থাৎ অপ শব্দ,—অনুরূপনিবন্ধন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা অশক্তি মাত্র, অর্থাৎ শক্তির অল্পতা মাত্র। সাধু শব্দ হইতে তদনুরূপ অপ শব্দের উৎপত্তি হয়, উচ্চারণের অশক্তিই উহার হেতু। বাক্যপদীয় গ্রন্থকার ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন:—

একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনৈব বর্ত্ততে॥

অর্থাৎ তিনি এক হইয়া শক্তির আশ্রয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন। শক্তি সমূহ হইতে তিনি অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। শক্তি কারণের আত্মভূতা, সুতরাং শক্তি মূলকারণ হইতে অভিন্না, কিন্তু

অভিন্না হইলেও শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ প্রতীতিও অপরিহার্য্য; সুতরাং ভিন্না। কিন্তু এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী যেরূপে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এই সকল উক্তি হইতে আমরা উঁহার আলোচনা-বার্ত্তিক সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ীয় দর্শন শাস্ত্রের জটিল সূক্ষ্ম অথচ সারগর্ভ সনাতন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রয়াস পাইব। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎপূর্ব্বে ভূয়সী আলোচনার প্রয়োজন।

প্রাচীন প্রাভাকরগণের মতে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শক্তিও একতম যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমান্য, সমবায়, শক্তি ও নিয়োগ। নব্য প্রাভাকরগণও শক্তি-পদার্থ স্বীকার করেন। ইঁহারা মীমাংসকবিশেষ। ইঁহাদের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য এই অষ্টবিধ পদার্থ। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না।

প্রাভাকারগণ বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেরূপ কার্য্য দ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ অতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থের অস্তিত্বও কার্য্য দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের অনুমান-পরিশিষ্ট মতে ইঁহাদের অভিমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম এই যে—গুণাদি পদার্থে শক্তি পদার্থ থাকে বলিয়া ইহা দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম পদার্থের অন্তর্ভূত নহে। শক্তিকে সামান্যাদির অনুরূপও বলা যায় না। কারণ ইহা সামান্যাদির ন্যায় নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে।

"তথাহি ন তাবৎ দ্রব্যাত্মিকা শক্তিঃ গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ। অতএব ন গুণাত্মিকা কর্ম্মাত্মিকা বা ন চ সামান্যাদ্যন্যতমরূপা * * নাতি-বিনাশিত্বাৎ—দিনকরী ব্যাখ্যা।

প্রাভাকরগণ বলেন, যাহা দ্বারা যৎকার্য্যসিদ্ধ হয় তাহাই তৎকার্য্য-সাধিকা শক্তি। কার্য্য-সাধন-যোগ্যতা—কারণনিষ্ঠকার্য্যোৎপাদন-

ধর্ম্ম-বিশেষই—শক্তি। করতল ও অনল-সংযোগে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় কিন্তু ইহার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে দাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আবার দাহক্রিয়া হয়। যাহার অভাবে কার্য্যের অভাব হয়, তাহা দ্রব্যাদি পদার্থনিষ্ঠ। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ ব্যতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থ স্বতন্ত্র। প্রাভাকরগণ বলেন—

"তথাহি যাদৃশাদেব করতলানল-সংযোগাদ্দাহো জায়তে তাদৃশাদেব সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো যদভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদ্‌যত্না-বত্ত্যাপেয়ং তেন বিনা তদভাবাৎ যত্তদনুভাবানুপপত্তে র্ব্যতিরেক মুখেন শক্তি-সিদ্ধিঃ—তত্ত্ব-চিন্তামণি—অনুমান-পরিশিষ্ট।

নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য তৎকৃত ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় তৎকৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের অনুমানপরিশিষ্টে প্রাভাকরগণের সংস্থাপিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ শক্তিকে একবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-কার বলেন "অথ শক্তি-নিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ম্। নহি নো দর্শনে শক্তি-পদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি? কারণত্বম্।"

অর্থাৎ শক্তি-নিষেধের প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ নাই। তবে কি শক্তি-পদার্থ আছে? হাঁ আছে। শক্তি পদার্থ নাই, আমাদের দর্শন একথা বলেন না। তবে শক্তি পদার্থ কি? কারণত্বকেই আমরা শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

শিবাদিত্য তৎপ্রণীত সপ্তপদার্থী গ্রন্থে দ্রব্যাদি পদার্থকেই শক্তির-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"শক্তি র্দ্রব্যাদি-স্বরূপমেব।"

ফলতঃ শক্তি-পদার্থ দার্শনিকগণকে এক প্রকারে বা অন্য প্রকারে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জগৎ ব্যক্তাবস্থায় যেমন শক্তির পরিচায়ক, অব্যক্তাবস্থাতেও সেইরূপ শক্তির পরিচায়ক। যাহা হইতে এই

জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি শক্তিমান্। এই জগৎ তাঁহারই শক্তির প্রকাশমাত্র। জাগতিক অনন্ত পরিবর্ত্তন-মালার মধ্যে শক্তি শাশ্বতী ও নিত্যা। ইহা দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-সম্মত। এক অণুতে অপর অণু সংযুক্ত হইয়া এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। এই সকল অণু-পরমাণু সংযোগের সময়ে যেমন পরিবর্ত্তন-নিয়মের পরিচয় প্রদান করে, আবার বিযুক্তির সময়েও সেই প্রকার পরিবর্ত্তনের অপরিহার্য্য নিয়মে পরমাণুর গতি সাধিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-সাধিকা শক্তি নিত্যা ও শাশ্বতী। এই শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ কিরূপ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে তাহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। আমরা শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অবশেষে গৌড়ীয় দর্শনের শক্তিবাদের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বৈষ্ণবদর্শনে মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। মায়া সম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে। সাংখ্যদর্শনকার মায়ার স্থানে প্রকৃতি পদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি পদটীও প্রাচীন ও বৈদিক। "প্র" উপসর্গবিশিষ্ট "কৃ" ধাতুর পরে "ক্তিন্" প্রত্যয়ে "প্রকৃতি" পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ এই যে, যদ্দ্বারা যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয় বা যাহা প্রকৃষ্টরূপে কোন কার্য্য করার ভাববিশিষ্ট, তাহাই প্রকৃতি।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকার পরিণামের সাধিকা। শ্রুতি বলেন :—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণো ন শেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ শ্বেতাশ্বতর-মন্ত্রম্।

ইহার জন্ম নাই, ইনি অজা, উৎপাদন-বিনাশ-রহিতা, সুতরাং নিত্যা।

তিনি একা অর্থাৎ সজাতীয়দ্বিতীয়রহিতা। পরমাণুর অনন্তত্ব প্রকৃতিরই বিকৃতি—প্রকৃতিরই সংক্ষোভ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সারের ভাষায় এই "একা" পদের ব্যাখ্যায় "হোমোজেনেটী" শব্দটী পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে "একা" পদের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ইনি লোহিত-শুক্লকৃষ্ণা অর্থাৎ রজঃসত্ত্বতমোগুণ-স্বরূপা। লোহিত শব্দটী রজগুণের প্রকাশক, শুক্ল শব্দটী সত্ত্বগুণের প্রকাশক, কৃষ্ণ শব্দ তমোগুণের নির্ণায়ক। ইনি মহৎ তত্ত্ব হইতে স্থূল পর্য্যন্ত বহু প্রকার এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টিকারিণী। রজোগুণ দ্বারা ইনি বিশ্ব-সৃষ্টি করেন। চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণ-ত্রয়-বিভাবিনী।

অর্থাৎ "হে মায়া-দেবি, আপনি ত্রিগুণ-বিভাবিনী এবং সকলের প্রকৃতি।" শক্তি, তমঃ, অজা, প্রধান, অব্যক্ত মায়া অবিদ্যা প্রভৃতি অর্থে প্রকৃতি শব্দের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পাণিনি সূত্রেও আমরা প্রকৃতি শব্দ দেখিতে পাই যথা :—জনি কর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।—১।৪।৩০।

অর্থাৎ জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। পাণিনি সূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, প্রকৃতি শব্দ দ্বারা এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৃত্তিকার জয়াদিত্য, টীকাকার কৈয়ট, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি সকলেই এই মতের সমর্থক।

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত যোগবার্ত্তিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—প্রধান, প্রকৃতি ও পরমাণু ইহারা সমানার্থক।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, নামরূপ-বিনির্ম্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সাংখ্য দর্শনের তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন :—

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা।"

অর্থাৎ যিনি প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃতি। ইহার অপর পর্য্যায় প্রধান, সত্ত্বরজস্তমগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি নামে অভিহিত। ইনি আরও বলেন, ইনিই বিশ্বকার্য্য-সংজ্যাতের মূল, ইহার কেহ মূল নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি। এই শক্তি তাঁহারই স্বরূপা, সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্না অথচ ভিন্না। সাংখ্য দর্শন ইহার ভিন্ন ভাবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি যদি ঈশ্বর নিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা হয়েন, তবে তাঁহার বেদ-প্রবাধিত সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। বেদের প্রমাণে ঈক্ষণপূর্ব্বিকা সৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে যে প্রকৃতির কথা আছে, যাহা সাংখ্যদর্শনে শ্রৌত প্রমাণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্যা প্রকৃতি ভগবৎশক্তি ; সেই শক্তি শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপা, অথচ ভিন্নবৎ প্রতীয়-মানা। এইরূপ প্রতীতি ভগবৎশক্তির অচিন্ত্যত্বেরই প্রমাণরূপিণী।

শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থলেই প্রকৃতিকে ভগবৎশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। প্রকৃত কথা এই যে, যদ্দ্বারা এই বিশ্ব-রচনা হইতেছে তাহা চিন্ময়ীশক্তি ভিন্ন জড়-শক্তি হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রতি পদার্থে আমরা জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। সুতরাং প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপদেশ অনুসারে জানা যায় পরমাত্মার আত্মভূতা, পরমাত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই জগৎ প্রপঞ্চের নিদান। ফলতঃ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভগবৎ-শক্তির পরিচায়ক, সকল পদার্থই ভগবৎশক্তি হইতে সম্ভূত। জগতের একটী পরমাণুও ভগবৎশক্তি বহির্ভূত নহে।

ভগবদ্বিশ্বাসী আর্য্যগণ এইরূপেই জগৎ-তত্ত্ব বিনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপেই জগৎ-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-শক্তি

স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিয়া মনে করিলে জগৎ কার্য্যের সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না। মায়াবাদীরা কেবল জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেবল এই জ্ঞানই তাঁহাদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্", কেবল চিন্মাত্রই তাঁহাদের একমাত্র স্বীকার্য্য। এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল মায়ায় ছলনা, কেবল মায়ারই খেলা।—এইরূপে এই বিশ্বের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া কেবল জ্ঞানমাত্রের প্রতিষ্ঠাই মায়াবাদীদের দার্শনিক মীমাংসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহা শ্রুতি-সিদ্ধ নহে। ভগবান্ শ্রীপাদ রামানুজ তদীয় ভাষ্যে উহা বিশিষ্টরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলবৎ শ্রৌতপ্রমাণ ও যুক্তিবলে মায়াবাদীদের এই সিদ্ধান্তের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

মায়াবাদীরা যে সকল যুক্তিতর্কের বলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতি-পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে একেবারেই অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করার জন্য নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই সকল তর্কযুক্তি শ্রৌতমূল বলিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রুতির মুখ্যার্থ বিনষ্ট করিয়া অর্থ-বিড়ম্বনা করিয়াছেন, শ্রীভাষ্য শ্রীমাধ্ব ভাষ্য এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সর্ব্বসংবাদিনী, ষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে মায়াবাদীদের শ্রুতি-ব্যাখ্যার অসারতা ও অযৌক্তিকতা পাঠকগণের জ্ঞাননেত্রে সহসাই সমুপস্থিত হইতে পারে। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ শ্রুতির স্বারস্য রক্ষা করিয়া যে দার্শনিক অভিমত সংস্থাপন করিয়াছেন; ব্রহ্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, জীব-তত্ত্ব ও জীবের সহিত শ্রীভগবানের যে সম্বন্ধ বিনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রখরতা, সূক্ষ্মতা, শ্রৌতবাক্যের সামঞ্জস্য-রক্ষণে অদ্ভুত দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎ-তত্ত্বনির্ণয়ে তাঁহাদের অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী প্রতিভার প্রভাব ও বৈভব অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীভগবান্ যে অনন্ত শক্তির আধার, এবং সেই সকল শক্তি অনন্ত হইয়াও যে এক এবং এক মূল তত্ত্ব হইতে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন,—আবার অভিন্ন হইয়াও যে নিত্য ভাবে ভিন্নবৎ প্রতীয়মানা,—বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এই সকল বিষয় যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

শক্তি বুঝিতে হইলে কর্ম্ম বুঝিতে হয়। কর্ম্মে শক্তি প্রকাশ পায়। কৃ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয়ে কর্ম্মপদ উৎপন্ন হয়। যাহা কৃত হয় তাহা কর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্মশব্দের অপর অর্থ ক্রিয়া। কর্ম্মই সৃষ্টি প্রভৃতির হেতু ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাংখ্যদর্শনকার বলেন, অনাদি আকর্ষণই জগৎ সৃষ্টির হেতু। (কর্ম্মাকৃষ্টেবানাদিতঃ।—সাং দঃ ৩।৬২) বৈশেষিক দর্শনে কর্ম্মের পাঁচটি প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। জড় জগতে শক্তির প্রকাশ এই পাঁচপ্রকার কর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক দর্শনে কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম প্রাকৃতিক শক্তিরই পরিচায়ক। বলা বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক শক্তি অপ্রাকৃত ভগবৎশক্তির বহির্বিকাশ। বাহ্য প্রকৃতিও পরমেশ্বরেরই শক্তি, বাহ্য প্রকৃতিও তাঁহারই নিয়মের পরিচয় প্রদান করে। আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের মধ্যে যে গ্রহণ ও ত্যাগের ক্রিয়া সতত পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে জ্ঞানময়ী শক্তিরই পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জ্ঞানের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন এই বিশ্বজগৎ সঙ্কল্পমূলক। এই প্রাকৃত জগতে যে শক্তি আমাদের মানসনেত্রের সন্নিকট অভিব্যক্ত হয়, তাহা অমূলক নহে, অসৎও নহে। মায়াবাদ সেই শক্তিকে উড়াইয়া দিবার জন্য যত প্রয়াসই করুন না কেন, শক্তি শ্রীভগবানের বা ব্রহ্মের স্বরূপভূতা, উহা অলীক নহে, মায়ার খেলাও নহে।

শক্তি, শক্তিমান্ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন। এক ঐশীশক্তি জগতে নানারূপে প্রকটিত হয়েন ইহাই বেদবেদান্তের উপদেশ। ঋগ্‌বেদ সংহিতা বলেনঃ—অগ্নে যত্তেদিবিবর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্স্বাযজত্র।

যেনান্তরিক্ষ মূর্ব্যাত তন্তন্থেষঃ সভানুরর্ণোবোনৃচক্ষাঃ। ঋগ্ ৩।২২।২

অর্থাৎ হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, অগ্নি তোমারই জ্যোতিঃ, তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহ-পাকাদি-ক্রিয়া-নিষ্পাদকরূপে যে তেজ বিদ্যমান, তাহা তোমারই তেজ, ওষধিসমূহে যে "সোমাখ্য" তেজ, জলে "উর্ব্ব" নামে যে তেজ, তাহাও তোমারই তেজ। বায়ুরূপে তেজদ্বারা তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছ।" এই শ্রুতি বৈদিক একেশ্বর-বাদেরই প্রমাণ।

ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে এক পরমেশ্বরের শক্তিই কোথাও অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও আদিত্য, কোথাও জল ইত্যাদি বিবিধ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তি-রূপান্তর-প্রক্রিয়া (Transformation of Energy) বলিয়া একই শক্তির যে বিভিন্নরূপের ব্যাখ্যা করেন, বেদে তাহারও মূল-মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদ সংহিতা-পাঠে আরও জানা যায় মরুৎই বৈদ্যুতাগ্নির আশ্রয়। এই মরুৎই বিশ্বের আকর্ষণীয় শক্তি।

"অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ" ঋক্ সং-৩।২৬, ২৫।

"অপ্সগ্নে সধিষ্টর সৌষধীরনুরুধ্যসে, গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ।"—ঋক্ সং ৬।৪৩।৩

অর্থাৎ হে অগ্নে, যে তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি ঔষধি সকলের উৎপাদনপূর্ব্বক উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার উহাদের অপত্যরূপে প্রাদুর্ভূত হও।"

বেদের এই সকল উক্তি কেবল শক্তির অনন্ত লীলারই অতি সুস্পষ্ট উদাহরণ। শ্রীভগবানই বিশ্ব-শক্তির মূলাধার। ভগবৎশক্তির দ্বিবিধ অবস্থা—পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। ব্যাবহারিক জগতে শক্তিলীলা

বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ ইহাকে ত্রিগুণময়ী বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। এই অবস্থা অন্তর্বহির্ভাবে বিদ্যমানা। ইহা কার্য্যকারণাত্মিকা। অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, আবার ব্যক্তাবস্থায় গমন,—ইহাই ব্যাবহারিক জগতে শক্তিলীলার এক বিশিষ্ট বিচিত্রতা। কিন্তু এই ব্যাবহারিক শক্তি পারমর্থিক শক্তি হইতেই প্রবাহিতা। পারমাথিক ভাগবতী শক্তিই ইহার মূল প্রস্রবণ। উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে প্রবাহিতা হইয়া প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হন। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে পরিণাম-ভাবের গতি উভয়তো বাহিনী। ইহার একটি গতি বহির্মুখী অপরটি অন্তর্মুখী, একটী পরাচীনা, অপরটী প্রতীচীনা, একটী কেন্দ্রাতিগা, অপরটী কেন্দ্রাভিগামিনী। পরিণাম-ভাব, যখন বহির্মুখ হয়, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ। শক্তির এই ভাবের নামই বেদে "কর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জগতের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,—শক্তি বা কর্ম্মেরই পরিচায়ক।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বলেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই—মূলশক্তি। এই বিশ্বজগতে শক্তির যত কিছু লীলা প্রত্যক্ষ হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণ, সেই সকল শক্তিকে যে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, উহাদের মূলশক্তি—ভগবানের ইচ্ছাশক্তি। উহা কোথাও সংকল্প, কোথাও বা ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, পরমেশ্বর স্বীয় মায়া-শক্তি-প্রভাব দ্বারা আকাশাদি বহুবিধ রূপবিশিষ্ট হইয়া বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, সুতরাং ইহাতে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় এই বিশ্বজগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা-শক্তি-স্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতও বলেন :—

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥
ইচ্ছা-শক্তি-প্রধান কৃষ্ণ-ইচ্ছা, সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব, চিত্তাধিষ্ঠাতা॥

ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে।
তাহাত সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি-আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥

সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ হইয়াও যে নিত্য ভিন্ন প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, ইহা প্রকৃতপক্ষেই বৈদিক সিদ্ধান্ত। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বৈদিক মন্ত্রের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রুতি-সম্মত নহে। মায়াবাদীরা বা কেবলাদ্বৈতবাদীরা সমগ্র শ্রুতির সুসামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের বুদ্ধি-প্রতিভা অতীব গৌরবজনক। শ্রীরামানুজাচার্য্য যে পরিণাম-বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বৈদিক সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের মায়া-শক্তি-বিকারে এই জগতের সৃষ্টি। বেদ বলেন, এই বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগ্‌অবস্থাতে জগদীশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। প্রলয়কালে জীব সকলের বাসনাবাসিত অন্তঃকরণ সকল মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের অতীত জন্মে অন্তঃকরণ-সংলগ্ন কর্ম্ম-সংস্কার

সমূহই ভাবী প্রপঞ্চের বীজ-স্বরূপ। এই সকল কর্ম্ম যখন ফলনোন্মুখ হয়, তাহা হইতে সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ কর্ম্মাধ্যক্ষ জগদীশ্বরের মনে তখনই জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। কল্পান্তরে জীবগণের গত কার্য্য বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ। ঋগ্বেদ-সংহিতায় স্থানে স্থানে ইহার মূলসূত্র দেখিতে পাওয়া যায় তদ্‌যথা,—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতী জীববিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ঋক্ সং ৮।১২৯।৪

বেদ-সংহিতা সমূহে জগৎ সৃষ্টির এইরূপ নানাবিধ অভিমত আছে।

পরবর্ত্তী পুরাণ সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণরূপে বেদ-বেদান্তের অনুসরণে বিরচিত, তাহাতেও এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছি যে ভগবানের কাম বা ইচ্ছাশক্তি হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মতের পোষক। তাঁহাদের মধ্যে আমরা এস্থলে এ, আর, ওয়ালেস্ সাহেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহার রচিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন গ্রন্থে (Natural selection) একস্থানে বৈদিক মন্ত্রের অতর্কিত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। এস্থলে উহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"আমরা শক্তির যখন অন্য কোন মূল কারণ জানিতে পারি না, তখন সকল শক্তিই ইচ্ছাশক্তি-প্রসূত। আমরা এই জগতে দুই প্রকার শক্তি দেখিতে পাই। এক প্রকার যথা—আকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ ও তড়িৎ প্রভৃতি; আর এক প্রকার শক্তি—আমাদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি। এই দুই শ্রেণীর শক্তির মধ্যে কোন শক্তির মূল কারণ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। আমরা এ বিষয়ে যতটুকু চিন্তা করিয়াছি তাহাতে আমাদের বোধ হইয়াছে যে সকল শক্তিই উচ্চতর কোন পুরুষের ইচ্ছাশক্তি-প্রসূত। ইচ্ছাশক্তি সকল শক্তির আদ্যাবস্থা। ওয়ালেসের শেষ কথা এই :—

The whole universe is not merely dependent on, but actually is the Will of higher intelligences or of One Supreme Intelligence.

ওয়ালেস্ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। আমাদের বেদ-বেদান্ত তাঁহার অধীত না হইলেও, তিনি বেদের সিদ্ধান্ত আপন প্রাণে বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্পষ্টতঃই বলেন, "বিশ্বজগৎ যে কেবল এক পুরুষ-প্রধানের ইচ্ছাধীন, তাহা নহে। পরন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই ইচ্ছা-স্বরূপ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারই অপরা প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হয় বেদ বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত। জগৎটাই ঈশ্বর ইচ্ছা ইহা বুঝা কঠিন। জড় পদার্থ যে শক্তি-কেন্দ্র-সমূহ হইতে উদ্ভূত বস্কোভিকের এই Centres of Force বা শক্তি-কেন্দ্র কি, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

প্রাকৃতিক শক্তি ভগবান হইতে ভিন্ন নহে, Matter বা জড়পদার্থও শক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। শক্তি ব্যতীত Matter বা জড় পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, এই শক্তি মাত্রই এক ইচ্ছাশক্তিময় পুরুষ প্রধান হইতে উদ্ভূত। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইয়াও ভিন্নরূপে নিত্য প্রতীয়-মান। এই যে ভেদাভেদ-বাদ, ইহার সবিশেষ ও সবিস্তার সূক্ষ্ম বিবরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনায় জানা যাইতে পারে।

আমরা বৈদিক গ্রন্থের আলোচনায় যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি, বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদমূলক, বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞান, যে সকল সত্য জগতে প্রচার করিতেছেন সে সমস্তই ন্যূনাধিক পরিমাণে বেদমূলক। জগতের যে সকল শক্তির কার্য্য পরিলক্ষিত হয় সেই সকল শক্তির মূল প্রস্রবণ,—স্বয়ং সর্ব্বশক্তিধর শ্রীভগবান্। তিনিই অনন্ত শক্তির আধার। এই জগৎ অহর্নিশ কেবল শক্তির নিয়মে পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইতেছে

এবং একই ঐশ্বরী শক্তি নানারূপে এই বিশ্বজগতে প্রকাশ পাইতেছেন। একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর-ব্যাপারই বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছেন, আলোক তাপ, তড়িৎ—একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। শক্তির একত্ব বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। আবার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-সম্মত। যে শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পায়, উহাই আবার পরিণাম ও অবস্থা বিশেষে আলোকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। শক্তির অন্যান্য প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্যারেডে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জাগতিক শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্তি-রূপান্তর-ব্যাপারকে (Transformation of Energy) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

বিলাতী ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রোভ্ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যদিও এস্থলে জড়ীয় শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ কোন আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি শক্তিতত্ত্ব বলিতে হইলে জড়ীয় শক্তি এবং অজড় চিচ্ছক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত আমরা দেখাইব যে সংকল্পাত্মিকা ইচ্ছা-শক্তি হইতে জড়জগতের যাবতীয় শক্তি প্রসূত হইয়াছে। দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীতে লিখিত আছে ;—"সৈবং বিশ্বং প্রসূয়তে" অর্থাৎ সেই মহামায়া শক্তি হইতে এই বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও যেন ঠিক এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন ,—There is a mysterious Force from which this universe is evolved.

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার কখনও চণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না, সম্ভবতঃ করেন নাই। কিন্তু চিন্তাশীল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাধনালব্ধ মহাসত্যের ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভার-তীয় বেদ বেদান্ত, অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করা কর্ত্তব্য। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীতে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা একদিকে যেমন দার্শনিক, অপর দিকে তেমনি আবার উচ্চতম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা জড়ীয় শক্তির আলোচনায় যেমন একই শক্তির অনন্ত রূপান্তর দেখিতে পাই, চিন্ময়ী শক্তিবর্গের মধ্যেও তেমনি এক ভাগবতী শক্তির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির রূপ ও প্রকাশ পুরাণাদি পাঠে জানা যায়। কালী, দুর্গা, গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, নারায়ণী, নারসিংহী প্রভৃতি শক্তির কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। রজস্তমময় জগতের পাপ-তাপ-দৈত্য ও দানব সংহারের জন্য রজস্তমময়ী শক্তির বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইজন্যই মাতৃরূপিণী মহাশক্তি সময়ে সময়ে এই জগতে রণরঙ্গের রুদ্রতালে নাচিয়া নাচিয়া ভীমা ভৈরবীরূপে অথবা রণচণ্ডীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। আবার চন্দ্রের সুধামাখা কিরণ-জালে, সুগন্ধি কুসুমের কোমল হাসিমাখা শুভ্র কান্তিতে অথবা শিশুর সরলতাময়ী মুখচ্ছবির মৃদুল হাস্যে আমরা যে আহ্লাদিনী শক্তির সুধামধুর কিরণচ্ছটা দেখিতে পাই, তাহাও সেই শক্তিমানের শক্তি-বিলাসেরই লীলাবিলাস।

ইহার পূর্ণবিকাশ—হ্লাদিনীর সার, প্রেমের সার,মহাভাব-গঠিত-তনু শ্রীরাধিকায়। সুতরাং শ্রীভগবানের একই চিন্ময়ী শক্তির এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত। বৈষ্ণবগণ এই আহ্লাদিনী শক্তির উপাসক। সুতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ অসমীচীন। আমরা সকলেই শক্তির উপাসক। হ্লাদিনী শক্তির চরম-সার শ্রীরাধার এবং তৎসখীগণের শ্রীচরণাশ্রয় ভিন্ন আমাদের ভগবৎ-প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। শক্তিবাদ যে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের অতি প্রধানতম অঙ্গ, এই সকল কারণে তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় শ্রীশ্রীগৌর-শশীর বৈদান্তিক উপদেশের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব-গণের অভিমত সংযোজন করিয়া তদীয় ষট্‌সন্দর্ভ এবং সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শক্তিবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবান্ যে নিখিলশক্তিবর্গের একমাত্র আধার ও আশ্রয় এবং সেই সকল শক্তি তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও যে অভিন্ন, তাহা তিনি অতি উত্তমরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বিষ্ণুপুরাণীয় শক্তিতত্ত্বেরই সবিশেষে উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামানুজ তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণীয় "বিষ্ণু-শক্তি পরা প্রোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা" প্রভৃতি বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা অতঃপরে পুরাণীয় শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়া উহাদের আলোচনা করিব। এস্থলে কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকগুলি অবৈদিক নহে। ঋগ্বেদ সংহিতায় লিখিত আছে :—

সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো।
বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্ম্মণি ॥ ২।২১।১৬৪।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মহদাদি সপ্তপ্রকৃতি-বিকৃতি, অর্দ্ধাংশ (প্রকৃত্যংশ) দ্বারা বিশ্বজগৎ প্রসব করেন। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে মহদাদি সপ্তত্তত্ত্ব বিশ্ব প্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ্য এই উভয়বিধ পদার্থের রেত-স্বরূপ বীজ বা কারণভূত। মহদাদি এই সপ্ততত্ত্ব বিষ্ণুর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পুরুষের এক দেশবর্ত্তী—এক পাদাশ্রিত। এই সপ্ততত্ত্ব তাঁহারই শক্তি। বেদ সংহিতার সর্ব্বত্র শক্তি ব্যাপার দৃষ্ট হয়।

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ইহারা বেদে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। বৈদিক দেবতা শব্দ কোথাও পরাৎপরমেশ্বররূপে আবার কোথাও বা ভগবৎশক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা

লোকদের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য অগ্নি ও বায়ু ইত্যাদি রূপে আবির্ভূত হন। দেবতাগণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন—উহারা পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনের জন্য একই দেবতা বহু নামে স্তুত হইয়াছেন। কর্ম্মভেদেই নাম ভেদ। ঋগবেদ সংহিতায় ইহার বহুল প্রমাণ দেখা যায় যথা :—

১। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু
রথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

২। একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি

৩। ত্বমেকোঽসি বহুতমং প্রবিষ্ট।

শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠে জানা যায় দেবতারা শক্তিবিশেষ। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, পরমেশ্বর অগ্নি ও সোম এই দুইরূপে বিরাজমান। এই জগতে তাঁহার এইরূপে প্রকাশ। এইজন্য জগৎকে অগ্নি-সোমাত্মক বলা হয়। অগ্নি ও সোম এই দুইটী বৈদিক দেবতা ভগবানেরই শক্তি। ইহারা বিষ্ণু-শক্তি, বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি। নিরুক্তিকারগণ বৈদিক দেবতাগণের তিন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা পৃথিবী স্থান—অগ্নির; অন্তরীক্ষ স্থান—বায়ুর এবং দ্যু স্থান সূর্য্যের। যেমন কর্ম্মভেদে নাম ভেদ, তেমনি আবার স্থান-ভেদেও নাম-ভেদ হয়। বস্তুত একই ভগবান্ নানা শক্তিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন। অথর্ব্ব বেদে অগ্নির স্বরূপ দর্শনার্থ লিখিত হইয়াছে :—

"দিব্যং পৃথিবীমন্বন্তরীক্ষং যে বিদ্যুতমনুসঞ্চরন্তি।
যে দিক্ষন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ॥" ৩।২১।৬।

অর্থাৎ দ্যুলোকে ভূলোকে এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরিক্ষ লোকে যিনি অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িৎরূপে

অভিব্যক্ত হয়েন, যিন জ্যোতিশ্চক্রে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি লোকত্রয় ব্যাপিকা দিক্ সকলের অন্তরে বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বজগতের আধার ভূত, সূত্রাত্মা বায়ুতে বিদ্যমান্ বিশ্বজগতের অনুগ্রাহক সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে হোম করা হউক।

বেদসংহিতায় শক্তিসম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থ নিরূপিত হয়। মহাভারতে পুরাণে, উপপুরাণে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিতত্ত্ব বিবিধরূপে আলোচিত হইয়াছে। মহাভারতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সমগ্র মহাভারতে ভীষ্মই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ অপর একটী শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষকে পরমতত্ত্ব ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার শ্রীচরণে প্রদান করিতেন; এই মহা-পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীমদ্ভগবত, পুরাণসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার টীকা-কারের সংখ্যা সম্ভবতঃ শতাধিক। এই পুরাণ সর্ব্বজন সম্মত এবং ইহা বেদার্থ পরিবৃংহিত, এই মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্. আর সেই শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত হ্লাদিনী সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তির মুলাশ্রয় সমস্ত শক্তিরসম্ভোগ স্থল ও সম্পোষ্টা। হ্লাদিনী শক্তির নিখিলরস মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিই শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকা সর্ব্বশক্তিময় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রধানতমা শক্তি। ইনি লীলারসাস্বাদন বিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্না বলিয়া প্রতীতা হয়েন, সেই প্রতীতি নিত্যা ও সনাতনী। আবার ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকৃত পক্ষেই অভিন্না। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। ললিতা বিশাখা ও ভগবৎশক্তি; শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি; মায়া-জগতের পরপারে বহুদূর আনন্দ শক্তিবর্গের লীলাস্থলী। জড়ীয় বিজ্ঞানে ও জড়ীয় দর্শনে এই শক্তিবর্গের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্তিরসে ধ্যাননিরত সাধকগণের প্রতি "রসো বৈ সঃ" অভিধায় অভিহিত পরমতত্ত্ব পরম সুপ্রসন্ন না হইলে এই আনন্দময়ী শক্তিবর্গের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

এই শক্তিবর্গের নিম্নস্তরে সম্বিৎ শক্তিবর্গের রাজ্য। যাঁহারা জ্ঞানের সাধক তাঁহারা এই রাজ্য লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই সম্বিৎ শক্তির সাধক। ইহাতে জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয়।

ইহার বহু নিম্নে মায়া বা বহিরঙ্গা জড়ীয় শক্তির রাজ্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিতত্ত্ব লইয়া অনুক্ষণ ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকেন। হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই শক্তি লইয়া বিজ্ঞানের উপরে দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুই তাঁহারই শক্তির প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক সিদ্ধান্তে সম্প্রতি এক বিপুল বিপ্লব উত্থাপিত করিয়াছেন। ইহার পরিণাম-ফলে শক্তিবাদের জয় অনিবার্য্য। ইলেক্‌ট্রন, পরমাণুর স্থান অধিকার করিতেছে। ইহার উপরে আর দুই এক ধাপ উঠিলেই জড়ীয় পদার্থ-গুলি যে শক্তিরই বিকাশ ও পরিণাম, এই সিদ্ধান্ত যে তাহা স্থিরীকৃত হইবে, এখনও ইহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শক্তি শব্দটীর বিবিধ পর্য্যায় আছে, যেমন "পাউ-য়ার" "ফোর্স" এবং "এনার্জী" প্রভৃতি। যাহা গতিশীল বস্তুর গতিকে রুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত করে, স্থিতিশীল বস্তুকে গতিশীল করে বা করিবার চেষ্টা করে, যদ্দ্বারা কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাই শক্তি। বৈজ্ঞা-নিক পণ্ডিত গ্যানো এই শক্তির কার্য্যভেদে নাম ভেদ করিয়াছেন। যে শক্তি গতির আরম্ভক, তাহা "পাউয়ার"। যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক তাহা "রেজিষ্ট্যান্স" বা প্রতিরোধ শক্তি, যে শক্তি গতির প্রবর্ত্তক, তাহা "একসিলারেটিং" ফোর্স নামে অভিহিত। যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক তাহা "রিটার্ডিং ফোর্স" বলিয়া কথিত হয়।

প্রফেসার বি, জি, টেট্ বলেন, যাহা বস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন

করে, তাহাই শক্তি। প্রফেসার বেমা বলেন, শক্তি দ্রব্যনিষ্ঠ। দ্রব্য স্বয়ংই গতি বা কর্ম্মের কারণ। দ্রব্য যদ্দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারগ হয়, তাহাই শক্তি। পণ্ডিত বেমা দ্রব্যের ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্ব ও কারণত্বকে শক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বা ক্রিয়াব্যাপ্যত্বের প্রতি কর্ত্তার ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তকত্বের যে সম্প্রয়োগ, তাহাই ব্যাপার। শক্তি ক্রিয়া নহে, ক্রিয়ার হেতু। কিন্তু ক্রিয়ার আতিশয্য-প্রকটও স্থল-বিশেষে শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন বস্তু যে কালে যে স্থান অতিক্রম করে অথবা অন্য বস্তুকে যে বলে উহা আপীড়ন করে, তদ্দ্বারা শক্তির মান নিরূপিত হয়। তাপ,—ক্রিয়াপ্রকর্ষ নহে, ইহা গতিরই প্রকার-ভেদ। তাপজনক কর্ম্মের প্রকর্ষকেই তাপবিষয়াশ্রিতা শক্তি বলা যায়। এই তাপজনক কর্ম্ম তাপ হইতে প্রসূত হয় না। উষ্ণ দ্রব্যের ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তক শক্তিসমূহই উহার উৎপাদক। উষ্ণ দ্রব্যে যে ঐ সকল শক্তি থাকে তাহাও দ্রব্যের উষ্ণতা-কারণ নহে, ঘটকাবয়ব অণুসমূহের (Constituents) প্রত্যেকেই শক্তিবিশিষ্ট।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভ বলিয়াছেন, শক্তি আমাদের অনুভবের বিষয় বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়াই আমাদের পরিচিত। গতি ও গতিশীল দ্রব্য আমরা এই দুই পদার্থ প্রত্যক্ষ করি। কার্য্য মাত্রই কারণ-প্রসূত শক্তির স্থূলাবস্থা। গ্রোভ বলেন, দ্রব্যনিষ্ঠ দ্রব্যের সহিত অবিনাভাব সম্বন্ধে ক্রিয়া নিষ্পাদক পদার্থই শক্তি। আমরা শক্তি দেখি না, শক্তির কার্য্য দেখি।

পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, শক্তি কি পদার্থ, তাহা আমাদের অজ্ঞেয়। জড় পদার্থ কি, গতি কি এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমা-দের মনে হয়, ইহারা শক্তিরই প্রব্যক্ত অবস্থা। আমরা শক্তি দ্বারাই জড় পদার্থ বা গতির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া থাকি। শক্তি, সকল পদার্থের মানদণ্ড। শক্তি বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং শক্তি অজ্ঞেয়, এই অজ্ঞেয়

মহাশক্তি হইতেই এই বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে। আমরা উহার স্বরূপ-বিনির্ণয়ে অসমর্থ। শক্তি বলিতে আমরা যাহা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, তাহা অপরিচ্ছিন্ন কারণের নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছিন্ন ভাব। হারবার্ট স্পেন্সারের মতে শক্তি-সাতত্যই (Persistance of Force) জগৎ সৃষ্টির হেতু। কিন্তু তাহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বলেন না। তাঁহার মতে তত্ত্বমাত্রই অজ্ঞেয় (unknowable)।

ফলতঃ হারবার্ট স্পেন্সারের মানস-নেত্র আরও কিছু বিকসিত হইলে তিনি আমাদের শাস্ত্রকারদের ন্যায় জড়ীয় শক্তির অন্তরালে জ্ঞানময়ী মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেন। চণ্ডীতে যে শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অনেক পরিমাণে তাঁহার অনুভূত হইত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই আলোচনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল। তাহাতে দার্শনিক ভাবেরও যৎকিঞ্চিৎ সমাবেশ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা জড়ীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই অপর পিঠ মাত্র। কিন্তু তথাপি তাহাতে একটা ব্যঞ্জনার ভাব আছে, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু হইতে অতীন্দ্রিয়ের নিকটে লইয়া যাওয়ার উপদেশ উহাতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

শক্তির সাতত্য সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার বলেন—"শক্তির সাতত্য বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য সমূহের অন্তরালে এমন কোন কারণ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে যাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। সেই কারণ অনবচ্ছিন্ন ও আদ্যন্তরহিত।"

হারবার্ট-স্পেন্সারের স্বীকৃত শক্তিকে আমরা শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। মহর্ষি কণাদ আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কোন কোন সার সিদ্ধান্ত স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তে সূত্রাকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন জড়জগতের

তত্ত্ব বলা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার জীবজগৎ, মানস কর্ম, শারীরিক কর্ম, প্রাণন-ব্যাপার প্রভৃতির কথাও তিনি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার উপরে তিনি শক্তিতত্ত্বের কথা বলিতে যাইয়া গতি-শক্তির নিরোধের কথা বলিতে বলিতে, জীবের ভব-যাতনার নিরোধের কথাও উপদেশ করিয়াছেন, (তদভাবে সংযোগা-ভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ— বৈশেষিক দর্শন ৫।২।১৮)। জড় বিজ্ঞানের সহিত, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের এইরূপ মাখামাখি,— এইরূপ সম্মিলন,—কণাদ সূত্রে ও পরবর্ত্তী বৈশেষিকগ্রন্থসমূহেও অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত শক্তির পর্য্যালোচনায় জানা যায়, জড়ীয় পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন,—আবার অধ্যাত্ম শাস্ত্র-পাঠেও স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, যিনি শক্তির মূলাধার, শক্তি তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন, আবার অভিন্ন হইলেও উহার ভিন্নবৎ প্রতীয়মানতা নিত্য। দ্রব্য পদার্থ হইতে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে না করিলেও শক্তি ও দ্রব্য বস্তুতঃ অভিন্ন। জড়ীয় পদার্থই শক্তি,— শক্তিই জড়ীয় পদার্থ (**Matter is force and conversely Force is Matter**).

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা আমরা **Matter** বলিয়া বুঝি, তাহা শক্তিরই প্রকট অবস্থা। যে শক্তি আমাদের স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা এক। আমরা অনলে-অনিলে, বিদ্যুতে-বজ্রে, আকর্ষণে-বিপ্রকর্ষণে শক্তির যে অনন্ত লীলা-রহস্য দেখিতে পাইতেছি, সেই সকল ব্যাপার একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকটন মাত্র। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়ীয় শক্তি এক। এই প্রকারের আলোচনার চরম বিকাশে আমরা জড় হইতে অজড় শক্তির রাজ্যে উপনীত হইতে পারি, এবং সেই আলোচনায় স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে,

এই সকল জড়ীয় পদার্থের মধ্যে যে শক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কোন জ্ঞানময় পুরুষেরই শক্তির লীলা-বিলাস। তিনি তদীয় শক্তির দ্বারা এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত করেন, আবার তিনিই তাঁহার এই সৃষ্টিকারিণী শক্তিকে সংহৃত করিয়া সৃষ্টির লয় করিয়া থাকেন, চেতন অচেতন সকলই তাঁহারই শক্তির প্রকট অবস্থা। জলে স্থলে আকাশে পাতালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, সকলেই সেই শক্তিময়ের শক্তির স্ফুরণ, তাঁহারই শক্তির বাহ্য পরিণতি—তাঁহারই শক্তির সাক্ষি-স্বরূপ তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী মহামহীয়সী শক্তির তরঙ্গ-লীলা-বিলাস।

কিন্তু আমরা এই জড় জগতে যে সকল শক্তি দেখিতে পাই, তাহাই তাঁহার শক্তির একমাত্র লীলাস্থলী নহে। মানুষের আত্মায় যে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, এই জ্ঞান তাঁহার সম্বিৎ শক্তির আভাস ; মানুষের আত্মায় যে প্রেম প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহারই আহ্লাদিনী শক্তিরই লেশাভাস।

শক্তিতেই শ্রীভগবানের ক্রিয়া ও ক্রীড়া সূচিত হয়। আনন্দময় ধামে শ্রীভগবান্ আনন্দময়ী বা হ্লাদিনী শক্তিবর্গের সহিত যে ক্রীড়া করেন, তাহা চিদ্‌ধামবাসীদেরও দুর্নিরীক্ষ্য ও দুর্ভাব্য। সাধক-বিশেষের সাধনা-বলে, বিশেষতঃ শ্রীভগবানের কৃপা বলে যে সকল ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত সিদ্ধগণ সেই আনন্দময় লীলা-রসাস্বাদন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন, কেবল তাঁহারাই সেই আনন্দ-শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই কেবল সেই মহাভাব-স্বরূপিণী ও তৎশক্তিবর্গের আনন্দলীলা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন, সেই আনন্দ-শক্তির লীলা-বিলাসের রাজ্য ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর।

আমরা জড় জগতের শক্তিরই স্বরূপ-নিরূপণে অসমর্থ, এইরূপ অসমর্থ হইয়াই এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই জড়ীয় শক্তিকে অজ্ঞেয় বলিয়া প্রকৃত পক্ষেই যথার্থবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। ঋষিগণ এইজন্য এই মায়া শক্তিকে অজ্ঞেয়া ও অনির্ব্বচনীয়া বলিয়া গিয়াছেন। যদি জড়ীয়

শক্তি সম্বন্ধে এই কথা যথার্থ হয়, তবে শ্রীভগবানের চিদানন্দময় অসীম ও অনন্ত ধামের শক্তি-লীলা-রহস্য কত দুর্ব্বোধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে সাধনা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার কৃপাই সাধকগণের একমাত্র ও প্রধানতম ভরসা।

শ্রীভগবান্ই সর্ব্বশক্তির আধার। আমরা এই যে শক্তির পূর্ব্বে "সর্ব্ব" বিশেষণ প্রদান করিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা খুব ঠিক নহে। কেন না, শক্তি ও শক্তিমানের যেমন অভেদ কল্পনা অসম্ভব, তেমনই আবার ভেদ কল্পনাও অসম্ভব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই এক প্রধানতম রহস্য। ভগবৎশক্তি এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তথাপি জগতের অনন্ত ব্যাপারে আমরা এই শক্তির অনন্ত ভেদ ও অনন্ত বিকাশ দেখিতে পাই; একই শক্তির অনন্ত লীলা!

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে লিখিত আছে—"আলোক-দায়িনী তৈজসী শক্তি, অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, মহত্ত্বদায়িনী ব্রাহ্মশক্তি, ত্রৈলক্যদায়িনী শাক্তিশক্তি, পরমপূর্ণতাদায়িনী শৈবীশক্তি, বিজয়সমৃদ্ধি-দায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীঘ্রগতি মানসী শক্তি, অতি প্রবল বায়বীশক্তি, দাহকারিণী আগ্নেয় শক্তি, নিবৃত্তিদায়িনী পায়সী শক্তি, সিদ্ধজননী মৌন-শক্তি, বিদ্যারূপিণী বার্হস্পতি শক্তি, ব্যোমগামিনী বৈমানিকী শক্তি, স্থৈর্য্যরূপিণী পার্ব্বতী শক্তি, গাম্ভীর্য্যরূপিণী সামুদ্রী শক্তি, কলঙ্ক বিরহিণী নাভসী শক্তি, শৈত্যশালিনী তোবারী শক্তি, ইত্যাদি দেশকাল ক্রিয়াময়ী শক্তি মাত্রেই সেই পরম নির্ম্মল ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে এই বৃহদুদ্দেশ্য জগৎশ্রীব্রহ্ম হইতেই কল্পিত হইয়াছে।

সমগ্র বিশ্বতত্ত্বে শক্তির যে অনন্ত অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনব চিন্তার পথে পরিচালিত করে, অভিনব আবিষ্কার সাধন করার জন্য তাঁহাদের গবেষণোদ্দীপ্ত প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত আমন্ত্রিত করে, তাহা সচ্চিদানন্দময়ী ভগবৎশক্তি-

রই আভাস, ভগবৎশক্তিরই স্থূল অভিব্যক্তি। ইহাই মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। বিষ্ণুমায়াও সর্ব্বত্র বহিরঙ্গা নহেন।

শঙ্করাচার্য্য এই শক্তিকে পরমার্থিক ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মায়া বহিরঙ্গা শক্তি অলীক নহে। শ্রীভগবান্ যেমন নিত্য, তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী মায়াও তেমনই নিত্যা। এই মায়াশক্তি কেবল আমাদের মিথ্যা জ্ঞানের আভাস বা ছলনা নহে। মায়া যখন ভগবৎশক্তি-স্বরূপিণী, সে অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব অলীক বলিয়া তুলিয়া ফেলিলে চলিবে না, এবং তাহা যুক্তিযুক্তও নহে। ঋষিগণ জড়শক্তিকে আকাশকুসুমের ন্যায় কখনও অলীক বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন নাই। যে শক্তিবর্গ দ্বারা জগৎরচনা-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অলীক বা মিথ্যা নহে। বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্মের জগৎকারিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হয়, ব্রহ্ম নিত্য, নিত্য হইতে অনিত্যের আবির্ভাব হইবে কেন? সুতরাং জগৎও নিত্য। এই জগৎ ব্রহ্ম-শক্তিরই অভিব্যক্তি, সে অভিব্যক্তি অতি স্থূল, এইজন্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই বহিরঙ্গা শক্তির অপর নাম মায়া। কিন্তু শঙ্কর মায়াকে ভগবৎশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। শঙ্কর যাহা মায়া বলেন, তাহার অর্থ ভ্রম-জ্ঞান। মায়া যদি ব্রহ্মতত্ত্বের বাহিরে হয়, মায়াকে যদি জ্ঞানের অভাব বলিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই দ্বৈতবাদ স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। অভাবও জ্ঞানের একটা বিভাগ। পরমার্থিক জ্ঞানের উদয়ে এই অভাব জ্ঞান একবারে তিরোহিত হয় এই যুক্তিবলে কেবলাদ্বৈতীরা মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রকৃত অস্তিত্ব তুলিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, জগৎ অজ্ঞানেরই সৃষ্টি, জ্ঞানোদয়ে জগতের অস্তিত্ব একবারেই অন্তর্ভূত

হয় না, কেবল চিন্মাত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য এইরূপ অভিপ্রায় বেদ-বেদান্তের বিরোধী। সমগ্র বেদে যে ভগবৎশক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন, আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। মায়াবাদীদিগের কাল্পনিক উক্তি প্রমাণ কিংবা বেদবেদান্তের উক্তিই প্রমাণ, তাহা হিন্দু পাঠকগণের অবশ্যই সুবিদিত। যাঁহারা শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ, তাঁহারা বলেন, শ্রুতিতে দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আংশিক ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভেদাভেদ-বাদই শ্রুতির পূর্ণ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য। ভেদাভেদ বাদ দ্বারাই শ্রুতির প্রকৃত তৎপর্য্য পরিগৃহীত হয়। শক্তিবাদ স্পষ্টতঃই শ্রুতিসম্মত। শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন। শক্তিই আবার ভেদাভেদ বাদেরও মূল ভিত্তি।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যখন শিক্ষা প্রদান করেন তখন কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও তাঁহার শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

আবার অন্যত্র :—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তার হয় অবস্থান॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহাকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বেরই অন্তর্গত। যাঁহার সদৃশ ও অসদৃশ দ্বিতীয় নাই তিনিই অদ্বিতীয় বা অদ্বয়। ইনি স্বীয় সদৃশ ও বিসদৃশ তত্ত্বান্তর-বিবর্জ্জিত। শ্রীকৃষ্ণের সমান কেহই নাই, তাহা অপেক্ষা বড়ও কেহ নাই। ইনি তত্ত্বতঃ স্বজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগতভেদরহিত। কৃষ্ণ হইতেই যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বিভূতি ও অনন্ত

অবতার আবির্ভূত হইতেছেন, লঘুভাগবতামৃতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥

একটী মণিতে যেমন নীল পীতাদি বর্ণ উদ্ভাসিত হয়, সেই প্রকার ধ্যান-ভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতও বিবিধরূপে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তিনি এক মূর্ত্তি হইয়াও বহুমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যখন রথারোহণে মথুরায় গমন করেন, অক্রুর সেই একমূর্ত্তিকেও বহুমূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। অবতারগণ, দেবগণ, মনুষ্যাদি প্রাণিগণ সকলই তাঁহারই শক্তি, আবার গোলোক বৈকুণ্ঠ ধামাদিও তাঁহারই শক্তি-বৈভব। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহারই মায়া-শক্তির বৈভবাত্মক। কিন্তু এই দৃশ্যমান বিশ্বাদি, দেবাদি, তদীয় ধামাদি ও তদীয় চিদানন্দময়ী শক্তিবর্গ তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা হইতে অভিন্ন। কিন্তু এই অভেদ যেমন অচিন্ত্য, তেমনি ভেদ-প্রতীতিও অচিন্তনীয়; গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই বিশিষ্টতা।

ভাস্কর ভাষ্যও ভেদাভেদ বাদের সমর্থক বটে, কিন্তু ভাস্কর যে ভেদ স্বীকার করেন তাহা ঔপাধিক ও অনিত্য। গৌড়ীয় বৈদান্তিকগণের ভেদপ্রতীতি অনিত্য নহে। নিম্বার্কভাষ্য যে ভেদাভেদ-বাদের সমর্থক, তাহাতে ঔপাধিক ভেদের কথা নাই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারগণ ভেদাভেদ শ্রুতি বহুল সংখ্যায় ও বহুত্র উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। তাহারা ঔপাধিক ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। ইঁহারা স্পষ্ট ভেদাভেদবাদী। কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণ বলেন, ভগবান হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমাদের সামর্থ্যাতীত, অভেদ কল্পনাও তেমনি আমাদের সামর্থ্যাতীত। ভেদাভেদবাদ অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার্য্য। কিন্তু স্পষ্টরূপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব—উহা চিন্তার

আয়ত্ত নহে, সেইজন্য এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও সেই অভেদ অচিন্ত্য, সেই ভেদও অচিন্ত্য (Unthinkable)।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত নির্ব্বিশেষবাদের ভিত্তি-উন্মূলনের জন্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শক্তিবাদই প্রধানতম। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আলোচনার সূক্ষ্ম রাজ্যে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই তাঁহারা বৈষ্ণব বেদান্ত ভাষ্যের অর্থ ও যৌক্তিকতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা ইহাতে আরও দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল তত্ত্ব তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় ছিল, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অতি বিশদরূপে সেই সকল বিষয় সূক্ষ্ম বিচারের আলোক-রেখায় উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও আনন্দতত্ত্ব প্রভৃতি ভজনসিদ্ধ বৈষ্ণব ঋষিগণের মানসনেত্রে অতীব সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মায়াবাদে বেদ-বেদান্তের সুচারুরূপে ব্যাখ্যা হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রৌত বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্য না করিয়াই নিজের অভিমত বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার ফলে মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ হইয়া পড়িয়াছে। শক্তিবাদই যে বেদ-বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য, যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে বেদের মন্ত্র-ভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ ও উপনিষদ্‌ভাগ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাই বৈষ্ণবগণের অভিমত।

উপনিষদ্ সমূহে কোন কোন শ্রুতি নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থক বলিয়া প্রতীত হয়, শঙ্করের ভাষ্যই উক্ত প্রতীতির কারণ। শাঙ্কর ভাষ্য পাঠ না করিয়া যদি কেহ বেদসংহিতা ও উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করেন, তবে সবিশেষবাদ ভিন্ন কাহারও চিত্তে নির্ব্বিশেষবাদের লেশাভাসও স্থান পাইবে না। অপরন্তু তাঁহারা স্পষ্টতঃই বুঝিতে

পাইবেন যে শক্তিবাদই বেদ বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বেদ-বেদান্তের সর্ব্বত্রই শক্তিবাদের অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তদীয় ভাষ্য, শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াও কার্য্যতঃ বা ফলতঃ শ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার যুক্তিজালে শ্রুতিও মায়া-বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপে শঙ্করের মায়াবাদ একবারেই অবৈদিক হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে ভগবৎশক্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব বেদান্ত-ভাষ্য,—পূর্ণরূপে বেদসম্মত ও বেদার্থ-সুসঙ্গত হইয়াছে, ইহাই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত।

মায়াবাদীরা ব্রাহ্মী শক্তির পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মবস্তু চিদেকমাত্র। ইঁহারা চিৎ ভিন্ন অপর পদার্থ স্বীকার করেন না। এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার নিমিত্ত শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় ব্রাহ্মী শক্তির অস্তিত্ব ও স্বাভাবিকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত শ্রীভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে বিচার করিয়াছেন তদ্‌যথা—(১১।৩।৩৮)

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞান-ক্রিয়ার্থ-ফলরূপতয়োরুশক্তিঃ
ব্রহ্মৈবভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মই অনেকাত্মশক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মূলে "ব্রহ্মৈব" পদে একটী "এব" শব্দ আছে। এই এব শব্দটী "নিশ্চিত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই শক্তি কল্পিত নহে, উহা ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি। "পৃথিবী যস্য শরীরম্" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতিই উহার প্রমাণ। অতিরিক্ত বস্তু, পৃথিব্যাদি স্থূলদৃষ্টি-গ্রাহ্য পদার্থ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম অদৃষ্টচর পদার্থ এস্থলে সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সদসৎরূপে প্রতিভাত হয়েন, কেন না তিনি এই দুইয়ের কারণ-স্বরূপ। এই সকল পদার্থ

ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই; তাহা হইলে এই শক্তিসমূহকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কল্পনায় এই সকল শক্তি অসিদ্ধ হইয়া উঠে। জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফল দ্বারা এই সকল ব্রহ্মবৈভবের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থকে,—মহদাদিজ্ঞান, শক্তি রূপ, সূত্রাদি (কার্য্যানামাধারত্বাৎ সূত্রস্থানীয়মিতি শ্রীবীররাঘবাচার্য্য) ক্রিয়াশক্তিরূপ। ব্রহ্ম, কার্য্যের আধার, এইজন্য ইনি সূত্রস্থানীয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়ার্থ রূপ সত্য। প্রকৃতিতে সর্ব্বভাবেরই সমাবেশ সূচিত হয়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মকে সদসৎস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম, ফলরূপে এই সদসতেরও পরস্থানীয় পুরুষার্থ-স্বরূপ, সর্বৈভব ভগবদাখ্য চিদ্বস্তু এবং তদনুগত শুদ্ধাখ্য জীববস্তু এই উভয়ই ফলস্বরূপ। এইরূপ জ্ঞান ক্রিয়াদি দ্বারা ব্রহ্মের বহু শক্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে বহু শক্তির প্রকাশ হইল, শ্রীজীব উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিতরূপে তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন যথা :—প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান, তাহা হইতে ক্রিয়া শক্তিদ্বারা কার্য্যাধার-স্বরূপ সূত্র, জ্ঞান শক্তিদ্বারা মহান্,—এই মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারই জীব বা তটস্থা শক্তি। বৈকুণ্ঠাদিবৈভব তাঁহারই উপলক্ষণক। এই উক্তি সপ্রমাণ করার নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাকার শ্রীজীব নিম্নলিখিত ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াছেন তদ্যথা :—"তে চ—সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ।"

আমরা শ্রুতিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত।" ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপা ২ খণ্ড।

অর্থাৎ হে সৌম্য এই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন।

কেহ বলেন, আদিতে অদ্বিতীয় অসৎবস্তু বিদ্যমান ছিলেন। সেই অসৎ হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে।

(২) কুতস্তু খলু সৌম্যেবংস্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সদেব সৌম্যেদমগ্র মাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। (তত্রৈব দ্বিতীয়ে)

অর্থাৎ হে সৌম্য ইহা কি প্রকার ? অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎজাত হইতে পারে ? হে সৌম্য এক অদ্বিতীয় সৎই অগ্রে ছিলেন।

(৩) তদৈক্ষত বহুস্যাং 'প্রজায়েয়েতি' তত্তেজোঽসৃজত-ইত্যাদি।

অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব, এই মনে করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন।

অতঃপরের প্রপাঠকে নিম্নলিখিত শ্রুতিগুলি পরিপঠিত হইয়াছে যথা :—

(১) তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজাণি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।

(২) সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনা-ত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত।

(৩) তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতে-মাস্তিস্রোদেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

(১) অর্থাৎ এই ভূতগণ অণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।

(২) তখন সেই দেবতা মনে করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতায় প্রবেশ করিব এবং ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশ পাইব।

(৩) তৎপরে দেবতা মনে করিলেন, আমি এই তিনের প্রত্যেককে ত্রিবৃত করিব। তিনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন নামে ত্রিবৃত করিলেন। অতঃপরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন :—

"আদাবেকং ততত্তদ্‌তদ্রূপমিতিশক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমায়াতাম্।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম আদিতে এক, তৎপরে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশ পায়, এতদ্দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইল।

যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। অদ্বিতীয় এক হইতে বহুত্বের আবির্ভাব এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার তদীয় "ফার্ষ্ট প্রিন্সিপাল" নামক গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এক শক্তি হইতেই অনন্ত শক্তির উৎপত্তি। বিশ্বকারণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইতেই বহু হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞান-সম্মত। শক্তির এই স্বভাবিকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। কেন না—"অন্যাসম্ভবেনোপাধিকত্বাযোগাৎ।"

অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তু ভিন্ন পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, এ অবস্থায় অন্য বস্তু না থাকায় ঔপাধিকত্বের অযোগহেতু এই শক্তি ব্রহ্মেরই স্বাভাবিক শক্তি।

এই সকল শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপবৈভবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবৎ নিত্য সিদ্ধ হইলেও সূর্য্যের রশ্মি পরমাণুবৃন্দ যেমন সূর্য্যেরই উপাদান ও সূর্য্যমূলক তদ্ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই সকল শক্তিও তদ্রূপ ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বীয় স্বীয় সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা ব্রহ্মসত্তামূলক এবং ব্রহ্মেরই উপাদান।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীজীব শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্যথা :—"তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ মুণ্ডক ২।২।১০

অতঃপরে শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের প্রাগুক্ত শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের এতৎ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও

উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এস্থলে পুনর্ব্বার ঐ সকল শ্লোক করিতেছি। যথা মৈত্রেয় মুনি, পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

নির্গুণস্যাপ্রেমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ
কথং স্বর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে।

ইহার প্রত্যুত্তরে পরাশর বলিতেছেন :—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যাভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥

শ্রীধর স্বামী ইহার যে টীকা করিয়াছেন ভগবৎসন্দর্ভে উক্ত টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"এই শ্লোকে ব্রহ্মের সৃষ্টাদিকর্তৃত্বশক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কথা এই যে, ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলা হইল, তখন সেই নির্গুণের আবার সৃষ্টাদি করার শক্তি কোথায়? শ্রীধর স্বামীর মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ :—ব্রহ্ম নির্গুণ (সত্ত্বাদিগুণরহিত), অপ্রেমেয় (দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছন্ন) শুদ্ধ (অদেহ, সহকারিশূন্য) অমলাত্মা (পুণ্যপাপ সংস্কার বিহীন, অথবা রাগদ্বেষাদিশূন্য) এইরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে কি? যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, কার্য্য করার সামর্থ্য আছে, এজগতে তিনিই কর্ত্তা এবং তাঁহা দ্বারাই কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

আমরা ঘটাদি যে সকল সৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আমাদের ধারণা হয় যে এই সকল সৃষ্ট পদার্থের অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছেন। যিনি কর্ত্তা অবশ্যই তাঁহার কার্য্য করিবার বাসনা এবং তদুপযোগিনী শক্তি আছে। কিন্তু ব্রহ্ম যদি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে তাঁহাকে কিরূপে সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। এই আশঙ্কা স্বাভাবিক। এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পরিস্ফুট ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর এই শ্লোকেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্লোকে বলা হইয়াছে ইহ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মণিমন্ত্রাদির শক্তিই তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে না। কেননা সকল শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ, ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যও তেমনি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম গুণাদি-বিহীন হইলেও তিনি যখন অচিন্ত্য শক্তিমৎ, তখন এ অবস্থায় জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতেও লিখিত হইয়াছে :—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে
পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্ব মিদং জগৎ ॥

ফলতঃ মণি মন্ত্রাদির প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মশক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক এবং উহা তর্কযুক্তির অতীত। এই সম্বন্ধেও বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে একটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে যথা :—

"স বায়ং সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যাদি।"

এই সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মই এই সকলের হেতু এবং তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্বও ভগবৎতত্ত্বের পরিকর।

মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ। সুতরাং প্রমাণের অগোচর। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সৃষ্ট হইতে পারে না। ব্রহ্মে অবশ্যই বিবিধ শক্তি আছে, ইহা শ্রুতিতেও জানা গিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ, মায়াবাদীদের এই মত গ্রাহ্য নহে। মায়াবাদীরা ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবলতর যুক্তি গুলিয়া

বলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহা "আগন্তুক"। অর্থাৎ জল যেমন স্বাভাবতঃ শীতল, কিন্তু অগ্নির সন্তাপে উহাতে উষ্ণতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির আপাততঃ প্রতীয়মানতা কেবল মায়ারই বিলাস মাত্র। এই আপত্তি-খণ্ডনের নিমিত্ত সন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, এইরূপ আগন্তুকত্ব ব্রহ্মে স্বীকৃত হইতে পারে না। কেননা শাস্ত্র বলেন :—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সুতরাং "ব্রহ্মে শক্তি আছে," একথা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে, এই শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি, উহা আগন্তুক নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি প্রভাবে দ্বারা প্রকৃত সত্ত্বাদিগুণের পরিণাম বটে এবং [illegible]ই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সাধিত হয়। অপরন্তু ব্রহ্ম বলিলেই [illegible] যে :—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং প্রাপঞ্চিক গুণাদিও ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে। মায়াও ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং তাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই। তবে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তিনি প্রাকৃত গুণাদি দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, কিন্তু স্বরূপ শক্তি নহেন। মায়া শ্রীভগবানের অধীন, এই নিমিত্ত তিনি মায়াধীশ। তাঁহার স্বরূপ শক্তি স্বাভাবিকী এবং উহা মায়াস্পৃষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও লিখিত হইয়াছে :—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তদিত্যাদি।" এতাদৃশ আরও প্রমাণ আছে।

এইরূপ প্রমাণ যুক্তির অবতারণা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই :—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ বৈভব জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মি তৎ প্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

অর্থাৎ একই সেই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ শক্তি, বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিভাবে সর্ব্বদাই বিরাজমান। সূর্য্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিমালা ও উহার প্রতিচ্ছবি উক্ত বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত কি অতীব প্রসিদ্ধ ও সদর্থক।

অতঃপরে এই উদাহরণের ব্যাখ্যা করা হইবে। এবরূপ শক্তিবিভাগ বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় :—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না-বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

শ্রুতি বলেন :—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি।"

ইহাতে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সে আপত্তি এই যে, "প্রত্যেক শক্তিই যদি বিশ্বব্যাপিকা ও নিত্যা হয়, তবে উহাদের একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?" এই অনুপপত্তি সহজেই খণ্ডিত হইতেছে, তদ্‌যথা :—

"ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবৎশক্তিসমূহ অচিন্ত্য। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন :—"দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্।" যাহা দুর্ঘট, তাহার সংঘটন হইলেই উহা অচিন্ত্য নামে অভিহিত হয় শক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। স্বরূপ শক্তিও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত। ইঁহারা সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজের ন্যায় বিরাজমান। তটস্থা শক্তি রশ্মি স্থানীয়। এই শক্তি চিন্ময়

শুদ্ধ জীবস্বরূপিণী। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্য স্থানীয়; ইহা সেই পরমতত্ত্বের বহিরঙ্গবৈভব জড়ময় "প্রধান" পদবাচ্য।

ইতঃপূর্ব্বে পরমতত্ত্বের চারি প্রকার অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে যথা—স্বরূপ, স্বরূপ বৈভব, জীব ও প্রধান। বিষ্ণুপুরাণে প্রধানকে মায়া বৈভবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শক্তিত্রয়ের সংখ্যা করা হইয়াছে। জীব-শক্তিই তটস্থা শক্তি। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই :—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

ইতঃপূর্ব্বেও ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবিদ্যা শব্দের অর্থ মায়া। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও ইহার আবরণী শক্তি প্রভাবে তটস্থ শক্তিময় জীবকে সহজেই অজ্ঞানতমঃপ্রভাবে সমাবৃত করিতে সমর্থ। এই মায়ার আবরণের তারতম্যানুসারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্ব-দেহে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মে এই সকল শক্তি নির্ব্বিশেষ ভাবে অবস্থিত নহে। ফলতঃ শ্রীভগবানে এই সকল শক্তিই মিলিত ভাবে অবস্থান করে। চিদচিৎ সকল পদার্থই শ্রীভগবানের শরীর। যথা শ্রীভাগবতে:—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ। ১১।৩৪।১

শ্রীভগবান্ যে চিদচিৎশক্তিযুক্ত শ্রীভাগবতে তাহাঁর প্রমাণ আরও আছে,—

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৭।৩।৩৪

শ্রীভগবান্ চিৎ অচিৎ সর্ব্বশক্তিময়। শ্রীভাগবতে এইরূপে ব্রহ্মশক্তি বা ভগবৎ শক্তির আলোচনা আছে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে অতঃপরে মায়াশক্তির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পরমাত্ম সন্দর্ভে তটস্থা বা জীব শক্তির ব্যাখ্যা বিচার করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে ভগবৎশক্তি তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কৈবল্যাদ্বৈতবাদিগণের অভিমত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "অদ্বয়বাদিগণ বলেন, স্বাজাতীয় বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব। শ্রীভাগবতে "বদন্তি" শ্লোকে যে "অদ্বয়" পদটী আছে সেই পদের প্রয়োগেই উপপন্ন হইতেছে যে পরমতত্ত্ব সজাতীয়াদিভেদরহিত। সুতরাং এই তত্ত্ব অনন্ত ও সত্য। জ্ঞেয়, জ্ঞান ও তৎসাধন সমূহের প্রবিভাগে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যাদিসাধনে অদ্বয়তত্ত্ব সান্ত হইয়া পড়েন। যদি বল অদ্বয়তত্ত্ব জগতের কর্ত্তা, তবে জ্ঞানই কর্ত্তা হইয়া উঠেন। আর যদি বল অদ্বয়তত্ত্ব বিক্রিয়মান হইয়া জগতের করণস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞানকে বাষ্পাদিবৎ জড় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞান অসত্য হইয়া পড়েন।

জ্ঞান শব্দটী জ্ঞপ্তি, অববোধ ও বোধপর্য্যায়ভুক্ত। এই জ্ঞান নামক তত্ত্বটী "শক্তিমৎ" একথা বলাও অসঙ্গত। যদি বল যে "এই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বটী স্বরূপভূত শক্তি", তাহাও বলিতে পার না,—স্বরূপশক্তি বস্তুটী কি, এই শক্তিটী অদ্বয়জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত? ইহার আক্ষেপবা স্বরূপত্ব কেন অন্তোই বা শক্তিত্ব কেন? সত্য বটে এই অদ্বয়জ্ঞানকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভগময়ত্ব যে গুণাত্মক, যে গুণদ্বারা ইনি "ভগবান্" বলিয়া শব্দিত হইয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং একটা স্বরূপশক্তি কল্পনা করিলেও উহা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জ্ঞানবিলাসের বহুত্ব বা নানাবত্ত্বও কল্পিত হইতে পারে না। অপিচ নানাবত্ত্বে ঈশিত্ব লক্ষণবিশিষ্ট গুণক্রিয়াদিইবা কি প্রকারে সম্ভাবিত

হইতে পারে? আরও কথা এই যে এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নীলপীতাদি আকার ও পরিচ্ছিন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? অদ্বয়জ্ঞানের আবার বর্ণ কি, তাহার পরিচ্ছদই বা কি? পরিচ্ছদ হইতেছে—দ্রব্যবিশেষ, বৈকুণ্ঠ হইতেছে—লোকবিশেষ,—সেখানে যাহারা গমন করে তাহারা জীববিশেষ,—এই সকলের অদ্বয়জ্ঞানত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ঐ সকল অবস্থা স্বীকার করিলে সকল কথাই হস্তি-স্নানের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও অযথা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সে মুহূর্ত্তে হস্তীকে স্নান করাইবে সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় স্বভাবে আবার হস্তী নিজ দেহকে ধুলি-ধূলায়িত করিবে। অদ্বয়তত্ত্বে শক্তিসংযোজন ও সেই প্রকার নিরর্থক। ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনও স্বভাবতঃ নির্ম্মল বা দোষশূন্য হইবে না। তবে বলিতে পার যে "এই জগৎ যখন কার্য্যময়, শক্তি ভিন্ন কখনও কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু তদুত্তরে আমরা বলি এই শক্তি, তত্ত্বও নহে, অতত্ত্বও নহে, উহা অনির্ব্বচনীয় সুতরাং উহা মিথ্যা এবং স্বরূপভূতা নহে। ভগাদি কেবল উপলক্ষণ মাত্র। জহদজহৎলক্ষণ দ্বারা ভগবান্ শব্দটী এখানে অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সামান্যাধিকারণ্যে প্রযুক্ত মাত্র। যেমন "সেই ইনিই দেবদত্ত" বলিলে "দেবদত্ত" শব্দটী উপস্থিত দৃশ্যমান ব্যক্তির পরিচায়করূপে প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ 'অদ্বয়জ্ঞানই ভগবান' এই কথা বলিলে জহদজহৎ লক্ষণ দ্বারা অদ্বয় জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব সূচিত হইয়া থাকে। (আমার অনুদিত সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে ইহার বিশেষ দ্রষ্টব্য)

কেবলাদ্বৈতবাদীদের এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণব বলেন, অদ্বয়তত্ত্বটী যখন ভাবরূপতত্ত্ব সুতরাং "গলগৃহীত" ন্যায় অনুসারে ইহার স্বরূপশক্তি কেবলাদ্বৈতবাদীদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। জগদাদি কার্য্য দর্শনে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার কে না করিবে? কেবলাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি দোষদুষ্ট। জগৎ যখন কার্য্য, কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং এই শক্তি, বস্তুর ধর্ম্মবিশেষ।

ঐ ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও কার্য্যসিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানে নিমিত্ত কারণে এই স্বরূপভূতা শক্তি নিত্য বিরাজমানা। এই শক্তি দ্বারাই কার্য্য-বিশেষের উৎপত্তি হয়। এই শক্তি ত্যাগ করিয়া অপর বস্তুবিশেষ স্বীকার অনর্থক। বিবর্ত্তবাদীদের পক্ষেও একটা অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য। শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, এই অবস্থায় শুক্তিকেই রজতভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। শুক্তিতেই রজতের ভ্রম হয় কিন্তু অঙ্গারে হয় না। ব্রহ্মেই জগতের ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তাহা হইলে ব্রহ্মই জগৎ-ভ্রমের অধিষ্ঠান। যখন অতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম-শক্তিরই পরিচায়ক।

সর্ব্বসংবাদিনীকার মায়াবাদের বিরুদ্ধে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিবাদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "আরও একটা কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি নিজে তৎসম্বন্ধে কিছু করেন কিনা? যদি এই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞান দ্বারাই বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিতে-ছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সুতরাং তদতিরিক্ত অজ্ঞানের অস্তিত্বই বা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? যদি বিবর্ত্তন ব্যাপারে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধ বস্তুর শক্তি স্বতঃই আসিয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈত শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই লিখিয়াছেন :—

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি।" (২,১,১৮ সূত্র ভাষ্য।)

অর্থাৎ শক্তি কারণে অবস্থান করিয়া কারণগত কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে কার্য্যশক্তি থাকে না, তাহা কারণ নহে, সুতরাং কার্য্যও জন্মায় না। শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন, ও কার্য্যের ন্যায় অসৎ

(অভাবরূপিণী) হইলে উহা কখনও কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। তাহা হইলে এই "বস্তুদ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে, ঐ বস্তুদ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে না"—কার্য্য-সাধনের এরূপ নিয়ম থাকিত না। অসত্ত্বের ও অন্যত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য্য হইত, কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি, কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য্য,—শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সর্ব্বসংবাদিনীকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বেদান্তের আলোক লইয়া শ্রীভগবৎশক্তিতত্ত্বকে অতীব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলোকের অনুচর অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞান চৈতন্যের অনুচর, অর্থাৎ যেখানে চৈতন্য সেইখানেই অজ্ঞান, ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। এই সিদ্ধান্ত হইতে আরও বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানসত্তার স্ফুরণ-ধর্ম্ম দ্বারাই স্বরূপ শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তীতি"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই শ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে :—

বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।

বৃহত্ত্বই তাঁহার শক্তিমত্তার প্রদর্শক। অন্যান্য পদার্থে আমরা যে শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই, সেই সকল শক্তির মূল প্রস্রবণ,—চিৎশক্তির সন্নিধানত্ব, নতুবা জড়ে শক্তির ক্রিয়া অসম্ভব। অন্যান্য পদার্থে যে শক্তি দেখিতে পাই, তাহাও ভগবৎশক্তির স্ফূর্ত্তিমাত্র।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সূত্রাকারে এই মর্ম্মে দুই একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়া প্রমাণ-স্বরূপ একটী বেদান্তসূত্র ও উহার শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্যথা :—প্রবৃত্তেশ্চ। ২।২।২ ইতি অত্রাদ্বৈতশারীরককৃতাপি ব্যাখ্যাতম্ "নন্থ তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রা-

ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতিচেৎ, ন অয়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ।"

এস্থলে লোকায়তিক নাস্তিকগণের মত-নিরসনার্থ তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের পরিহার করা হইতেছে। নাস্তিকগণ বলেন, "তুমি কেবল বলিতেছ আত্মার প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু তুমি যে প্রবৃত্তি দেখিতেছ উহা দেহসংযুক্ত আত্মারই প্রবৃত্তি; বিজ্ঞানস্বরূপ মাত্র বস্তুর প্রবৃত্তি কোথায়? সুতরাং প্রবৃত্তিবিহীন শুদ্ধ চেতনার প্রবর্ত্তকত্ব উৎপন্ন হইতেছে না।"

লোকায়তিগণের এই মত পরিহারার্থ শঙ্কর বলেন, প্রবৃত্তি না থাকিলেই যে কোন বস্তু প্রবর্ত্তক হইতে পারে না একথা বলিতে পার না। অয়স্কান্তমণি এবং রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অয়স্কান্তমণি স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। রূপাদি বিষয় সকল প্রবৃত্তিবিহীন হইয়াও চক্ষুর প্রবর্ত্তক হয়। সর্ব্বপ্রবৃত্তিরহিত হইয়াও ঈশ্বর সর্ব্বগত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হইয়া সকল পদার্থের প্রবর্ত্তক। যদি বল অজ্ঞান হইতেই জগদ্রূপ কার্য্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, অজ্ঞান ও মিথ্যা, জগৎরূপ কার্য্যও মিথ্যা। সুতরাং জগৎ প্রবর্ত্তকত্বাদি শক্তি ব্রহ্মের নহে, উহা অজ্ঞানের।

মায়াবাদিন্, তুমি একথাও বলিতে পার না। কেন না "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করও এই ব্যাপারেই ব্রহ্মের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্ত্যাদি হইয়া থাকে। জগৎ কার্য্যে ব্রহ্ম-প্রসঙ্গ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্ত স্বরূপ-শক্তির স্থিতি একেবারেই দুর্নিবার হইয়া উঠে। কেননা এতৎপক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সবিতৃপ্রকাশ প্রকাশ্যনাশেও নষ্ট হয় না, সবিতার ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। সবিতা আছেন অথচ তাহার প্রকাশ নাই, ব্রহ্ম আছেন অথচ তাঁহার শক্তি নাই ইহা অর্দ্ধ কুক্কুটীবৎ

উপহাস্য।" এইরূপ উক্তির পরে শ্রীপাদ গোস্বামী শ্রীমৎ শঙ্করের ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্",—১।১৫।—সূত্রভাষ্যে :—"অসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশত ইতি কর্ত্তৃত্বব্যাপদেশদর্শনাৎ। এবম্ সত্যপি কর্ম্মণি ব্রহ্মণ স্তদৈক্ষতেতি কর্ত্তৃত্বব্যাপদেশোপপত্তে র্ন দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।"

অর্থাৎ যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে তখন যেমন সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এইরূপ বলা হয় এবং অকর্ম্মক-কর্ত্তৃত্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয় বস্তু) না থাকিলেও "তৎ ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিলেন তদ্রূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্ব-ব্যবহার ও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে দৃষ্টান্তের কোনও বৈষম্য নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তদীয় সহস্র নাম ভাষ্যেও লিখিয়াছেন :—"স্বরূপসামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতি শ্রুতিঃ।"

সুতরাং এস্থলেও শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ-সামর্থ্য বা স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুর শক্তি কার্য্যের উত্তরকালে ও পূর্ব্বকালে তৎতৎ বস্তুতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় বিরাজমান থাকে। কার্য্যকাল প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ। ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এই কথা। শঙ্কর ভাষ্যেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

"বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাৎ"

অর্থাৎ যে যে স্থলে অচেতয়মানতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বিষয়াভাব নিবন্ধন, কিন্তু চৈতন্যাভাব জনিত নহে।

শক্তির উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিলে উহার কার্য্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু কারণত্ব স্বীকৃত হয় না, অথচ স্বীকৃত না হইলে শক্তির স্বরূপহানি হয়। আরও একটা কথা এই যে 'জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানই" সম্ভবপর "জ্ঞানমাত্রাশ্রয়" সম্ভবপর নহে। অজ্ঞান স্বীকার করিলে অবশ্যই

উহা হইতে পৃথক্ লক্ষণশীলজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সেই জ্ঞানেও শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। কেন না এই জগৎ যদি শক্তির ক্রিয়াস্থলরূপে পরিগণিত হয় এবং অজ্ঞান হইতেই যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কারণ এই যে, এই অজ্ঞানও জ্ঞান হইতে উদ্ভূত।

আর এক কথা এই যে চিন্মাত্র ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আর সকল মিথ্যা, চিদেকব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন জ্ঞান নাই। ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত। এতাদৃশ জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে? জ্ঞানকে অভ্যাসস্বরূপও বলিতে পার না, কেন না, অভ্যাস স্বীকার করিলে কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর নিখিল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকিলে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যদি বল উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে আপত্তি এই যে ব্রহ্ম যদি নিবর্ত্তকজ্ঞান হয়েন, তবে জ্ঞাতৃত্বটী কি উহার স্বরূপ কিংবা জ্ঞাতৃত্বটী ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়? যদি বল জ্ঞাতৃত্বটী ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, উহা অধ্যস্ত, তাহা হইলে অভ্যাস এবং তাহার মূল আর একটী অবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়, ইহারা উভয়েই নিবর্ত্তক জ্ঞান হইতে পৃথক্। নিবর্ত্তক জ্ঞানান্তর স্বীকার করিলে উহার ত্রিরূপত্ব নিবন্ধন জ্ঞাতৃত্ব পক্ষে অনবস্থা দোষ ঘটে। অপর পক্ষে জ্ঞাতৃত্ব যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে আমাদের পক্ষই গৃহীত হইল বলিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বই উহার স্ফূর্ত্তির হেতু। তজ্জন্য স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি? স্বপ্রকাশত্ব হইতেই উহা ভাসমান হইয়া থাকে, উহার প্রকাশের জন্য পৃথক বস্তুর কল্পনার আবশ্যক হয় না। ইঁহারা যাহাকে স্বপ্রকাশত্ব বলেন, আমরা তাঁহাকেই স্বরূপশক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। স্বপ্রকাশত্ব ভিন্ন কোন স্বপ্রকাশ বস্তু থাকিতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ তাহাতে অবশ্যই ধর্ম্ম বা শক্তি আছে। যদি বল

অপরের অনপেক্ষা সিদ্ধিই স্বপ্রকাশ সিদ্ধি, এতদ্ব্যতীত স্বপ্রকাশ সিদ্ধি নামে কোন ভিন্ন বস্তু নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের পক্ষ হইতে বক্তব্য এই যে সিদ্ধি প্রভৃতি ও এই স্বরূপ-শক্তি।

অপিচ মায়া বাদীরা বলেন ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ। তাহারা সবিশেষ প্রকাশ মায়াবাদে অস্বীকার্য্য। এই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ মাত্র ব্রহ্মবাদে সপ্রকাশত্বও প্রতিপন্ন হয় না। যদ্দারা নিজের ও পরের ব্যবহারযোগ্যতা প্রতিপাদিত হয় তাদৃশ বস্তুই প্রকাশ নামে অভিহিত। নির্ব্বিশেষ বস্তু এই উভয়স্বরূপ-বিহীন এবং ঘটাদিবৎ অচিৎ। যদি বল যে উভয়রূপ বিহীন হইয়াও উহাতে প্রকাশ ক্ষমতা থাকিতে পারে। একথা বলিতে পার না। ক্ষমত্ব, অর্থ সামর্থ্য,—সামর্থ্য স্বীকার করিলে নির্ব্বিশেষবাদ স্বতঃই নিরস্ত হয়। অপিচ নির্ব্বিশেষবাদে স্বীয় অভ্যুপগম এবং অনিষ্টাদি ও স্বীকৃত হয় না। অপর কথা এই যে নির্ব্বিশেষবাদ অপ্রমাণ। কেন না নির্ব্বিশেষবাদীরা একথা ও বলিতে পারেন না যে নির্ব্বিশেষ বস্তুতে এই প্রমাণ আছে। যেহেতু সর্ব্ব প্রকার প্রমাণই সবিশেষ বস্তু বিষয়ক। নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রমাণের বিষয় হইলে উহা প্রমেয় হইয়া পড়ে। মায়াবাদীরা বলেন যাহা প্রমেয় তাহা নশ্বর। সুতরাং নির্ব্বিশেষ প্রমের প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলে প্রমেয় বলিয়া নশ্বর হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম স্বানুভাবসিদ্ধ, সুতরাং স্বসম্প্রদায়সিদ্ধান্তানুসারে তাহাকেই যদি নির্ব্বিশেষ বলিতে চাহ, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু এই স্বানুভাবসিদ্ধ পদার্থ ও আত্মসাক্ষিক সবিশেষ অনুভব দ্বারা নিরস্ত হইয়া পড়েন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে দুই পক্ষ হইতেই বিবাদের কথা তোলা যাইতে পারে। একপক্ষ বলেন সবিশেষ ব্রহ্ম বস্তুত্বনিবন্ধন ঘটাদিবৎ পদার্থে পরিণত। অপরপক্ষ বলেন তোমাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আদৌ বস্তু নহেন, উহা অলীক, অপিচ উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেমন শশবিষাণ।

এইরূপ বিচারের পর সর্ব্বসংবাদিনীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে নির্ব্বি

শেষ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহেন যথা :—"শব্দস্তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধান সামর্থ্যাৎ পদবাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতিপ্রত্যয় যোগেন হি পদত্বম্। প্রকৃতি প্রত্যয়য়োরর্থভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনমবর্জ্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থভেদেনিবন্ধনঃ। পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থসংসর্গবিশেষাভিধায়িত্বেন নির্ব্বিশেষ বস্তুন্যৈব ন প্রবর্ত্ততে। ইতি তস্মৎ সবিশেষত্বং এবং সিদ্ধং। স চবিশেষঃ শক্তিরেব।

অর্থাৎ সবিশেষ বস্তুতেই শব্দের অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য থাকে। কেননা পদবাক্য রূপেই শব্দের অর্থ-বোধ হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ে যোগে পদ রচিত হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। পদভেদ নিবন্ধনই অর্থভেদ হয়। বাক্য পদসমূহের দ্বারা রচিত হয়। অনেক পদার্থ সংযোগ বাক্যের অর্থ নিরূপিত হয়। অতএব নির্ব্বিশেষ বস্তু অবলম্বনে শব্দার্থ প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং শব্দার্থ প্রতিপাদনে সবিশেষত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই বিশেষ, শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের অন্তিম অধ্যায় হইতে পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর একটী শ্লোকাংশ ও উহার স্বামিকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্যথা :—'ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণঃ'। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকাংশের টীকায় লিখিয়াছেন—অর্কপ্রকাশবৎ স্বতন্ত্রা দৃকজ্ঞানং যস্য স অর্কদৃক্ অতঃ সর্ব্বদৃশাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রকাশকঃ ইতি।" অর্কপ্রকাশের ন্যায় যাঁহার জ্ঞান স্বতসিদ্ধ এবং এই নিমিত্ত যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক। সর্ব্বসংবাদিনীকার এস্থলে শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন যথা :—"জ্ঞানস্বরূপস্য চ তস্য জ্ঞাতৃস্বরূপত্বং দ্যুমণিদীপাদিবদ্যুক্তম্।"

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনি জ্ঞাতৃস্বরূপও বটে, দ্যুমণি ও দীপাদি ইহার উদাহরণ। "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য একস্থলে লিখিয়াছেন :—

যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরাদিসম্বন্ধমন্তরেণেক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি ন তচ্চোদ্যমবতরতি। সবিতৃপ্রকাশবৎ ব্রহ্মণোজ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপিচ অবিদ্যাবতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমাবীশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ।

ন তস্যকার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে
পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।
অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তমিতি চ।

অর্থাৎ "উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শরীরাদি সম্বন্ধ থাকে না, তৎকালে তৎকালে তাঁহার ঈক্ষিতৃত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত নহে" এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। সতত প্রকাশ সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান,—উহা নিত্য, সুতরাং ইহার উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই। অজ্ঞানী সংসারী জীবেরই শরীরাদি নিমিত্তক জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান প্রতিবন্ধকরহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে সে নিয়ম নাই।

দুইটী বেদ মন্ত্রদ্বারা ঈশ্বরের শরীরাদি অনপেক্ষা জ্ঞানতা ও অনাবরণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ এই যে, "তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই, তাঁহার সমানও নাই, অধিকও নাই, শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট শক্তি ও স্বতসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে। অপিচ তাঁহার হস্তপদ নাই অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দেখেন, তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি

জানেন, তিনি বেত্ত্ব বা জ্ঞেয় বস্তু জানেন কিন্তু তাঁহার জ্ঞান নাই, ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন ইত্যাদি।"

সর্ব্বসংবাদিনীকার বলেন, যদি বল জ্ঞানের নিত্যতায় জ্ঞান-বিষয় স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপদেশ দৃষ্ট হয় না, এরূপ আপত্তিও করিতে পার না। কেননা সূর্য্যপ্রকাশে প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলব্ধি হয়। "নাভাব উপলব্ধেঃ।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। স্বরূপত্ব স্বীকৃত হইলেই শক্তিত্বও স্বীকার্য্য হইয়া উঠে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে পরমেশ্বরের বিমলা চিচ্ছক্তি চৈতন্য নামে অভিহিত। এই শক্তি সতা ও পরা। ভগবানের জড়া শক্তি অবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে চিজ্জড়াত্মক জগতের উদ্ভব হয়।

সর্ব্ব-সংবাদিনীকার এইরূপ সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া আরও প্রমাণার্থ "বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধর স্বামিকৃত উহার টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বামী লিখিয়াছেন, বিষ্ণুশক্তি শব্দের অর্থ বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি, এই শক্তি পরব্রহ্ম পর-তত্ত্বাখ্যা। ইহা ভেদবিরহিত সত্তামাত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। স্বরূপ শক্তি বলিলে কার্য্যোন্মুখ শক্তি বুঝায়। কার্য্যোন্মুখত্ব দ্বারাই স্বরূপের শক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্বরূপ বিশেষ্যরূপ। এই শক্তিমৎ বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। জগৎ কার্য্যক্ষমত্বমূলক। শক্তি কার্য্যক্ষমত্বের পরিচায়ক। এই ক্ষমত্বাদিরূপা শক্তি নিত্যা। সুতরাং উহাই স্বরূপ-শক্তি। তথাপি ইহা বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

এই শক্তি সম্বন্ধে বস্তুর নিরূপণযোগ্যতা নাই সুতরাং পৃথকত্ব নাই। সুতরাং এই শক্তিকে শক্তিমদ্ বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্ব নামে অভিহিত

করা হইয়াছে। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে যদি ইহাকে তোমরা শক্তিবল, তবে সেই শক্তির নাম বস্তুই হউক না কেন? উহা ত বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম-বিশেষ। শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বেদান্তিগণ বলেন আমরা উহাকে বস্তু বলিতে পারি না। বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা বস্তুশক্তিই স্তম্ভিত হয়। বস্তু আছে, কিন্তু উহার কার্য্যোন্মুখত্ব স্তম্ভিত, এমত স্থলে পৃথকত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। নতুবা এতাদৃশ স্থলে যুক্তি-বিরুদ্ধতা দোষ বটে। ইহাকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, সুতরাং উহা ভিন্ন এবং ভিন্নভাবে ও চিন্তা করা যায় না উহা অভিন্ন, এই নিমিত্ত শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহাই শ্রুতিবাক্য। অপিচ এই ব্রহ্ম স্বগতভেদ-বিবর্জ্জিত। যদি বল ব্রহ্মের বিশিষ্য ও বিশিষ্টতা সকলেরই স্বীকার্য্য এবং যদি শক্তিমান্ ও শক্তির পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বগতভেদবিবর্জ্জিতত্বে বিরোধ উপস্থিত হয়।" কিন্তু এরূপ বিরোধে দোষ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু যদিও ব্রহ্মের জন্ম বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়্‌ভাব বিকার শাস্ত্রযুক্তির অসম্মত। কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সকল শব্দের ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারেই অপরিহার্য্য। তন্মাত্রেও স্বগতভেদ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ গন্ধাত্ম পৃথিবীর কথাই প্রথমে ধরিয়া লও। গন্ধতন্মাত্র এক হইলেও উহাতে অনন্ত ভিন্নতা বহুল বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

> করম্ভ পুতিসৌরভ্য শান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্।
>
> দ্রব্যাবয়ব-বৈষম্যাদগন্ধ একো বিভিদ্যতে॥

শ্রীধরস্বামীর টীকার মর্ম্মানুযায়ী ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—করম্ভ (মিশ্র গন্ধ) যেমন ব্যঞ্জনাদির গন্ধ, পুতিগন্ধ, সুগন্ধ, শান্ত (পদ্মাদির গন্ধ), উদগ্র (লশুনাদির গন্ধ), অম্লগন্ধ—এইরূপ বহুল গন্ধের অনুভব হয়,

আবার এই সকল গন্ধ শ্রেণীর মধ্যেও অনন্ত প্রকার ভেদ আছে। দ্রব্যাবয়বের বিভিন্নতা হইতেই এক গন্ধতন্মাত্রের বহুল স্বগত ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল বিশেষ বা ভেদ, গন্ধাতিরিক্ত অপর কিছুই নহে; কেন না সেই সকল বিশেষ ও ভেদ কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই অনুভবগম্য।

তন্মাত্রের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মের যে লক্ষণ বিচার করেন তাহাতেও স্বগতভেদবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে: অদ্বৈতবাদীরা বলেন—'বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম' এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুই শব্দ কি এক অর্থবাচী অথবা দুই ভিন্ন অর্থবাচী? এই দুই শব্দ একার্থ-বাচী হইলে পৌনরুক্ত দোষ ঘটে; যদি দুই বিভিন্ন অর্থবাচী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব এই দুইটী পৃথক্ লক্ষণবাচী শব্দ এক বস্তুতে ব্যবহৃত হওয়ায় স্বগতভেদাপত্তি হইয়া উঠে।

যদি বল বিজ্ঞান জাড্যের প্রতিযোগি এবং আনন্দ দুঃখের প্রতিযোগি সুতরাং উক্ত দুইটী শব্দপ্রয়োগ দ্বারা জাড্য ও দুঃখের প্রতিযোগিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। একথা বলিতে পার না। কেন না দুই ব্যাবৃত্তির দুই প্রতিযোগির স্থাপনাই যুক্তিযুক্ত।

বিজ্ঞান ও আনন্দ শব্দ দ্বারা যে এক পদার্থের উপস্থাপনা করা হয়, সেই পদার্থ কি দুইয়ের একতর, অথবা দুই হইতে পৃথক্। যদি দুইয়ের একতর হয়, তবে অন্য পরিত্যাগের হেতু কি? অপিচ একতরের দুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর? আনন্দমাত্র বলিলেই যদি দুই প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে পদ-প্রয়োগ-লাঘবের রীত্যানুসারে আনন্দ শব্দে বিজ্ঞান পদটীও উপলব্ধ হয়। তাহাতেও দোষের তিরোভাব হয় না। কেননা আবার বিজ্ঞান শব্দটী পুনরুক্ত হয়। বিজ্ঞানত্বের প্রধান্য স্বীকার করিয়া আনন্দকে যদি অনুগত বলা যায়,

তাহা হইলে আনন্দের হানি ঘটে, তাহা হইলে আবার পুরুষার্থ থাকে না। আবার অপর পক্ষে যদি এরূপ বলা যায় যে অনুকূল বিজ্ঞানই আনন্দ এবং আনন্দকর যে বিজ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম, এরূপ বলিলেও অনুকূল লক্ষণ ধর্ম্ম দুষ্পরিহর হইয়া উঠে। ব্রহ্মকে আনন্দ ও বিজ্ঞান হইতে অন্যতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতা অসিদ্ধ হয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই সম্বন্ধে বহুল বিচার প্রদর্শন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন "ব্রহ্মে জাড্য ও দুঃখের ব্যাবৃত্তি-যোগ্যতা অবশ্যই আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই যোগ্যতাকেই আমরা শক্তি বলিয়া অভিহিত করি।"

অতঃপরে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় স্বীয় মীমাংসার দৃঢ়তা সাধনের নিমিত্ত শ্রীভাষ্য হইতে সবিস্তাররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

কোনও প্রকার যুক্ত্যাভাস দ্বারা সবিশেষ অনুভূয়মান অনুভব ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল হেতু দ্বারা এই সবিশেষ অনুভূয়মান অনুভব নির্ব্বিশেস বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সেই সকল হেতু সত্তাতিরেকী (অনুভবের স্বীয় সত্তাবহির্ভূত) নিজের অসাধারণ স্বভাববিশেস। এইরূপ হেতু সকল দ্বারা যাঁহারা নির্ব্বিশেষত্ব সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বুঝিয়া দেখেন না যে এই অনুভবের স্বীয় সত্তাতিরেকী নিজের অসাধারণ স্বভাববিশেষও ইহার সবিশেষত্বই বজায় রাখে। এই অবস্থায় এইরূপ নির্দ্ধারণের অর্থ এই যে, কোন প্রকার বিশেষ সমূহ দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুর অপর বিশেষসমূহ নিরস্ত হয় মাত্র কিন্তু এতদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষত্বের কোনও প্রমাণ হয় না।

অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্যে সামানাধিকরণ্যে অনেকগুলি বিশেষণ আছে। বহু বিশেষণ দ্বারা এক বস্তু অভিহিত হইয়াছে। এই বিশেষণগুলি বহু গুণপ্রকাশক।

মহামতি সুদর্শনাচার্য্য শ্রীভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা টীকায় লিখিয়াছেন

"সত্তার অনতিরেকী হইলে পক্ষতাবিশিষ্ট হেতু হইত। তাহা অযুক্ত কেননা, পক্ষবৃত্তিকই হেতু। স্বাসাধারণ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, "স্ব শব্দের ব্যধিকরণে সিদ্ধ পরিহার।" সুতরাং এই সুবিখ্যাত শ্রুতি নির্ব্বিশেষমত-সাধক নহে।

বহু অর্থ-প্রকাশের নিমিত্ত এক অধিকরণে যে অনেকার্থ বৃত্তিত্ব তাহারই নাম "সামানাধিকরণ্য"। এক্ষণে আমরা সত্যং জ্ঞানং আনন্দম্ এই তিনটী পদকে মুখ্যার্থরূপেই (গুণ বা বিশেষণরূপে) গ্রহণ করি, অথবা তত্তৎগুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারেই (তত্তৎগুণাভাবের প্রতিযোগিরূপেই) গ্রহণ করি, এই উভয়ের যে অর্থই কেন গ্রহণ করি না,এই সকল পদের প্রয়োগে নিমিত্তভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল এইমাত্র বিশেষ যে,—একপক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থ প্রকাশ পায়, অপরপক্ষে উহাদের লক্ষণার্থ অভিব্যক্ত হয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" পদগুলি অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিরূপে ব্যবহৃত হইলে সেই প্রতিযোগিত্ব বা প্রত্যনীকত্ব কখনও বস্তুস্বরূপরূপে গৃহীত হইতে পারে না। যদি এক পদদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপ অভিব্যক্ত হইত, তবে এত-গুলি পদপ্রয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা হইলে এই সকল পদ প্রয়োগে নিশ্চয়ই বৈয়র্থ্য হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। কেন না এক বস্তুতে এই সকল পদের নিমিত্তভেদাশ্রয় নাই। কিঞ্চ বিশেষণভেদনিবন্ধন বিশিষ্টতাভেদজনিত এক ব্রহ্মেরই অনেকার্থত্ব, এই সকল পদের সামানাধিকরণ্য-বিরোধিও নহে। কেননা, সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই এই যে একই বস্তুর অনেক বিশেষণবিশিষ্টতা প্রতিপাদনপর পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। শাব্দিকগণ বলেন "ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দসমূহের যে একার্থে বৃত্তি তাহাই সামানাধিকরণ্য।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকায় কৈয়ট লিখিয়াছেন—"ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তযুক্তস্য অনেকস্য শব্দস্য একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।"

বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটী শব্দ ভিন্নার্থক হইলেও এই দুই শব্দ প্রয়োগহেতু ব্রহ্মের দ্বাত্মকতা ঘটে না। প্রকৃত কথা এই যে, একই ব্রহ্মবস্তু স্বরূপ ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্যহেতু ভিন্নভাবে নিরূপিত হইয়াছেন। কেহবা তাঁহাকে জ্ঞানরূপে বুঝিয়াছেন, কেহবা তাঁহাকে আনন্দরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে "ইহা শুক্ল" "ইহা জ্যোতিঃ" এইরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়; "বিজ্ঞান" ও "আনন্দ" শব্দ-দ্বয়ের প্রয়োগও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। সত্যত্ব ও আনন্দত্ব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নহেন। যেহেতু এই উভয়ই ব্রহ্মের ধর্ম্ম।

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রে অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য সবিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা:—

১। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

২। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৩। সর্ব্বে নিমিষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি ন তস্যেশে কশ্চন; যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। যএনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি।

অতঃপরে সর্ব্বসংবাদিনীকার "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়া আনন্দময় প্রকরণের বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আনন্দময় প্রকরণকে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসন বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, উহা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদের নিম্নলিখিত সূত্র গুলির সমষ্টিই "আনন্দময় প্রকরণ" নামে অভিহিত:—

(১) আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ১২। (২) বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। ১৩। (৩) তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ। ১৪। (৪) মান্ত্রবর্ণিক মেবচ গীয়তে। ১৫। (৫) নেতরোনোপপত্তেঃ। ১৬। (৬) ভেদব্য-পদেশাচ্চ। ১৭। (৭) কামাচ্চ নানুমা নাপেক্ষা। ১৮। (৮) অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি। ১৯। সর্ব্বসংবাদিনীকার এই কয়েকটী সূত্রের

ব্যাখ্যায় বহুল পরিমাণে শাঙ্কর ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াও অবশেষে মূল বিষয়ে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদসম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া সবিশেষবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আনন্দময় প্রকরণটীর বিচার করিতে বসিয়া সাক্ষাৎ ব্যাসদেবকেও শব্দপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রদর্শিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনীতে এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রয়তা তৎ-প্রমাদমার্জ্জনার্থং স্বচাতুরীব্যঙ্গভঙ্গ্যা তদানন্দময় সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ং, আনন্দময় ইত্যত্র ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি।

ইহার ভাবার্থ এই যে যদিও "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্রের "আনন্দময়" পদের প্রয়োগ দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য সূত্রকারের বেদান্ত-অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া তাহার প্রমাদমার্জ্জনার নিমিত্ত স্বীয়চাতুরীময় বাক্যভঙ্গীতে আনন্দময় সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" লিখিত আছে, তৎস্থলে স্বপ্রধান ব্রহ্মই উপবিষ্ট হইয়াছেন, উহা বাজে ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং সূত্রকারের কোন অপরাধ নাই।

শঙ্করাচার্য্য বলেন "আনন্দময়" এই পদ শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হয় নাই, আনন্দ শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (অভ্যাস) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে শ্রীজীব বলেন, "অভেদবিবক্ষয়া ত্বানন্দত্বেনচাভ্যা-সোঽপীতি।" অর্থাৎ আনন্দময় ও আনন্দ,—ইহাতে কোন ভেদ নাই, রবির প্রকাশ প্রাচুর্য্যবৎ আনন্দ শব্দই প্রাচুর্য্যার্থে আনন্দময়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে "অভ্যাসের" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

অতঃপরে সর্ব্বসংবাদিনীকার "বিকার" সূত্রের শাঙ্করভাষ্য সমালো-

চনা করিয়াছেন, বিকার সূত্রটী :—'বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।' "আনন্দময়" পদের ময়ট্ প্রত্যয়টীর বিকারার্থ আশঙ্কানিরশনের নিমিত্ত এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। আনন্দময় পদটী ময়ট প্রত্যয়ান্ত। ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে ব্যবহৃত হয়, স্বতরাং আনন্দময় বলিলে ব্রহ্ম বুঝায় না এই আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। প্রাচুর্য্য অর্থেই এখানে ময়ট্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য ১৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় এক পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"এরূপ বলিতে পার যে "অন্নময় আত্মা হইতে প্রাণময় আত্মা ভিন্ন, তাহা হইতে মনোময় আত্মা ভিন্ন,মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তরবর্ত্তী। এই-রূপ ক্রমে পরিপাঠিত শ্রুতিতে সমুদয় ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ ই বিকার, কেবল আনন্দময় শব্দস্থ ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ "প্রাচুর্য্য" এরূপ অর্দ্ধ জরতীয় ন্যায় স্বীকার কর কেন? যদি বল "সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম তদবিকারে পরিপঠিত বলিয়া ঐরূপ অর্থ স্বীকার করি। ইহাতে আপত্তিকারীদের কথা এই যে, উহা অসঙ্গত। কেননা এরূপ বলিতে গেলে অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। উহা যুক্তি-যুক্ত নহে। আনন্দময়ের অন্তরে অপর কোন আত্মার সংবাদ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বতরাং আনন্দময় আত্মাই পরমাত্মা, অর্থাৎ ব্রহ্ম। ইহা স্বীকার না করিলে প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষ ঘটে।"

শ্রীজীব গোস্বামীও লিখিয়াছেন :—"নন্থবিকারার্থকময়ট্ [illegible]হাস্তঃ-পাতিতত্বাৎ কস্মাদর্দ্ধজরতীবৎ প্রাচুর্য্যার্থো ন যুজ্যত এবং"

ইহার মর্ম্ম এই যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বশতঃই আনন্দময়ে অর্দ্ধজরতী ন্যায়ের ব্যবহার হইতে পারে না।

নির্ব্বিশেষবাদ নিরসনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়

স্বয়ং বহুল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল যুক্তিজালে সর্ব্বসংবাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভে অনুব্যাখ্যা সমাবৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে যে সকল সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'অপিচৈবমেকে' এই সূত্রের ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যে লিখিত আছে "অতএব নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদেঽপি প্রধানতুল্যত্ব-মিতি।" শ্রুতি সমূহের সাহায্যেই স্বয়ং সূত্রকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা, ঐ সকল শ্রুতির পারমার্থিক মুখ্য অর্থ এই যে, যে ব্রহ্মজিজ্ঞাস্য, তিনি ঈক্ষণাদি গুণযুক্ত; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্বও অপারমার্থিক হইয়া উঠেন; বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন। "মন্ত্রবর্ণাৎ" "ঈক্ষতে নাশব্দম্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন। চৈতন্য গুণযোগ ভিন্ন চেতনত্ব হয় না। ঈক্ষণগুণাবিরহী হইলে জগৎনির্ম্মাণে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেও ও সাংখ্যকারের প্রধানের কোনও পার্থক্য থাকে না। সুতরাং তাহাতেও দোষ ঘটে। অপিচ—'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। ৩।২।১১ সূত্র।

এই অধিকরণে ও সকল বাক্যেরই সবিশেষ পরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আনন্দময় প্রকরণের:—অস্মিন্নস্যচ তদ্‌যোগং শাস্তি। ব্রহ্মসূত্র ১।১।১৯।

এই সূত্রটী আনন্দময় প্রকরণের অন্তর্গত। এই সূত্রের ভাষ্য শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:—অপিচানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বেপ্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নির্ব্বিশেষন্তু ব্রহ্মবাক্যশেষে শ্রুতিতে—বাঙ্মনোসয়োরগোচরত্বাভিধানাৎ।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্ম বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন॥

অর্থাৎ প্রিয়াদি অবয়ব আছে বলিয়া আনন্দময়কে সবিশেষ ব্রহ্ম বলিতে পার না। কেননা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য-শেষে জানা যায় যে তিনি বাক্যমনের অগোচর। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতে উল্লিখিত শ্রুতিবচনের অর্থ এই যে বাক্য ও মন যাঁহাকে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনিই আনন্দব্রহ্ম। যে জন আনন্দ ব্রহ্মকে জানেন, কিছুতেই তাঁহার ভয়ের কারণ নাই। অভিপ্রায় এই যে গুণ বা বিশেষ না থাকাতেই তিনি বাক্য ও মনের অতীত। অপিচ দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবনিবন্ধন ভয়, ভেতব্য ও ভয় কর্ত্তার অভাব হয়। এই নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রীভাষ্যে নিরাকৃত হইয়াছে। যথা :—

তৈত্তিরীয় উপনিষদের কোন কোন অনুবাকে ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণসমূহ 'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে' হইতে বর্ণন আরব্ধ হইয়াছে, তৎপরে লিখিত হইয়াছে "তে যে শতং" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের আনন্দাতিশয় অনুক্রমপ্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। তারপরে ব্রহ্মের কল্যাণগুণময়ত্বের অনন্তত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি।" অতঃপরে শ্রুতি স্পষ্টরূপই বলিয়াছেন :—

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

এতদ্দ্বারা পরব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের বিষয় আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যাহা কামনা করার উপযুক্ত, তাহাই কাম, সুতরাং কামাঃ" পদের অর্থ কল্যাণগুণ সমূহ। সফলকাম সাধক ব্রহ্মের সহিত অশেষ কল্যাণগুণ লাভ করে ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন,—'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চরে।'

এস্থলে গুণপ্রধান্য বলার নিমিত্তই সহ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ" এই শ্রুতির অর্থ এরূপ নহে যে তিনি মনের অগোচর। এতৎ সহ "যস্যা মতং তস্যমতং" ও অবিজ্ঞাতং বিজানতাং ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয় যে ব্রহ্ম,

জ্ঞানের বিষয় নহেন তাহা হইলে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু এরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইত না। ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনাত্মক। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে উপাসনাত্মক জ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় না। উপাসনার পদার্থ সগুণ। সুতরাং ব্রহ্মও সগুণ। কিন্তু এই ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণ গুণময়, তাঁহার অপরিমিত গুণ বাক্য ও মন দ্বারা পরিমিত হয় না। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে যে তিনি বাক্য মনের গোচরাতীত। এই জন্যই বলা হইয়াছে,—যে বলে আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি সে তাহার কিছুই জানে নাই। কেননা, তাঁহার গুণ অনন্ত ও অপরিমিত।

সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ও লিখিয়াছেন :—

যত্তু যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিকং শ্রূয়তে তদিদমীদৃশমিদং পরিমাণং বেতি নির্দ্দেশাসামর্থ্যপরমেব অলৌকিকত্বাদনন্তত্বাৎ।"

অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে "যতোয়বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে অনন্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণের পরিমাণ করা যায় না। তিনি এই পদার্থ, তিনি এতাদৃশ, তিনি এই পরিমাণবিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, কেননা তাঁহার গুণ অলৌকিক ও অনন্ত।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এসম্বন্ধে উপসংহারে লিখিয়াছেন :—অতএব অলৌকিক বিশেষবত্ত্বে সতি তস্য "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি মহিমা চ সঙ্গতাঃ স্যাৎ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের অলৌকিক বিশেষবত্তাতেই "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতির অর্থ তাহার মহিমাই অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতেও লিখিত আছে "মদীয় মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি সংজ্ঞিতম্।" অর্থাৎ আমার মহিমাই পরম ব্রহ্ম সংজ্ঞায় শব্দিত।

শ্রীভাষ্যে অতঃপরে উক্ত হইয়াছে :—

দহরবিদ্যায়াং—"তস্মিন্নদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি বদগুণা প্রাধান্যং বক্তুং সহ্ শব্দঃ।

পাণিনি সূত্রেও দেখিতে পাই ঃ—সহযুক্তেঽপ্রধানে।—২।৩।১৯।
অর্থাৎ সহার্থেন যুক্তেঽপ্রধানে তৃতীয়াস্যাৎ। যথা পুত্রেণ সহগতঃ পিতা। সহার্থক শব্দমাত্র গ্রহণম্। পুত্রেন সার্দ্ধং ধনবান্। পিতুরক্রিয়াসম্বন্ধ সাক্ষাচ্ছ্বদেনোচ্যতে। পুত্রস্যতু প্রতীয়মান ইতি পুত্রস্য অপ্রাধান্যম্। সহার্থ শব্দপ্রয়োগং বিনাপি তৃতীয়া।"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তৎপ্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপকে স্মৃতি, অলঙ্কার, দর্শন ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে বহুল উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার দার্শনিক উপদেশগুলি শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীজীব, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই সকল উপদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীগোপাল ভট্টই তাঁহাকে এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রধানতম দুর্গ—নির্ব্বিশেষবাদ বিচলিত করাই বৈষ্ণব-দর্শনের এক প্রধানতম বিচার-গৌরব। বৈষ্ণব-বেদান্ত ব্যাখ্যা এই বিষয়ে কি পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এখনও তাহা বহুল পণ্ডিত জনের অপরিজ্ঞাত। অবজ্ঞা ও অনুসন্ধানাভাবই তাঁহাদের এইরূপ অনভিজ্ঞতার প্রধানতম হেতু। বেদান্তসূত্র সম্বন্ধে বৈষ্ণবভাষ্যকারগণের সূত্রার্থনিচয়ের সরলতা ও অক্লিষ্টদোষ-বিবর্জ্জিত ব্যাখ্যা, শ্রুতির সামঞ্জস্য-সংরক্ষণ, যুক্তির নিপুণতা ও পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। শঙ্করভাষ্যে যেরূপ অসমাঞ্জস্য ও ক্লিষ্টতা দোষময়ী ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, বৈষ্ণবভাষ্য-কারগণের ব্যাখ্যায় তাদৃশ দোষ অতি বিরল। আমরা বেদান্তসূত্রভাষ্যপাঠকগণকে কতিপয় ভাষ্য নিরপেক্ষভাবে তুলনা করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই আমাদের এই বাক্যের সারবত্তায় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী স্বাভাবতঃই দক্ষ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইহার উপরে ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি তাঁহার উত্তমরূপ অধীত ছিল। তিনি সর্ব্বসংবাদিনীতে বেদান্তের অতি জটিল তত্ত্ব সমূহের সুমীমাংসা করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডিত না হইলে শ্রীভগবানের অবতারবাদ অসিদ্ধ বা মায়িক হইয়া যায়। সেইজন্য নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডনের এই বিপুল প্রয়াস।

"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" ৩২।১১।

এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—সন্ত্যভয়-লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ "সর্ব্বকর্ম্মঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

অর্থাৎ শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় ব্রহ্মবোধক বাক্য আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মব্যঞ্জক। আবার অপর পক্ষে "ব্রহ্ম স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, এই সকল বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক।

"ন তাবৎ স্বতএব পরস্য ব্রহ্মণ উভয় লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। নহ্যেকং বস্তু স্বতএব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুগন্তুং শক্যং, বিরোধাৎ।"

অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বতঃ এই দুই রূপ উৎপন্ন হয় না। একই বস্তু এক সময়ে রূপবান্ ও রূপবিবর্জ্জিত এইরূপ অভ্যুপগম ন্যায়বিরুদ্ধ। কেননা উহা পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন।

"অস্তিতর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনা অন্যাদৃশ স্বভাবঃ সম্ভবতি।"

তর্কস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ হইলেও কিন্তু স্থানাদি উপাধি দ্বারা দ্বিরূপ হইতে পারে না কি? তাহাও অসম্ভব কেননা উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না যেমন

স্বচ্ছ স্ফটিক অলক্তাদি উপাধিযোগেও অস্বচ্ছ হয় না। উপাধি সকল অবিদ্যা দ্বারাই অভ্যুপস্থাপিত হইয়া থাকে।

"অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্ত বিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্, ন তদ্বিপরীতম্।

সুতরাং সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়বোধক ব্রহ্মের অন্যতর গ্রহণ করিতে হইলে সমস্ত বিশেষ রহিত, নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্য নহে। পরমপূজ্য শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী উক্ত বেদান্তসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এক্ষণে তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে:—অত্রাধিকরণে সর্ব্বেষামেব বাক্যানাং সবিশেষপরত্বমেব দর্শিত মস্তি। তথাহি তদর্থঃ সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যেবমাদিকং পরস্য ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং চিহ্নম্। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ মিত্যেবমাদিকং নির্ব্বিশেষত্বং চিহ্নম্। তদেতদুভয়ং চিহ্নং পরস্য ন সম্ভবতি,—বিরোধাৎ।

অর্থাৎ এই অধিকরণে যে সকল বাক্যের উল্লেখ হইয়াছে সেই সকল বাক্যই সবিশেষ ব্রহ্মবোধক; সর্ব্বকামাদি শ্রুতি-সবিশেষত্ব-বোধক, অপর পক্ষে "অস্থূলাদি শ্রুতি, নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ব্যঞ্জক। সুতরাং এই উভয় চিহ্ন পরব্রহ্মের পক্ষে সম্ভবনীয় নহে। কেননা, ইহারা পরস্পর-বিরোধী।

"নাপি স্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্ উপাধিযোগেন সবিশেষত্বং স্বতো নির্ব্বিশেষত্ব মেবেতি।"

স্থান অর্থাৎ উপাধি অঙ্গীকার করিয়াও এরূপ বলা যায় না যে উপাধি যোগেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব কিন্তু ব্রহ্ম স্বতঃনির্ব্বিশেষ। "হি যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈবোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য সবিশেষত্ব মুপলভ্যতে।"

অর্থাৎ—এই হেতু যে উপাধি সম্বন্ধ থাকুক, আর নাই থাকুক,—ব্রহ্মের সবিশেষত্বই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

তত্রোপাধি সম্বন্ধে তাবদুভয়থাপি সবিশেষত্বম্, তেনোপাধিনা তস্যৈব

স্বরূপশক্তি-প্রকাশশ্চ। যদি তত্র স্বরূপশক্তির্ন স্যাৎ তদা জড়স্য তস্যোপাধেঃ প্রবৃত্ত্যাদিকমপি ন স্যাৎ।

উপাধি-সম্বন্ধ-বিষয়ে নিম্ন নির্দ্দিষ্ট উভয় প্রকারেই সবিশেষত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে,—(১) উপাধি দ্বারা এবং (২) স্বীয় স্বরূপ শক্তি প্রকাশ দ্বারা। যদি স্বরূপশক্তি অস্বীকার কর, তবে জড় বস্তুর সেই উপাধি প্রবৃত্তিরও অভ্যুপগম হয় না। স্থান শব্দের অর্থ—উপাধি। কিন্তু শঙ্করভাষ্যের টীকায় ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—"ন স্থানত উপাধিতোঽপি পরস্যব্রহ্মণ উভয়ত্বচিহ্নসম্ভবঃ।"

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় সর্ব্বসংবাদিনীতে লিখিয়াছেন ব্রহ্মের উপাধিও আগন্তুক নহে। কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে :— সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্। ৬ষ্ঠ প্রপা দ্বিতীয় খণ্ড, ১।

এই স্থলে যে ইদং শব্দের উল্লেখ আছে, বিশ্বই সেই ইদং" শব্দের বাচ্য। ব্রহ্মের সহিত এই বিশ্বের যে তদাত্ম্য সম্বন্ধ, এই উপনিষদ-বাক্যেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। যদি বলা যায় যে এই জগৎ একটা উপাধি-মাত্র, তাহাতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কোনও হানি হয় না। ব্রহ্ম উপাধি-দোষে লিপ্ত নহেন। উপাধি অসৎ, ব্রহ্ম সৎ। সৎ ব্রহ্মে অসৎ উপাধির স্পর্শ অসম্ভব। এতৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদই বলেন :

এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো ঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতিও সবিশেষত্ব-বোধক। এতদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাও সবিশেষত্বেরই প্রতিপাদক। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগৎ উপাদান বলা হইয়াছে। জগজ্জীব-তাদাত্ম্য-বাক্য দ্বারাও সবিশেষত্বই সপ্রমাণ হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে "সদেবসোম্যেদ" শ্রুতি বাক্যটী উপক্রম বিরোধ-দোষে দুষ্ট হয়। কেন না, ইদং অর্থাৎ এই বিশ্বকে সৎ

বলা হইয়াছে। বিশ্ব যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতির উপক্রম বিরোধ-দোষ ঘটে, কিন্তু "সৎ" ও "ইদং" এই উভয়ের তাদাত্মভাব সামানাধিকরণ্যে সংস্থাপন করিলেই এই শ্রুতির অবিরোধ স্থাপিত হয়।

এইরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যও "বৃহৎ শব্দ বাচ্যের অভাব প্রতিপাদক নহে।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের "এক" শব্দটী জগদুৎপাদন-স্বরূপ ব্রহ্মের একত্ববোধক অর্থাৎ বহুল পরমাণু দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত এক ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান; এতদ্দ্বারা ব্রহ্মশক্তির অভ্যুপগম হইয়াছে। সুতরাং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বাক্যেও ইদং বা ব্রহ্মশক্তি ধ্বনিত হইয়াছে। অদ্বিতীয় শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের স্বীয় শক্তিই ব্যঞ্জিত হয়। ঘট-নির্ম্মাণে যেমন কুলাল মৃত্তিকাদির প্রয়োজন, জগৎ নির্ম্মাণে ব্রহ্ম তেমন অপর কোন বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের মধ্যে যে একটা "এব" শব্দের প্রয়োগ আছে, ব্রহ্মের পক্ষে তাদৃশ ব্যাপারের অসম্ভব-নিবৃত্তি নিমিত্তই উক্ত "এব" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধে যে উপাধিত্ব-প্রত্যয় শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, উহা বহিরঙ্গা-শক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে। তাঁহার পরাশক্তি উপাধিবর্জ্জিত; উহা দ্বারা ব্রহ্ম যে অক্ষয়, তাহাই অধিগম্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে যে নির্গুণ অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রাকৃত হেয় গুণাদিকেই প্রতিষিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্বও বিভুত্বাদি কল্যাণ গুণ-যোগই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন :— "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্ ইত্যাদি।

নির্গুণ নিরঞ্জন ইত্যাদি পদদ্বারা তাঁহার প্রাকৃত হেয় গুণ বিষয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নঞ প্রত্যয়ের দ্বারা যদি ব্রহ্মের সকল প্রকার গুণই নিষিদ্ধ হয়, তাহাহইলে যে, নির্ব্বিশেষবাদিগণের স্বীয় সিদ্ধান্তিত নিত্যাদি গুণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু জ্ঞানমাত্র-

বাদিগণও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতা স্বীকার করেন। যদি ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলেই নির্ব্বিশেষত্ববাদ চূর্ণীকৃত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মকে কেবল আনন্দস্বরূপ বলিলেও সেইরূপ নির্ব্বিশেষত্ব-বাদ নিরস্ত হয়। এমন কি বৃহৎ বোধক ব্রহ্ম শব্দটী পর্য্যন্ত নির্ব্বিশেষত্বের বিরোধী। বৃংহণ হইতেই ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং উহাতেও ব্রহ্মকে সবিশেষে পরিণত করিতেছে। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুতিও সবিশেষত্ব প্রতিপাদক। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব ও অনন্তত্বের প্রতিপাদক। এইরূপ অর্থ দ্বারাই "ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থসামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদে এই সকল শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনীতে এইরূপ বহুল যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। স্বরূপ শক্তি স্বীকার না করিলে দ্বৈতবাদ মানিতে হয়। নির্ব্বিশেষবাদীরা দ্বৈত-বাদ স্বীকার করেন না। আমরাও দ্বৈতবাদ স্বীকার করি না। শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী বটে। গুরুপ্রণালিকানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের স্রষ্টা। যেখানে দ্বৈতভাব প্রতি-ভাত হয়, সেখানে একে অপরকে দেখে, কিন্তু শ্রুতি বলেন—"সর্ব্বং আত্মৈব অভূৎ, তৎকেন কং পশ্যেৎ" অর্থাৎ সকলই এক আত্মস্বরূপ, সুতরাং কে কাহার দ্রষ্টা হইবে? অপিচ "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" এই সকল শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জীব ও জগৎ অস্বীকৃত হয় নাই। জীব ও মায়া তাঁহারই শক্তি, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য, সকলই

তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত, সকলই তদাত্মক, সুতরাং তদতিরিক্ত নানাত্ব অস্বীকার্য্য, এইজন্য অভেদবাদই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অভেদবাদ সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। কেন না শ্রুতি বলেন—"অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-ভেদ অস্বীকৃত হইয়াছে। অপিচ আরও শ্রুতি এই যে "বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি" এই শ্রুতিও অগ্রাহ্য নহে। কিন্তু ইহাতে ভেদবাদ ঘটে। যিনি নির্বিকার তিনি বহু হন কি প্রকারে? সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে এ শ্রুতিও দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, নিত্য নির্ব্বিকার বস্তু অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা কার্য্যভাবভেদ অঙ্গীকার করেন। ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ইহার সদর্থ হয় না। এইরূপ সদ্ ব্যাখ্যাই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্মত। যদি বল "নানা" অপরমার্থবিষয়া, কিন্তু তাহাও বলিতে পার না, কেন না ব্রহ্মের নানাত্ব প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনবগত। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই নানাত্ব একবার প্রতিপাদন করিয়া আবার প্রতিষেধ-বাক্য দ্বারা এই সকল নানাত্বের প্রতিষেধ করা প্রকৃত পক্ষেই উপহাস্য।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে "ইহ" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মণি"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় যাহা কিছু জানা যায় তৎসমুদায় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নহে, তৎসকলই ব্রহ্মের স্বরূপাত্মক। নানা শব্দের এইরূপ অর্থ না করিলে এই শব্দটীর প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া উঠে। সুতরাং জীব, জগৎ ও মায়া এই সকল "বহু" বা "নানা" হইলেও ইহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে এবং ইহাদের অস্তিত্বও মিথ্যা বা ইন্দ্রজালবৎ অলীক নহে।

নির্ব্বিশেষবাদীরা ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটীকে নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করেন যথা :—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা।

অথ অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।

এই শ্রুতির "নান্যৎ পশ্যতি" বাক্যের অর্থ এই কেবল তিনিই একমাত্র দর্শনীয়। ইহাতে ব্রহ্মের রূপত্ব সিদ্ধ হইল। "নান্যং শৃণোতি" ইহার অর্থ তিনি ভিন্ন আর শ্রাব্য নাই। ইহাতে তাঁহার শব্দবত্ত্ব সিদ্ধ হইল। এই উপলক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের স্পর্শাদিমত্ত্বও বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন :—"সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যায় যে বহিরিন্দ্রিয়েও ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। "নান্যদ্ বিজানাতি" বাক্যের অর্থে বুঝা যায় যে অন্তঃকরণেও তিনি স্ফুরিত হয়েন। অন্যদর্শনাদির নিষেধ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্তত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে। এই নিখিল জগৎ তাঁহারই বিভূতির অন্তর্গত। শুদ্ধচিত্তে জগৎও তাঁহারই বিভূতিরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাদৃশ তত্ত্বদর্শীর নিকট জগতের দুঃখ-প্রদত্বও অনুভূত হয় না। তাই উক্ত হইয়াছে :—

"ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষেও ইহাই বলা হইয়াছে :—

স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দ স্বরাড় ভবতি, সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই ব্রহ্ম সবিশেষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ফলতঃ শ্রুতির সর্ব্বত্রই এইরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

"সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি শ্রুতিঃ।

বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের পরমতত্ত্ব—প্রেমময় শ্রীভগবান্। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বেদসংহিতার মন্ত্রভাগেও ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার প্রমাণ পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও পুরাণে সবিস্তারে শ্রীকৃষ্ণের অশেষকল্যাণ-গুণময়ত্বের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ অতি [illegible] যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন

করিয়াছেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এক শ্রেণীর সাধক, সাধনাবশে কেবল মাত্র নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব চিন্তা করিয়া থাকেন কিন্তু সাধনার বিকাশে ও পরিস্ফুটতায় জানা যায়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি কেবল জ্ঞান নন, তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময়, অনন্ত কল্যাণ গুণময়। তিনি নির্ব্বিশেষ চিদেকমাত্র নহেন—তিনি "রস বৈ সঃ" তিনি অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি। তিনি মধুময় ও আনন্দময়, শুধু ইহাই নহে তৎসৃষ্ট জীবদলের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তিনি নিরন্তর প্রস্তুত। সুতরাং তিনি অশেষ কৃপাময়। জীবের আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগ, তাহার দুঃখের রোদন ও হৃদয়ের আবেগ সেই নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিকে স্পর্শ করে। তাহার সকরুণ ব্যাকুল আর্ত্তনাদ তাঁহাকে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে তাঁহার কোমল করুণ কৃপার ছবি সময়ে সময়ে উজ্জ্বল বা ক্ষীণভাবে প্রতিফলিত হয়। জীব ব্যাকুল ভাবে কাতর প্রাণে তাঁহাকে যখন ডাকে, তখন তিনি নীরবে নীরবে প্রতি ডাকেই সাড়া দেন। নিরাশা ও বিষাদের ঘন জমাট আঁধারে মানুষের হৃদয় যখন সমাচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে সেই অবস্থায় মানুষ যখন কাতর প্রাণে তাঁহার শ্রীচরণের পানে দৃষ্টিপাত করে, তখন সহসা কি-জানি-কেমন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তাঁহার চরণের নখচ্ছটা হইতে বিমল জ্যোৎস্নার তরল কিরণ তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া সে আঁধার হৃদয় উজলিয়া তোলে, তাহাতে তখন ঝলকে ঝলকে অলৌকিক আনন্দ উথলিয়া উঠে। বিষাদের অশ্রুলহরী শুকাইতে না শুকাইতেই অতুল আনন্দের রক্তরাগে মানুষের বিষণ্ণ বদনখানি সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে। জীবের সহিত শ্রীভগবানের এই মধুর সম্বন্ধ কেমন ঘনিষ্ঠ, বৈষ্ণব দর্শনের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মায়াবাদীর কেবল জ্ঞা[illegible]ই সম্বল। তিনি মুখে আনন্দের কথা বলিয়া থাকেন, উঃ নিগ[illegible]গণ স্থানে স্থানে তাঁহাকে যে আনন্দ

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মায়াবাদী শুষ্কমুখে কেবল তাহারই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সেই আনন্দামৃতের রসাস্বাদনে চিরবিভোর ও চিরলালায়িত। সেই আনন্দতত্ত্ব কেবল তাহারই প্রতিধ্বনি করেন। সেই আনন্দতত্ত্ব কেবল তাঁহাদের তর্কযুক্তির গোচর নহেন, তিনি তাঁহাদের নিত্য আস্বাদনের বিষয়। বৈষ্ণবগণ কেবল এই আনন্দময়কে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করেন না, এই পরমতত্ত্ব তাঁহাদের সাধনার চরম অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন।

তাঁহারা তখন নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই আনন্দময় মধুরচ্ছটা-সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে যে কিরণরাশি তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সমক্ষে বিস্ফুরিত হয়, তাহা তাঁহারা সেই আনন্দময়ের মাধুর্য্যচ্ছটা বলিয়াই মনে করেন। বায়ু, তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহাদের নিকট চিরমধুময়ের মাধুর্য্য বহন করিয়া আনে, সিন্ধুর লহরে লহরে তাঁহারা অনন্ত মাধুর্য্য সিন্ধুর তরঙ্গ লহরী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হয়েন। উদ্ভিজ্জগৎ সেই আনন্দময়ের কোটী কোটী বিচিত্র সংবাদ তাঁহাদের নিকট আনয়ন করে, উষার কনকরাগে পূর্ব্বভাগ যখন অনুরঞ্জিত হয় সেই তরুণ অরুণ আলোকের সংস্পর্শে সুপ্ত জগৎ যখন জাগিয়া উঠে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যখন নবজীবন লাভ করে, বৈষ্ণব সাধক, প্রতি উষায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই মাধুর্য্য-সিন্ধুর আনন্দলীলা-সন্দর্শনে অনন্ত রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। আবার ঘোর নিশীথে বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে, আবার গাঢ় আঁধারে গিরি, নদী, বন, উপবন যখন প্রচ্ছন্ন হইয়া যায় তখনও তাঁহারা তাঁহাদের চিরসুহৃদ রসিকশেখর কালাচাঁদের মোহন মধুর বাঁশরী-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে বিবশ হইয়া পড়েন। জগৎজোড়া এমন আনন্দের ভাব এমন করিয়া দেখিতে জানেন,—কেবল বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব দার্শনিক।

আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবের দর্শনে ও বৈষ্ণবের কাব্যে বুঝি কোন সীমান্ত রেখা নির্দ্দিষ্ট নাই। বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব দার্শনিক,—একই কথা। বৈষ্ণবের কাব্য সূক্ষ্মতম মহাদর্শন শাস্ত্র। আবার বৈষ্ণবের দর্শন শাস্ত্র বিশাল বিপুল অনন্ত মধুর মহাকাব্য-বিশেষ। মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য, এই কাব্য ও দর্শনের প্রাণস্বরূপ। বেদ বেদান্ত যাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পরম তত্ত্ব যখন মানুষের সাধনার চরম সীমায় প্রতিভাত হয়েন, তখন তিনি কেবল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও আনন্দের আকারে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে "আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সরস্বতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া বুঝিয়াছিলেন, লোকে যাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপধারী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করে, তিনি আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ এবং মহাপ্রেমরসপ্রদ। ধ্যানমজ্জিত শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য-সিন্ধুতে মগ্ন হইয়া গাইলেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধু-গন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"

পরম তত্ত্ববিৎ শ্রীরায় রামানন্দ দেখিয়াছিলেন এই পরম তত্ত্ব রসরাজ মহাভাব 'দুইয়ে একরূপ'। ইহার উপরে আর কেহ এই পরম তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ অনুভব ও আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

জগৎপ্রসবিনী শক্তিই বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি নামে অভিহিতা। সংস্কৃত ভাষায় মায়া শব্দটী অতি প্রাচীন, এবং বহু স্থানে বহু অর্থে এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বৈয়াকরণগণ বহু অর্থে এই শব্দটার ব্যুৎপত্তি-সাধন-প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

১। মীয়তে অপরোক্ষবৎ প্রদর্শ্যতে অনয়া ইতি। মা+"মাচ্ছাস-সিস্থভ্যো যঃ" উণাদি ৪০।৯ ইতি যঃ টাপ্।

এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধনে ইহার অর্থ ইন্দ্রজালাদি। অমরকোষ অনুসারে ইহার অপর পর্য্যায় শাম্বরী। অভিধানিক জটাধর মায়ার কতকগুলি পর্য্যায় শব্দের উল্লেখ করেন তদ্‌যথা :—ইন্দ্রজালি, কুহক, কুসৃতি, শাম্বরি।

২। মাতি বিশ্বমস্যাং মনীষাদিঃ।

এই ব্যুৎপত্তিক্রমে বিশ্বপ্রসূতি, বিশ্ববিধারিণী ও বিশ্বসংহারিণী শক্তি মায়া শব্দের বাচ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে।

৩। মীমিতে জানাতি সংখ্যাত্যনয়েতি (মা+যঃ টাপ্)

এই ব্যুৎপত্তিক্রমে মায়া শব্দের প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞান অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঋগ্বেদ সংহিতাতে প্রজ্ঞা-অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মেদিনী অভিধানে মায়া শব্দ বুদ্ধি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অভিধানকার জৈন হেমচন্দ্রের অভিধানে মায়া শব্দের কৃপা ও দম্ভ অর্থ ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মায়া অর্থ শঠতা তদ্‌যথা :—

"মায়া তু শঠতা শাঠ্যং কুসৃতির্নিকৃতিশ্চ সা।"

ক্ষুদ্রোপায়ও মায়া বলিয়া অভিহিত হয়, যথা :—

"মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে ত্রয়ঃ।"

ঋগ্বেদে শক্তি ও সামর্থ্য অর্থেও মায়া শব্দের প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—"দাসানামিন্দ্রোমায়য়া।" ৪।৩০।২১

সায়ণ ভাষ্যে এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা :—"মায়য়া—স্বকীয়া শক্ত্যা।"

ঋগ্বেদের কয়েকটী স্থান হইতে মায়া শব্দের প্রয়োগ ও উহার অর্থের করা যাইতেছে :—

১। মায়াভিরিন্দ্রং মায়িনং ত্বং শুষ্ণমাভিরঃ।

এস্থলে ইন্দ্রকে "মায়িনং" বলা হইয়াছে। সায়ণ তদীয় ভাষ্যে "মায়িনং" পদের অর্থে "নানাবিধ কপটোপেতং" এবং "মায়াভি" পদের অর্থে "কপটবিশেষৈঃ" লিখিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ৪ ঋকে, ৮০ সূক্তের ৭ ঋকে, এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের ১১ সূক্তের ১০ম ঋকেও এইরূপ মায়া শব্দের উল্লেখ আছে। কপট বঞ্চনা, ছল ছদ্মভাব প্রভৃতি অর্থে এই সকল ঋকে মায়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭ সূক্তের পঞ্চম ঋকে প্রজ্ঞা অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্যথা :—"অস্তভাং মায়য়া দ্যাং অবগ্রহসঃ।" এস্থলে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন :—"মায়য়া প্রজ্ঞয়োপায়েন।" দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১৬ ঋকে লিখিত আছে :—"মা বো মায়া অভিদ্রুহে।" আবার তৃতীয় মণ্ডলের ২৭।৭ ঋকেও মায়া শব্দের উল্লেখ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের ৬০ সূক্তের প্রথম ঋকেও মায়া শব্দের উল্লেখ আছে।

২। "মহীমিত্রস্য বরুণস্য মায়া" ৬১।৭ ঋক্। এই ঋকটিও তৃতীয় মণ্ডলে দ্রষ্টব্য। চতুর্থ মণ্ডলে ৩০ সূক্তে ১২ এবং ২১ ঋকে মায়া শব্দের উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলে ২ সূক্তে ৯ ঋকে লিখিত আছে :—"প্রাদেবী র্মায়া সহতে।" এখানেও আসুরী মায়া অর্থাৎ ছলনা অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

এই মণ্ডলের ৬৩ সূক্ত ৩ ঋকে, ৭৮ সূক্ত ৬ ঋকে, ৮৫ সূক্তে ৫ এবং ৬ ঋকে, ৮ মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১৫ ঋকে এবং দশম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৯ম ঋকে মায়া শব্দের উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদেও ১২।১।৮, ১৩।২।৩ এবং ৮।১০।২২ মন্ত্রেও মায়া শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বাজসনেয় সংহিতার ১৩।৪৪, ২৩।৫২, ৩০।৭ মন্ত্রেও মায়া শব্দ দেখিতে পাওয়াযায়। অর্থ সম্বন্ধে আর কোনও বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইল না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৬।৩৬ ও ৮।২৩ মন্ত্রেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।১০, এবং ৮।২ মন্ত্রেও মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ২।৪,২।৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। "কাং চিন্ময়াং কুণ্যাং ইত্যাদি।" "তানিন্দ্রঃ কয়াচন মায়য়াহন্ধঃ নাশংস।" এই মন্ত্রও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে এতদ্ব্যতীত উহার আরও অনেক স্থানে এই শব্দটি রহিয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে ১।১৬ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়া শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশীতে মায়া ও শক্তি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আছে।

বৈদিক গ্রন্থের বিবিধ স্থানে এইরূপ মায়া শব্দের উল্লেখ আছে। এই সকল স্থলের কোন কোন স্থানে মায়া শব্দটী শক্তি ও সামর্থ্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থলবিশেষে বৈদিক গ্রন্থে মায়া শব্দে দম্ভ ও কৃপা অর্থও প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে ইহার প্রয়োগরূপ প্রদর্শন করিয়া মায়া শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে।

মায়াকে প্রকৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ও পঞ্চদশীতে লিখিত আছে :—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

শ্রীচণ্ডীতে মহামায়াদেবীকে ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন :—

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী"

এখানে সাক্ষাৎ মহামায়া দেবীই প্রকৃতি,—'প্রকর্ষেণ করোতি বিশ্ব-সৃষ্টিমিতি।" যিনি প্রকৃষ্টরূপে বিশ্ব রচনা করেন তিনিই প্রকৃতি। ইনি আবার শ্রীহরির মহামায়া শক্তি। শ্রীচণ্ডী আবার বলেন,—"সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" ইনি বিশ্ব-প্রসবিত্রী,—হারবার্ট স্পেন্সারের সেই "Mysterious Force". শ্রীভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন, আমার প্রকৃতি দ্বিবিধ,—পরা ও অপরা। পঞ্চভূত মন বুদ্ধি বা অহঙ্কার— আমার অপরা প্রকৃতি এবং জীব আমার পরা প্রকৃতি।

প্রকৃতি হইতেছেন মায়া, মায়া আবার ভগবানেরই শক্তি, কেবল যে এই মায়া বহিরঙ্গা শক্তি তাহাও নহেন, ইনি অন্তরঙ্গা শক্তিও বটেন। সুতরাং জীবমায়া ও জড়মায়া, সুতরাং মায়ারও দুই বিভাগ হইতে পারে। এই মায়া বিশ্বের যেমন উপাদান-কারণ, তেমনি নিমিত্ত-কারণ ;—পরমাত্ম সন্দর্ভে ইহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

মায়া যে কত অর্থে এবং কতভাবে পুরাণাদিতে ও দর্শনাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। আমার লিখিত পাঞ্চজন্য মাসিক পত্রের 'শরতে শারদা' প্রবন্ধ হইতেও এ সম্বন্ধে এস্থলে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে :—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ।

বেদবেদান্তের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এখানে যাহা বলা হইল, পুরাণে সেই মহাসত্য অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতি-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির নাম ও ধাম অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বহুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীমৎ শ্রীজীব গোস্বামি মহাশয় তদীয় সন্দর্ভগ্রন্থে ভগবৎশক্তি সম্বন্ধে যে সুবিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তত্ত্ববিচারতঃ শাক্ত বৈষ্ণবের মূল বিষয়ে ভেদবুদ্ধি বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরীষ্যতে॥

এই শ্লোকে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ তিরস্কৃত করিয়া ভগবত্তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। শ্রীজীবের সন্দর্ভগ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণ এ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন।

শ্রীপাদ শ্রীজীব সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণের আরও দুইটী শ্লোক লইয়া অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে শ্লোক দুইটী এই :—

১। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর।

২। যাতীতা গোচরাবাচাং মনসাং চাবিশেষণা
জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্।

এই স্থলে অপরা ও পরা নামে ভগবৎশক্তির দুই প্রকার বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। সর্ব্ব-সম্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীপাদ জীব ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, হে সর্ব্বাত্মন্ তোমার চিৎ শক্তি হইতে অপরা যে শক্তি আছে যাহা বহিরঙ্গা, জীবমায়া বা মায়া প্রভৃতি নামে খ্যাত, যাহা সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বজীবে বিদ্যমানা, সেই গুণাশ্রয়া শক্তিকে নমস্কার। তাঁহা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যেন সুদূরে থাকা যায়, তিনি যেন এই কৃপা করেন, এই জন্য তৎপ্রতি নমস্কার। জড়প্রকৃতি সত্বাদিগুণের আশ্রয়স্বরূপিণী। ঊর্ণনাভ যেমন চাকচিক্য দেখাইয়া কীট-দিগকে আবদ্ধ করে এই গুণাশ্রয়া মায়া শক্তি জীবদিগকে তেমনই আবদ্ধ করেন। সুতরাং পূর্ব্বেই অনুনয়-প্রদর্শনার্থে ইহার প্রতি নমস্কার করিতেছি। কিন্তু তোমার অন্তরঙ্গা পরমেশ্বরী শক্তি যাহা চিৎ শক্তি বা আত্মমায়া নামে প্রসিদ্ধা তাহার অনুসরণার্থই তাঁহার বন্দনা করি, যেহেতু তিনি জ্ঞানি-জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা।" এই পদের বহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইনি বিদ্যাস্বরূপিণী, স্বরূপশক্তি, এবং মুক্তি-ভক্তি প্রদায়িনী। ইনিই অশেষ কল্যাণগুণগণের জনয়িত্রী। শ্রীমাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিদ্বারা জানা যায় ইনি নিত্যানন্দা ও নিত্যরূপা। ইনি শ্রীচণ্ডীর মহাবিদ্যা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরাশক্তি—তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রের চিৎশক্তি যোগমায়া :---

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

চিংশক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে
সা সত্যেব পরা জড়াভগবতঃ শক্তিস্তবিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চনিখন্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তে।
তচ্ছক্ত্যাসাবিকারয়া ভগবতশ্চিৎশক্তিরুদ্দিশ্যতে।

এখন একটুকু বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে। বেদান্তে মায়া, প্রকৃতি, মহামায়া, যোগমায়া, আত্মমায়া এইরূপ অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার, তাহাতেও এই সকল পদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় ষট্ সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্বভগবৎ ও পরমাত্ম সন্দতে এই মায়াদির প্রতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরাণ। আমাদের আলোচনা বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কি প্রকার, তাহার উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনেকেই মনে করেন বৈষ্ণবেরা শক্তিপূজার বিরোধী। এ ধারণা অমূলক। বৈষ্ণবমাত্রেই শক্তিবাদী। বৈষ্ণবদর্শন শক্তিতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব বেদান্ত নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের পক্ষপাতী নহেন—যেহেতু 'শক্তিবর্গতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং চিদেকরূপমেব ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিলে শক্তিবর্গ এবং উহাদের ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কেবল চিদেক রূপই বুঝায়। বৈষ্ণবগণ এই ব্রহ্মকে উপাসকবিশেষের একটী চিৎস্ফুরণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। শ্রীভগবান্ই ভজনীয় গুণসম্পন্ন এবং তিনি অনন্ত শক্তির সমাশ্রয়। অনন্ত শক্তি সমূহের মধ্যে যে শক্তি অন্তরঙ্গা পরা বা বিশুদ্ধ-চিৎশক্তি, বৈষ্ণবগণ তাঁহার উপাসক। শ্রীনারদপঞ্চ রাত্রের শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদে এই পরাশক্তিই শ্রীদুর্গা নামে অভিহিত হইয়াছেন যথা :—

জানাত্যেকা পরাকান্তং সৈবদুর্গাতদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥

যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়াস্মলভো জ্ঞেয়ঃ আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত হইয়াছে—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি॥

এই শ্লোকের অর্থ-বিচারে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়াদির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই শ্লোকে যে মায়া শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মায়া-শব্দের অর্থ কি? শ্লোকটীতে দেখা যায় ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াশক্তি প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া নানা কার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভূত হইবেন। এই মায়ার পরিচয়ার্থ বলা হইয়াছে যাহা দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়। এই শ্লোকে যে "অংশেন" পদটী আছে তাহার কোন ব্যাখ্যা এই অনুবাদে হইল না। এ পদটী এখন হাতে রহিল। ব্যাখ্যায় সে প্রয়োজন প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীধরস্বামী কেবল "কার্য্যার্থে" এই পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, দেবকী গর্ভসঙ্কর্ষণ ও যশোদা স্থাপনাদি কার্য্য ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে। ইনি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।

এই শ্লোকটী লইয়া একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে পারে। এস্থলে তাহার সূচনা দেখাইতেছি। এইটী প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক। প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে আদিষ্টা হইয়া মায়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, এই শ্লোকে তাহাই জানা গেল। সেই আদেশটী কি তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্ যথা—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজ নাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতং।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে ॥
অন্যাশ্চ কংস-সংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকং
তং সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয়।
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।

ইহাই হইতেছে—আদেশ। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে প্রথম অধ্যায়ে যে মায়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনি যোগমায়া। যশোদার গর্ভে যোগমায়া দেবীই জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অন্যত্রও (১০।৩।৪৭) দেখা যায়—'যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া'। আবার শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে—অদৃশ্যতানুজাবিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।' এখানেও অষ্টভুজা দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ইহার কয়েক ছত্র পরেই—

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভুব হ।

ইহাতে মনে হয়, শ্রীভাগবতে মায়া ও যোগমায়া শব্দটী বিশেষ কোন পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু এই দুই পদের অর্থ একরূপ নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন অর্থে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীতে যিনি দুর্গা, মহামায়া, অম্বিকা, চণ্ডী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনিই "নন্দগোপগৃহে জাতা, যশোদাগর্ভসম্ভবা" বলিয়া চণ্ডীর উপসংহারে পরিচিতা হইয়াছেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম চার অধ্যায়ে যে মায়া বা যোগমায়ার কথা বলা হইয়াছে—তিনিও চণ্ডীর সেই মহামায়া।

"ভগবান্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি
যান্ ভবান্ ব্রবীতি———ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভকে রোহিণীর উদরে সন্নিবিষ্ট করেন। সুতরাং প্রাগুক্ত মায়া শব্দের অর্থ যোগমায়া।

ইহার পরে শ্রীভগবান্ এই যোগমায়া দেবীকে আরও বলিতেছেন:—

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীং।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদাচণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

"হে দেবি তুমি সর্ব্বকামপ্রদা সর্ব্বকামবরেশ্বরী। তোমাকে মানুষেরা নানা প্রকার উপহার-বলি দ্বারা পূজা করিবে। তুমি নানা স্থানে নানা নামে পূজিত হইবে।" যে কয়েকটী নাম উল্লিখিত হইল, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়ধ্বজ তৎসমূহের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা—(১) ইহাঁকে জানা বড় কঠিন (Mysterious) এইজন্য ইঁহার নাম—দুর্গা; (২) ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলা লীলা যাঁহার—এইজন্য ভদ্রকালী—(৩) সর্ব্ব-দেশকে পরাজিত করেন বলিয়া—বিজয়া; (৪) ইনি বিষ্ণুশক্তি—এইজন্য বৈষ্ণবী; (৫) কুশব্দের অর্থ ভূমি—ইনি মর্ত্তধামে আনন্দ পান বলিয়া কুমুদা; (৬) শত্রুর প্রতি কোপ করেন বলিয়া চণ্ডী; (৭) সদানন্দা বলিয়া কৃষ্ণা; (৮) মধুকুলোৎপন্না বলিয়া মাধবী; অথবা মাধব প্রিয়া বলিয়া মাধবী (৯) সুখদান করেন বলিয়া কন্যা (কং সুখং নয়তীতি) অথবা নিত্য কুমারী; (১০) মীয়তে জ্ঞায়সে অর্থাৎ জানা যায় বলিয়া মায়া; (১১) নর সমূহের আশ্রয় বলিয়া নারায়ণী (১২) সকলের ইষ্টা—ঈশানী; (১৩) শীর্যতে ইতি শারঃ, তং সংসারং দ্যতি খণ্ডয়তি অর্থাৎ ইনি সংসারদুঃখ-

শয় করেন বলিয়া **শাকম্ভরী**; (৪) সকলের মাতা এইজন্য অম্বিকা।"

ইনি কোন্ স্থানে কোন্ নামে প্রসিদ্ধা শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্য তদীয় সুবোধিনী টীকায় তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন যথাঃ—কাশীতে দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী ও মহালক্ষ্মী কুহলাপুরে, চণ্ডিকা কামরূপে, মায়া শারদা উত্তরদেশে, অম্বিকা অম্বিকাবনে, কন্যকা কন্যা কুমারীতে ইত্যাদি আরও বহুস্থানে ইনি বহুনামে বিরাজিতা।

শ্রীপাদ সনাতন "যোগমায়া" পদের বহু ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথাঃ— যোগ শব্দের অর্থ ভগবৎশক্তি বিশেষ। শ্রীভগবানের এই শক্তিবিশেষ ব্রহ্মাদি দেবগণকেও মোহিত করেন বলিয়া ইনি যোগমায়া নামে। প্রসিদ্ধা। এই যোগমায়া জীবকারণ-শক্তি (Cosmo-psychical Force) অপেক্ষায় পরাবস্থায় স্থিতা বলিয়া ইহার অপর নাম "একানংশা"।

আমাদের সাধারণ দর্শন শাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে মায়া-শব্দটী লইয়া সবিশেষ ভ্রান্তির উদয় হইয়া থাকে।, এক শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতে পাই মায়া শব্দটী কত রকম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। ইন্দ্রজাল, কৃপা, দম্ভ—প্রভৃতি মায়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়।

২। ইহার উপরে—মায়া যে অবিদ্যার বৃত্তি, তাহা তো সকলেই জানেন; এই মায়া অজ্ঞান শব্দেরও একটী পর্য্যায়।

৩। মায়া—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ (শ্বেতাশ্বতর)

৪। ইতি পরমেশ্বরের জগন্নির্ম্মাণকারিণী বিচিত্রশক্তি (Cosmo-physical Energy)।

মায়ার কথা কত বলিব? মায়ার কার্য্য যেমন অনন্ত—মায়া এক হইয়াও যেমন অনন্ত বস্তুর প্রসূতি, মায়া শব্দটীর অর্থও

তেমনই ইন্দ্রজালের মত। দর্শনে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণে এ শব্দটী যে কত প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে মায়া শব্দটীর বহুল অর্থে প্রয়োগ দেখিয়া একেবারেই বিহ্বল হইতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকা সত্ত্বেও মহর্ষি বেদব্যাস মায়া শব্দটীর এমন বহুল বিচিত্র প্রয়োগ করিয়া পাঠকদিগের মস্তিষ্কে মায়ার ইন্দ্রজাল জারি করিলেন কেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের সূক্ষ্ম বুদ্ধিও এই মায়া শব্দের অতি বিচিত্র বিপ্রতিপত্তিসূচক বহু অর্থ দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিল। কেবল তিনি নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীব্যক্তিগণও এই অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবকৃত পরমাত্ম সন্দর্ভে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া, যথা :—

তত্র নানাভিন্নতাজনিতভ্রান্তিহানায় সংগ্রহ শ্লোকাঃ—

মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচ সা স্মৃতাঃ।
প্রধানেঽপি ক্বচিদ্দৃষ্টা তদ্বৃত্তিমোহিনী চ সা॥
আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতিশ্চিচ্ছক্তি স্বন্তরঙ্গিকা।
শুদ্ধে জীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীর্য্যয়োঃ॥
চিন্মায়া শক্তি বৃত্ত্যোস্ত বিদ্যাশক্তিরুদীর্য্যতে।
চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়সমাস্মৃতা॥
প্রধানাব্যাকৃতাব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌ পরম্।
ন মায়ায়াং ন চিৎশক্তাবিত্যাহাহুর্বিবেকিভিঃ॥

অর্থাৎ মায়াশব্দটী কথনও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে কথনও বা বহিরঙ্গা শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কথন কথন প্রধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার কথনও বা প্রধানের যে বৃত্তিদ্বারা জীব সকল মোহিত হয় তাহাকেও মায়া বলা হয়। চিৎশক্তি অন্তরঙ্গা শক্তিনামে প্রসিদ্ধা। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি শুদ্ধজীবে দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও

বীর্য্য বুঝাইতে চিন্ময়ী শক্তির বৃত্তিদ্বয়কে বুঝায়। উহারা বিদ্যাশক্তি নামে খ্যাত। মায়ার চিৎশক্তি বৃত্তি যোগমায়া নামে খ্যাত। প্রধান শব্দে এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিটিকে মায়াশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষার একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ, প্রকরণ, লক্ষণ, ঔচিত্য, দেশ ও কাল প্রভৃতির বিচারে শব্দার্থ নিরূপিত হইয়া থাকে। এমন যে ব্রহ্মন্ শব্দ—তাহাও কোথাও নির্গুণ ব্রহ্ম, কোথাও সগুণ ব্রহ্ম, কোথাও বেদ, কোথাও বা একবারেই জড়া প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মন্ শব্দটীও সেইরূপ –কোথাও বা পরব্রহ্ম, কোথাও বা সগুণ ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও জীবাত্মা, কোথাও চিত্ত, কোথাও মন, কোথাও বা একবারেই দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মায়া শব্দটীরও সেইরূপ বহু অর্থ,—কোথায় ছল, প্রতারণা—কোথায় বা দয়া, আর কোথায় একেবারেই ভগবানের চিৎশক্তি; আবার কোথাও বা জড়প্রকৃতি, অজ্ঞান, অবিদ্যা:—একেবারেই বিপরীত! জীবমায়া গুণমায়া, যোগমায়া, মহামায়া প্রভৃতি শব্দবিশেষের যোগে অর্থের যে অত্যন্ত ভিন্নতা হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। এ সম্বন্ধে লিখিতে হইলে বৃহদাকারের একটা সন্দর্ভ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। এবিষয়ে অধিকতর আলোচনা স্থানান্তরে করা যাইবে।

এখন বৈষ্ণবগণের মায়াতত্ত্বের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীশারদা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। 'বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী' ইত্যাদি শ্লোকটীর যে সবিশেষ বিচারের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এখন তাহার অনুসরণ করিতেছি। বৈষ্ণব তোষণী-টীকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:—বিষ্ণু শব্দের অর্থ বিশ্বব্যাপী ভগবান্। তাঁহার মায়াখ্যা শক্তি ভগবতী—সর্ব্বশক্তিযুক্তা। শক্তিযুক্তা বলিলেই তাঁহার কার্য্য দেখাইতে হয়। কার্য্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় হয়। সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে, তাহাদের পরিজ্ঞাত বস্তুর

উল্লেখ করিতে হয়। মায়া বলিলে সাধারণতঃ লোকে ইহাই বুঝে, যাহাদ্বারা জগৎ মোহিত হয়, তাহাই মায়া। চণ্ডীর মেধা ঋষিও ইহা বলিয়াই মহামায়ার পরিচয় দিয়াছিলেন যথা :—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃকার্য্যোযোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমুহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ মহামায়ার কার্য্যে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা মহামায়াস্বরূপিণী। শ্রীভাগবতেও পুনঃ পুনঃ যোগনিদ্রা পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মহামায়া জগৎ সংমোহিত হয়। সেই ভগবতী মহামায়া দেবী জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্ব্বক মোহমুগ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত একই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু জীবমোহ কার্য্যটি চিৎশক্তির কার্য্যের বিপরীত। চিৎশক্তি চৈতন্য-প্রদায়িনী—জ্ঞানদায়িনী। একই শক্তির বিপরীত ক্রিয়া;—অচিন্ত্য ব্যাপার! অচিন্ত্য হইলেও অসম্ভব নয়—অপ্রাকৃতও নয়। জার্ম্মেন ডাক্তার হ্যানিম্যানের Similia Similibus Curanter বা সমঃ সমং শময়তি সিদ্ধান্ত স্মরণ কর। ইপিকাকের স্থূল মাত্রায় বমি উৎপাদন করে, সূক্ষ্মমাত্রায় বমি প্রশমন করে। মায়া সম্বন্ধেও সেই কথা। স্থূল মায়া অথবা মায়ার জড়ীয় অংশ মোহ উৎপাদন করে কিন্তু উহারই পরাবস্থা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গমায়া বা চিৎশক্তি কিম্বা যোগমায়া জীবের মোহ অপসারণ করিয়া ভগবদুন্মুখ করেন। উহা স্থূল মায়াই সূক্ষ্মাবস্থা বা পরাবস্থা। তাই বৈষ্ণব তোষিণী টীকাকার বলিয়াছেন—"চিৎশক্তি ব্যবর্ত্তিতা"। মায়ার যে অংশ জীব মোহিত করেন, তাহা চিৎশক্তি-সম্বন্ধবিবর্জ্জিতা। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির স্থূলাবস্থা কখনই ভগবানের চিন্ময়পরিকর যশোদাদির মোহ জন্মাইতে সমর্থ নহেন। উহা স্থূল মায়ার

কার্য্য নহে—ভগবতী যোগমায়ার কার্য্য। "কার্য্যার্থ" পদের অর্থ দেবকী গর্ভ-সঙ্কর্ষণ ও যশোদাস্থাপনাদি। শ্রীধরী ব্যাখ্যার সহিত তোষণী ব্যাখ্যার এই অংশে মিল আছে। "অংশেন" পদের অর্থ করা হইয়াছে "ভগবদংশেন" সুতরাং হরির মায়া হরিরই অংশ। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই মায়াদেবী তদাদিষ্ট হইয়া যশোদাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহাই শ্রীপাদ সনাতনের টীকার মর্ম্ম।

কিন্তু ইহা লইয়া তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন - সূক্ষ্ম প্রতিভাশালী শ্রীভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয়। তাঁহার বিবিধ বিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যানের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যেঃ—স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং অন্যান্য ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী কংসাদির মোহনের জন্য ভগবান্ যোগমায়া ও মায়াকে অবতারিত হইতে আদেশ করেন। শুধু বহিরঙ্গা মায়াকে নহে—অন্তরঙ্গাকেও আদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই শ্রীভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে "যোগমায়াং সমাদিশৎ"—(.।২।৩)। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আদিষ্ট হইয়া "অংশেন সহ" অর্থাৎ স্বাংশভূত বহিরঙ্গামায়াসহ কার্য্যার্থে আবির্ভূত হইবেন। ইহাই "অংশেন" পদের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ যিনি ভগবতী মায়া তিনি যোগমায়া। শ্রীচণ্ডীতে এই যোগমায়া দেবীর অপর নাম—মহাবিদ্যা, যথা :—

১। "মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ"।

২। "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী" ইত্যাদি।

সাধারণ মায়াকে তটস্থা শক্তি বা জীবমায়া বলা যাইতে পারে এবং গুণমায়া বা বহিরঙ্গমায়াও বলা যাইতে পারে। ইহারই আরও একটুকু পরাবস্থায় ইহাকে জগৎ প্রসবিনীও বলা যায়—"সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" কেবল প্রসব নহে—জগতের রক্ষণ ও সংহারও ইঁহার কার্য্য। যথা শ্রীচণ্ডীতে—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

সুতরাং ইনি হারবার্ট স্পেন্সারের **The mysterious Force from which the Universe is evolved.** ইনিই বৈজ্ঞানিকগণের **Creative, Conservative** এবং **Distructive** বা **Disintegrating Force,** ফলতঃ এই অবস্থায় ইনিই **Cosmo-physical Force.**

আবার নারদ পঞ্চরাত্রে ইহাকে চিন্ময়ী পরমা শক্তি শ্রীদুর্গা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সে অবস্থায় ইনি জগৎসৃষ্টিব্যাপারের পরাবস্থায় অবস্থিতা। সে অবস্থায় ইনি একবারেই বিশুদ্ধজ্ঞানরূপিণী—এ অবস্থাটী জাগতিক বস্তুর অতিগা (**Transcendental**) তখন ইনি "প্রেমস্বরূপস্বভাবা"—তখন ইনি গোকুলেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকারই নিকটবর্ত্তিনী তখন ইনি যোগমায়া পৌর্ণমাসী। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান্ রাসলীলাবিলাস করেন। তখন ইনি মহামায়ারও উপরিচরা পরাবস্থায় বিরাজ করেন। মহামায়া ইহারই আবরিকা শক্তি। তাই নারদ পঞ্চরাত্র বলেন:—

অনয়া মুলভোক্তেয়ঃ আদিদেবাখিলেশ্বরঃ।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।

মায়ার এই এক বিচিত্র লীলা! কোথাকার জিনিষ কোথায় উঠিলেন!—পথের নোড়া শালগ্রামরূপে দেবাদিদেবের পুজনীয় হইলেন! ব্যাপার এইরূপই অদ্ভুত।

সাধারণ মায়ার কথা দূরে থাকুক, যোগমায়া ও মহামায়াতে অনেক প্রভেদ। দেবকী-গর্ভ সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ সপ্তমাসের গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে

সন্নিবেশন, ইহা মায়ার কার্য্য নয়—মহামায়ার নয়—যোগমায়ারই অবস্থা-বিশেষের কার্য্য।

প্রেমলীলায় যোগমায়ার যেরূপ আবির্ভাব, এই সকল ঐশ্বর্য্যময় ব্যাপারে যোগমায়ার ঠিক সেইরূপ আবির্ভাব নহে। বলভদ্র সাধারণ মায়ার নিয়ন্তা। তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে মহামায়াও অসমর্থা। যশোদার ন্যায় নিত্য সিদ্ধা ভগবৎপরিকরের স্বাপন (ঘুমাইয়া রাখা) সাধারণী মায়া হইতে সম্ভবপর নহে। ইহাও যোগমায়ারই কার্য্য। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ বলেন যিনি দেবকীর কন্যারূপে কংস-হস্তে অর্পিতা হইলেন এবং কংসকে বঞ্চনা করিলেন, তিনি কিন্তু যোগমায়া নহেন—চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের কথা এই যে "নতু যোগমায়া তাদৃশতুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব।" অর্থাৎ উহা যোগমায়ার কার্য্য নহে—তাদৃশ দুষ্টলোকের সহিত যোগমায়ার উপযোগ সম্ভাবিত নহে।

ইনি কংসহস্ত হইতে উৎপ্লুতা হইয়া বহু নামে বহুস্থানে বিবিধরূপে বিরাজ করিলেন। ইনিই শ্রীচণ্ডীতে লিখিত যশোদাগর্ভসম্ভবা মহামায়া, ইনিই বিন্ধ্যবাসিনী। রাসলীলা-সম্পাদনের জন্য ভগবৎ-প্রেয়সীগণ পতিশ্বশ্রূ প্রভৃতিকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, সেই বঞ্চনা যোগমায়ারই কার্য্য। সাধারণী মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারেন না;—ভগবদ্ধামে তাঁহার প্রবেশাধিকার একবারেই অসম্ভব। রাসলীলার প্রারম্ভে স্পষ্টতঃই লিখিত হইয়াছে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"। দুর্য্যোধন ও শাল্ব আদি অসুরেরা গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ ভগবান্‌কে দেখিয়াও দুষ্ট যাদব বলিয়াই মনে করিতেন। ইহা মায়ারই বঞ্চনা—যোগমায়ারও নহে—মহামায়ারও নহে। ভগবদ্‌বিমুখতা মায়ারই কার্য্য। ইহারা ভগবদ্‌বিমুখ ছিলেন সুতরাং যোগমায়ার দয়ালাভের অনুপযুক্ত। সূক্ষ্মদর্শী চক্রবর্ত্তী বলেন, বিমুখ জনগণের মোহন, মায়ার কার্য্য। অপরপক্ষে ভগবদ্-উন্মুখ জনগণের মোহন যোগমায়ারই আবির্ভাব-বিশেষের কার্য্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্

বিশ্বনাথ অপর একটি মায়ার সন্ধান দিয়াছেন—উহা বৈষ্ণবী মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতে যশোদা-মোহনে লিখিত হইয়াছে:—

"বৈষ্ণবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ।"

বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমময়ী শ্রীমতী যশোদাকে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপাদি দর্শন করাইলেন। অন্য কেহ হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইত। কিন্তু ভাবাধিক্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে যশোদা কোনও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান করিলেন না। ইহা মাধুর্য্যের মোহন-ব্যাপার-বিশেষ। কিন্তু এই মোহনও,—মায়ার কার্য্য ত নহেই, সাধারণ যোগমায়ার কার্য্যও নহে। প্রেমেরই স্বভাব এই যে উহা প্রতিক্ষণই ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানকে সমাবৃত করিয়া চিদানন্দময়ী মমতানিগড়ে জড়াইয়া স্বপরিকরচিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ করেন, এবং প্রতিক্ষণ স্নেহাধিক্য বৃদ্ধি করিয়া তন্মাধুর্য্যাস্বাদরূপ মহোদধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। উহা অকৃত্রিম রাগময়ী প্রেম-ভক্তিরই লক্ষণ। ইহাতেও মোহন ব্যাপার আছে বলিয়া ইহাও মায়া নামেই অভিহিত হইয়াছে।

ইহাই হইতেছে শ্রীচক্রবর্ত্তিমহাশয়ের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। ইহা দ্বারা মায়া, জীবমায়া, গুণমায়া, মহামায়া, যোগমায়া এবং যোগমায়ারও আবির্ভাব-বিশেষের পার্থক্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া গেল।

কিন্তু যোগমায়া সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ স্ফুটতর ভাবে না বলিলে যোগমায়াতত্ত্ব ভালরূপে বুঝা যাইবে না। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-মহোদয়—শ্রীরাসলীলায় "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই বাক্যস্থিত যোগমায়া পদের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই:—

১। পরাখ্যা সচ্চিদানন্দ শক্তিবিশেষঃ।

২। যোগঃ ঐশ্বর্য্যং তদ্‌যুক্তা মায়া দয়া; "মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ"।

৩। যোগঃ আত্মারামগতোমায়াং আবরণাত্মিকা-কপটতাং বা যোগ-যুক্তাং মায়াং উপসামীপ্যেন নিত্যমাশ্রিতোঽপি ইত্যাদি।

৪। যোগে সংযোগে যা মায়া যজ্ঞপত্নীস্বিব বঞ্চনা ইত্যাদি।

৫। বুনক্তি নিত্যং বক্ষসি সংযোগং প্রাপ্নোতীতি যোগা যা মা লক্ষ্মীস্তস্যাং নিত্যং বর্ত্তমানঃ তয়া সদা সেব্যমানোঽপি,—ভগবানপি।

৬। যোগায় সংযোগায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়াঃ—বংশী। স্যাং মানে শব্দে চ ইত্যস্য ক্ষত্ররূপং।

৭। যোগস্য সংযোগস্য মায়ো মানং পর্যাপ্তির্যস্যাং সা যোগমায়া—শ্রীরাধা।

নারদ পঞ্চরাত্রে পার্ব্বতীর উক্তিতে একটী শ্লোক আছে তাহা এই যে, "তদ্‌রাসে ধারণাদ্‌রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।" এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ অবশ্যই এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৮। যোগস্য সম্ভোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া—শ্রীরাধা।

পঞ্চরাত্রে যোগমায়া শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ভগবতী যোগমায়া দুর্গা আরও উন্নততর গ্রামে উন্নীত হইয়া একবারেই হ্লাদিনী শক্তির পরাবস্থায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার অপরাবস্থারও উল্লেখ আছে, যথা :—

> যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
> তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥
> যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
> তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা॥

শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা বড়ই কঠিন;—এক বস্তুরই অনন্ত প্রকাশ,—সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম—একেবারেই জড়ে পরিণতি! ইহা খাঁটি অদ্বৈত বেদান্ত,—অদ্বয়তত্ত্ব! এক হইতে অনন্ত। যিনি চিন্ময়ী তিনিই মৃন্ময়ী—কখনও কার্য্যকারণাতীত অবস্থা—কখনও বা সদসৎরূপে কার্য্যকারণাবস্থা—এইরূপে সেই একই মূলতত্ত্ব নানাভাবে

বিরাজ করিতেছেন। আমাদের জ্ঞান অবস্থাবিশেষের বা আবির্ভাববিশেষের পার্থক্যে পৃথকত্ব ও বহুত্ব দেখিতে পাইতেছে।

পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু-রসনাসু চ।

বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতিস্থিতিরেব চ॥

প্রাণাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা, রসনাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ইহাই ভগবৎশক্তির বিভাগক্রম। তার পরে আরও দেখা যায়—

বুদ্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্নাচ পার্ব্বতী॥

অন্যান্য পুরাণাদিতে ও কাব্যগ্রন্থসমূহেও মায়াশক্তির কিছু কিছু তথ্য আছে কিন্তু তৎসকলই প্রায় এইরূপ ভাবাত্মক।

ঋগ্বেদ সংহিতায় মায়া শব্দটী যেমন "কপট" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মহাভারতেও এই শব্দটীর সেইরূপ বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বহু স্থলে মায়া শব্দের দৃষ্ট হয় যথা :—

১। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সংভবাম্যাত্মমায়য়া।

২। দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

৩। মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ।

৪। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

শ্রীভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে শক্তিবাদ সম্যকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এস্থলে শক্তিবাদ ও মায়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে :—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ

বিবাদসম্বাদ ভুবোভবন্তি।

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈনমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

অর্থাৎ যাঁহারা পরস্পর বিরোধী শক্তি-সমূহ এই সকল বাদীবিবাদি-গণের মধ্যে মুহুর্মুহু আত্ম-মোহের সৃষ্টি করেন, সেই অনন্ত গুণশালী ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি।

শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাঁহার মায়াশক্তি ও স্বরূপ আপাতত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ। অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ শ্লোকে লিখিত আছে :—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেক মনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥"

অর্থাৎ আপন আপন বর্গে (group) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরস্পর বিরুদ্ধ গতিবিশিষ্ট। এই সকল বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুনির্ব্বাহ করে, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা এক অনন্ত আদ্য আনন্দ মাত্র অবিকার ব্রহ্মকে বন্দনা করি। আর একটী প্রমাণ এই যে—

"স্বর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধ-নিরুদ্ধ-শক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈপুরুষায় বেধসে ॥" ভাঃ ৪।১৭।৩৩

অর্থাৎ যাঁহার শক্তি, দ্রব্যের আকারে ক্রিয়ার আকারে, কারকের আকারে, চেতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সকল শক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুন্নদ্ধ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানময় পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি।

ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই উক্তির সমর্থনের জন্য শ্রীভাগবতের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ। ভাঃ ৩।৩৩।৩।

তিনি বলেন এই উক্তি ব্রহ্ম সূত্রেরই প্রতিধ্বনি। ব্রহ্মসূত্র হইতে তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

১। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। ২।১।২৭

২। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২।১।২৮

প্রথম সূত্রটার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন :—'লৌকিকানামপি মণি-মন্ত্রৌষধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেক কার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেনাবগন্তুং শক্যন্তে অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুতাঽচিন্ত্যস্বভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ লৌকিক মণিমন্ত্রৌষধিসমূহেরও দেশকাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশতঃ শক্তিসমূহ বিরুদ্ধ প্রকারে অনেক কার্য্য-বিষয় হইয়া থাকে। উপদেশ ভিন্ন সেই সকল শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল তর্কদ্বারা জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন ইত্যাদিও বিনা উপদেশে কেবল তর্কের গোচর নহে। এ অবস্থায় অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের রূপ শব্দ প্রমাণ ভিন্ন কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? এই নিমিত্ত পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন, যে সকল ভাব চিন্তার অগোচর সে সকল ভাবে তর্কযোজনা করিয়া বুঝিতে প্রয়াস পাইবে না। যাহা প্রকৃতি সমূহ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাই অচিন্ত্য।

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে এই সূত্রের আরও পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দেখিতে

পাওয়া যায়। গোবিন্দ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মের কর্তৃত্ব পক্ষে লোকদৃষ্ট দোষের আশঙ্কা নাই। কেন না, ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য-জ্ঞানাত্মক হইয়াও সমূর্ত্ত; জ্ঞানবৎ এক হইয়াও বহু প্রকারে অবভাত, নিরংশ হইয়াও সাংশ, অমিত হইয়াও পরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ত্তা ও নির্ব্বিকার, শ্রুতিতে তাহার এইরূপ স্বভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মস্বরূপ বিনির্ণয়ে বলা হইয়াছে :—

১। "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্"

তিনি যে অলৌকিক তাহাও ঔপনিষদী শ্রুতিতে জানা যায়। তদ্‌যথা:—

২। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ ইতি কঠোপনিষদ্।

৩। দ্যা বা ভূমী জনয়ন্ দেব এক এবঃ ইত্যাদি। তিনি সর্ব্বকর্ত্তা হইয়াও নিরঞ্জন, বিভু হইয়াও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, এই সকলই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক।

জগৎ রচনা ব্রহ্মের যে অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক, অপর সূত্রও তাহারই প্রমাণ স্বরূপ। এক ব্রহ্মে এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বিশ্বের প্রকাশ,—তাঁহার অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্যেরই প্রকাশক। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ সূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি :—'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' ইত্যাদি তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে।

অর্থাৎ ব্রহ্মপূর্ণ শক্তি, তজ্জন্য তাঁহার শক্তি পূরণের জন্য অপর কিছুর কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। একটী শ্রুতিতে লিখিত আছে :—

তাঁহার কার্য্য (প্রাকৃতিক দেহ) নাই, করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কিছু দেখা যায় না। তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া শক্তির বিষয় শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে। তিনি

পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট এই নিমিত্ত এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্ষীরাদির ন্যায় বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়।

এস্থলে পরিণাম-বাদের কথাটাও কিছু বলিয়া রাখি—ব্রহ্মের পরিণাম হইলে বিকারিত্ব দোষ ঘটে। ভগবৎশক্তির অন্তর্গত দ্রব্য-শক্তিরই পরিণাম হয়। পরিণাম বাদ বিষ্ণুপুরাণেও পরমাত্ম-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণু পুরাণেও ভগবৎ শক্তির অচিন্ত্যত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা ভগবৎ-সন্দর্ভধৃত প্রমাণ :—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবনামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ অচিন্ত্যাং তর্কসহং যজ্জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি; যদ্বা অচিন্ত্যা—ভিন্নাভিন্নআদি বিকল্পৈ শ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি।"

এই লোকে মণিমন্ত্রাদির শক্তিই যখন অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, তখন ব্রহ্ম শক্তিই যে অচিন্ত্য হইবে তাহাতে ত কোন কথাই নাই। ভিন্ন অভিন্ন প্রভৃতি বিকল্পনা দ্বারা যাহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় না তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। সুতরাং ভগবৎশক্তি অবিচিন্ত্য।

ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য, এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না, এই জগতের প্রায় সকল তত্ত্বই আমাদের অচিন্ত্য। যাহা আমরা জানি বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই আমরা জানি না, আমাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। জ্ঞানের আলোক কোন কোন তত্ত্বের কিয়দ্দূরে গমন করিয়া অবশেষে অজ্ঞেয়তার বিশাল রাজ্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে। দশদিকেই ভগবৎশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব, সে প্রভাবের পরিমাণ করা বা চিন্তার আয়ত্ত করা একেবারেই অসম্ভব।

জগতের দিকে চাহিলেই ভগবৎশক্তির অনন্ত মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হয়, আকাশে অনন্ত নীলিমা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সম্মুখস্থিত এই বৃক্ষ বা একটী ধূলি-কণার বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব, ইহাদের মধ্যে, এই সান্ত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্তশক্তির অনন্ত প্রভাব বিরাজিত। আমাদের চিন্তা উহার একটীও আঁকড়িয়া ধরিতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের গর্ব্ব একেবারেই অসার।

এই যে নেত্রসমক্ষে নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল বিরাজ করিতেছে, কোন্ শক্তির প্রণোদনায় ইহার উৎপত্তি হইল, কি প্রকারে ইহা ভূমির রস গ্রহণ করিতেছে, কি প্রকারেই বা ইহার নয়ন-সুখকর শ্যামল বর্ণচ্ছটা বিকসিত হইল, এই সকল প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও-না-কোনও প্রকারে মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। ইহার দ্বারা জীবসমাজের কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাও কিছু কিছু অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইতে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাও অতি সীমাবদ্ধ।

যদি বাহ্য বস্তুর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদের আরও ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় বস্তুর জ্ঞান যাহা জানিতে পারিতেছি তাহা অপেক্ষাও আরও অধিক তথ্য জানিতে পারিতাম। যাঁহার চক্ষু আছে, নাসিকা আছে এবং স্পর্শজ্ঞান আছে ও রসনা আছে তিনিই গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ কোমল স্পর্শ ও আস্পদ বিশেষ অনুভব করিতে সমর্থ। কিন্তু এই চতুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার কোনও এক ইন্দ্রিয়ের অভাব তিনি সেই ইন্দ্রিয়ের উপলভ্য, গুণ জ্ঞানেও অসমর্থ হইয়া পড়েন। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভগবৎশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আসিতেছি, তাহার বহিরঙ্গ দিকটার অধিকাংশই আমাদের সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু একেতো ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অত্যল্প, তাহার উপরে এই সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বহুবিধ কারণে দুর্ব্বলতা জন্মিয়া থাকে, অপরন্তু বস্তু সমূহের যথাযথ তত্ত্ব গ্রহণে ইহাদের শক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর। এই অবস্থায় আমরা আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ গোচর বস্তু সমূহের সমস্ত তত্ত্ব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভগবৎশক্তি সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ যথার্থই বলিয়াছেন যে --

"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ" ভাগবত ৩।৩৩।৩

ফলতঃ একটী পরমাণুতে অনন্তশক্তি ভগবানের যে অনন্ত প্রভাব বর্ত্তমান, ক্ষুদ্র জীবের নিকট তৎসকল একেবারেই অচিন্ত্য।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীভগবানের শক্তির অচিন্ত্যত্ব সপ্রমাণ করার জন্ত যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব দর্শনের এক বিশেষত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ ভগবানের শক্তি অভিন্নও বটে, আবার ভিন্নও বটে। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাস্কর মতের ভেদাভেদ নহে। ভাস্কর যে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন তাহা ঔপাধিক ভেদ মাত্র, সে ভেদাভেদবাদে প্রতীতির নিত্যতা নাই। উহা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী হইলেও বস্তুতত্ত্ব বিষয়ে কেবল উপাধির ভিন্নতা ব্যতীত অপর কোনও ভিন্নতা স্বীকার করে না, সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের এই মতটী শঙ্করের মায়াবাদের এ পিঠ আর ও পিঠ; নামে ভেদাভেদবাদ, কার্য্যত খাটি অদ্বৈতবাদ মাত্র।

শ্রীমৎ নিম্বার্ক-সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদের সমর্থক। তাঁহারা ভেদাভেদ শ্রুতির আলোক লইয়া ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শাস্ত্রে যে ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র। ইঁহারা ভগবান ও তাঁহার শক্তি এই দুইটী লইয়া দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহারা শক্তিকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন; —

শক্তির্নামকার্য্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধো বস্তুনো ধর্ম্মবিশেষঃ। সা তু সর্ব্বেষ্বিমনুপাদানে নিমিত্তে চ কারণে স্বরূপভূতৈব মন্তব্যা কার্যবিশেষোৎপত্তৌ তৎকারণত্বেন বস্তুবিশেষ-স্বীকারানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ।"

অর্থাৎ কার্য্যের অন্যথা অনুপপত্তিসিদ্ধি সম্বন্ধে বস্তুর ধর্ম্ম-বিশেষই শক্তি। যাহার অভাবে কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাই শক্তি। শক্তি, কার্য্যের সাধক। বস্তুর যে ধর্ম্মবিশেষের বর্ত্তমানতা দ্বারা কার্য্যের অন্যথা অসিদ্ধ হয়, তাহাই তাহার শক্তি। এই শক্তি নিমিত্ত কারণে এবং উপাদান কারণে স্বরূপভূতরূপে বিরাজমান থাকে, কার্য্যবিশেষের উৎপত্তিতে তৎকারণত্বে নৈয়ায়িকগণ বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু এইরূপ বস্তুর কারণত্ব সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠশক্তি স্বীকার না করিয়া বস্তুবিশেষকে স্বীকার করা অনর্থক, ইহাই বৈদান্তিকগণের মত। শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

শ্রীজীব গোস্বামী এই সকল আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,— "ভগবৎশক্তি ভগবানেরই স্বরূপ, উহা ভগবান হইতে যে ভিন্ন আমরা তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ, আবার উহা যে তাঁহা হইতে অভিন্ন তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ। সুতরাং এইরূপে ভেদাভেদবাদ স্বীকার্য্য এবং উহা অচিন্ত্য—"তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ, তৌ চাচিন্ত্যাবিতি।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই অধিকতর আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন না। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এবং "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি" এই দুই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টতঃ ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজও এই দুই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এস্থলে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিচার করিয়াছেন সকল বস্তুর শক্তিই (Energy) অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। তড়িৎ একটী শক্তি, আমরা উহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই না, মেঘে যে অনলরেখা উদ্ভাসিত হয়, উহাকে আমরা বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত করি। বাস্তবিক কথা এই যে, বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে মেঘস্থ বাষ্পগুলিই বিদ্যোতিত হইয়া বিজলী রেখার সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎশক্তির স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সকল শক্তিই এইরূপ আমাদের অপ্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। দ্রব্য পদার্থে যখন শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখনই আমরা শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। দ্রব্যশক্তিই যখন অচিন্ত্য, তখন ব্রহ্মশক্তি যে অচিন্ত্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ব্রহ্মের কারণ অবস্থায় জগৎ যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, তখন জগতের অবস্থা—"শক্তিমাত্রবিশেষ"। (Potential state) অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অচিন্ত্য শক্তি হইতে এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়, প্রলয়ে এই বিশাল বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিরূপে কারণে লীন হইয়া যায়। যিনি অশেষ শক্তির আধার, যাহার শক্তি হইতে এই বিশাল বিশ্বের প্রকাশ, তাহাতেই বিশ্ব শক্তিমাত্রাবশেষ (Natura naturans) ভাবে অবস্থান করে, আবার শক্তিসংক্ষোভের নিয়মে ভগবান্ আবার সেই সেই সকল শক্তিকে ক্রিয়মান অবস্থায় (Kinetic Condition) আনিয়া বিচিত্র জগৎ (Natura-naturata) প্রকটিত করেন।

শ্রীপাদ রামানুজের এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও অভিপ্রেত। শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বিস্তৃত করিয়াছেন, এমন কি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচরিতামৃতে ভগবৎ-শক্তির আলোচনার্থ প্রাগুক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রৌত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই বিশ্ব ভগবৎশক্তিরই প্রকাশ এবং এই সকল শক্তি ও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর।

বেদের কাম্য কর্ম্মের খুটিনাটি হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই পরিহার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের সার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ সকল উক্তি দার্শনিকগণ শ্রৌত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, আরণ্যক গ্রন্থ ও উপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি পুরাণ পাঠে মনোনিবেশ করা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে যে বৈদিক যুগের সার সত্যগুলি ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, জীবাত্মা ও বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিম্বা মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি পুরাণে অতি পরিস্ফুটরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা হইতেছে যে, ভারতীয় ঋষিগণ সমগ্র জগতে যেমন মহাশক্তির মহালীলা প্রত্যক্ষ করিতেন তেমনি আপনাপন অন্তরাত্মায় মহামায়ার মহিয়সী শক্তি অনুভব করিতেন। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে লিখিত আছে—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

অর্থাৎ সেই মহিয়সী মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগৎরূপে প্রকাশিতা এবং সমগ্র জগতে সেই মহাশক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ইঁহাকে মহামায়া বলিতে হয় বল, জগদ্ধাত্রী বলিতে হয় বল, জগদীশ্বরী বলিতে হয় বল, জগতের স্রষ্ট্রী, পালয়িত্রী ও সংহর্ত্রী বলিতে হয় বল, বৈষ্ণব দর্শনে কিন্তু ইহাকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার তত্ত্ব চিরদিনই অজ্ঞেয়। শ্রীচণ্ডীতে ইন্দ্রাদিদেবগণের যে স্তব আছে তাহাতেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যথা :—

"ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।"

জীবশক্তি তটস্থা নামে অভিহিতা। জ্ঞানরূপিণী গৌরীশক্তি বা

নারায়ণী অন্তরঙ্গা-শক্তির অন্তর্গত। কিন্তু হ্লাদিনী শক্তিবর্গ ইহাদেরও উপরিচর। আহ্লাদিনী আনন্দময়ী, প্রেমবিলাসিনী, ভগবৎশক্তিবর্গ শ্রীভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, এই সকল শক্তি যে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান, তাহাও চিন্তায় আনা যায় না অভিন্নাবৎ ও প্রতীয়মান বলিয়াও চিন্তায় ধারণা হয় না (The same or different can not be represented in our thought) ইহাদের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিনটী বিষয় অবলম্বনে এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনায় বহুল বাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শাস্ত্র-আলোচনাকারিগণ এইরূপে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈবাদ, ভেদাভেদবাদ, সৎকার্য্যবাদ, আরম্ভ-বাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতি বিবিধ বাদ সংস্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একটী বেদান্ত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম, এই সকল বাদের মধ্যে গৌড়ীয় আচার্য্য প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত। ইহাতে গোড়ামীর লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, অথচ সকল মতের যথাশাস্ত্র সামঞ্জস্য এই সিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। ভেদাভেদবাদ অবশ্যই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। বাদর হইতে ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত অনেক বেদান্তচার্য্যই ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যেও ভেদাভেদ বাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌যথা ;—অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যা-মংশত্বাবগমঃ,—২।৩।৪২ সূত্র ভাষ্য।

নিম্বার্ক ভাষ্যে ভেদাভেদবাদ দৃঢ়ী কৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যের বেদান্ত সিদ্ধান্তে ভগবৎশক্তি দৃঢ়রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সম্মত। এই সম্প্রদায়ের পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চাচিন্ত্যাবিতি।"

অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ হইতে তদীয় শক্তিবর্গকে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করা যায় না এই হেতু ভেদ প্রতীতি হয়, আবার ভিন্ন বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, বলিয়া অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য।

সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে ভাগবত সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় এই উক্তি দ্রষ্টব্য। আবার পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যাতেও লিখিত হইয়াছে—

"অপরেতু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্য ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি।"

অর্থাৎ "নিরাগম তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বলিয়া ভেদ ও অভেদ অসীম দোষসমূহদর্শনে,—ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা যায় না, এইজন্য অভেদ সাধনে এবং সেই প্রকার অভিন্ন ভাবে চিন্তা করা যায় না বলিয়া ভেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অপর একশ্রেণী ব্যক্তিরা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন" এই গ্রন্থে ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে—"তত্র বাদর-পৌরাণিক-শৈবানাং মতে ভেদাভেদো ভাস্কর মতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল পতঞ্জলি-মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্য মতে চাপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যাভেদাভেদবেব শক্তিমযত্বাদিতি।"

অর্থাৎ "বাদর পৌরাণিক, শৈব ও ভাস্কর মতে ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। মায়াবাদীদের মতে ভেদাংশ ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিক। গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি মতে ভেদবাদ স্বীকৃত।

রামানুজ ও মাধ্বাচার্য্য মতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। অচিন্ত্য শক্তিময়ত্ব বলিয়া স্বমতে অচিন্ত্য ভেদাভেদই স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপে মূল সন্দর্ভেও অচিন্ত্য পদের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অচিন্ত্য শব্দের অর্থ কি ইহাই আমাদের বিচার্য্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রভাষ্যকৃত বরাহপুরাণ বচন যথা—

(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

এই স্থলে যাহা প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(২) ভাগবত সন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার তিনটী অর্থ করিয়াছেন—

(ক) অচিন্ত্যং তর্কাসহম্ (অতর্ক্য)

(খ) অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তায়িতুমশক্যা কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ।

(গ) দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্।

ইহাতে জানা যাইতেছে অপ্রাকৃত ও তর্কাসহ বিষয়ই অচিন্ত্য। ভিন্না-ভিন্নত্বাদিবিকল্প দ্বারা যাহা চিন্তনীয় নহে, যাহা কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞান-গোচর তাহাই অচিন্ত্য। আরও জানা যাইতেছে যাহাতে দুর্ঘটঘটকত্ব আছে তাহাই অচিন্ত্য। লৌকিক তর্ক দ্বারা ভেদ ও অভেদের একতম পক্ষ স্বীকার করিলে শ্রৌত প্রমাণেরও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না। ব্রহ্ম যখন অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট, তিনি যখন অচিন্ত্য শক্তিময়, সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য, ইহাই স্বাভাবিকী বিশুদ্ধ প্রতীতি।

এক অচিন্ত্য পদযোজনা দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য এই বেদান্ত সিদ্ধান্তের পরিস্ফুট মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিষদের মন্ত্রসমূহ ব্রহ্ম শক্তির অচিন্ত্যত্বের পোষক। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রের বিষয় তর্কগোচর নহে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য। এমন কি জড়ীয় শক্তি

পর্য্যন্ত অচিন্ত্য। এই অবস্থায় শ্রৌত প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত ভগবান্ ও তদীয় শক্তির ভেদ ও অভেদের অচিন্ত্যত্বই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। অতঃপরে ভেদাভেদবাদের ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভেদাভেদবাদ পদের পূর্ব্বে "অচিন্ত্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োগ তিনি কেন করিলেন, তাঁহার উক্তিতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সর্ব্বসম্বাদিনীতে যেস্থলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং যাহা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি ব্রহ্মসূত্রের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটি এই —"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। এই তর্ক বেদ-বিরোধী তর্ক বলিয়া শঙ্করাচর্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষা-নিবন্ধন লৌকিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই। এই প্রকার লৌকিক তর্কের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণীত হয় না, এই নিমিত্ত শঙ্কর বলিয়াছেন, ঔপনিষদ্ জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, উহার দ্বারাই মোক্ষ হয়। তর্কপ্রভাব জ্ঞান অসম্যক্।

ব্রহ্মতত্ত্ব তর্কের অগোচর, যাহা তর্কের অগোচর তাহাই অচিন্ত্য, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এজন্যই অচিন্ত্য পদের অর্থ করিয়াছেন— "তর্কাসহম্"। বাস্তবিক ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের লৌকিক তর্কের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, এই সূত্রের ভাষ্যেই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—সুপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য কপিলের এবং তাদৃশ অন্যান্যের সমস্ত তর্ক প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না অতিপবিত্র ও পূণ্যাদ কপিল, কণাদ প্রভৃতিরও মতবৈপরীত্য দেখা যায়। অর্থাৎ তর্কের দ্বারা একের মত অপরে খণ্ডন করিয়াছেন।

এই অবস্থায় কাজেই বলিতে হয় তর্কের যখন স্থিরতা নাই, তখন নিখিলশক্তির সমাশ্রয় ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রীরামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্ম সমাশ্রয়ণীয়ঃ। শাক্যৌলোক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কানামন্যোন্য ব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে।

অর্থাৎ তর্কের স্থিরতা নাই এই নিমিত্ত বেদ প্রমাণমূলক ব্রহ্ম কারণ-বাদই সমাশ্রয়যোগ্য। শাক্য, ঔলক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাপ্রভব মহাত্মগণের তর্কে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ব্রহ্ম-কারণ-বাদ তর্কমূল নহে, উহা শ্রুতি-প্রমাণ-মূলক। এই নিমিত্ত শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"অতীন্দ্রিয়েঽর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্"

অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অর্থ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষা নিবন্ধন তর্ক প্রমাণ নহে। বেদবাক্যই প্রমাণ। সুতরাং ভেদাভেদবাদ অতর্ক্য অতএব অচিন্ত্য।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভাষ্য টীকাকার মহাত্মা শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য অনেক বিচারের পর লিখিয়াছেন:—

"তস্মাদচিন্ত্যানন্তাঘটনঘটনপটীয়সীশক্তিমত্তয়া নিঃশেষদোষগন্ধাস্রোত-মাহাত্ম্যং সার্ব্বজ্ঞাদ্যনন্ত সদ্গুণাশ্রয়ং পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণং ন প্রধানমিতি।

অর্থাৎ বহুল বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অচিন্ত্য-অনন্ত-অঘটন-ঘটন-পটু-শক্তি দ্বারা সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত-মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অনন্ত সদ্গুণাশ্রয় পরব্রহ্মই জগতের কারণ, সাঙ্খ্যকারোক্ত প্রধান নহে।

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যখন ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তখন তর্কের অবস্থান কোথায়? এমন কি কপিল কণাদ প্রভৃতিও একের তর্ক অপরে খণ্ডন করিয়াছেন। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগৎ-কারণতা

প্রকৃতপক্ষে অতর্ক্য। ব্রহ্ম যে তর্কগোচর নহেন তৎসম্বন্ধে বলদেব শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—"শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ,—'নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি।"

শ্রুতিতে ব্রহ্মের অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা—কঠোপনিষদে যম নচিকেতকে বলিতেছেন, "হে প্রেষ্ঠ এই পরম তত্ত্বগ্রহণোপযোগিনী বুদ্ধিকে শুষ্ক তর্ক দ্বারা কুপথে পরিচালিত করিও না।"

উপনিষদে এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ বাদরায়ণ সেই সকল শ্রৌত প্রমাণের সার-স্বরূপ "তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্র স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রমাত্রেই বহুল শ্রৌত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম লৌকিক তর্কের অগোচর এই নিমিত্তই তাঁহাকে অচিন্ত্য বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কথা সকলেরই স্বীকার্য্য যে বেদবিরোধী তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত নহে, আবার লৌকিক ব্যাপারের নিমিত্ত লৌকিক তর্কসমূহও অপ্রতিষ্ঠিত নহে। যদি সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার লোক-ব্যবহারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ-দোষ ঘটে।

কিন্তু ব্রহ্মশক্তি তর্কগোচর নহে। এস্থলে বেদ-বাক্যই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি যে অচিন্ত্য, ইহা বৈদান্তিকমাত্রেই স্বীকার্য্য সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধীয় ভেদাভেদবাদও অচিন্ত্য, ইহাই বেদান্ত দর্শনের সুমীমাংসিত সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মতত্ত্বের অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শ্রৌত প্রমাণ ও লৌকিক যুক্তি উভয় দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া এক শ্রেণীর দার্শনিক যেমন ভেদ-বাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, অপর পক্ষে অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক একবারে অভেদ বাদের উদ্ঘোষণা করিয়া ভেদবাদকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা বাদাবাদের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বেদ-

বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা দেখিতে পান,—ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদক উভয় প্রকার শ্রৌত প্রমাণই বেদবেদান্ত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই বিশুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্মত। এক প্রকার দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, আবার অন্য প্রকার দৃষ্টিতে তাঁহাকে অশেষ কল্যাণ-গুণের সমাশ্রয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নির্গুণতা বা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের যিনি আশ্রয়, তিনিই অচিন্ত্য-প্রভাব ব্রহ্ম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে বৈদান্তিকগণ ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও তদীয় ব্রহ্মসূত্রের বহু স্থানে ভেদাভেদবাদই বেদান্ত সিদ্ধান্তিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে এই সম্বন্ধে দুই একটি সূত্রের অবতারণা করা যাইতেছে ; তদ্‌যথা :—

ন স্থানতোঽপি, পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। ৩।২।১১ সূত্র।

অর্থাৎ জীব সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগ্রস্ত হইলেও উহাতে পরমাত্মার কোন দোষ-স্পর্শ হয় না। কেন না শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর নিজেও ব্রহ্মদ্বিরূপতার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

আবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১ সূত্রের ভাষ্যে অদ্বৈতগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শক বাক্য যে সহস্র সহস্র আছে ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ ২৮ সূত্রের ভাষ্যে দ্বিরূপত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবল নিজের যুক্তিতে অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, "নহ্যেক বস্তু স্বতএব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যবগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ।" অর্থাৎ

একই বস্তু স্বতঃই রূপাদিবিশিষ্ট এবং রূপাদি-বর্জ্জিত এরূপ অভ্যুপগম হয় না। কেন না এই সিদ্ধান্ত পরস্পর-বিরোধী।

শঙ্কর এখানে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত দলন করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে তিনি নিজেই "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" "আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি" প্রভৃতি সূত্র ব্যাখ্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব অচিন্ত্য বলিয়া কত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সেই সকল প্রমাণ যুক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মের দ্বিরূপতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। বেদাবিরোধী তর্কের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বীয় কল্পনা দ্বারা এবং স্বীয় যুক্তি দ্বারা কেবলাদ্বৈত মত স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত উৎপ্রেক্ষাকে নিরঙ্কুশ বলিয়া স্বীয় ভাষ্যেই উহাকে হেয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এস্থলে কিন্তু নিজেই নিজের অগ্রাহ্য প্রমাণ অবলম্বনে অদ্বৈতবাদ স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং যে বিচার প্রণালী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এখানে "গরজে"র অনুরোধে নিজেই সেই অগ্রাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এই অগ্রাহ্য মতের আর কে আদর করিবে? ফল কথা এই যে ব্রহ্মতত্ত্বঅচিন্ত্য। এইজন্যই ব্রহ্মতত্ত্বে বিরুদ্ধধর্ম্মা-শ্রয়ত্বের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে।

শঙ্কর যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা লৌকিক দৃষ্টিতেও বিরোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। অচিন্ত্যপ্রভব ব্রহ্মতত্ত্বে, উহাতো একেবারেই বিরোধজনক নহে। বিরোধ হইলে শ্রুতিই বা অকাণ্ডে বিরোধের প্রশ্রয় দিবেন কেন? শঙ্করের স্বকপোলকল্পিত অনুমানে শ্রৌত প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

পদার্থ মাত্রেরই দ্বিরূপতা স্বীকার্য। মানুষ, জীব, বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর যাহা লইয়াই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সকল পদার্থেই তাঁহার দ্বিরূপতা জ্ঞান স্পষ্টতঃই অভ্যুপগত হইবে। ইহাতে

বিরোধ নাই, অসামঞ্জস্য নাই,—অপর পক্ষে উহাই অবিরোধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং উহাই প্রমাণশ্রেষ্ঠ শ্রৌত প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত জ্ঞান অসম্যক্ ও একাংশিক। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। পরমাত্মসন্দর্ভে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সূক্ষ্মদর্শী শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার সুমীমাংসা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।"

ইহার ভাবার্থ এই যে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের অনু-প্রবেশ স্বতঃসিদ্ধ। শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। আবার চিজ্জাতীয় পদার্থের হিসাবে জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য অভিন্ন, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ এই সকল হেতু বশতঃ কোথাও অভেদ-নির্দ্দেশ, আবার এক বস্তুতেই অনন্ত বৈবিধ্য বা বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হওয়ায় অপর পক্ষে ভেদ-নির্দ্দেশও স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও দ্বিরূপতা প্রতিপাদক শ্রুতির স্বারস্য রক্ষা করিয়াই ঐ সকল স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ফলতঃ অচিন্ত্য ভেদাভেদই যে বেদান্তের,—ব্রহ্মসূত্রের,—ও শ্রীভগবদ্‌গীতার অভিপ্রায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই জগতের অবস্থান এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মেই জগতের লয়," এই ভাবাত্মক বহুল বেদান্ত-বাক্য-কুসুম গ্রথিত করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ "জন্মাদস্য যতঃ" সূত্র করিয়াছেন। এই সূত্র

দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান জগতের কারণ নয়। যদি অজ্ঞানই জগতের কারণ হইত তাহা হইলে ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্ম-নিরূপণে ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। অপিচ অজ্ঞান মায়াবাদীদের মতে অসৎ পদার্থ, অজ্ঞান কখনও জগতের কারণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ সৃষ্টি যে ঈক্ষণপূর্ব্বিকা ইহাই শ্রৌত প্রমাণসঙ্গত,—এই শ্রৌত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রধানকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত উহার প্রতিকূলে বহুল তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ইহার পরে মায়াবাদীরা আবার কোন্ তর্কবলে অজ্ঞানকে জগৎকর্ত্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন? তাঁহাদের অনুকূলে শ্রৌত প্রমাণ নাই, তর্কযুক্তিও নাই, তবে তাহার স্বকপোল কল্পিত মত অন্যে মানিবে কেন? ফলতঃ ব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা, ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগৎ উৎপন্ন, সুতরাং জীব ও জগৎ এক হিসাবে তাঁহা হইতে অভিন্ন। এই নিমিত্ত এই উভয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপতা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, জীবও জগদাকারে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহাও অনিত্য নহে—নিত্য। কেন না শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলিতেছেন :—

নিত্যো নিত্যানাম্।

এই সকল নিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যত্ব তাঁহার নিত্যত্বেই প্রতিষ্ঠিত। স্বকপোল-কল্পিত অর্থ দ্বারা এই সকল শ্রুতি "ব্যাবহারিক সত্যমাত্র পারমার্থিক সত্য নহে" এইরূপ অভিমত প্রকাশের কোনও যুক্তি বা কারণ দেখা যায় না। বেদান্ত দর্শনের অভিপ্রায়ই যে,—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তাহা ইতঃপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যে সূত্রটী এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে, তলাইয়া দেখিলে ইহাতেও সুস্পষ্টরূপেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে করুন "এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ব্রহ্মেই

ইহা অব্যক্তাকারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিবে।" এই শ্রুতির দ্বারা এক হিসাবে বুঝা যাইতেছে, এই বিশ্বরূপ বস্তুটীর সহিত ব্রহ্মের উৎপাদ্য উৎপাদক সম্বন্ধ ; এ অবস্থায় ভেদ প্রতীতি স্বাভাবিক ; আবার যখন দেখা যাইতেছে এই বিশ্ব ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অপর কোনও পদার্থ নহে,—ইহা তাঁহারই বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির মূর্ত্তি মাত্র—তখন স্পষ্টতঃই বলিতে হয়, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য বা "অব্যপদেশ্য" অর্থাৎ ইহা বলিয়া বুঝানো যায় না।

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশের হেতু। অজ্ঞান এই সকল ব্যাপারের কারণ নহে। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি লয়, পুরুষ বিশেষের শক্তি সাপেক্ষ। ব্রহ্মের এই সকল শক্তি আছে এবং ব্রহ্মই সকল শক্তির নিত্য আধার। শক্তি সমূহ বা ব্রাহ্মীশক্তি ব্রহ্মেরই নিত্য অঙ্গীভূত, এই নিমিত্ত উহা স্বরূপ শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগৎ প্রকাশের পূর্ব্বে ও পরে এই শক্তি সমভাবে ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে ; এই শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম আপন হইতে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত করিয়া প্রদর্শিত করেন এবং শক্তিরূপে সকল পদার্থের অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করেন, এই নিমিত্ত যাহা জড় পদার্থ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও চেতনার লক্ষণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে স্বীকার করা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম সকল বস্তুতে নিয়মকরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার এই ঐশী শক্তির প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট, সুতরাং এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে।

আবার জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে জীব ব্রহ্মেরই চেতনাশক্তির আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্যে এই ভেদাভেদবাদ অতি স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি ;—জীব ও ব্রহ্মে যেমন ভেদ-প্রদর্শক শ্রুতি আছে, আবার তেমনি অভেদ প্রদর্শক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। "তত্ত্বমসি" বেদ বাক্যাদি যেমন অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিরূপে গৃহীত হয়, আবার অর্থবলে তেমনই ভেদ প্রদর্শক শ্রুতিরূপেও গণ্য হইতে পারে।

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। জীব ব্রহ্মের অংশ, অপূর্ণ এবং অত্যল্প শক্তি-বিশিষ্ট। মুক্তাবস্থাতেও জীব পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারেন না, ব্রহ্ম-সূত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই অংশ। এই অংশত্ব-সম্বন্ধ নিত্য ও চিরসত্য ; সুতরাং পরম মোক্ষ অবস্থাতেও জীবের এই স্বরূপের বিনাশ অসম্ভব। তবেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে জীব কোন অবস্থাতেই সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করিতে পারেন না।

ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের সপ্তদশ সংখ্যক সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—"অংশ নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব-মধীয়ত, একে"

শ্রীনিম্বার্ক এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অংশাংশি ভাবাৎ জীবে পরমাত্মানৌ ভেদাভেদৌ দর্শয়তে"—অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মা অংশাংশি-ভাব হেতু এই উভয়েও যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে ভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"পরমাত্মনো জীবঃ অংশঃ" অর্থাৎ জীব পরমাত্মার অংশ। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই যে, জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানিশাবিত্যাদি ভেদ ব্যপদেশাৎ তত্ত্বমসীত্যাদ্যভেদ ব্যপদেশাচ্চ।" অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু উভয়েই অনাদি, এইরূপ ভেদ-প্রদর্শক, বহুল শ্রুতি দৃষ্ট হয় এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বহু বিচারের পর ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। "চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাহগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-য়োরৌষ্ণ্যম ; অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।" অর্থাৎ যেমন

অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণত্ব বিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ চৈতন্য বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতি বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে জীব ঈশ্বরের অংশ।

এইরূপে বেদান্ত দর্শনের অহিকুণ্ডলবৎ প্রভৃতি সূত্র ও তাহার ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই, বেদান্তের প্রকৃত অভিপ্রায়। ইহা ঔপচারিক ভাবে ভাস্করীয় সিদ্ধান্ত এবং বাস্তব ভাবে শ্রীনিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত কিন্তু আমাদের মতে ভেদাভেদ উভয়ই অচিন্ত্য (ভেদাভেদৌ অচিন্ত্যৌ) শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীভগবৎসন্দর্ভে স্পষ্টতঃই তাহা লিখিয়াছেন। আবার শ্রীভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সর্ব্ব সম্বাদিনী গ্রন্থে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন:—তাহা দৃঢ়তার জন্য "স্থূণা-নিখনন-ন্যায়" অনুসারে বহুস্থানে বহুবার বলা হইয়াছে এখনেও বলা হইয়াছে:—

"স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্‌ভেদঃ, ভিন্নত্বেনচিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো ভেদাভেদবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চাচিন্ত্যাবিতি" আবার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে:— "স্বমতেঽচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্য শক্তি ময়ত্বাদিতি।" এই ভেদাভেদবাদ তর্কসংস্থাপ্য নহে, সুতরাং অচিন্ত্য কেবল ব্রহ্মসূত্র বলিয়া নহে, উপনিষৎ বাক্য ও ভগবৎগীতা বাক্য দ্বারা এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন এবং ধীর ভাবে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ বেদান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শক্তিবাদ সুদৃঢ় ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে বেদান্ত সূত্রভাষ্য বলিয়া

মনে করেন। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তিমস্কন্ধে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে –

"সর্ব্ব-বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মহাপুরাণকার শ্রীব্যাসদেব স্বয়ংই শ্রীভাগবতকে সকল বেদান্তের সার বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই উক্তির সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হয়। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ষট্সন্দর্ভাত্মক শ্রীভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থ বিরচিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বেদান্ত-তত্ত্বের সার মর্ম্ম সুন্দররূপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তের যাহা মূল লক্ষ্য, এই গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে সেই তত্ত্বের অতি পরিস্ফুট আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্ একই অদ্বয় তত্ত্বের নামান্তর। সাধক বিশেষের সাধনার তারতম্য অনুসারে ব্রহ্ম-পরমাত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি শব্দের অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। জ্ঞানগর্ব্বী সাধকগণ ভক্তের প্রিয়তম ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ শক্তি ও তদ্বর্গলক্ষণ-বিবর্জ্জিত নির্গুণ নিরবয়ব, চিৎসত্তামাত্রের ঈষৎ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা ব্রহ্মশক্তির সমাশ্রয়,—রসিকশেখরের এক প্রকার ছলনা বিশেষ। ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি অনন্ত।

বেদান্ত দর্শনের সম্প্রদায়বিশেষ যে ব্রহ্মশক্তি অনুভব করিতে পারেন না, তাহার কারণ ব্রহ্মশক্তির অভাব নহে। বস্তুতঃ উহা যে এতাদৃশ সাধকগণের সাধনাবিশেষেরই অনিবার্য্য ফল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র

নাই। তিনি জ্ঞানগর্ব্বীদের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশ করেন না সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মশক্তি স্বীকারের উপায় সমর্থন করিতে অসমর্থ হন।

কিন্তু পরম করুণাময়ী শ্রুতি পদে পদে ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদ-বেদান্তে ব্রহ্মশক্তির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও তদনুসারে অদ্বৈর তত্ত্বকে কেবল মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া নিরস্ত হন নাই, তাঁহাকে ভগবান্ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ভাগবৎসন্দর্ভে ব্রহ্মশক্তির যথেষ্ট সূক্ষ্ম-বিচার করিয়া গিয়াছেন। পরমতত্ত্ব যে কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি যে সর্ব্বশক্তির আধার এই গ্রন্থপাঠে তাহা অতি পরিস্ফুটরূপে বুঝা যাইতে পারে। সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থখানিও শ্রীজীবের রচিত। উহা আত্ম সন্দর্ভ চতুষ্টয়ের অনুব্যাখ্যা স্বরূপ। এই গ্রন্থের ভগবৎসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যাতেও শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেদবেদান্ত গ্রন্থপাঠের পক্ষে পুরাণ পরম সহায়। সায়ণাচার্য্য বেদসংহিতা ব্যাখ্যা করারকালে পুরাণ হইতে প্রচুরতর সাহায্যলাভ করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও পুরাণের বাক্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব বেদান্তা-চার্য্যগণ শ্রৌত ও পৌরাণিক বচন উভয়ই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ পুরাণ সমূহকে বেদ-বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন:—

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদান্ সমুপবৃংহয়েৎ।

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ বিস্তার করিতে হইবে। বেদসংহিতার উপাসনা প্রণালী কর্ম্মবহুল। উপনিষদের উপাসনা প্রণালী কর্ম্মবিবর্জ্জিত। পুরাণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা-

প্রণালী ও হিন্দু সদাচারের ব্যবস্থা ব্যবহার রীতিনীতিগুলিকে সুমার্জ্জিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পৌরাণিক উপদেশের এই উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহিত্ব সন্দর্শনে শ্রৌত প্রমাণের ন্যায় পৌরাণিক প্রমাণের যথেষ্ট সম্মাননা করিয়া বেদান্ত সিদ্ধান্ত,—উভয় প্রমাণের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পৌরাণিক প্রমাণদ্বারা শ্রৌত প্রমাণ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শক্তিতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব জীবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি জীবগণের জ্ঞাতব্য বহুতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভূমিকায় শক্তিতত্ত্ব এবং তদন্তর্গত মায়াতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে জীবতত্ত্বও ভগবৎ-শক্তি-তত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলেই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি,—মায়া তটস্থাশক্তি জীবের বিষয় আলোচনা করা যেমন প্রয়োজন, হ্লাদিনী শক্তির তথ্য সম্বন্ধে কিছু বলাও তেমনই প্রয়োজনীয়।

এখানে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীপ্রভুর নিকট আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্ব্বেও তাঁহারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, এ কথা মনে করা সঙ্গত নহে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতেন। আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এবং দর্শনশাস্ত্র সমূহের জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা থাকে। সেই সকল সিদ্ধান্তে বহু বিপ্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলেন, জড়াতীত পৃথক্ চৈতন্য বস্তু নাই। এই জড়দেহ হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়; যেমন তণ্ডুল ও গুড়ের মিশ্রণে মদ নির্ম্মিত হয়; এই মদে মত্ততা জন্মায়,

সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহে স্বতঃই চেতনা জন্মে। তদতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য নাই,—ইহাই চার্ব্বাকের সিদ্ধান্ত। চার্ব্বাকের অনুচরগণ বার্হস্পত্য সম্প্রদায় নামে খ্যাত ছিলেন। ইহারা বেদ মানেন না, দেহাতিরিক্ত পৃথক্ আত্মা স্বীকার করেন না, পরলোকেও স্বীকার করেন না। ইহারা দেহাত্মবাদী। ইউরোপেও প্রাচীন সময় হইতে এইরূপ দেহাত্মবাদী সম্প্রদায় ছিলেন এবং এখনও আছেন। খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইটালী প্রদেশে ডিমোক্রিটাস্ (Democritus) নামক একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য মানিতেন না। লেঞ্জ (Lange) নামক আধুনিক—একজন গ্রন্থকার "জড়বাদের ইতিহাস" (History of Materialism) নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ইউরোপীয় অনেক জড়বাদী পণ্ডিতের কথা আছে। ইহতে জানা যায়, তৎসময়ের আস্তিকেরা এই নাস্তিককে বড় ঘৃণা করিতেন।

ইংরেজ পণ্ডিত বেকন্—এই নাস্তিকের প্রধান স্তাবক ছিলেন। ডিমোক্রিটাস্ (Democritus) বলিলেন পরমাণুই চরম বস্তু। ইহারই যোগ বিয়োগে বিশ্ব-রচনা ও বিশ্ব-সংহার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জগদীশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই। আকাশ ও পরমাণু এই দুই পদার্থ নিত্য ও সত্য। পরমাণু অনন্ত, উহাদের আকার প্রকারও অনন্ত। যাহাকে লোকে আত্মা বলে তাহা এই সূক্ষ্ম পরমাণু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের সংযোগ-বিশেষে চেতনার উৎপত্তি হয়।

ইহার পরে এম্পিডকলস্ (Empedocles) নামক একজন কবি-প্রকৃতিক দার্শনিক ছিলেন। তিনিও পরমাণুবাদী। ইনি বলেন প্রীতি ও বিদ্বেষ পরমাণুর স্বভাব। প্রীতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে আকর্ষণ ঘটে, বিদ্বেষে উহা হইতেখসিয়া যায়। এইরূপেই সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে এইরূপে জড়বাদের উৎপত্তি ও প্রসার হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে হাক্স্‌লী, টিণ্ড্যাল্, ডারুইন্ প্রভৃতি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যে কথা জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা তাহার বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ পণ্ডিত হিউম (Hume) প্রণীত ধর্ম্মের প্রাকৃত ইতিহাস (Natural History of Religion) নামক গ্রন্থেও এই সকল বিবরণ আছে। আণবিক দর্শন শাস্ত্রের অপর পণ্ডিত এপিকিউরাস (Epicurus)। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটাসের গ্রন্থ-পাঠে ইঁহার জড়বাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইনি দেশবিদেশে জড়বাদ প্রচার করেন। চার্ব্বাক বলিতেন, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," ইঁহার উক্তিও কতকটা সেইরূপ ছিল,—"পান-ভোজন কর, ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াও, মরণের চিন্তা করিও না। মৃত্যুচিন্তা মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে। যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ মৃত্যু নাই; মৃত্যু হইলে আর আমরা থাকিব না।" সাধারণ লোক যে সকল দেবতা মানিতেন, তিনি সেরূপভাবে দেবতা মানিতেন না। শুনা যায়, ইনি সুনীতি-পরায়ণ ছিলেন।

এপিকিউরাসের মৃত্যুর অনেকদিন পরে রোমে আর একটী জড়বাদী পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাঁহার নাম,—লুক্রিটিয়াস (Lucreteous) খ্রীঃ পূঃ ৯৯ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রাকৃত-বস্তু-স্বরূপ নামে (On the Nature of Things) একখানি গ্রন্থ-প্রণয়ন করেন। ইঁহার ধারণা ছিল দেবতায় বিশ্বাস করা এবং দেবতারদ্বারাই জাগতিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপ ধারণা,—মানুষের মনের এক বিষম কু-ধারণা। পরমাণু দ্বারাই জগৎ রচিত হয় ও বিনষ্ট হয়। পরমাণুর সংযোগ বিয়োগই জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। পরমাণুগুলি নিত্য ও সত্য।

জগৎ-সৃষ্টিতে কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পুনঃ পুনঃ পরমাণুর সংযোগে-বিয়োগে, ক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায়, ঘাতে প্রতি-

যাতে চেতনার উদ্ভব হয়। পরমাণুর কার্য্য ভিন্ন তদতিরিক্ত অন্য কোন শক্তি স্বীকারের আবশ্যক দেখা যায় না। পরমাণুগুলি অনন্তকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিতে করিতে অবশেষে একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ রচনা করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে।

আমাদের সাংখ্যদর্শনকার কপিল ঋষি বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই ধরণের বিশ্ব-রচনা-প্রণালী দেখাইয়া প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ববাদ প্রবর্ত্তন করেন কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাশীল কপিল অতীব সূক্ষ্ম প্রতিভাবান্ ছিলেন। ইঁহাদের ন্যায় স্থূলজ্ঞানী ছিলেন না। ইঁহারা দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য স্বীকার করেন না কিন্তু তিনি স্থূল প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যদিও তাঁহার জগৎ-রচনা-প্রণালী অতীব স্বাধীন চিন্তার ফল, তথাপি তিনি যে বহু পুরুষবাদ বা বহু জীববাদ-সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তন করেন, তাহা অবৈদিক নহে। অজ্ঞান অচেতন পরমাণু বা প্রকৃতি দ্বারা যে এই বিচিত্র-বিশাল-বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য।

ইটালীয় দার্শনিক জীয়র্ডেনো ব্রূণো (Giordano Bruno) আমাদের কপিল দেবের শিষ্যানুশিষ্যের মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্রমবিকাশ-সাধনই (Unravaling and unfolding) প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ শক্তি হইতেই জগতের কার্য্য সাধিত হয়। এই ব্যাপার সাধনের জন্য বহিঃকর্ত্তা (External Artificer) স্বীকারের প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি স্বনিহিত শক্তি ও ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ প্রসব করেন। *

* By her own intrinsic force and virtue she brings these forms forth. Matter is not the mere naked, empty capacity which philosophers have pictured her to be, but the universal mother, who brings forth all things as the fruit of her own womb.

পূর্ব্বে এই ব্রাণো খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইলে পরধর্ম্মে অবিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইনি অভিযুক্ত হইয়া জেনেভা প্যারীস্, ইংলণ্ড এবং জার্ম্মেণীতে পালাইয়া পালাইয়া আত্মগোপন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। ১৫৯২ সালে ভেনিস্ নগরে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন, বিচারে অপদস্ত, সমাজচ্যুত এবং অবশেষে পুনর্বিচারের জন্য আদালতে নীত হন। বিচারে আদেশ হয় যে ইহাকে শিষ্টভাবে দণ্ড-ভোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন রক্তপাত না হয়। এই বিধি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহে সূচ্যগ্র ভেদ করিয়াও একবিন্দু রক্তপাত করা হয় নাই কিন্তু তাঁহার সজীব সুস্থ বলবান্ দেহটীকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে ইউরোপের এক মহাস্মরণীয় দিন।

গ্যালিলীয়ো তৎসাময়িক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটী নূতন কথা বলিয়া-ছিলেন, তাহা এই যে,—"সূর্য্যই এই সৌরজগতের কেন্দ্র" এই অপরাধে ব্রাণোর ন্যায় তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু গ্যালিলীয়ো প্রাণটীকে বড় ভালবাসিতেন। তেত্রিশ বৎসর পরে তিনি বাইবেল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি সূর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া-ছিলাম তাহা মিথ্যা। তিনি এই বলিয়া মৃত্যুর দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই পরমাণুবাদ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা হইতে আবার জাগিয়া উঠে। পেরিগ্যাসেণ্ডি আবার এই মত জাগাইয়া তোলেন। তিনি প্রথমতঃ বলেন, ভগবানই জগতের আদি কারণ। অচিরেই তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া বলেন, ভগবান্ পরমাণুতে শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, সেই শক্তিবলে পরমাণুগণ দ্বারা জগৎ রচনা হইতেছে। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের মূল-বীর্য্য জড়পদার্থে

অন্তর্নিহিত আছে। (The Principle of every change resides in matter.

এ সিদ্ধান্তটীর কিয়দংশ ভাগবত-সিদ্ধান্তের সদৃশ। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পরমাণু-কর্তৃক সৃষ্টির আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবৎ-ঈক্ষণশক্তি ব্যতিরেকে পরমাণুগণ স্বত একত্র হইতে পারে না। পরমাণু সমূহে ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে কিন্তু পরমাণুগণ ভগবৎ-শক্তি ব্যতিরেকে জগৎ-রচনায় যে অত্যন্ত অশক্ত, তাহা এই স্কন্ধেরই পঞ্চমঅধ্যায়ে লিখিত আছে। উক্ত অধ্যায়ে আটত্রিশ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন :—

"অতঃ সমম্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসম্বন্ধাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ড রচনায়াম্ অনীশা অসক্তাঃ" ইত্যাদি—। শ্রীভগবদ্গীতাতেও লিখিত আছে :—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তেসচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, জড়ে স্বভাবতঃ চেতনা নাই। ভগবানের দৃষ্টিতে জড় স্বচেতনবৎ কার্য্য করে, উহাতে ভগবৎ-শক্তি অন্তর্নিহিত থাকিয়া প্রকৃতির জগৎ-পরিণাম সাধন করেন। ইহাই পরিণাম-বাদের মূল হেতু, ইহাই দৈহিক সচেতনেত্বের ও মূল কারণ। কপিলদেব যে অচেতন প্রকৃতির দ্বারা জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদান্তিগণ-দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইয়াছে।

সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতিই জগৎ-সৃষ্টির কর্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহা ঠিক নহে। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি-প্রণালীটী মন্দ নহে, উহা কিয়ৎ পরিমাণে Darwin এর evolution বা ক্রমবিকাশ-বাদের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক-ভাবগর্ভ। সাংখ্য-দর্শনকার বলেন, প্রকৃতি-কৃতই এই সৃষ্টি,— ঈশ্বর-প্রযুক্ত নহে। প্রকৃতি আপন প্রয়োজনেও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। পুরুষের মোচনই প্রকৃতি-প্রবৃত্তির ফল স্বরূপ। সাংখ্য সূত্রের

টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "আরভ্যতে ইত্যারম্ভঃ সর্গঃ—মহদাদিভূতঃ প্রকৃত্যৈব কৃতো নেশ্বরেণ ন ব্রহ্মোপাদানোনাপ্য-কারণঃ" অর্থাৎ মহদাদিভূত সৃষ্টিব্যাপার প্রকৃতিকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে ; ব্রহ্মও ইঁহার উপাদান নহেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সাংখ্য দর্শন এস্থলে বেদান্ত মতের স্পষ্টতঃই প্রতিবাদ করিলেন। অথচ বিশ্ব সৃষ্টি ব্যাপার যে অকারণ নহে তাহাও বলিলেন। অকারণ হইলে অত্যন্ত ভাব বা অত্যন্ত অভাব এই দুই দোষ ঘটে। চিৎশক্তির পরিণাম অসম্ভব। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ও বিশ্বের উপাদান হইতে পারেন না। ঈশ্বরও বিশ্বের কর্ত্তা নহেন। অথবা ভগবদ্গীতায় যেমন বলা হইয়াছে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" একথা যুক্তিযুক্ত নহে। অধ্যক্ষতা-রূপেও প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টি করেন না। অথবা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিও বিশ্বের কর্ত্রী নহেন। কেননা, নির্ব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব। প্রকৃতি স্বার্থে ও পরার্থে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সাংখ্য দর্শন এই প্রকারে বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ, পাতঞ্জলাভিমত ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিবাদ ও নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। যদি বল যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সর্ব্বার্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন এই জগতের সৃষ্টি অসম্ভব। তাঁহাদের মত-নিরাকরণের জন্ম সাংখ্যকার বলিতেছেন,—"বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য, পুরুষবিমোক্ষ-নিমত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।" অর্থাৎ যেরূপ গাভীর অচেতন স্তনদুগ্ধ বৎসবৃদ্ধির জন্ম স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষ বিমোক্ষের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। সুতরাং সৃষ্টি-ব্যাপার সাধনের জন্ম ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এই কারিকার উপরে শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্র এই যে, "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"। অর্থাৎ অশব্দ প্রধান,—জগতের কারণ হইতে পারে না। কেননা প্রধানের চেতনা নাই

এবং শ্রুতিতেও প্রধানকে জগৎকর্ত্তা বলা হয় নাই। প্রত্যুত সৃষ্টি যে ঈক্ষণ পূর্ব্বিকা ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সুতরাং প্রধানের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে জগতের কর্ত্তা তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? তোমরা ঈশ্বরকে কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছ। তন্মধ্যে একটী বিশেষণ "অবাপ্তসর্ব্বকাম"। অর্থাৎ তাঁহার কোনও কামনা নাই। যদি তাঁহার কোনও কামনা থাকে তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার প্রয়োজন কি? যদি বল কারুণ্যই এই প্রবৃত্তির মূল, তাহাও বলিতে পার না। কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবদিগের ইন্দ্রিয়-শরীর-বিষয়ের উৎপত্তি থাকে না, সে অবস্থায় জীবের দুঃখ হয় না। তাহা হইলে কাহার দুঃখ-মোচনের জন্য কারুণ্যের উদয় হইবে? আবার যদি বল যে সৃষ্টির পরে জীবদিগের দুঃখ দেখিয়াই ভগবানের কারুণ্যের উদয় হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেননা তাহা হইলে ইতরেতরা--শ্রয়ত্ব দোষ ঘটে। কারুণ্যের দ্বারা সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির দ্বারা কারুণ্য, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যদি বল ঈশ্বর করুণা-প্রণোদিত হইয়াই জীব-দিগকে সুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি কোনও জীব সুখী কোনও জীব দুঃখী এরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কেবল কর্ম্ম-বৈচিত্র্য-বশতঃই বিশ্বে এরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এ কথাও বলিতে পার না। কেননা ভগবান্ ইচ্ছাশীল এবং বিবেচনা-পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্য কর্ম্মাধিষ্ঠানের দ্বারা; তাঁহার অনধিষ্ঠান মাত্র হইতে অচেতন কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এ যুক্তিতেও দুঃখের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখা যায়, বিশ্বোৎপত্তিতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহা অচেতন প্রকৃতিরই কার্য্য। প্রকৃতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতি অচেতন্। তাঁহার স্বার্থানুগ্রহ বা কারুণ্য তৎকার্য্যের প্রযোজক হইতে পারে না। সুতরাং তৎকর্ত্তৃত্বে

উক্ত দোষ-প্রসঙ্গের অবতারণা অসম্ভব। তবে পরার্থে প্রকৃতির প্রয়োজন স্বীকৃত হইতে পারে। যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্য গাভীর স্তন্যদুগ্ধের প্রবৃত্তি। প্রকৃতি ও তদ্রূপ পুরুষ বিমোক্ষণের জন্য সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

অপর পক্ষে বেদান্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বিশেষতঃ এই সৃষ্টি-কার্য্যে সর্ব্বত্রই যখন জ্ঞানবত্তার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, তখন জ্ঞানময় পুরুষ-শক্তিভিন্ন এই অনন্তকৌশলময় জগতের অচেতন কর্ত্তা হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের "ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ" চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের উক্ত সূত্র হইতে ২১ সূত্র পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের জগৎ কারণত্ববাদ সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার পরের সূত্র হইতে উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যে সৃষ্টি হয় না, তাহার পূর্ব্বপক্ষ বিস্তৃত করিয়া অনিমিত্তত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে :—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"

সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাদি, নিজে অনাদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। সুতরাং শ্রীপাদরূপ-সনাতনের সিদ্ধান্তিত শ্রীকৃষ্ণই যে সচ্চিদানন্দসিন্ধু এবং সর্ব্বকারণের কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে সকলেরই স্বীকার্য্য। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-কারণবাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সবিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, যথা :—

সেইত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ-মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজা গলস্তন॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেই নহে যাতে কৃষ্ণ হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥
দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডেরগণ॥

মহর্ষি কপিল অচেতন প্রকৃতিতে যে চেতনার আরোপ করেন, অচেতন দ্বারা চেতনার ন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করেন, ইহা একদিকে যেমন বেদ-বিরুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি যুক্তি-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ বহু কষ্ট কল্পনা করিয়া জড়ে চেতনার ধর্ম্ম আরোপ করেন। তাহাদের সেই সকল যুক্তি ও সুবিচার একেবারেই তিষ্টিতে পারে না, অপিচ বিজ্ঞানের মুখে সুদীর্ঘ অসার কল্পনা একবারেই অশোভনীয়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য-মত-খণ্ডন দ্বারা সেই যুক্তিতে পরমাণু কর্ত্তৃত্ববাদও খণ্ডন করিয়াছেন। যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতে সেই ধর্ম্মের আরোপ করা একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। অচেতন দৈহিক অণুদ্রুত (Corporeal molecules) চেতনার ধর্ম্ম আরোপ করিয়া জড়বাদিগণ দেহাতিরিক্ত পৃথক চৈতন্য নাই, এইরূপ

সিদ্ধান্ত করেন। বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ সূত্রের "ন চ স্মার্ত্তম্,—অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ) ভাষ্যের সাহায্যে জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইতে পারে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অচেতন। উহাতে অন্তর্যামিত্ব-ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সে ধর্ম্মের আরোপ করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। সুতরাং দেহের চেতন ধর্ম্ম নাই, আত্মাই চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

এখন জীব যে কি বস্তু, তাহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া দাঁড়াইতেছে। নব্য জীব-তত্ত্ব-শাস্ত্র (Modern Biology) নিরূপণ করিয়াছেন, (Protoplasm) চিৎকণের আধার। ঠিক্ এই কথা বলিতে বেদান্তীদের সহিত বায়োলজিষ্টগণের মতের কোন পার্থক্য হয় না। উহাতে আধার-আধেয় সম্বন্ধে চিৎকণ ও দৈহিক অণুতে পার্থক্য থাকিয়া যায়, কিন্তু ইহারা বলেন চেতনা, পদার্থেরই উচ্চ শ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষ (Function), কিন্তু তাহাতো নয়। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় চিৎ ও জড়ে পার্থক্য আছে। নিষ্প্রাণ হাইড্রোজেন্ পরমাণু, অক্সিজেন পরমাণু, কার্‌বন্ পরমাণু, ফস্‌ফরাস্ পরমাণু, প্রভৃতি দ্বারা মাস্তিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে,—বর্ত্তমান্ কেমিকো-ফিজিয়োলজিকেল বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় (Chemico Physiological Analysis) এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন মনে করুন, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণু স্বতন্ত্র অবস্থায় চেতনা-বিহীন; অতঃপরে আরও দেখুন ইহারা নানারূপে মিশ্রিত হইয়া একটী পদার্থ রচনা করিতেছে। এই পদার্থ-গঠন-প্রক্রিয়াটী যান্ত্রিক ক্রিয়ার ন্যায় (Mechanical Process) সম্পন্ন হইতেছে। এই মিশ্রণ পদার্থটীর নাম মাস্তিষ্ক পদার্থ (Brain)। আপনার সিদ্ধান্ত এই যে, এই মস্তিষ্ক পদার্থ হইতেই আপনার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, মানসিকজ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, পরিচিন্তন এবং প্রীতি, ও বিদ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপার প্রকাশ পায়। এই অচেতন পরমাণুগুলি হইতেই

আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদনুভব-বৃত্তি (Emotions) প্রভৃতির কার্য্যগুলি যে সম্পন্ন হয়, তাহা আপনি কোন প্রকারে আপনার বুদ্ধিতে আনিতে পারেন কি? কোনও প্রকারে ইহা ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন কি? দেহাতিরিক্ত পৃথক চৈতন্তের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই সকল চেতনা-বিহীন পরমাণুগণের সংযোগ বিশেষ হইতে আপনার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মানবীয় চিত্তবৃত্তির কার্য্যাবলী প্রস্ফুরিত হয়, এইরূপ ধারণা করা কি ততোঽধিক কঠিন ব্যাপার নহে?

আমি নাসিকার ঘ্রাণ-বহা নাড়িকা (Olfactory nerve) পর্য্যন্ত, মৃগনাভি-কস্তুরীর অণুর গতিবিধির তথ্য অবগত হইতে পারি। কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গের গতিও আমি অনুভব করিতে পারি। নাসা-রন্ধ্রে গন্ধবহা নাড়িকায় গন্ধদ্রব্যের অণু কি প্রকারে প্রবেশ করে, তাহাও আমি বুঝিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আরও কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার আমার জ্ঞান-গোচর হয়, তাহা এই যে, বাহ্যপদার্থের জ্ঞান-বাহিনী নাড়িকাগুলির বহিঃপ্রান্তে (Periphery) বিকম্পন উপস্থিত হইয়া তরঙ্গ-রঙ্গে উহা যে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গিয়া মস্তিষ্ক-পদার্থের অণুগুলিকে বিকম্পিত করিয়া তোলে, তাহাও আমি ধারণায় আনিতে পারি। কিন্তু উহার ফলে কি প্রকারে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান মনোবুদ্ধির কার্য্য এবং প্রীতি-বিদ্বেষের ব্যাপার ঘটে তাহা একেবারেই আমার বুদ্ধির আগম্য।

দার্শনিকপণ্ডিত প্রবর (Leibnitz) এই কাঠিন্য অনুভব করিয়া জড়ীয় পরমাণু-স্থলে মোনাড্ (Monad) নামক বস্তু বিশেষ-সমূহের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। জড়বাদের কল্পনায় এইএকভীষণ বাধা। বর্ত্তমান সময়েও ইউরোপ ও আমেরিকায় জড়দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-সপ্রমাণ করার জন্য অনেক চিন্তাশীল মনীষাসপন্ন সুলে-

থক বহুগ্রন্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। বিসপ বাটলারের লিখিত (Analogy of Religion) নামক গ্রন্থখানি এইবিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট বিচারপূর্ণ গ্রন্থ। টিণ্ড্যালপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণও এই গ্রন্থ খানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। দেহাতিরিক্ত পৃথক্ আত্মা দেহ সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াও যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে পারে, বিসপ বাটলার ইহা বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, চশ্‌মার সঙ্গে চক্ষুর যে সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেই সম্বন্ধ। চশ্‌মা যেমন নিজে কিছু দেখিতে পারে না কিন্তু দুর্ব্বল দৃষ্টির সাহায্য করে মাত্র; প্রকৃত দ্রষ্টা,—চক্ষু। আবার অপর বিচারে চক্ষু দ্রষ্টা নয়, দ্রষ্টা,—আত্মা; চক্ষু চশ্‌মার ন্যায় দর্শন-ক্রিয়া-সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ মাত্র কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানবান্ নয়, আত্মাই জ্ঞানবান্। ভাষাপরিচ্ছেদের টীকায় মুক্তাবলীতে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে, :—

"এবং চক্ষুরাদীনাংজ্ঞানকরণানাং ফলোপাধানমপি কর্ত্তারমন্তরেণ নোপপদ্যত ইত্যতিরিক্তঃ কর্ত্তা কল্প্যতে।"

দর্শনাদি ব্যাপারে তত্তৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে চিত্তের সম্বন্ধ-সংশ্রব না থাকিলে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় বর্ত্তমানে থাকা-সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। অমাদের চিত্ত যখন কোন বিষয়ে ধ্যানস্থ হয়, তখন আমাদের নিকটস্থ ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বিষয়-ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত ব্যাপারে, চিত্ত সম্পর্কবিরহিত হইলে বিষয়-জ্ঞান জন্মেনা। সুতরাং আত্মাই জ্ঞানময়, দেহ জ্ঞানময় নয়।

জার্ম্মান্ দার্শনিকগণ এই চিত্তাভিনিবেশ ব্যাপারটীকে Vorstellung নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণেরও এবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান Spiritualist গণ spirit body বা লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধে যে বিপুল আলোচনা করিয়া দেশস্থ জনগণকে

বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছেন, ভারতবাসীদের নিকট সেই সকল তথ্য অতিপ্রাচীন। তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বহুল আশ্চর্য্য ব্যাপার যোগী-দের দ্বারা সম্পন্ন হইত। কায়-ব্যূহ-রচনা, পরকায়-প্রবেশ, মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে সজীবদেহে বহুমাসব্যাপী অবস্থান এবং পুনর্ব্বার তদবস্থা হইতে ব্যুত্থান এবং সংসার-ক্ষেত্রে পূর্ব্ববদ্‌বিচরণ, জাগতিক জনগণের সহিত মৃত আত্মার কথোপকথন, আরও কত প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্র-সমূহেও আত্মার পুনর্জ্জন্মবাদ ও জাতিস্মরাদি প্রভৃতি বিষয় প্রচুররূপে আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে স্থূল দেহ, লিঙ্গ দেহ ও কারণ দেহ, এই ত্রিবিধ প্রকার দেহের উল্লেখ আছে। বেদান্ত-দর্শনে মায়াবাদিগণ এই জীববাদের সমর্থন করেন কিন্তু কপিল বহু-জীববাদী, বৈষ্ণব বেদান্তিগণও জীবাত্মার অণুত্ব, বহুত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এসম্বন্ধে অতঃপরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। আমাদের ষড়্‌দর্শন পুনর্জ্জন্ম বাদের এবং দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চেতনত্বের সবিশেষ পক্ষপাতী। উপনিষদে আত্মার অণুত্ব-সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। জৈন-দর্শন আত্মার অণুত্ব স্বীকার করেন না,—মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করেন। ইহা কতকটা স্পিরিচুয়ালিষ্টগণের 'স্পিরিট বডি' বা মানুষের আকার-সদৃশ আধ্যাত্মিক দেহের আকার তুল্য। জীবাত্মা সম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন,—

শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।

তথাত্বং চেন্দ্রিয়াদীনামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ॥

জড়দেহে চৈতন্য ধর্ম্ম নাই। কেননা মৃত্যু হইলে শরীরটী পড়িয়া থাকে কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাদি থাকে না। স্মৃতি আত্মার একটা ধর্ম্ম। যদি শরীরই আত্মা হইত, তবে আমরা বাল্যকালে যাহা দেখি, বার্দ্ধক্যে

তাহার স্মরণ হইত না। কেননা, বার্দ্ধক্যে বাল্যদেহের একটী পরমাণুও বর্ত্তমান থাকেনা। পাশ্চাত্য দেহ-বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বলেন ঃ—

"প্রতিনিয়ত দেহ-ক্ষয়ে প্রত্যেক সাতবৎসরে পরমাণু ও অণু দেহ হইতে তিরোহিত হয় এবং নব নব উপাদানে দেহ উপচিত হয়।" যদি দেহই আত্মা হইত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হইত। আপত্তিকারীরা বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ব-শরীরোৎপন্ন সংস্কার নব উপাদানে সংক্রামিত হয়, তাহাতেই স্মৃতি-সংস্কারের ধারা সংরক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এস্থলে বলেন, "The former molecules bequeath their legacies to their successors") কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, উহাতে অনন্ত সংস্কার-কল্পনা-গৌরব-দোষ ঘটে। শরীরের চৈতন্যত্ব স্বীকার করিলে অনেক প্রকার দোষ জ্ঞানগোচর হয়। একটা পুরাতন উদাহরণ দিতেছি ঃ—শিশুরা জন্মমাত্রই প্রায়শঃ মাতৃস্তন্য পান করে। ক্ষুধা-নিবারণের জন্যই স্তন্যপানের প্রয়োজন কিন্তু শিশুদের সেই সময়ে ইষ্ট-সাধন জ্ঞানের স্মারকতা-অভাব-নিবন্ধন তাহাদের স্তন্যপান-প্রবৃত্তি একবারেই অসম্ভব হইত। স্তন্যপান করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, শিশুদেহে সেই জ্ঞান আদৌ উদ্দীপিত বা উদ্ভাবিত হইতে পারে না। ইহা আত্মার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মাই প্রকৃত কর্ত্তা, শরীর তাহার করণ মাত্র।

এই প্রকার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণেরও চৈতন্য নাই, কেননা চক্ষুর অভাব হইলেও পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ থাকে। যে চক্ষু একবার কিছু দেখিয়াছে, যদি সেই চক্ষুই দর্শন-জ্ঞানের অনুভবিতা হইত, তাহা হইলে সেই চক্ষুর অভাবে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর আর স্মরণ হইত না। আসল কথা এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষে অনুভবিতা নয়, আত্মাই অনুভবিতা। চক্ষু না থাকিলেও আত্মা তো নিত্যরূপেই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং অনুভবিতার অভাব হয় না। আচ্ছা, যদি বল, চক্ষুরাদির চৈতন্য না-ই

থাকুক, কিন্তু মনের চৈতন্য মানিতে বাধা কি ! তাতেও বাধা আছে। কেননা, মন—অণু ; অণুর প্রত্যক্ষে অধিকার নাই। মহত্ত্বই প্রত্যক্ষের হেতু। এইরূপ, বিজ্ঞানেরও চেতনা নাই যেহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান, পর পর বিজ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি বল বিজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশরূপ, তাহাতে চেতনরূপ না থাকিবে কেন ? জ্ঞান সুখাদি তো তাহার আকার-বিশেষ। বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ নহে। মৃগমদ-বাসনা-বাসিত বসনে যেমন মৃগমদ-গন্ধ সংক্রামিত হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানেও আত্মার প্রকাশ-গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে। উহাতে চেতনার দ্বারা সঞ্চারিত হয় মাত্র। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান ইহার কোনটীই সচেতন নহে, কেবল আত্মাই সচেতন। এই জীবাত্মার স্বরূপ জানিবার জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট শ্রীপাদরূপও সনাতনের জীব-বিষয়ক প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তদীয় "First Principles" নামক গ্রন্থের Ultimate Scientific Ideas নামক তৃতীয় অধ্যায়ে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন এই যে, যে পদার্থের চিন্তা করে, সে পদার্থটী কি। তিনি নিজে এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ডেকার্টেস্ বলেন, আত্ম-প্রত্যয়ই আত্মার অস্তিত্বের মূল। "I am as sure of it as I am sure that I exist।" হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, ইহাতে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বুঝা যায় না, আর ইহা লইয়া এঁকাধিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, আত্ম-প্রত্যয় জ্ঞানটা কোথা হইতে হয় ? "আমি আছি" এইরূপ জ্ঞান কি মনের ধর্ম্ম কিম্বা "অহং" (Ego) বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা কি তাহারই ধর্ম্ম ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই অহং একটী দ্রব্য\পদার্থ (Entity)। আমরা যে চিন্তাকরি তাহাকি কোন পদার্থের বাহ্যক্রিয়া ? অথবা

সেই অনুভব বস্তুটী এবং আমাদের অনুভব কি একই পদার্থ? সন্দেহ-বাদীরা মনে করেন, আমাদের অনুভব ও পরিচিন্তনাদি দৈহিক ক্রিয়ার ন্যায় মানসিক ক্রিয়া-বিশেষ। আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একটা কথা ভাবিবার বিষয়, তাহা এই যে,—বহির্জগৎ আমাদের উপরে বহুল ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়াগুলি কাহার উপরে বহির্জগতের ভাবের ছাপ (Impressions) দেয় এবং তাহা কি পদার্থ? কোন পদার্থের উপরে যে এই ছাপ পড়ে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহবাদীরা 'সম্বিৎ বা জ্ঞান মাস্তিষ্ক ক্রিয়ার ফল'—এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিতে চাহেন, এবং তাহা হইতে যে আত্ম-প্রত্যয় হয়, এই তথ্য বুঝাইতে চাহেন। তাঁহারা অন্যান্য বাহ্যজ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, কেবল আত্ম-প্রত্যয়টীই কি অসত্য? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান এই সম্বন্ধে যাহাই উত্তর করুন না কেন, আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাসটী একান্ত অপরিহার্য্য।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন, আমাদের আত্মা, চিত্ত বা মন,—যাহাই হউক না কেন,—(a bundle of states of consciousness, as matters are possibly a bundle of sensible qualities) জনষ্টুয়ার্ট মিলের এই বাক্যে আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিক Mr. Mansel আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই কিন্তু ক্যাণ্টের অনুচরগণ স্থান-জ্ঞানকে বস্তুগত (objectivity of space) বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, অহম্ প্রত্যয় এবং ইদম্ প্রত্যয়,—এই উভয়ের A perceiving subject and a perceived object) মিলনে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইহাকে আদিম দ্বৈতজ্ঞান (Primitive dualism of consciousness) বলা যাইতে পারে। আমাদের শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজামাতৃমুনি ও তদনুচর শ্রীরামানুজাচার্য্য এই অভিমত স্বীকার করেন। ইহাও সেই "স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ" অর্থাৎ আমি আমাকে জানি। আত্ম প্রত্যয় এই যে, আমি যে আছি, ইহা আমি

জানি। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে জ্ঞাতাই—জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতাই-জ্ঞাত, অর্থাৎ উভয়েই এক। A true Cognition of self implies a step in which the knowing and the known are one, in which subject and object are identified দার্শনিক পণ্ডিত Mansel এই সিদ্ধান্তে আস্থা সংস্থাপন করেন না। তাঁহার মতে ইহা ইতরেতরাশ্রয় দোষ। (Annihilation of both) অর্থাৎ পৌরাণিক সুন্দ ও উপসুন্দ এই দুই ভ্রাতা যেরূপ নিহত হইয়াছিলেন ইহাতেও তেমনি "অহমিদম্" এই উভয় পক্ষেরই বিনাশ হয়।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছেন যে,—জগৎতত্ত্বের ন্যায়, শক্তিতত্ত্বের ন্যায়, জীবতত্ত্বও অজ্ঞেয়। যদিও শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ঈশ্বরতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এবং তদন্তর্গত মায়াতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতিকে অচিন্ত্য (unthinkable and unknowable) বলিয়া সাধারণতঃ বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সংস্থাপিত সিদ্ধান্ত,—"অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে", তথাপি তিনি জগদীশ্বরের অশেষ কল্যাণগুণময়ত্ব, জীবের অণুত্ব, নিত্যত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও পুনর্জ্জন্মত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বাদির অচিন্ত্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রমাণার্থ পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতু তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতেভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব, প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত ব্যাপার হইতে ভিন্ন। সুতরাং ইহাঁদের তত্ত্ব-নির্ণয় করাও সুদুষ্কর। তথাপি শাস্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতানুসারে তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন।

দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় আছে তন্মধ্যে জীবতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতম। জীব পদার্থ কি ইহা লইয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র যেরূপ শ্রমযত্ন সহ আলোচনা করিয়াছেন বিজ্ঞান ও এ বিষয়ে তেমনি অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান-ব্যাপার কখনও বা দুইটী নির্ঝরণীর ন্যায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া অবশেষে দুই ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে এবং এক হইতে অপরটী এত অন্তরাল হইয়াছে যে, উহাদের সম্মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আবার কখনও বা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সুদূর প্রসারিত হইয়াও অবশেষে সম্মিলিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীব যে ভগবদংশ এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে। এমন কি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন মহোদয়গণ উচ্চকণ্ঠে জগৎকে জানাইয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে,—"জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ"। ইঁহার এই উক্তি বেদ বেদান্তানুমদিত বলিয়াই শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাসের উপর ইনি স্বীয় উক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার ইঁহাদেরই তুল্য বেদবাদী ব্রহ্মর্ষি মহাত্মগণ, শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিচার-নিপুণ শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়াছেন, ব্রহ্ম,—চিৎসিন্ধু ; জীব তাঁহারই কণাবিন্দু ; ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ; জীব—সুখদুঃখ-ময় ; কিন্তু উভয়ই চেতন, উভয়ই নিত্য। জীব অণু ও বহু,—ব্রহ্ম এক ও বিভু। জীব মায়ামর ব্রহ্ম মায়াধীশ। জীব-কর্ম্ম-বশী, ব্রহ্মকর্ম্ম-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিতা। জীবও ব্রহ্ম এইরূপ ভিন্ন লক্ষণ-বিশেষ। জীব ব্রহ্মেরই তটস্থ-শক্তি ও তদধীন। অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে ;—

১। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণা পঞ্চধা সংবিবেশ। মুণ্ডকে।

২। বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেতাশ্বতরে।

৩। আরাগ্র মাত্র হ্যবরোপি দৃষ্টঃ। তত্রৈব।

"আরাগ্রাত্থিতং মানম্ আরাগ্রমাত্রম্" ইতি বাচস্পতি মিশ্রঃ। তোত্রপ্রোথিত শালাকার নাম—আরাগ্র উহার দ্বারা উত্থিত পদার্থের মান "আরগ্র মাত্র" নামে অভিহিত।

ব্রহ্মসূত্রের নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে আত্মার অণুত্ব সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে :—

১। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্। ২। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ৩। নাণুরতশ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ৪। শব্দোন্মাভ্যাঞ্চ।

গতাগতি সম্বন্ধে শ্রুতি এই:—"এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষোবা মূর্দ্ধ্নোবা অন্যেভ্যো বা শরীর দেশেভ্যঃ যে বৈ কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে—ইতি বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে।

অর্থাৎ এই আত্মা চক্ষু মস্তক অথবা শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রামণ করে। যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে, সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরগামী হয়। সে চন্দ্রলোকে গমন করে। কর্ম্ম করিবার জন্য আবার চন্দ্রলোক হইতে উহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আগমন করে। উৎক্রান্তি গতি ও আগতি আত্মার এই ত্রিবিধ নিয়ম শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ায় জীবের পরিচ্ছন্নতাই জানা যায়। বিভু বা পূর্ণ ব্যাপক পদার্থের উৎক্রান্ত্যাদি আবশ্যক হয় না।

একটী বিরোধ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা বৃহদারণ্যকে :—

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই সকল শ্রুতিতে আত্মা মহান্ ও আকাশবৎ সর্ব্বগত প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন এই সকল শ্রুতি পরমাত্মপর।

"স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে স্বশব্দ অণুত্ববাচী শব্দ

এবং উন্মানদ্বারা আত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। স্ব শব্দ অর্থাৎ "অণু" শব্দ। এষোঽণুরাত্মা" এই আত্মা অণু। সুতরাং শ্রৌত প্রমাণে আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ষোড়শ সূত্র হইতে ৫৩ সূত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় পাদের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল জীবতত্ত্বেরই আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য জীবের অণুত্ববাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার ভাষ্য, আত্মার বিভুত্ববাদের সমর্থক, তবে জীবাত্মা যে নিত্য, চেতন, কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, কর্ম্মবশ ইত্যাদি তাঁহারও স্বীকার্য্য। মায়াবাদী বেদান্তী ও বৈষ্ণব বেদান্তিদের বাদ-বিচার অতঃ-পরে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। এস্থলে জীবাত্মার একটী অত্যুত্তম লক্ষণ-সংগ্রহ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন আচার্য্য শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়-গুরু শ্রীজামাতৃমুনির উপদিষ্ট জীবের স্বরূপ-লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল :—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এবচ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥
আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো নচ।
ন দেহো নেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন নাপি ধীঃ॥
ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্॥

চেতনো ব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণুর্নিত্যনির্ম্মলঃ॥
তথা জ্ঞাতৃত্ব-কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নিজধর্ম্মকঃ।
পরমাত্মৈকশেষত্বস্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বতঃ॥

শ্রীজামাতৃমুনি-প্রোক্ত উল্লিখিত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে প্রণব-ব্যাখ্যানে লিখিত আছে। এই শ্লোকগুলিতে জীব-লক্ষণ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীও পরমাত্মসন্দর্ভে জীবাত্মার লক্ষণ বলিয়া এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে জীব, জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন, জড়প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অজ, নির্ব্বিকার, একরূপ, স্বরূপভাক্, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অক্ষর, পরমাত্মার শেষভূত। অপিচ জীব হরির দাস, অন্যের দাস নহে।

তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন:—এই আত্মা,—দেব, নর, তির্য্যক্, স্থাবর, দেহ, ইন্দ্রিয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইহার কিছুই নহে। এই আত্মা, জড়, বিকারী, বা জ্ঞানামাত্রাত্মকও নহে। ইনি একরূপ, স্বরূপভাক্, চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য নির্ম্মল, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তাদি নিজ ধর্ম্মক, পরমাত্মার একশেষত্ব স্বভাব এবং আপনাতে আপনি প্রকাশ। এই সকল লক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। মূলে শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-ব্যাখ্যায় জীবতত্ত্ব-কথন স্থলে জীবের প্রত্যেক লক্ষণের ব্যাখ্যা, শ্রীভাষ্য ও পরমাত্ম-সন্দর্ভাদির অভিপ্রায় অবলম্বনে লিখিত হইবে।

জীব যে অতি সূক্ষ্ম ও অণু-পরিমিত এবং অনন্ত ইত্যাদি লক্ষণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের স্বীকৃত নহে কিন্তু উপনিষদ্ বহুস্থলে জীবকে অণু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন:—

"এষোঽণুরাত্মা" ইত্যাদি,—মুণ্ডকে; "বালাগ্র শতভাগস্ত" ইত্যাদি,—শ্বেতাশ্বতরে; "আরাগ্রমাত্র" ইত্যাদি,—শ্বেতাশ্বতর ৫।৮।

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব" ইত্যাদি—শ্রীভগবদ্গীতায়;

গুণিনামপ্যহং সূক্ষ্মং মহতাং চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়নামহং মনঃ॥

মায়াবাদ ব্যাখ্যা বজায় রাখার জন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যার গৌণার্থ করিয়াছেন এবং গোঁজামিল দিয়া গা-জোড়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবাত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্র ভাষ্যের ২।৩।২৯ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন:—

"তস্মাদ্দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্ববচনমুপধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্।"

অর্থাৎ জীবকে যে "অণু" বলা হইয়াছে, তাহা দুর্জ্ঞেয়ত্ব অভিপ্রায়ে, অথবা উপাধি অভিপ্রায়ে। শ্রীধর স্বামী "সূক্ষ্মাণামপ্যহং" জীব শ্লোকের টীকারম্ভে শঙ্করেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"তদেতদণুত্বমাহ—সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবইতি তস্মাৎ সূক্ষ্মতা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ যদ্ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতম্। মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্মণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পরপ্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্যানন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্যভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চমধ্যে হি সর্ব্বকারণত্বান্মহত্তত্ত্ব মহত্ত্বং নাম ব্যাপকত্বং নতু পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া দুর্জ্ঞেয়ত্বং যথা তত্ত্বং প্রপঞ্চে জীবা নামাপি সূক্ষ্মত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্যম্, শ্রুতয়শ্চ:—

১। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি।

২। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীব স বিজ্ঞেয় ইতি।"

৩। "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট ইতি চ।"
অর্থাৎ সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত জীব দুর্জ্ঞেয় পদার্থ ও সূক্ষ্মনামে অভিহিত হয়, কিন্তু এখানে তাহা বিবক্ষিত হয় নাই। "মহৎ সমূহের মধ্যে মহান্ ও সূক্ষ্ম সমূহের মধ্যে জীব" এই বাক্যদ্বয় পরস্পর প্রতিযোগী। সূক্ষ্ম শব্দ দুর্জ্ঞেয় অর্থে ব্যবহৃত হইলে এই দুই বাক্যের আনৈক্যোর্থ্য-উক্তিতে যে স্বারস্য আছে, তাহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এখানে সেরূপ অর্থ অসঙ্গত। প্রপঞ্চ মধ্যে যেমন সর্ব্বকারণতা-হেতু মহত্ত্বের মহত্ত্ব ;—উহা ব্যাপক হইলেও পৃথিব্যাদি অপেক্ষা উহা সুজ্ঞেয় নহে। সেইরূপ প্রপঞ্চে জীবের সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎ পরমাণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই শ্লোকের স্বারস্য।

সূক্ষ্মদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভেও এই টীকাটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিস্তুতির "অপরিমিতা ধ্রুবাঃ" পদ্যটী জীবের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভেও "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" এই শ্লোকাংশ ব্যাখ্যার পরেই শ্রুতি-স্তুতির উক্ত শ্লোকটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামি-মহোদয় শ্রীপাদ জীবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই স্বীয় গ্রন্থে এই তত্ত্বের আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। এস্থলে "অপরিমিতা ধ্রুবাঃ" পদ্যটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্লোকটী এই :—

অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভূতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহা হইতে জাত, শ্রুতিতে ইহা জানা যায়। কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা যখন

বিভু- চৈতন্য পরমাত্মার অংশ সুতরাং জীবও বিভু একথা অযুক্ত। সেই অযুক্ততা-প্রদর্শনের নিমিত্তই শ্রীভাগবতে শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে "হে ধ্রুব সত্য সনাতন ভগবন্, অনন্তসংখ্যক নিত্য জীবগণ যদি সর্ব্বগত (বিভু) হইত, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব থাকিত না এবং উহারা শাস্ত্র এরূপ নিয়মও থাকিত না। ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব নিয়ম্য। ইহাই বেদকৃত নিয়ম। শ্রুতি বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইহাতে জায়মানত্বাবস্থায় ব্যাপ্যব্যাপক ভাবে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণের এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে উপাদান হইতে যাহা জাত হয়, জায়মানের সম্বন্ধে যাহা নিয়ন্তৃ হয়, সেই নিয়ন্তৃ সততই স্বরূপাংশে বা শক্ত্যাংশে জায়মানের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তকের অভাবে প্রবর্ত্তিতের উদ্ভব অসম্ভব। যিনি পরমাত্মাকে অপর বস্তুর সমান বলিয়া মনে করেন, তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধান্তদুষ্টতানিবন্ধন অবিজ্ঞাত। কেন না, শ্রুতি বলেন :—

১। অসমো বা এব পরো নহি কশ্চিদেব দৃশ্যতে সর্ব্বৈস্ত্বেতে ন বা জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ ছিদ্রগ্রাহ্যেতে ভবন্ত্যথ পরো না জায়তে ন ম্রিয়তে সর্ব্বে হ্যপূর্ণাশ্চ ভবন্তীতি—চতুর্ব্বেদ শিখায়াম্।

২। ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

৩। ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ।

(বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ,—বিষ্ণুপুরাণে)

৪। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীভগবদ্গীতার একটী প্রমাণ-বচন লিখিত হইয়াছে, তদ্যথা :—

যথাপ্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

উপসংহারস্থ জীব-পরিমাণের নির্দ্দেশক প্রমাণটী বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরেও আছে।

বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা।
তস্যাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥

অতঃপরে শ্বেতাশ্বতরীয় বালাগ্র শতভাগস্য শ্রুতিটী এবং পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। তোষণীর সিদ্ধান্ত ও পরমাত্মসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত মূলতঃ প্রায় একই রূপ। কিন্তু পরমাত্মসন্দর্ভের উপসংহারে একটী উপাদেয় মীমাংসা দৃষ্ট হয়, তদ্‌যথা :—

যৎতু শ্রীভগবদ্গীতাসু "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদিনা জীবনিরূপণং তত্র সর্ব্বগতঃ শ্রীভগবানেব। তৎস্থস্তদাশ্রিত শ্চাসাবণুশ্চ ইতি সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ জীবঃ প্রোক্তঃ।

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্গীতায় যে "নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জীব লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, তৎস্থলে শ্রীভগবানই "সর্ব্বগত" শব্দের বাচ্য। তাঁহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত অণু স্বরূপ জীবও তজ্জন্য সর্ব্বগত নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের এই ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যা-সম্মত। শ্রীপাদ রামানুজের মতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—জীবের স্বরূপ নিয়মাত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ন্তৃত্ব। ইহাই বুঝাইবার জন্য এই শ্লোক। ভগবন্ তুমি ধ্রুব, নিত্য-স্বরূপ,। শ্রুতি বলেন নিত্য সমূহের মধ্যে তুমি নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে তুমি মূলচেতন। সুতরাং জীবগণ নিত্য এবং অসংখ্যেয়। জীবগণ সর্ব্বগত হইলে শাস্য-শাসক নিয়ম থাকে না। জীব বিভু হইলে জীবও ঈশ্বর সমান হয়। শাস্যতার অভাব ও নিয়মাতার অভাব-বারণের জন্যই এই শ্লোক।

শ্রীকবিচূড়ামণি চক্রবর্ত্তী তদীয় অন্বয়বোধিনী টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাস সূরির দীপিকায় এবং "সুদর্শন" সূরির শুকপক্ষীয় টীকায় "ধ্রুবাঃ" পদটীর "অস্পন্দাঃ" অর্থ করিয়া অন্য রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা তত্ত্বদীপি-

কায়াম্ঃ—"অপরিমিতাঃ অসংখ্যেয়া স্তনুভৃতো জীবা যদি সর্ব্বগতাঃ ধ্রুবাঃ অস্পন্দাঃ স্যুঃ তর্হি "উৎক্রান্তি গত্যাগতিঃ" শ্রুতি-বিরোধস্যাৎ" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য তদীয় সুবোধিনী টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যার উপসংহারে এবিষয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের একটী সিদ্ধান্ত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তদ্ যথা :—

নিয়ন্তা জীব-সজ্যস্ত হরি স্তেনাণবো মতাঃ
জীবা ন ব্যাপকাঃ কাপি চিন্ময়া জ্ঞানিনাং মতাঃ।

অর্থাৎ জীবসমূহের নিয়ন্তা—একমাত্র হরি। জীবসমূহ অণু, চিন্ময় ও অব্যাপক, ইহাই জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত।

বিজয়ধ্বজ অতি প্রাচীন টীকাকার। ইঁহার টীকার উপসংহারেও জীবের অধীনতা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা :—

"স্বতন্ত্রোনাপরঃ কশ্চিৎ বিষ্ণোঃ প্রাণপতেঃ প্রভোঃ"
বিষ্ণুই জীবসমূহের নিয়ন্তা। তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বতন্ত্র নহে।

জীবের অণুত্ব সপ্রমাণ করার নিমিত্ত বেদান্তসূত্রের ২ অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২৩ হইতে ২৮ সূত্রপর্য্যন্ত আরও কয়েকটী সূত্র আছে যথা :—

(১) অবিরোধশ্চন্দনবৎ। (২) অবস্থিতিবৈশিষ্যাদিতিচেন্নাভ্যুপ-গমাদ্‌হৃদি হি। (৩) গুণাদ্বা লোকবৎ। (৪) ব্যতিরেকো গন্ধবৎ। (৫) তথা দর্শয়তি। (৬) পৃথগুপদেশাৎ ;—এই কয়েকটী সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীর-ব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহৈকদেশস্থ আত্মাও সকল দেহব্যাপী বেদনাদির উপলব্ধি (অনুভব) করেন। ত্বক্-সম্বন্ধ থাকায় ঐরূপ উপ-লব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বক্‌সম্বন্ধ, সমুদায় ত্বকে থাকে; ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপিনী, সেই কারণে প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপলব্ধি সম্পন্ন হয়।

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত।

যেহেতু উহা দার্ষ্টান্তিকের সমান নহে। যদি আত্মার একদেশস্থিতি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অদ্যাপি আত্মার দৈহিক দেশস্থতা নির্ণীত হয় নাই) চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, একদেশে অপ্রত্যক্ষ; তাহা অনুমেয়, একথা বলিতে পার না। অনুমান অসম্ভব। (আত্মা অল্প; তৎপ্রতি হেতু, ব্যাপিকার্য্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অনুমান অযুক্ত)। দেহব্যাপিনী বেদনা কি সকল দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মা ব্যাপী বলিয়া অনুভূতা হয়? অথবা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ সংশয়িত অনুমান অগ্রাহ্য। প্রতিবাদী এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন বলিতেছেন - চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্ত সদোষ নহে। চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও দৈহিকদেশে অবস্থান কথিত হইয়াছে। কোথায়? তাহা বলিতেছি। আত্মা হৃদয়দেশে অবস্থান করেন, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। যথা—"এই আত্মা হৃদয়ে।" "সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা।" "হৃদয়ে কোন্ আত্মা?" "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়" "হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ" ইত্যাদি। অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে, যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত সমদৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন, দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ।

বীজ অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও চৈতন্য গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ন ও প্রদীপ একস্থানে থাকে; কিন্তু তাহার প্রভা গৃহব্যাপিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে। সেইরূপ আত্মা অণু ও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, তাই সকল দেহব্যাপী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব, তাহার সূক্ষ্মাংশ (পরমাণু) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণ যোগ্য সূক্ষ্মাংশ নাই, সেজন্য

অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া "গুণাদ্বা" সূত্র বলা হইল। বলিতে পার, গুণ গুণী পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে অন্যত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রের শুক্ল গুণ কি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বৃত্তিমান্ হয়, অর্থাৎ অবস্থিতি করে? দীপপ্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না। কেননা, তাহাও দ্রব্য, গুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব তেজের নাম দীপ, আর বিরলাবয়ব তেজের নাম প্রভা। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্র বলা হইতেছে—

যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদ্‌দ্রব্যের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ্‌দ্রব্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্তস্থানে ব্যাপ্ত হয়, যেমন পুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও গন্ধ গুণকে পাওয়া যায়, সেইরূপ, জীব অণু হইলেও তাঁহার চৈতন্যগুণের ব্যতিরেক (অন্তস্থানে সংক্রম) হইতে পারে। অতএব "গুণত্বাৎ" হেতুটী অনৈকান্তিক। গুণ আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক কুত্রাপি যায় না ব্যাপ্ত হয় না, ইহা নিয়মিত বা সার্ব্বত্রিক নহে। কেন না গন্ধগুণে ঐ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়)। যে হেতু গন্ধগুণকে আশ্রয় ত্যাগ করিতে দেখা যায়, সেই হেতু, গুণের আশ্রয় বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্ব্বত্রিক। গন্ধ ও সূক্ষ্ম আশ্রয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধপরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে), একথা বলিতে পার না। কেন না, যে মূল দ্রব্য হইতে গন্ধবৎ পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় হওয়া মানিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মূল দ্রব্যের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা হীনগুরুত্বাদি হইত (আয়তন ও ওজন কমিত)। বলিতে পার, গন্ধাধার অংশ (পরমাণু) সকল বিশ্লিষ্ট হয় কিন্তু অত্যন্ত অল্প (সূক্ষ্ম) বলিয়া তাহা লক্ষ্য হয় না। এইস্থলে আমাদের বক্তব্য, গন্ধপরমাণু সর্ব্বদিকে প্রসৃত (বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত) হয়, সে সকল নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধজ্ঞান জন্মায়, একথা বলিবার উপায় নাই। কেন না পরমাণু মাত্রেই অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় নহে। অথচ নাগকেশরাদিতে ব্যক্ত গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য

আঘ্রাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হয়। আশ্রয় পরিত্যক্তরূপ উপলব্ধ হয় না, জ্ঞানগোচর হয় না, তদ্দৃষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতিরেক হয় না, একথা বলিবার অযোগ্য। গন্ধের আশ্রয় ব্যতিরেক (বিশ্লেষ) প্রত্যক্ষ ; সেই কারণে তাহা অনুমানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনই অনুমান করা কর্ত্তব্য। রসগুণ, তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, রূপাদিও গুণ সুতরাং রূপাদিও জিহ্বার দ্বারা জানা যাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শ্রুতি, আত্মার স্থান হৃদয়, পরিমাণ অণু এই সকল বলিয়া "লোম পর্য্যন্ত নখাগ্র পর্য্যন্ত" এইরূপ উক্তিতে চৈতন্যের দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর ব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন।"

"প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া" এই শ্রুতিতে আত্মাকে কর্ত্তা (আরোহণ ক্রিয়ার) ও প্রজ্ঞাকে করণ বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, চৈতন্য গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা। "বিজ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্য গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সুপ্ত হন।" এই প্রত্যগুপদেশ (কর্ত্তৃরূপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নতা কথন), উপদেশ ও চৈতন্যগুণের দ্বারা আত্মার দেহব্যাপিতা অভিপ্রায়ের পোষক। অতএব আত্মা অণু।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদরূপকে যে শ্রৌত প্রমাণটী বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

"কেশাগ্র-শত ভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্ম-স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ।

এই শ্লোকটীর পাঠ-পাঠান্তর সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীল কবিরাজ এই শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থ হইতে পাইলেন তাহার সন্ধান পাই নাই। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় লিখিত আছে শ্রীভাগবতের ৮৭ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই

শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিলাম ২৬ শ্লোকের টীকায় আদৌ এই শ্লোক নাই। ব্যাখ্যাকার মহাশয় "অপরিমিতা ধ্রুবা" শ্লোকটিকেই ২৬ সংখ্যক শ্লোক বলিয়া অপর টীকায় লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত সংস্করণে "অপরিমিতা ধ্রুবা" শ্লোকটী ৩০ সংখ্যক ; সম্ভবতঃ অন্য সংস্করণের গ্রন্থে উহা ২৬ সংখ্যক শ্লোক বলিয়া ধৃত হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতে অনেকগুলি টীকা আছে বলিয়া আমরা প্রত্যেক টীকাতে এই শ্লোকটীর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ঠিক অবিকল এই শ্লোকটী দেখিতে পাইলাম না। তবে "অপরিমিতা ধ্রুবা" শ্লোকের টীকায় উক্ত ভাবাক্রান্ত এবং প্রায় এতদ্রূপ একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক ধৃত হইয়াছে। এই শ্রুতিটী পঞ্চদশীতেও জীব প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পাঠ ভিন্ন। সেটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রুতি, তদ্‌যথা :—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধাকল্পিতস্যচ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

এই শ্রুতিটী শঙ্কর ভাষ্যে, রামানুজ ভাষ্যে, ভাস্কর ভাষ্যে এবং আরও বহু ভাষ্যে জীব-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটী অতি বিখ্যাত কিন্তু ইহার যথেষ্ট পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, যথা পরমাত্ম-সন্দর্ভে :—তথাচ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে জীবতত্ত্ব-নিরূপণে :—

ন তস্য রূপং বর্ণো বা প্রমাণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
ন শক্যঃ কথিতুং বাপি সূক্ষ্মশ্চানন্ত বিগ্রহঃ।
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
তস্যাং সূক্ষ্মতরো জীবঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অন্বয়বোধিনী টীকাতেও এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় তদ্‌যথা :—

বালগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্যচ।
ভাগো জীবো স বিজ্ঞেয়ঃ সুখদুঃখফলৈকভাক্॥

কৃষ্ণধর্মোত্তরে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, যথা :—

বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা।
তস্যাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পাঠ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু উক্ত পাঠটি যে তৎপরবর্ত্তী লিপিকরগণের কল্পিত নহে তাহা মূলের পয়ার-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াই বুঝা যায় তদ্‌যথাঃ—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

এইপয়ার "শতাংশ সদৃশাত্মকো জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং" বাক্যেরই খাটি অনুবাদ। এই শ্লোকটী সুবিখ্যাত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি— 'বালাগ্রশত-ভাগস্য" শ্লোকেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীনাচার্য্য উক্ত শ্লোকটীর তাৎপর্য্যাবলম্বনে এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন। এইরূপ তাৎপর্য্যশ্লোক-বিরচনের একটী গুহ্য হেতুও অতি স্পষ্ট। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শেষ পদে ("স চানন্ত্যায় কল্পতে") অবলম্বন করিয়া জীবের অণুত্ব-খণ্ডনের নিমিত্ত তুমুল বিবাদ করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ২।৩।২৯ এই সূত্র-ভাষ্যে লিখিত আছে :—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

ইত্যণুত্বং জীবস্যোক্ত্বা পুনরানন্ত্যমাহ,—তচ্চৈবমেব সামঞ্জস্যং স্যাৎ যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য ভবেৎ পারমার্থিকমানন্ত্যম্। ন হ্যুভয়ং মুখ্যমেব কল্পতে, ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্ সর্বোপ-নিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ ইত্যাদি।

অর্থাৎ শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের যে পরিমাণ হয়, জীব সেই পরিমাণ। সেই জীব অনন্ত

অর্থাৎ অসীম। শাস্ত্র জীবকে একবার অণু বলিয়া আবার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। যদি অণুত্ব ঔপচারিক ও আনন্ত্য পারমার্থিক অর্থে গৃহীত হয় তবেই এই শাস্ত্র-বাক্যের সঙ্গতি হইতে পারে। অণুত্ব ও আনন্ত্য দুইটী মুখ্য বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না। আনন্ত্যকে ঔপচারিক বলিতে পার না, কেন না ব্রহ্মস্বভাব প্রতিপাদন করাই সমুদায় উপনিষদের অভিপ্রেত।

"অনন্ত্যায় কল্পতে" পাঠটীই এই তর্কোত্থাপনের হেতু-স্বরূপ মনে করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শ্লোকটীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আদৌ উক্ত অংশ স্বীকার না করিয়া অন্যরূপ পাঠের সমাবেশ করিয়াছেন, যেমন "সুখ দুঃখফলৈকভুক্। তস্যাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে" ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান শ্বেতাশ্বতর গ্রন্থের শ্লোকটীকে সংশোধন করিয়া সম্ভবতঃ কোন বৈষ্ণব ভাষ্যকার শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকটী শ্রুতি-সম্মত করিয়াছেন। ইহাতে জীবাত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদকতার কোনও তর্ক উঠিতে পারে না। "স চানন্ত্যায় কল্পতে" পাঠের স্থানে "সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ" বলায় আর অসীমত্বের বা বিভুত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অনন্ত,—অর্থাৎ সংখ্যাতীত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করার সুবিধা পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কারণে পরবর্ত্তী কোন বৈষ্ণবাচার্য্য কোন গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় এই পাঠ ঠিক করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির পরিস্ফুট তাৎপর্য্যদ্যোতক উক্ত শ্লোকটীই গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের ধারণা।

আমরা বেদবেদান্ত হইতে প্রথমতঃ জীব সম্বন্ধে কতিপয় প্রধানতম সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছি :—

১। জীব-জন্ম-মরণ বিরহিত—সুতরাং নিত্য। "জন্ম-মরণ" শব্দ

স্থাবর জঙ্গম দেহ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, জীব—সম্বন্ধে নহে। এসম্বন্ধে উপনিষদাদিতে বহুল শ্রৌত-প্রমাণ আছে।

(ক) জীবাপেতং বাবকিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। (খ) স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ সন্ ম্রিয়মানঃ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। (গ) ন জীবো ম্রিয়তে। (ঘ) স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম। (ঙ) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। (চ) অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ। শাঙ্কর ভাষ্যে ধৃত শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দুইটী সূত্রে এই সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। সূত্র দুইটী এই :—

১। চরাচরব্যাপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্ত স্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।

২। নাত্মাঽশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।

অতঃপরেজীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জানা যায় :—

(১) জীব জ্ঞাতা—জ্ঞান স্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা। জীব যদি চিন্মাত্র হইত, তাহা হইলে মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিতে জীবের জ্ঞানভাব অনুভূত হইত না। "নাহং খল্বয়মেবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এব ইমানি ভূতানিতি।" মোক্ষদশাতেও জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।" রামানুজের মতে জীব জ্ঞাতাও জ্ঞান স্বরূপ। বেদান্ত-সূত্রকার বলেন :—"জ্ঞোতএব" অর্থাৎ এই আত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ। শঙ্করভাষ্যে আত্মা জ্ঞান মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্তিত। কিন্তু রামানুজাদির মতে উক্ত সূত্রানুসারে জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ইতি—প্রশ্নোপনিষৎ ৪।৯

শঙ্করভাষ্য ও নিম্বার্ক ভাষ্য এই দুইটী সূত্র জীবের জন্মমরণ-রহিতত্ব প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিম্বার্ক মতের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীনিবাস আচার্য্য বেদান্তকৌস্তভে প্রথমোক্ত সূত্রটীর যে পদব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

অগ্রিমসূত্রাদাত্মেতি পদং লভ্যতে। যোঽয়মাত্মন উৎপত্তিবিনাশয়োর্ব্যপদেশো লৌকিকঃ স ভাক্তঃ স্যাৎ। জীববিষয়ে গৌণোঽস্তীত্যর্থঃ। কুত আহ মুখ্য ইত্যত আহ "চরাচরব্যাপাশ্রয় ইতি জঙ্গমাজঙ্গমশরীরবিষয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ "তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" তদ্ভাবে শরীরভাবে উপত্তিবিনাশয়োর্ভাবিত্বাৎ।"

এই ব্যাখ্যান শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ। কিন্তু প্রথমোক্ত সূত্রটী রামানুজভাষ্যে জীবতত্ত্ব প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। রামানুজের মতে এই সূত্রটী তেজোঽধিকরণের অন্তর্গত। রামানুজ বলেন :—

চরাচরব্যাপাশ্রয় ইত্যাদ্যুচ্যতে চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় স্তদ্ব্যপদেশস্তদ্বাচিঃ শব্দঃ চরাচর বাচিশব্দো ব্রহ্মণ্যভাক্তো মুখ্য এব ; কুতঃ ব্রহ্মভাবভাবিত্বাৎ সর্ব্বশব্দানাং বাচক ভাবস্য নামরূপ ব্যাকরণ শ্রুত্যাহি [illegible]গতম্। ইতি তেজোঽধিকরণং সমাপ্তম্।

আমাদের শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও রামানুজের মতানুসরণ করিয়া তদ্ব্যবহৃত পদাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন :—

"চরাচরব্যাপাশ্রয় স্তদ্ব্যাপদেশো জঙ্গম-স্থাবর-শরীরবাচক স্তত্তচ্ছব্দো ভগবত্যভাক্তো—মুখ্যঃ স্যাৎ। কুতঃ তদ্ভাবেতি তদ্ভাবস্য সর্ব্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচক ভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধং ভবিষ্যত্বাৎ।"

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচক শব্দসমূহ ভগবানে মুখ্য,—গৌণ (ভাক্ত) নহে। কেন না বেদান্তাদি শাস্ত্র-শ্রবণের পর উঁহাদের অর্থানুভব হইলে সকল শব্দেরই ভগবদ্বাচক ভাবের ভবিষ্যত্ব ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্ রামানুজের ভাষ্যের "ব্রহ্মণি" স্থলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভগবতি" পদের প্রয়োগ

করিয়াছেন মাত্র। শঙ্কর ও ভাস্কর এই সূত্রে "ভাক্ত" শব্দ দেখিতে পাইয়াছেন কিন্তু রামানুজ ও বিদ্যাভূষণ উহাকে "অভাক্ত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপিতু রামানুজ "নাত্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্র হইতেই আত্মাধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরও ইহাই স্বীকৃত। অর্থাৎ এই আত্মা দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা ইত্যাদি। বৈশেষিক মতে আত্মা আগন্তুক চৈতন্য, সুগতও কপিল মতে নিত্য চৈতন্য চার্ব্বাক মতে দেহই চৈতন্য, দিগম্বর মতে দেহাতিরিক্ত তৎপরিমাণক, লোকায়তিক মতে জীব ভূতচতুষ্টয়োৎপন্ন, বৈভাসিক মতে ক্ষণিক বাহ্যার্থ, যোগাচারাভিমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ, মাধ্যমিক অভিমতে উহা শূন্য মাত্র। বেদান্তকৌস্তুভ প্রভায় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অভিমত নিরাকৃত হইয়াছে। বেদান্ত-কৌস্তুভে শ্রীনিবাসাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

"জীবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্ববানেব।"

অপিচ "তস্মাৎ অহংপ্রত্যয়গোচরোঽয়মাত্মা জ্ঞানস্বরূপজ্ঞাতেতি।" আমাদের [illegible]ভূষণ মহাশয় অবিকল এই সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

জীবের উৎপত্তিবাদ সম্বন্ধে রামানুজ "যস্মাঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ" ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ; কেহ কেহ এই শ্রুতিকে জীবের উৎপত্তি-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা বলা যায় না যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য। জীবের যখন ব্রহ্মত্ব আছে, তখন জী[illegible]ত্য। সুতরাং ইহার উৎপত্তি নাই। এই বিষয় সপ্রমাণ করার জন্য তিনি কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

১। জ্ঞাজ্ঞৌদ্বাবজাবীশানীশবীবিতি।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

২। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তত্রৈব

শঙ্করভাষ্যে ধৃত শ্রুতিগুলিও রামানুজ ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামানুজ এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। যাহা হউক পূর্ব্বে একটী শ্রুতিতে

জীবোৎপত্তিপ্রতিপাদক ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বহুশ্রুতি উহার বিরোধী। তাহা হইলে কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিজ্ঞার অনুপরোধ হইতে পারে? ইহার মীমাংসা এই যে জীবের কার্য্য দেখিয়াই উহার একটা ঔপচারিক উৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। অদৃষ্টবতী তমোশক্তি ও জীবশক্তি এই উভয় শক্তিক ব্রহ্ম অবস্থান্তরাপন্ন হইলেই কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। জীব ও প্রধানাদি পদার্থ উভয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া অতঃপরে রামানুজ বলিতেছেন:—ইয়াংস্তু বিশেষঃ— বিয়দাদেরচৈতনস্ত যাদৃশো অন্যথাভাবো, ন তাদৃশো জীবস্ত। জ্ঞান-সঙ্কোচবিকাশলক্ষণো জীবস্তান্যথাভাব, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্যন্যথাভাবলক্ষণঃ।"

অর্থাৎ বিশেষ এই যে, বিয়দাদি অচেতন পদার্থের যে প্রকার অন্যথাভাব বা পরিণাম ঘটে, জীবের পরিণাম সেরূপ নহে—উহা জ্ঞানের সঙ্কোচবিকাশলক্ষণবিশিষ্ট। দেহাবচ্ছিন্ন জীবের জ্ঞান-সঙ্কোচ ঘটে, দেহ মুক্তিতে উহার জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু অচেতন পদার্থ স্বরূপতই অন্যথা অভাব প্রাপ্ত হয়। আমাদের শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন:—

"ইয়াংস্তু বিশেষঃ। প্রধানাদেব চৈতন্যস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্যথাভাবে, জীবস্তু ভোক্তৃর্জ্ঞানসঙ্কোচবিকাশাত্মনেতি।" ভোগ্য পদার্থই জাত, ভোক্তাজীব জাত নহে। জাতপদার্থ স্বরূপতঃ অন্যথাভাব (পরিণাম) প্রাপ্ত হয়। ভোক্তা-জীবের পরিণাম কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশ মাত্র। জীবের কখনও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব হয় না। এতদ্দ্বারা [illegible] বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জড়পদার্থ, শক্তি ও জীবাত্মা সম্বন্ধে ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার স্বাধীনভাবে বহুল চিন্তা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের বেদান্তিগণ যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি সে সকল সিদ্ধান্তের কোনটী স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ইঁহার মতে

সচ্চিদানন্দ পদার্থের স্বতঃ অস্তিত্ব যেমন তর্ক-বিরোধী ; ইহার সংশয়ত্বও তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ। উহাকে অদ্বৈত বলাও যেমন প্রতিবাদজনক, বহু বলাও তেমনি দোষাবহ। এইরূপ সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ, ব্যক্তি বা অব্যক্তি, ক্রিয়াশীল বা নিষ্ক্রিয় ; সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সমষ্টি বা অংশ,—ইহার কোন প্রকারই যুক্তিসঙ্গত নহে। নাস্তিক্যবাদ, সর্ব্বভূতে ভগবদস্তিত্ববাদ, (Pantheism) বা ঈশ্বরবাদ কোনটীই ইহার মতে তর্কসহ নহে। অবশেষ আমাদের ভগবৎ ধারণা-সম্বন্ধে যে একটী উচ্চতম তত্ত্ব আছে, হার্ব্বাট স্পেন্সার তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "Further developments of theology, ending in such assertions as that "A God understood would be no God at all," and "To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy, exibit this recognition still more distinctly. It pervades all the cultivated theology of the present day. So that while other elements of religious creeds one by one drop away, this remains and grows ever more manifest, and thus is shown to be the essential element.

Here, then, is a truth in which religions in general agree with one another, and with a philosophy antagonistic to their special dogmas.

If Religion and Science are to be reconciled, the basis of roconciliation must be this deepest, widest, and most certain of all facts—that the power which the Universe manifests to us is inscrutable.

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং তদীয় জে'ষ্ঠতাতদ্বয় সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্‌কে "অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্য্য" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যখনই

ভগবানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, ইঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়াছেন,—তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং কার্য্য মানব যুক্তির অগম্য, মানব-বুদ্ধির অচিন্ত্য, মানুষের যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব, অবোধ্য ; বিরুদ্ধবিবিধ শক্তির সমাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি মানবীয় যুক্তিতর্কের অধীন নহে এবং মানুষের বিচার দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। ফলতঃ প্রত্যেক দেশেরই ভগবদ্বিশ্বাসী লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ;" শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন,—"বিদূর-কাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্," হে ভগবন্, কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায়না। ইউরোপীয় ভক্তেরাও বলেন,—"Oh God, inscrutable are Thy ways."

মানব সমাজ ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধানে যতই অধিক দূর অগ্রসর হইবেন, ততই ভগবানের তত্ত্বানুসন্ধান-সম্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধান্ত জন-সমাজে জ্ঞাপিত হইবে। আলোক যত বাড়ে, অন্ধকারের পরিধি তত অধিক প্রসরতর হয়। তলবকার উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—"যস্যা-মতং তস্যমতম্" অর্থাৎ যিনি বলেন, আমি ভগবানকে জানিয়াছি তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। যিনি বলেন, আমি কিছুই জানি না, তিনি বরং কিছু জানেন।

শক্তিতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধেও পণ্ডিত প্রবর হারবার্ট স্পেন্সারের এইরূপ অভিপ্রায়। জীবও শক্তিরই মূর্ত্তিবিশেষ, ইহাই তাঁহার অভিমত। কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াও তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছেন উহা অজ্ঞেয় (unknowable), মানুষের চিন্তায় উহার নির্ণয় হয় না।

বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী শক্তি সম্বন্ধেও ইঁহার সেই সিদ্ধান্ত। ইনি ঈশ্বর-কারণ-বাদ, স্বতঃ সৃষ্টিবাদ(Self-created), স্বতঃ পরিণাম বাদ, ঈশ্বরেক্ষণ-জনিত পরিণাম বাদ, আরম্ভ বাদ বা পরমাণুবাদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার

বাদেরই অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরমাণুবাদ সম্বন্ধে ড্যালটন (Dalton) ও নিউটন (Newton) প্রভৃতির অভিমত, রুস বৈজ্ঞানিক বস্কোভিকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন, পরিশেষে বস্‌কোভিকের (Boscovich) সিদ্ধান্তেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে নিউটনের সিদ্ধান্ত বস্‌কোভিকের অলীক কল্পনা হইতে কতকটা নির্দ্দোষ। ইহার উত্তরে বস্‌কোভিকের কোন শিষ্য যদি বলেন যাঁহারা অণুপরমাণুর সংযোগে জগদুৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়াসী, তাহাদের নিকটে জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ শক্তিতে চরম পরমাণুগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হয় ? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে উহা যোগাকর্ষণের ফল (A cohesive Force)। ইহার পরে যদি আবার প্রশ্ন হয় যে প্রবল বল দ্বারা পৃথক্ কৃত বা ভগ্ন আণবিক অংশ আবার কি প্রকারে আবার সংযুক্ত হয়, ইহার উত্তরেও বলা হয়—'সেই কার্য্যও ঐরূপ সম্পন্ন হয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার তর্কবিতর্কই ইহারা এক কথায় খণ্ডিত করিতে চাহেন। অবশেষে ইহাদিগকে বস্‌কোভিক-কল্পিত "শক্তি-কেন্দ্র" (Centres of Forces) সিদ্ধান্তে যাইয়া উপনীত হইতে হয়, কিন্তু ইহাও ধারণার অতীত। * হারবার্ট স্পেন্সার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড

* Thus it would appear that the Newtonian view is at any rate preferable to that of Boscovich. A disciple of Boscovich, however, may reply that his master's theory is involved in that of Newton, and cannot indeed be escaped. "What holds together the parts of these ultimate atoms ?" he may ask. "A cohesive force," his opponent must answer. "And what." He may continue, "holds together the parts of any fragments into which, by sufficient force, an ultimate atom might be broken ?" Again the answer must be—a cohesive

কেলভিনের (Lord Kelvin) পরমাণুবাদ (Vortex Atom) সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও ইনি তর্ক তুলিয়াছেন। †

ফলতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তও অজ্ঞেয়তা বাদের অভিমুখী। কিন্তু ভগবৎশক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্তই প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

force' "And what," he may still ask, "If the ultimate atom were reduced to parts as small in proportion to it, as it is in proportion to a tangible mass of matter—what must give each part the ability to sustain itself?" Still there is no answer but—a cohesive force. Carry on the mental process and we can find no limit until we arrive at the symbolic conception of Centres of forces without any extension.

Matter then, in its ultimate nature, is as absolutely incomprehensible as Space and Time. Whatever supposition we frame leaves us nothing but a choice between opposite absurdities.

† To discuss Lord Kelvin's hypothesis of vortex-atoms, from the scientific point of view, is beyond my ability from the philosophical point of view, however, I may say that since it postulates a homogenous medium which is strictly Continuous (non-molecular), which is incompressible, which is a perfect fluid in the sense of having no viscosity, and which has inertia it sets out with what appears to me an inconceivability. A fluid which has inertia, implying mass, and which is yet absolutely frictionless, so that its parts move among one another without any loss of motion, cannot be truly represented in Consciousness. Even were it otherwise, the hypothesis is held by Professor Clerk. Maxwell to be untenable.

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে :—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

অর্থাৎ যাঁহার পরস্পর বিরোধি শক্তি-সমূহ এই সকল বাদিবিবাদি-গণের মধ্যে মুহুর্মুহু আত্ম-মোহের সৃষ্টি করে সেই অনন্ত গুণশালী ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি।

শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাঁহার মায়াশক্তি ও স্বরূপ আপাতত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ। অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ শ্লোকে লিখিত আছে :—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেক মনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥"

অর্থাৎ আপন আপন বর্গে (group) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরস্পর বিরুদ্ধ-গতিবিশিষ্ট। এই সকল বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুনির্ব্বাহ করে, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা এক অনন্ত আদ্য আনন্দমাত্র অবিকার ব্রহ্মকে বন্দনা করি।

আর একটী প্রমাণ এই যে —

"সর্গাদি যোঽস্য অনুরুণদ্ধি শক্তিভি
র্দ্রব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধ-বিরুদ্ধ-শক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈপুরুষায় বেধসে ॥" ভাঃ ৪।১৭।২৮

অর্থাৎ যাঁহার শক্তি দ্রব্যের আকারে, ক্রিয়ার আকারে, কারকের আকারে, চেতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সকল শক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানময় পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি।

ফলতঃ শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যতই বিচার করা যায় ততই উহার দুর্জ্ঞেয়তাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চদশীর চিত্রদীপে লিখিয়াছেন:—মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। মায়ার লক্ষণ এই যে:—

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥
নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ ॥
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ।

যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এতাদৃশ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। সুতরাং মায়ার স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব।"

"এই জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশমান কিন্তু ইহার যে কোন বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও তাহার বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ জগৎকে মায়াময় বলিয়াছেন। সুতরাং পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিলে স্পষ্টই ধারণা হইবে যে মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব।"

যদি জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এই জগতে কোন এক বস্তুর তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পান, তথাপি কোন্-না-কোনপক্ষে অবশ্যই তাহাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে এবং তাঁহারা তাহার প্রকৃত তথ্য

নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন।" পঞ্চদশীর চিত্রদীপে জীবদেহ ও উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে ইহার অতি উত্তম উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিত্যজ্ঞানই সর্ব্বস্ফূর্ত্তির কারণ। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে স্ফূর্ত্তি নাই। এই অপরিচ্ছিন্ন নিত্যজ্ঞান কোন প্রকারেই প্রমেয় নহে। প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে এই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপর অখিল জ্ঞানের নিবর্ত্তক। ইহার সহিত ইতর বস্তুর স্পর্শন অসম্ভব, সুতরাং শূন্যের ন্যায় এই জ্ঞানের প্রতীতি হয়। বিবেকাবস্থায় কেবল অস্তিত্বমাত্র দ্বারা পারিশেষ্য প্রমাণ সাহায্যে এই জ্ঞানের প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং স্ফূর্ত্তিমাত্র সন্দর্শনেই যদি এই জ্ঞানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা করিতে পার, কিন্তু কৈবল্যদশায় এই শক্তির আদৌ কোন প্রকার স্ফূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এই শক্তিত্ব বলে পৃথক বস্তুত্বের স্বীকার করিয়া চিদেকমাত্র আত্মায় অপর বস্তুর ন্যায় ক্রিয়া বিরোধের আশঙ্কা নাই। কেন না, চিদেক পদার্থ স্বপ্রকাশ বস্তু, ইহার প্রকাশের নিমিত্ত অপর বস্তুর প্রয়োজন হয় না, ইহাই মায়াবাদীদের যুক্তি।

কিন্তু মায়াবাদীরা যে কৈবল্য স্বীকার করেন তাহা নির্দ্দোষ নহে। কৈবল্য আনন্দের সত্তাই কেবলত্বানন্দস্ফূর্ত্তি কিন্তু কৈবল্যাবস্থায় আনন্দের সত্তামাত্র জ্ঞান ব্যতীত স্ফূর্ত্তি স্বীকৃত হয় না। যাঁহার স্ফূর্ত্তি নাই, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়ের ন্যায় জড়। এই প্রকারে নিজে বা অপরে কুত্রাপি যদি স্ফূর্ত্তির পরিচয় না পাওয়া যায়, তাদৃশ পদার্থ হয়ত জড়বৎ অথবা শূন্যবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। *এইরূপ কৈবল্য লাভে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? মায়াবাদীরা বলিয়া থাকেন স্বরূপাবস্থানই পুরুষার্থ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কৈবল্য স্বীকার করিলে এই স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুষার্থে দোষ বটে, সুতরাং স্বরূপশক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই গ্রন্থের ভূমিকা সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বহুল জটিল সূক্ষ্ম-চিন্তাপূর্ণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। মূল গ্রন্থে

সেইসকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে সুকোমল-বুদ্ধি পাঠক পাঠিকাগণের বহুল অসুবিধা হইত, অথচ শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষায় এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের সমাবেশ না করিলে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণবৎ প্রতিভাত হইত। এই ভূমিকায় লীলা-কথার উল্লেখ না করিয়া এবং সেই লীলার তরল-মধুর তরঙ্গ না তুলিয়া, তরঙ্গ বৈদান্তিক আলোচনার প্রতপ্ত শুষ্ক মরুতে বিচরণকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, পাঠক মহোদয়ের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে এবং এজন্য কেহ কেহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

সুমধুর লীলারসের সরসবর্ণন পাঠক মাত্রেরই হৃৎকর্ণের রসায়ন, উহা সকলেরই মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ, আমরা তাহা জানি। কিন্তু কি করিব? শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তসমূহকে কেবল লীলা-কথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন নাই। যাঁহারা সুতর্ক ও সুযুক্তিপ্রিয়, যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শনের ভিতর দিয়া ভগবৎতত্ত্ব বুঝিতে চাহেন, পরমকারুণিক মহাপ্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত দার্শনিক যুক্তির যথেষ্ট আলোচনাময় উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপকে তিনি কেবল সুমধুর কাব্য-রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের অফুরন্ত উৎস উৎসারিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা সেই সকল উপদেশের সূত্রমাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু শ্রীপাদ গোস্বামিগণের গ্রন্থেমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত সমূহের বিপুল আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইয়া উঠে। শ্রীভগবানের শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেরই তাহা সুবিদিত। কিন্তু সেই উপদেশ অতি সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণ যাহাতে শ্রীচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত বিশদরূপে ও বিস্তৃতরূপে জানিতে ও

বুঝিতে পারেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তজ্জন্য ভগবৎতত্ত্ব জীবতত্ত্ব ও সাধ্যসাধন তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়। বিবিধ গোস্বামিগ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব বিকীর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যা ও যুক্তিতর্কাদির সহিত যাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা চিন্তাশীল পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করা যায়, তাহাই আমাদের অভিপ্রায়। যাঁহারা প্রেমভক্তির মন্দাকিনী স্রোতে নিমজ্জিত আছেন, যাহারা তর্কযুক্তির অপর পারে যাইয়া আনন্দ-ময়ের আনন্দ-রস-মদিরায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ তথাগত মহানুভাবগণের নিমিত্ত আমাদের এ প্রয়াস নহে। মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছিলেন :—

শাস্ত্রেযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।

উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার ॥ শ্রীচৈঃ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং শাস্ত্রযুক্তির আলোচনা দেখিয়া বৈষ্ণবের ভয় করা অকর্ত্তব্য।

এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সুবিখ্যাত আচার্য্য শ্রীপাদরূপ ও শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সূক্ষ্ম দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রেমভক্তির তথ্য এবং অশেষ-কল্যাণ-গুণগণ-নিলয় শ্রীভগবানের উপাস্যত্ব সংস্থাপিত করিয়া এই পার্ষদ ভ্রাতৃযুগলের শিক্ষার্থ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,সেই সকল সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের কিছু আভাস এই ভূমিকায় প্রদত্ত হইল। ইহাতে ভগবৎশক্তিতত্ত্ব এবং তদন্তর্গত মায়াতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে আলোচিত হইল। এই সকল তত্ত্ব সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়া ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইল। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞ পাঠকগণের অজ্ঞাতও জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বিন্যস্ত করা হইল এবং এই উপায়ে মূল গ্রন্থখানিকে অপেক্ষাকৃত সুখ-পাঠ্যরূপে প্রকাশিত করার যথেষ্ট সুবিধা করা হইল। শক্তিবাদের সহিত মায়াবাদের পরমার্থতঃ প্রতিকূল সম্বন্ধ রহিয়াছে।

শক্তিবাদ সংস্থাপিত না হইলে জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও অশেষ ভজনীয় গুণশালী ভগবৎতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হয় না। এইজন্যগৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি—শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইল। ইহাতে একশ্রেণীর কোমল হৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে এই সুবিধা হইল যে তাহারা মূল গ্রন্থখানিকে কঠোর বা তাদৃশ ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করিবেন না। অপর দিকে যাহারা দার্শনিক আলোচনা করিতে ভাল বাসেন, তাহারা যথাক্রমে ধারাবাহিকরূপে শক্তিতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতির শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাবিতর্ক দেখিতে পাইবেন।

ভূমিকা যদিও কাহারও কাহার মতে কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু বিষয়ের গুরুতা ও প্রয়োজনীয়তা-বিচারে এই ভূমিকা অতি দীর্ঘ বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। প্রত্যুত গ্রন্থের কলেবর আরও বৃহত্তর করিতে পারিলে ভূমিকার আয়াতন আরও দীর্ঘতর করা যাইত। বহুল আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীরূপ-সনাতনের শিক্ষা হইতে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। ভূমিকায় কেবল দার্শনিক তত্ত্বই আলোচিত হইল. ইঁহাদের কাব্যরসালঙ্কারাভিজ্ঞতার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, মূলেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইবে কিন্তু আমি আমার আত্মতৃপ্তির উপযোগিনী সবিশেষ আলোচনা নানাবিধ কারণে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ ইহাতে বহু ত্রুটি দেখিতে পাইবেন। কৃপা করিয়া আমাকে জানাইলে আমার আত্ম-শোধনের সুবিধা হইবে এবং তজ্জন্য আমি অবশ্যই ভ্রম-প্রদর্শক মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ইত্যলং বিস্তরেণ—

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৩৩৪ সাল, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা।

নিবেদন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই কয়েক অধ্যায়ে যে প্রণালীতে শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের প্রতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এই গ্রন্থেও সেই প্রণালী-অনুসারে মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল। বিষয়-গুলি অতীব গুরুতর। সিদ্ধপুরুষের লিখিত গ্রন্থের মর্ম্ম অনুভব করা সাধন-ভজন-বিহীন ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি-মহাশয় যে বয়সে প্রভুর এই চরিতামৃত লিখিয়া ছিলেন, আমিও সেইরূপ জরাতুর বার্দ্ধক্য অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তহইয়াছি। তিনি কিন্তু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাহার উপরে আবার স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল-দেব তাঁহার প্রতি এই গ্রন্থ লেখার আদেশ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগণের কৃপা-আশীর্ব্বাদও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই দীনহীন জনের কোনও সাধন-সম্পদ নাই, ভক্তগণের এবং শ্রীভগবানের কৃপালাভের কোনও যোগ্যতা আমার নাই,—এতদ্ব্যতীত যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, শ্রমচিন্তা, অধ্যয়ন-অধ্যবসায় লিপিকলা-কুশলতা ও নিষ্ঠাময়ী ভগবদ্ভক্তি এই রূপ গ্রন্থ-বিরচনে প্রয়োজনীয়,—তাহা কিছুই আমাতে নাই। কিন্তু মনোরথের তো অগম্য স্থল নাই, উহা ভূলোকে দ্যুলোকে ও বৈকুণ্ঠ-গোলকে সর্ব্বত্রই বিচরণ-শীল।

প্রিয় পাঠক-মহোদয়গণ, আমার এই ধৃষ্টতা অবশ্যই আপনারা ক্ষমা করিবেন, ক্ষমা করার কি কারণও আছে। এই গ্রন্থে শ্রীগৌর-গোবিন্দের ভুবন-পাবন, সর্ব্ব-দোষ-নাশক মধুমাখা নাম বহুবার লিখিত হইবে। ইহাতে সাধু-সজ্জনগণ আমার সকল দোষই ক্ষমা করিতে পারি-বেন। কূপের জল, তীর্থ-জলের ন্যায় পবিত্র নহে, যমুনা-জাহ্নবীর পূত-পবিত্র সলিলের ন্যায় উহা আদরের যোগ্য নহে কিন্তু সেই কূপোদককে যখন শালগ্রাম-শিলার স্নান হয়, তখন উহা শ্রীচরণামৃত! তখন উহাঁর প্রত্যেক বিন্দুই দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার পরম পবিত্রতা-জনক বলিয়া সকলেই সাদরে উহা গ্রহণ করেন, ইহা শ্রীপাদ রূপেরই উক্তির অনুবাদ মাত্র, এবং ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

মঙ্গলাচরণ

বন্দে গুরুনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তৎচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণ-চৈতনসংজ্ঞকম্ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনকরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীর-জন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ
শ্রীচৈতন্য-কৃপা-ভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

যাঁহারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-গান-নৃত্যপরায়ণ, প্রেমামৃত-সাগরসদৃশ, ধীর-অধীর জনের প্রিয়, লোকের প্রিয়কর, নির্ম্মৎসর, সর্ব্বজনের পূজিত শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র, ভব-ভার-বহ জনের ত্রাণকর্ত্তা,—আমি সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট গোপালভট্ট ও শ্রীজীবের বন্দনা করি। ১

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ । ২ ॥

যাঁহারা নানাশাস্ত্রবিচার-নিপুণ, সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপক, লোকহিত-কারী যাঁহারা ত্রিভুবন মান্য, সর্ব্বজন শরণ্য ও রাধা-কৃষ্ণ-ভজন-মত্তমধুপ, আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে-রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ।৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনায় যাঁহারা শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীগোবিন্দগানামৃতে-যাঁহারা পাপতাপশান্তি করেন, যাঁহারা আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনে সুনিপুণ, এবং কৈবল্য-বিস্তারক,—আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডল-পতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ
গোপী-ভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহুঃ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

যাহারা রাজাধিরাজগণের সঙ্গ-সম্মান-ভোগ-বিলাসত্যাগী, কন্থা কৌপীন-ধারী, দীনবন্ধু এবং সতত গোপীভাব নিমগ্ন, তাহাদিগকে বন্দনা করি।

কূজৎ কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানা রত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে
রাধাকৃষ্ণ মহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥

বিবিধ বিহগ কল কূজিত রত্নময় বৃন্দাবনে যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজন ও জীবের মঙ্গল সাধন করিতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি।

সংখ্যা-পূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌচ যৌ
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতে র্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।৬॥

যাঁহারা সংখ্যা-পূর্ব্বক নামজপ-গান-নতিস্তুতি তে কাল অতিবাহিত করিতেন, যাঁহারা আহার-নিদ্রা জয়ী ছিলেন, যাঁহারা অত্যন্ত দীনবেশে বিচরণ করিতেন, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্মৃতি-মধুরিমায় আনন্দ-মোহে বিমুগ্ধ থাকিতেন,—আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

রাধাকুণ্ডতটে-কলিন্দী-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষদশয়াগ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুর্ণ বরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ, রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।৭॥

যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ততায় নানা ভাবদশাপ্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, হরিগুণগান করিতেন, কখনও বা আনন্দে ভাবাভিভূত হইতেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
গোবর্দ্ধন-কল্প-পাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈ র্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৮॥

"হা রাধে, হা কৃষ্ণ, হা ললিতে তোমরা কোথায়" এই বলিয়া যাঁহারা ব্রজের নানাস্থানে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ ও বিলাপ করিতেন, আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করি

শ্রীমৎ রূপ-সনাতন-

—শিক্ষামৃত—

প্রথম অধ্যায়—প্রবর্ত্তনা

প্রসন্ন সলিলা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান,—পুণ্য পবিত্রতাময় প্রয়াগতীর্থে শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু গৌর-শশী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীচরণান্তিকে শ্রীরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান; বাত-বিচলিত বংশপত্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ-যষ্টি বিকম্পিত হইতেছিল, নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ, দুই এক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল—তিনি কি-জানি-কি বলিতে উদ্যত হইলেন, বলিতে গিয়াও সহসা বলিতে পারিলেন না, ভাষা গদ্‌গদ হইয়া পড়িল—কিয়ৎক্ষণ পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী দুই একজন ভক্ত শুনিতে পাইলেন,—শ্রীরূপ ভক্তিগদ্‌গদ বিনয়-মধুর ভাবে মৃদুকণ্ঠে আধ-আধ অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন :—

> 'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদায়তে
> কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।'

শ্রীরূপের প্রণতি-বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, প্রেমময় প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—উভয়ে প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইলেন—অনুজ অনুপম ও অন্যান্য কতিপয় ভক্ত, অবনত মস্তকে ভক্ত ও ভগবানের এই মধুময়-মিলন-দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। প্রভু নিজে উপবেশন

করিলেন, শ্রীরূপকে শ্রীচরণসমীপে বসাইলেন। তখন শ্রীরূপ প্রভুর চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তিবিনম্র মৃদু কণ্ঠে বলিলেন,—দয়াময়, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গৃহান্ধকূপ হইতে শ্রীচরণ-নখ-চন্দ্রের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে টানিয়া আনিয়াছেন,—এখন এ অজ্ঞের হৃদয়ের অন্ধকার কিরূপে দূরে যায়, কি প্রকারে ভগবৎতত্ত্ব-জ্ঞান-চন্দ্রিকা এহৃদয়ে উদিত হয়, কিরূপে ভক্তিরসে এই চিত্তমরু পরিষিক্ত হয়, এবং এই শুষ্কহৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হয়, কৃপা করিয়া সেই উপদেশ করুন। আমি অজ্ঞ, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের কিছুই জানিনা, সেবারও কিছুই জানিনা,—কেবল ঐ শ্রীচরণ-রেণুই আমার সর্ব্বস্ব—কিসে আমার গতি হইবে—কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

প্রভু স্নেহ-মধুর প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—'শ্রীরূপ, তোমার কিছুই অজ্ঞাত নাই, সাধুদের স্বভাবই এই যে, জানিয়াও তাঁহারা মর্য্যাদা-সংরক্ষণের জন্য এবং দার্ঢ্যের জন্য শিক্ষালাভের প্রশ্ন করেন। এই বিনয়, তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত ভক্তের উপযুক্তই বটে,—এই বলিয়া প্রভু শ্রীরূপের মস্তকে ও বক্ষে স্বীয় শ্রীকরস্পর্শ করিলেন; শ্রীরূপের সমগ্র দেহের মধ্য দিয়া যেন এক সুস্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। তাঁহার মনে হইল,—যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-জ্যোতি তাঁহার সমগ্র দেহে নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরূপ নয়ন নিমীলিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, ধ্যান-মজ্জিত তাপসের ন্যায়, নিশ্চল নিস্পন্দভাবে রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর কৃপা-উপদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন,—শ্রীরূপ, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করিয়াছেন, তাঁহার দয়া অসীম। আমি তোমায় প্রথমতঃ তাঁহার ভক্তিরসের কথা বলিব—কিন্তু কি বলিব?—সে কি বলিবার বিষয়!—'

"পারাবার-শূন্য —গম্ভীর ভক্তি-রস-সিন্ধু ।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥"

কিন্তু ভক্তিকথা বলিবার পূর্ব্বে তোমায় সংক্ষেপতঃ একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি। ভক্তি, ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধনা—প্রেম উহার প্রয়োজন। কিন্তু এই ভক্তি-প্রাপ্তির অধিকারী কে, এই উপদেশপ্রাপ্তির যোগ্য কে—পূর্ব্বে তাহা জানা আবশ্যক। এই ভক্তিদ্বারা কাহার কি উপকার হয়, তাহা পূর্ব্বেই জানা কর্ত্তব্য। মায়াবদ্ধ জীবের জন্যই ভক্তি-উপদেশের প্রয়োজন। অতএব ভক্তি-উপদেশ শ্রবণের পূর্ব্বক্ষণে জীব-লক্ষণ শ্রবণ কর।

"কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ" ॥

জীব অতি সূক্ষ্মবস্তু,—কেশের অগ্রভাগ কত সূক্ষ্ম! উহারও শতভাগ করিলে উহার এক এক অণু কত সূক্ষ্ম হয়, তাহা ধারণায় আনাও কঠিন,—জীব তাদৃশ অতি সূক্ষ্মতম অণু-সদৃশ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" "সূক্ষ্মপদার্থ সমূহের মধ্যে আমি জীব।", ইহাতে বুঝা যাইতেছে—যে জগতে যত সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, জীবের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ আর কিছুই নাই। শ্রুতি বলেন "এষোঽণুরাত্মা" এই আত্মা অণু; এস্থলে অণু—অর্থ পরমাণু। পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আর কিছুই নাই। পরমাণুই অংশ-বিভাগের পরাকাষ্ঠা।

আত্মা অণু হইলেও সমগ্র দেহের চেতয়িতা। মণি-মন্ত্র-ঔষধাদির প্রভাব হইতে চমৎকারজনক ফল হয়—তাহা যুক্তিদ্বারা স্থির করা যায় না, আত্মারও তেমনি প্রভাব বশতঃ গুণে ইহা অণুমাত্র হইলেও এতদ্দ্বারা সমগ্র দেহ সচেতন হয়। জীবের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ আর কিছুই নাই,। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, আত্মা দুর্জ্ঞেয় এইজন্যই সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। আত্মা যে দুর্জ্ঞেয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে

জীবের সূক্ষ্মত্ব বলা হইয়াছে তাহা পরমাণু সদৃশ বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। কেন না, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আমি মহৎ সমূহ হইতে মহান্ এবং সূক্ষ্মসমূহের মধ্যে জৈব পদার্থের তুল্য সূক্ষ্ম। তাহা হইতে সূক্ষ্ম তো আর কিছুই নাই, আমি সূক্ষ্ম সমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম পরাকাষ্ঠা জীব"।

শ্রীরূপ, জীব যে অতি সূক্ষ্ম, শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়ে শ্রুতিগণও তাহা বলিতেছেন, যথা :—

"অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদিসর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুবা নেতরথা
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মত-দুষ্টতয়া।"

ইহার অর্থ তোমার জানাই আছে। তথাপি তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণের জন্য বলিতেছি—জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহা হইতেই আবির্ভূত, ইহাই শ্রুতির অভিমত। জীব চিৎকণ ও ভগবদংশ সুতরাং জীবের বিভুত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব শাস্ত্রযুক্তিসম্মত নহে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন," হে ভগবন্, জীব যখন অনন্ত ও নিত্য ইহাদিগকে বিভু বলিলে জীব ও ঈশ্বরে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা ভাব থাকে না। ব্রহ্মবিভু, জীবও যদি বিভু হয়, তবে উভয়ই সমান হইল। বাস্তবিক পক্ষে জীবে ও ভগবানে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা, শাস্যশাসকতা, নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাব আছে। ঈশ্বর নিয়ামক, জীব—নিয়ম্য, ইহাই বেদের বিধান। জীবকে বিভু বলিলে এই নিয়ম থাকে না। জগতে এইরূপ জীব অসংখ্য। জীব—বিভু নয়—একও নয়—ইহা সূক্ষ্ম। জগৎ অনন্ত জীবের লীলাভূমি। জীব অণুসদৃশ হইলেও চিৎকণ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্—চিৎসিন্ধু; জীব তাঁহারই-কণা—চিৎবিন্দু। এই চিৎশব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান নয়—ইহাতে প্রেমও বুঝিতে হইবে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ প্রেম-সিন্ধু; জীব তাঁহারই স্বজাতীয় বস্তু—প্রেম-বিন্দু। জ্ঞান ও প্রেম আত্মনিষ্ঠ নিত্যধর্ম্ম; আত্মার সহিত

সমবেত সম্বন্ধে সম্বন্ধ। কণাদ সম্প্রদায়ী বৈশেষিকগণ মনে করেন চৈতন্যাদি আত্মার আগন্তুক ধর্ম্ম—তাহা নহে; গুণের সহিত গুণীর সম্বন্ধের ন্যায় চৈতন্যাদিতে আত্মার সমবেত নিত্য সম্বন্ধ। জ্ঞান ও প্রেম আত্মারই স্বরূপ। জীব,—নিত্য, জন্মমরণহীন, প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন, অনাদি পরতত্ত্ব-জ্ঞানের সংসর্গ-অভাবে জীব, ভগবানের কথা ভুলিয়া যায়, ইহাই ভগবদ্‌বৈমুখ্য। জীব ভগবদ্‌বিমুখ হইলেই মোহিনী মায়া জীবের হৃদয়ে আপন অধিকার বিস্তার করে। মায়া স্বীয়া আবরিকা শক্তিতে জীবের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জ্ঞানকে সমাবৃত্ত করে,—জীব যে ভগবৎ দাস এই জ্ঞান আর তখন থাকে না। আবার অন্য দিক দিয়া মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তি,—জড় দেহেই আত্মবোধ জন্মায়। এইরূপে আত্মা অবিদ্যা সমাচ্ছন্ন হইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে আরম্ভ করে। ভগবদ্ বিমুখতাই সংসার-রোগের হেতু, ভগবৎ-সাম্মুখ্যই এই রোগ প্রশমনের উপায়। শ্রুতি বলেন "যতোবা ইমানীত্যাদি" অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হই-তেছে ইত্যাদি······তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। ইহাতে ব্রহ্ম ও জীবে নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব ভাব দৃষ্ট হয়। কার্য্য-কারণের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই ভাব পরি-লক্ষিত হয়। যাহা হউক যাহা জন্মে, তাহাই তাহার নিয়ামক হয়। জগৎ কারণ, জীবের নিয়ন্তা। কার্য্য—নিয়ম্য। যাহারা বলেন উপাদান-কারণ ও কার্য্য সমান, তাহাদের সেই বিধান বিধানই নহে, সে অভিমত দুষ্ট, যেহেতু উহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ। চতুর্ব্বেদ শিখায় জীবও পরমাত্মার পৃথক্ লক্ষণ, এমন কি উভয়ে পরস্পর বিপরীত লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পরমাত্মার সমান কেহ নাই, তাহা অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই। সুতরাং জীব বিভু নয়, জীব—অণু। পরমাত্মাই বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। গীতায় যে জীব নিরূপণে "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু" ইত্যাদি বলা হইয়াছে,—সেস্থলে শ্রীভগবানই সর্ব্বগত, জীব তাঁহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত-ইহাই বুঝিতে হইবে। *

* এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-কথা বলার পূর্ব্বে জীবতত্ত্বের উপদেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন, জীব পরমাত্মারই তটস্থা শক্তি উহারা সূক্ষ্ম এবং অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রেণু-গণনা যেমন অসম্ভব, জীব-গণনাও তেমনি অসম্ভব। জীব এত সূক্ষ্ম যে অতি শক্তিশীল অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও জীব-চৈতন্যের অস্তিত্ব জানা যায় না। যে সকল স্থল আমাদের দৃষ্টিতে 'শূন্য' আকাশ বলিয়া মনে হয়, সেরূপ স্থলেও আমাদের চক্ষুর অদৃশ্যভাবে—এমন কি অনুবীক্ষণেরও অদৃশ্য ভাবে অনন্ত কোটি জীবরাশি আলোক-তরঙ্গে বিবিধ রঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। উহাদেরও ক্ষুধা আছে, ভাল মন্দ বুঝিবারও শক্তি আছে;—অথচ উহাদের অস্তিত্ব পরমাণুবৎ সূক্ষ্মতম বলিয়া আমাদের প্রত্যক্ষের অতীত। জীবদেহ ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, উহা পরমাণুরই সমষ্টি। কিন্তু জীব পদার্থ জড় নহে উহা চেতন এবং পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম—একবারেই আমাদের ধারণাতীত। জীব সম্বন্ধে অবশেষে বৈজ্ঞানিকগণেরও এই সিদ্ধান্ত হইবে যে উহাও শক্তিবিশেষেরই সূক্ষ্মতম ব্যষ্টি (unit) মাত্র। *

জীবশক্তি সূক্ষ্ম, চিৎকণ ও অনন্ত সুতরাং দুর্জ্ঞেয়;—এই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্"। বহু অনুসন্ধানেও যখন জীবতত্ত্ব আমাদের জ্ঞান গোচর হয় না, তখন "আশ্চর্য্যবৎ"—"দুর্জ্ঞেয়" এই সকল জ্ঞানের ধাঁদাজনক কথা ভিন্ন আর কিছুই নয়। জীব-সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? জ্ঞানানুসন্ধানের নিরন্তর সুদীর্ঘ গবেষণার পরে জ্ঞানী কেবল এই মাত্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে—চরমে কিছুই জানা যায় না †

* Each perceiving agent is an unit of congereis of mysterious Energy

† He more than any other truly knows that in its limited nature nothing can be known (First Principles, Herbert Spencer

জ্ঞান-প্রয়াসের ব্যর্থতা-সম্বন্ধে শ্রীপ্রভু ও শ্রীভাগবতাদি হইতে উপদেশ-বাক্য সংগ্রহ করিয়া পার্ষদ শ্রীপাদগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে অশেষ মঙ্গলের পথ ভক্তিমার্গকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই ক্লেশ কেবল ক্লেশমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যাহারা তণ্ডুল-গর্ভ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষকে অবঘাত করে, তাহাদের শ্রম যেমন নিষ্ফল হয়, নিখিলমঙ্গল-নিকর ভক্তির পথ অনুসরণ না করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ করে, তাহাদের সেই ক্লেশও তদ্রূপই বিফল হয়। এইজন্য অনন্ত সুখের মহাসাগর চিরমধুর ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে চিত্তকে নিমজ্জিত রাখাই ত্রিবিধ দুঃখপূর্ণ সংসার জ্বালা যাতনা হইতে পরিত্রাণের উপায়। সুতরাং প্রেমভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ইহাই জীবের অশেষ কল্যাণসাধক।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদকে স্নেহ মধুর বাক্যে বলিতেছেন—"তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু।"

শ্রীরূপ, জগতে যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুদুর্ল্লভা। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবের অন্ত নাই। অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণুবৎ বস্তুতেও চেতনা আছে, কোথায় যে চেতনা নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহা অচেতন বলিয়া মনে করি, তাহাতেও হয় ত অব্যক্ত ভাবে জীবশক্তি বর্ত্তমান। চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী প্রভেদ-রেখা বিনির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কোন্ লক্ষণ দ্বারা যে চেতন বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, সেরূপ লক্ষণ বুঝাইয়া দেওয়াও সহজ নহে। বেদান্ত বলেন,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ইহার অর্থ-বোধও সহজ নহে। কেহ কেহ মনে করেন,—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কিন্তু একশ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, জীবও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা; ইহারা সকলই মায়ার ভেল্কী!

ইহাদের এই ধারণা বেদ-বিরুদ্ধ। বেদের কথা এই যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, জীবও সত্য ; ইহাতে সবিশেষ কথা এই যে জীব ও জগৎ সত্য ও নিত্য বটে কিন্তু পরম সত্য ও পরম নিত্য নহে। শ্রুতি 'বলেন, নিত্যো নিত্যানাং'। ইহার অর্থ এই যে, জীবও জগৎ নিত্য কিন্তু শ্রীভগবান্ পরম নিত্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"সত্যং পরং ধীমহি"। সুতরাং জীব ও জগৎ সত্য বটে কিন্তু শ্রীভগবানই পরম সত্য। তাঁহার সত্তাতেই ইহাদের সত্তা, ইহাই শ্রুতির অভিমত। পুরাণাদিও এই অভিমত-অবলম্বনে জীব ও জগতের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, ব্রহ্মের সত্তাতেই যখন জগতের সত্তা, ব্রহ্ম হইতেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন জগৎও ব্রহ্মময়। কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাবহারিকভাবে চিৎ ও অচিৎ এই দুই ভাগে জাগতিক পদার্থ-সমূহকে বিভক্ত করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সর্ব্বভূতেই শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, তথাপি ব্যাবহারিক জগতে ছোট বড় ভালমন্দ প্রভৃতির একটা বিশেষত্ব আছে, তাই শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে শ্রীদেবহূতির প্রতি কপিলদেব বলিয়াছেন :—

জীবাঃ শ্রেষ্ঠ হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ॥
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃশ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ ॥
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ। শ্রীভাগ, ৩।২৯ অধ্যায়।

শ্রীরূপ, কপিলদেবের অভিপ্রায় তুমি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিতেছ। তিনি বলেন, জগতে যত জীব আছে তন্মধ্যে যে সাধক, দেহ গেহ-স্ত্রী-পুত্র-মন-প্রাণ-আত্মা সমস্তই আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার মত শ্রেষ্ঠতম আর কেহ নাই। জীবমাত্রেরই স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ। সাধনার উত্তরোত্তর উন্নতিতে স্বার্থাভিসন্ধি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। উৎকৃষ্টতম সাধনায় স্বার্থের অত্যন্ত বিনাশ হয়। মুক্তির সাধনাতেও স্বার্থ-সাধন-বাসনা পূর্ণরূপে রহিয়া যায়, কেবল প্রেমের সাধনেই আত্ম-বিসর্জ্জন বা স্বার্থ-বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধ ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি কোটি কোটি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের আবাস; তন্মধ্যে অজীব হইতে জীব শ্রেষ্ঠ, জীব সমূহের মধ্যে প্রাণধারী জীব উত্তম, ইহাই শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। এখন ভাবিয়া দেখ, প্রাণবায়ু-হীন জীবই বা এই জগতে কত আছে? আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা করা যায় কিন্তু জীবের সংখ্যা করা যায় না। সাধারণ লোক মনে করিতে পারে, যে প্রাণী বলিলেই বুঝি জীব বুঝায় কিন্তু তাহা নহে। যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানেই জীবত্ব স্বীকার্য্য। প্রাণ-বায়ুর ক্রিয়া, দৈহিক যন্ত্র-সাঙ্কেপ। চেতনাবিশিষ্ট বস্তু মাত্রই জীব, যে জীবে প্রাণ-বায়ুর কার্য্য হয়, সেই জীব অপেক্ষাকৃত উন্নত।

তাহা অপেক্ষা চিত্তবিশিষ্ট; চিত্ত-বিশিষ্ট অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব,—শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-বিশিষ্টতার মধ্যে আবার তারতম্য আছে, স্পর্শে-ন্দ্রিয় অপেক্ষা রসেন্দ্রিয়, তদপেক্ষা গন্ধেন্দ্রিয়, তদপেক্ষা শব্দেন্দ্রিয়, তদপেক্ষা চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ এই সকল* ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের মধ্যে দর্শন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ,—ক্রমবিকাশের ফল। এই সকল বাক্য হইতে

ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অতি নিম্নতর জীবের মধ্যে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে যখন ইন্দ্রিয়-সৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে জীব স্পর্শেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছিল; তৎপরে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি জীববিশেষে প্রকাশ পাইতে লাগিল। জীব সর্ব্বশেষে দর্শনইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—কপিলদেবের বাক্যে ইহাই জানা যাইতেছে। আবার ইন্দ্রিয়শীল অপেক্ষা বহুপদ কীট শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জন্তু, তদপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যগণের মধ্যে আবার বহু স্থান-ভেদে, আচার-ব্যবহারভেদে, শিক্ষা-সংসর্গভেদে, ধর্ম্মজ্ঞান-বিশ্বাসভেদে শত শত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য আছে। এই সকল মনুষ্যের মধ্যে যে সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা আছে, সেই সমাজের লোকেরা ভাল; চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার বেদের অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; তাহাদের মধ্যে আবার সংশয়চ্ছেত্তা পণ্ডিত উত্তম, তন্মধ্যে আবার ক্রিয়াশীল সদ্বিপ্র শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মকাণ্ডের উত্তম অধিকারী অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসীদের মধ্যে আবার ভক্ত-যোগী শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ যোগীদের অপেক্ষা যে সকল প্রেমিকভক্ত নিখিল-স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহার সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন :—

> "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তমো মতঃ ॥"

ইহাতেও জানা যাইতেছে যে শ্রীভগবানে যাহার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পিত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীরূপ, এই কথাটা তোমায় অপর এক প্রকারে বলিতেছি :—

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যগ্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তারমধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদমানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্ভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক তোমায় বলিতেছি, হয়ত তুমি তাহা জান।” শ্রীরূপ দীনভাবে বলিলেন,—দয়াময়, পতিত পাবন, আমি অত্যন্ত অধম কিছুই জানিনা, আমি যে আপনার শ্রীমুখে এই সকল গভীর তত্ত্ব কথা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি, তাহা কেবল আপনারই দয়া। আপনি এ অজ্ঞকে অজ্ঞের মতই জ্ঞান করিয়া সকল কথা বলুন।

প্রভু বলিলনে,—শ্রীরূপ, আমি তোমায় জানি। তুমি আমার অতি প্রিয়, তুমি ইহা সকলই জান, তথাপি তোমায় বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমে লিখিত আছে :—

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাং
ভক্তির্মুকুন্দ চরণে ন প্রায়েনোপজায়তে॥
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ্ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনহন্তো শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥

আমি তোমার নিকট এই কয়েকটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি। গোবিন্দ-চরণে বৃত্রাসুরের সুদৃঢ়া ভক্তি ছিল। ইহাতে পরীক্ষিতের মনে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবদ্ভক্তি অতি দুর্লভ, ইহা দেবতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়না; এমন কি শুদ্ধ-সত্ত্ব-অমলাত্ম ঋষিদের মধ্যেও মুকুন্দ-চরণে প্রায়শঃই দৃঢ়-ভক্তি জন্মে না। বৃত্রাসুরের হৃদয়ে তাদৃশী ভক্তির উদয় কি প্রকারে হইল? এই জগতে পৃথিবীর ধুলি-কণার মত অসংখ্য জীব রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উন্নততর মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করে, আবার এই সকল মনুষ্যের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক মুক্তির ইচ্ছুক এবং মুমুক্ষুগণের মধ্যে অতি অল্প লোক মুক্তিলাভ করেন, আবার মুক্তগণের মধ্যে অতি অল্প লোক ভক্তি-পথের উপাসক। ফলতঃ কোটী কোটী জীবের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ, প্রশান্তাত্মাও প্রেমীভক্ত অতি বিরল। ইহাতে তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে প্রেম-ভক্তি অতি সুদুর্লভ। তন্ত্রে লিখিত আছে:—

১। জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি সহজেই লাভ করা যায়; যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা ভোগ-

বিলাস-লাভও সহজেই ঘটে কিন্তু সাধন-ভক্তির চরণসীমা প্রেমভক্তি সহজলভ্য নহে। তাদৃশ সহস্র সহস্র সাধনেও ভক্তি লাভ হয় না। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে :—

২। নষ্টপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা॥

যাহাদের মন কুটিল, যাহারা মূঢ় ও পুণ্যহীন, তাঁহাদের শ্রীগোবিন্দ-চরণে ভক্তি জন্মে না, গোবিন্দের স্মরণ ও কীর্ত্তন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

উক্ত পুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন :—

৩। নিমিষং নিমিষার্দ্ধম্বা মর্ত্ত্যানামিহ নারদ।
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে॥

হে নারদ, মানুষের পাপের শেষ বীজটুকুও যে পর্য্যন্ত দগ্ধ না হয়, তাবৎকাল এক নিমিষ বা অর্দ্ধনিমিষের জন্যও ভগবৎ-চরণেভক্তির উদয় হয় না।

যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে :—

৪। জন্মান্তর সহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

সহস্র সহস্র জন্মে তপ-জ্ঞান-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা মানুষের পাপ ক্ষীণ হইলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তির উদয় হয়।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে :—

৫। "জন্ম কোটিসহস্রেষু পুণ্যৈঃ যৈঃ সমুপার্জ্জিতং।
তেষাং ভক্তির্ভবেৎশুদ্ধা দেবদেব জনার্দ্দনে॥"

সহস্র কোটি জন্মে বহু সাধন-পরিশ্রম-জনিত পুণ্যে মানুষের জনার্দ্দনে ভক্তি জন্মে।

অগস্ত্যসংহিতায় :—

৬। ব্রতোপবাস-নিয়মৈর্জ্জন্মকোট্যাপামুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক্ ভক্তির্ভবতি কেশবে॥

কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও যজ্ঞাদি দ্বারা যে পুণ্য জন্মে, সেই পুণ্য-প্রভাবে ভগবানে ভক্তি জন্মে।

শ্রীভাগবতে উদ্ধব গোপীদিগকে বলিতেছেন, আপনাদের কৃষ্ণভক্তি অতি বিশুদ্ধা। এরূপ ভক্তি অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

৭। দানব্রততপোহোমজপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তি অতি দুর্লভ সাধনা; ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মার্জ্জিত বহু দান, ব্রত তপস্যা, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার কঠিন সাধনার অমৃতময় ফল।

শ্রীভগবদ্গীতায়:—

৮। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

পাপরাশি বর্ত্তমান থাকিলে হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর অধিষ্ঠান অসম্ভব। বহু জন্ম-কৃত পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় সাধক ভজনের জন্য দৃঢ়ব্রত হয় এবং ভজন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজনের অধিকারী হয়।

পদ্মপুরাণে প্রহ্লাদ-স্তুতিতে লিখিত আছে:—

৯। লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিষ্বেকস্তু বুদ্ধতে।
ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ॥

শ্রীরূপ, এই ভক্তিতত্ত্ব পরমানন্দঘন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত একজন ইহার তত্ত্ব শ্রবণ করিতে প্রয়াসী হয়। কোটী কোটী লোকের মধ্যে হয়ত একজন ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। বহু কোটী লোকের মধ্যে হয়ত একজন প্রকৃত ভক্তির অনুশীলন করে কিনা সন্দেহ।"

শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন—

১০। রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদুনাং।
দৈবং প্রিয়ং কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেব মঙ্গভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের ও যদুদিগের পালক ও উপদেষ্টা, উপাস্য ও কুলপতি; অধিক কথা কি বলিব, কখন কখন পাণ্ডবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তীও হইয়াছেন। তোমাদের প্রতি তাঁহার এমনই দয়া কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করেন, তাহাদিগকে তিনি মুক্তি পর্য্যন্তও দিয়া থাকেন। অথচ শ্রবণাদিরূপ ভক্তিযোগ দান করেন, না। ভক্তিযোগ কেবল তাঁহার কৃপা-প্রসাদ হইতে লভ্য।

শ্রীরূপ, ভক্তি প্রকৃতই সুদুর্লভা। জগতে নানা শ্রেণীর সাধকগণ নানাপ্রকারে সাধন করেন। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, তপস্যা, স্বাধ্যায়, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি সাধনা বহু প্রকার আছে কিন্তু প্রেম-ভক্তির সাধন অতি দুর্লভ। সেই জন্য ভাগবতাদি শাস্ত্র সমূহে অতি স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে যে, প্রেমভক্তি সাধনা-রাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সুদুর্লভা।"

শ্রীরূপ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। মহাযোগীর ধ্যানাবস্থার মত শ্রীরূপের সর্ব্বেন্দ্রিয় মহাপ্রভুর উপদেশ-সুধা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর কথা যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীরূপ তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তখনও তাঁহার কর্ণ-রন্ধ্রে মহাপ্রভুর মধুমাখা বাক্যের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল।

মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীরূপ শুনলে তো,—ভক্তির সুদুর্লভতা?

শ্রীরূপ। আজ্ঞে হাঁ প্রভু, শুনেছি সব; এখন আপনার কৃপায় অনুভব করিতে পারিলে তো হয়?

মহাপ্রভু। তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এখন একবার ভক্তিমাহাত্ম্য শুন।

এই বলিয়া দয়াল প্রভু ভক্তিমহিমা বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

শ্রীরূপ, অন্যান্য সাধনায় যে ফল না পাওয়া যায়, ভক্তি-সাধনায় সম্যক্‌রূপে সেই ফল লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন :—

১। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদ বিহিত ধর্ম্ম এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি মানবাত্মার উন্নতি সাধনে যাদৃশ ফল প্রদান করিতে না পারে কেবল একমাত্র আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি সর্ব্বফল-প্রদানে পরম সমর্থ।

পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে :—

২। যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥

ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি স্বভাবতঃ কোন পাপ করেন না কোন প্রকারে ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির পাতক উপস্থিত হইলে অন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন হয় না। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে নারদ-অম্বরীস সম্বাদে লিখিত আছে :—যেমন পাক-নিমিত্ত প্রজ্বলিত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ অনুষ্ঠীয়মানা ভগবদ্ভক্তি তৎক্ষণাৎ পাতক সকলকে দগ্ধ করে।”

শ্রীরূপ বলিলেন,—দয়াময়, ভক্তিসাধনায় পাপ নষ্ট হয়; তা তো হইবারই কথা। যে সাধনা সর্ব্বসাধনা হইতে পরম শ্রেষ্ঠা, সে সাধনায় পাপ-নাশ হইবে ইহা তো সহজেই বুঝা যায়। কি প্রকারে ভক্তি দ্বারা পাপের বীজ নষ্ট হয়, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

প্রভু বলিলেন,—ভক্তি ব্যাপারটী কি তাহা বলিলেই তুমি সকল কথা বুঝিতে পারিবে। আমি তোমায় প্রথমতঃ ভক্তির দুই একটী লক্ষণ বলিতেছি। “ভজ্‌” ধাতুর উত্তরে ক্তিন্‌ প্রত্যয় করিয়া ভক্তি পদটী সিদ্ধ হয়। “ভজ” ধাতুর অর্থ সেবা “ভজ শ্রিঙ্‌ সেবায়াম্‌” :—

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী ॥

এই নিরুক্তি গরুড় পুরাণে লিখিত আছে। সাধনাসমূহের মধ্যে ভক্তি-সাধনা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা, ইহাতে তাহাও জানা যায়। এই সেবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভাবেই হইতে পারে। নয় প্রকার বৈধী ভক্তিতে এই সেবার কথা পরিস্ফুট হইয়াছে, যথা :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

এই প্রকারে যে ভগবদনুশীলন করা হয়, তাহাই সেবা, কিন্তু এইরূপ সেবা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই হইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

অর্থাৎ রোগী, অর্থকামী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতি-শালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। ভক্তির এই ফল ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই লভ্য হয় :—

অকামোঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥

কিন্তু নিষ্কাম ভজনে যে ফলাধিক্য হয়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে :—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে।
ন তেষাং ভব বন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের ভক্ত, সকাম ; চতুর্থ জ্ঞানী ভক্ত, ইনি নিষ্কাম। এই নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্তের ভক্তি, জ্ঞান-মিশ্র

ভক্তি ; কিন্তু এই শ্লোকে যে একটী 'চ' কার আছে তাহাতে নিষ্কাম প্রেম-ভক্তকে বুঝায়। তাদৃশ প্রেমভক্ত জ্ঞানীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ভক্তির আর একটী লক্ষণ এই যে :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তি। প্রতিকূলানুশীলনে ভক্তি হয় না কিন্তু যে প্রকারেই হউক কৃষ্ণানুশীলনমাত্রই ফলপ্রদ। কংস ও শিশুপাল ভয়ে ও ক্রোধে কৃষ্ণানুশীলন করিতেন, তাহার ফলে এই উভয়ের সাযুজ্য-মুক্তি হইয়াছে। কংস দিবা-নিশি ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতেন এবং জগৎকে কৃষ্ণময় দেখিতেন,—

"চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ"।

ইহা অনুশীলন বটে কিন্তু অনুকূল নহে। কিন্তু এই অনুশীলনে কোন প্রকার ফল-কামনা থাকিবে না। কেন-না, এইটী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ। অপিচ জ্ঞান-কর্ম্মাদিও ইহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকিবে না। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ শুষ্ক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধান জ্ঞান নহে, যেহেতু, ভজনীয় ভগবানের জ্ঞান, ভজনেরই অনুকূল। কর্ম্ম শব্দের অর্থ অন্যান্য স্মৃতিতে যে সকল কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে, শুদ্ধ ভক্তির সাধনে সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাজ্য। কিন্তু ভগবৎ-সেবাদিকর্ম্ম অবশ্যই প্রয়োজনীয়। জ্ঞান-কর্ম্মাদি পদে যে 'আদি' শব্দটী আছে তাহার অর্থ,—বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস ইত্যাদি। এই সকল ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাঁহার যে সেবা বা অনুশীলন, তাহাই উত্তমাভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। সুতরাং গীতায় উক্ত শ্লোকে যে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা শুদ্ধাভক্তি নয়। এইরূপে কর্ম্মে ও যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত যে ভগবৎ-পূজনাদি হইয়া থাকে সে সকলকেও ভক্তি না বলিয়া

কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ নামে অভিহিত করাই ভাল। ভক্তি,—স্বয়ং মহারাণী, ইনি অপরাপর সাধনার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নিজের নাম বজায় রাখিয়া তাহাদের পরিচারিকা হইতে চাহেন না। তথাপি কেহ কেহ কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি, যোগ মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি ইত্যাদি গুণীভূতা ভক্তি ইত্যাদি উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐ সকল ব্যাপারে প্রকৃত ভক্তির প্রাধান্য না থাকায় উহাদিগকে ভক্তি বলা ঠিক নয়। উহাদের মধ্যে কর্ম্মাদিরই প্রাধান্য থাকে সুতরাং উহাদিগকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা ভাল।

"প্রাধান্যেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি,"—

মীমাংসাদর্শনে এই একটা ন্যায় আছে। প্রাধান্য-অনুসারে নাম নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত। সকাম কর্ম্মের ফল,—স্বর্গ; নিষ্কাম কর্ম্মের ফল, জ্ঞানযোগ; আবার জ্ঞান ও যোগের ফল, নির্ব্বাণ-মোক্ষ। আর্ত্ত অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু এই ত্রিবিধ ভক্তের ফল-কামনা, যথাক্রমে,—আরোগ্য, সুখৈশ্বর্য্য ও সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্তি; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির ফল কেবলই হরিতোষণ, ইহার অন্য কোন হেতু নাই; ইহা অহৈতুকী অপ্রতিহতা এবং অব্যভিচারিণী। শ্রবণাদি-নবধা ভক্তিরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই এই পরা ভক্তির উদয় হয়। শ্রীভাগবত বলেন :—

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

এই নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তি হরিতোষণের সাধনা এবং ইহা হইতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হন। ইহাই উত্তমা ভক্তি। গীতায় বহু স্থানে এই ভক্তির উল্লেখ আছে, যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম॥

এই ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় শোক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার চিত্তোদ্বেগ থাকে না। আত্মা এই অবস্থায় সুপ্রসন্ন ভাবে থাকেন। ভগবান্ বলেন, এই ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে সম্যক্‌-রূপে জানিতে পারেন। রসময়ত্ব, প্রেমময়ত্ব এবং আনন্দময়ত্ব প্রভৃতি আমার পরমস্বরূপ। এই পরাভক্তি দ্বারা সাধক তাহা জানিয়া আমার পূর্ণতম তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করেন। গীতায় এইরূপ ভক্তি সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যতি তচ্ছৃণু॥

ইহাতে জানাযায় ভগবানে চিত্তের পরমাসক্তিই পরা ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রেও কথিত হইয়াছে,—"সা পরমানুরক্তিরীশ্বরে"। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই, পরা ভক্তি। পুনশ্চ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

আবার নবম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

এইরূপ ভক্তিই উত্তমা ভক্তি। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন, আমি অনন্যা ভক্তি-সাধনে লভ্য,—"ভক্তিলভ্যস্ত্বনন্যয়া"। এইরূপ ভাবের ভক্তির আর একটী লক্ষণ তোমায় বলিতেছি :—

অনন্যমমতা বিষ্ণোঃ মমতা প্রীতিসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥

শ্রীভগবানে প্রীতিমাখা অসাধারণ অনন্যমমতা-বোধই ভক্তি। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা সকলই একান্ত ভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া তৎসেবা-ভাবে বিভাবিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুশীলন বা সেবনই, ভক্তি। এইরূপ সেবাই ভক্তি শব্দে প্রযুক্ত "ভজ্" ধাতুর প্রকৃত অর্থ। ইহার আর একটী অতি উপাদেয় লক্ষণ আছে তাহা এই :—

> সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
> হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

ভগবৎ সেবাভিন্ন সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ পরায়ণ হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। এই অবস্থায় চক্ষু অনবরত তাঁহার রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ তাঁহারই বাক্য শুনিতে ব্যাকুল হয়, নাসিকা তাঁহার ঘ্রাণের জন্য আকুল হয়, স্পর্শেন্দ্রিয় অনবরতই তাঁহার স্পর্শ চায়, মন তাঁহারই ধ্যানে বিভোর থাকে,—এইরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি ভগবানের অভিমুখে যখন উন্মুখ হয়, তখন সেই অবস্থা পরাভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে এবিষয়ে অতি মধুর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তোমায় সেই বেণু-রব-মুগ্ধা গোপীদের কথাই বলিতেছি। উহা রাগাত্মিকা ভক্তির নবানুরাগের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উহাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎকট আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহার প্রতিছত্রেই পরমমাধুর্য্যময়ী প্রীতির অবিতৃপ্ত তৃষ্ণার আবর্ত্তময় উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির আর একটী লক্ষণ শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ হইতে বলা যাইতেছে :—

> দেবানাং গুণ-লিঙ্গানামানুশ্রবিকর্ম্মণাম্।
> সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
> অনিমিত্তা ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।

এস্থলে "গুণলিঙ্গানাং দেবানাং" পদ দুইটীর অর্থ গুণ প্রকাশক ইন্দ্রিয়-সমুহের। শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইহারা গুণ,—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা পদার্থের গুণ জানিতে পারি। "আনুশ্রবিক কর্ম্মণাং" পদদ্বয়ের অর্থ বেদ-বিহিত কর্ম্ম। সুতরাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, একনিষ্ঠ অনন্তচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক ভাবে, অযত্নসিদ্ধভাবে এবং নিষ্কাম ভাবে যখন ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয় তখন সেই অবস্থাই ভাগবতী ভক্তি। ভগবৎ-সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে এই সাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্রম সন্দর্ভে দেবানাং ইত্যাদি পদের অর্থ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুতে যে তাদৃশী চিত্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীধরী টীকার সহিত এইটুকু পার্থক্য।

শাস্ত্রকারগণ কোন কোন বিষয়ের তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক ও নৈর্গুণ ভেদে চারিরকম লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে কপিলদেব দেবহূতি দেবীকে চারপ্রকার ভক্তির লক্ষণ শুনাইয়াছিলেন। সগুণাভক্তির একাশি প্রকার ভেদ শ্রীধর স্বামী প্রকল্পনা করিয়াছেন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নবপ্রকার ভক্তি আছে উহার প্রত্যেকটী নয় প্রকার করিয়া নয়কে নয় দিয়া গুণ করিলে একাশী প্রকার হয়। তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে। উক্ত অধ্যায়ের দশম শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন, "তদেবং সগুণা-ভক্তিরেকাশীতিভেদাঃ।" বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই একাশীতি সগুণাভক্তির লক্ষণ লিখিত আছে। কপিলদেব সামান্যাকারে স্বগুণা ভক্তির লক্ষণ বলিয়া নিগুর্ণা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন তদ্‌যথা :—

> মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
> মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
> লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম।

অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

ইতঃপূর্ব্বে "দেবানাং গুণ-লিঙ্গানাং" ইত্যাদি শ্লোকে নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ স্বয়ং কপিলদেবই বলিয়াছেন; এস্থলেও তিনি বিশেষরূপে আবার এই ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, মা, আমি তোমায় নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ একবার বলিয়াছি। এখন আবার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থান করি; সাধক বিশেষের চিত্ত যদি অনবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল আমার প্রতি ধাবিত হয়, তবে চিত্তের সেই ভাবকে নির্গুণ ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভক্তি ফলাভিসন্ধানরহিতা এবং অব্যবহিতা হইয়া থাকে। এই ভক্তি নিজেই যখন সুখরূপা, তখন এই সাধনার অন্য কোন সুখ কামনার প্রয়োজন থাকেনা। গিরিগর্ভস্থিত প্রস্রবণের ন্যায় এই ভক্তি স্বতঃই নিত্যসুখের প্রস্রবণ। গঙ্গাস্রোত যেমন অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, এই ভক্তিরূপ-স্রোতস্বিনীও সেই প্রকার অবিরাম শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়।"

শ্রীরূপ, তুমি তো একজন প্রধান সুকবি, বল দেখি, উপমাটী কেমন হইয়াছে?

শ্রীরূপ বলিলেন,—প্রভু, আমি কাব্যরসালঙ্কারের কি জানি? আপনার কৃপায় এখন কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, পরমতত্ত্বই পরমরস এবং সেই রসই কাব্যের একমাত্র বিষয়। আপনি যে উপমার কথা বলিলেন, তাহা অতি সুন্দর; ভক্তিপ্রবাহ ও জাহ্নবী-প্রবাহ উপমা উপমেয়ের বিষয় হইতে পারে। গঙ্গাজল,—শীতলতায়, পবিত্রতায়,

দ্রবতায় এবং জগৎ-পূজ্যতায় চিরপ্রসিদ্ধ। জাহ্নবী দ্রব-ব্রহ্মরূপা ও পূজনীয়া, ভক্তিও শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিণী, ইনিও ততোধিক জগৎপূজ্যা। জাহ্নবী-জলে দেহ-মন পবিত্র হয়, ভক্তি পাপবিনাশিনী ও প্রেমপ্রদায়িনী; জাহ্নবী, বিষ্ণু-পাদপদ্মোদ্ভবা; ভক্তি স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ আনন্দশক্তি। তুলনায় দ্রব-ব্রহ্ম জাহ্নবী অপেক্ষায় ভক্তি-জাহ্নবীরই মাহাত্ম্য যেন অনেক পরিমাণে বেশী বলিয়া মনে হয়। গঙ্গা-জল স্রোত যেমন পরাবর্ত্তিত হইয়া ফিরিয়া আসে, শ্রদ্ধা ভক্তিও সেই প্রকার অন্য কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া ভগবানের চরণকেই ফিরিয়া ঘুরিয়া আশ্রয় করে, ভগবান্ চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা স্বীকার করেন না। ভক্তির প্রভাব জাহ্নবীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী। জাহ্নবী, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু নির্গুণা ভক্তি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তোমার সিদ্ধান্তই যথার্থ,—ভক্তির মাহাত্ম্য তাদৃশই বটে।

ভক্তির এই লক্ষণ এবং ইহার পূর্ব্ব লক্ষণগুলি দ্বারা অতি সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ ভিন্ন চিত্তের যখন অন্য কোন দিকে গতি না থাকে, মনের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থফলাভিসন্ধানের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যখন ভগবানে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই পরা ভক্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে।

কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে ভক্তির এই লক্ষণ বলিয়াছিলেন। মানুষের চিত্তবৃত্তি নানাবিষয়ে ধাবিত হয়। উহাদিগকে একীভূত করিয়া ভগবানের প্রতি সমগ্র ইন্দ্রিয়গণ সহকারে নিয়োগ করা, প্রকৃত পক্ষেই এক কঠোর সাধনা; উহা আবার স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, উহাতে অপর কোন স্বার্থ-ফলাভিসন্ধান থাকিবে না। এই রূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানে সমগ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিসহ নিখিল চিত্তবৃত্তির প্রেরণাই পরাভক্তির সাধনা।

শ্রীরূপ, এই জন্যই তো বলিয়াছি পরাভক্তি অতি সুদুর্ল্লভ। সাধনার রাজ্যে পরাভক্তি প্রকৃত পক্ষেই জগৎপূজ্যা এক অদ্বিতীয় শ্রীশ্রীমহারাণী। অন্যান্য সাধনা ইহারই পরিচারিকা। শ্রীভাগবত যথার্থই বলিয়াছেন, এই ভক্তি সাধনা-বিষয়ে সর্ব্বসমর্থা। এমন কি, ইনি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় অধিপতি শ্রীভগবানকেও বশীভূত করিতে সমর্থা। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "বশীকুর্ব্বন্তি সদ্ভক্তিঃ সৎপতিং সৎস্ত্রিয়ো যথা।" সতী-সাধ্বী-প্রণয়িণী পত্নী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি এই পরাভক্তি পরমেশ্বরকে বশীভূত করিতে পারেন। এই ভক্তি ভগবৎ-স্বরূপশক্তি আহ্লাদিনী-বৃত্তিভূতা। শ্রুতি বলেন,—"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি।"

শ্রীরূপ, তাই তোমাকে বলিয়াছি এই ভক্তিতত্ত্ব বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা শ্রীভগবানেরই অচিন্ত্য স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ।

"পারাবার-শূন্যগম্ভীর-ভক্তি-রস-সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু॥"

শ্রীরূপ অতি বিস্মিতভাবে বলিলেন,—আজ্ঞে হাঁ প্রভু দয়াময়, সে তো যথার্থ কথা। আমি যে অতি অধম। আমার কি এমন ভাগ্য হবে, যে আমি উহার বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিতে পারিব? আপনি পরম দয়াল, কিন্তু আমি যে অতি জঘন্য।" মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—শ্রীরূপ, তোমার দীনতা এখন রাখিয়া দাও। তুমি যে কে এবং কেমন, তাহা আমি বিলক্ষণই জানি। এখন ভক্তির শক্তির কথা শুন :—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

ভক্তি ক্লেশবিনাশিনী, মঙ্গলদায়িনী, মোক্ষ-লঘুত্বকারিণী, ঘনীভূত আনন্দ-স্বরূপিণী, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী, সুতরাং অতীব সুদুর্ল্লভা। প্রথমতঃ ক্লেশ-নাশের কথাই বলা যাউক। পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যা, এই তিনটী

ক্লেশ। ইহাদের মধ্যে পাপ আবার দুই প্রকার,—প্রারব্ধ পাপ এবং অপ্রারব্ধ পাপ। এই দ্বিবিধ প্রকার পাপ নষ্ট করিবার ক্ষমতাই ভক্তির আছে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাহার উদাহরণ আছে। যে পাপ ফলনোন্মুখ হয়, তাহার নাম প্রারব্ধ পাপ; আর যে পাপ বাসনাময় ও প্রারব্ধোন্মুখ, তাহার নাম বীজ; যে পাপ বীজত্বোন্মুখ তাহার নাম কূট; কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থাস্বরূপ ফল যে পাপদ্বারা আরব্ধ হয় না, তাহাকে অপ্রারব্ধ বলা যায়। এই বিষয়টী কিঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বলা যাইতেছে। শাস্ত্রকারগণ পাপভোগের চারিটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পাপ আদি বীজরূপে অবস্থান করে, তাহার নাম অপ্রারব্ধ। সেই পাপ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন তাহার নাম কূটাবস্থা। যখন সেই পাপ শাখা-পল্লবাদি-সমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার নাম বীজ-পাপ, যখন এই শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বীজ পাপটী পাপ ফলের প্রসবোন্মুখ হয়, তখন তাহাকে প্রারব্ধ বলে। এই সর্ব্বপ্রকার পাপাবস্থাই ভক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভক্তিদ্বারা অনেক প্রকার শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুভফলের বিষয় বলা যাইতেছে। যাহার ভক্তি আছে, তিনি সমস্ত জগতের প্রীতি ও অনুরাগ লাভ করিতে পারেন, তাহার বিবিধ সদ্‌গুণাদি লাভ হয়। এমন কি তাহার সর্ব্ববশীকারিত্ব এবং সকমঙ্গলকারিত্ব শক্তি জন্মে। পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে, যিনি হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদ্বারা সমগ্র জগতের তর্পণ হয়। স্থাবর-জঙ্গম সকলেই তাঁহার অনুরক্ত হয়। ইহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে দ্রষ্টব্য। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে;—

> যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ, ভগবানে যাহার নিষ্কাম ভক্তি আছে, দেবগণ তাঁহার সেই ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সকল গুণের সহিত তাঁহাতে বাস করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার মহদ্‌গুণ কোথা হইতে হইবে? সে কেবল অসৎমনোরথে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাহ্য বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় অর্থাৎ তাহার কোনই অর্থসিদ্ধি হয় না। দেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির হরিভক্তি অসম্ভব। জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি মহত্তের গুণ। অভক্ত ব্যক্তিতে এই সকল গুণ সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ ব্যক্তি অলীক বিষয়-সুখের জন্য কাল্পনিক মনোরথে কেবল ইতঃস্তত ধাবিত হইয়া থাকে।

আর একটী শুভ হইতেছে,—সুখ। ইহা আবার তিন প্রকার,—বৈষয়িক, ব্রাহ্ম এবং ঐশ্বরিক। তন্ত্রে লিখিত আছে, গোবিন্দ-চরণারবিন্দে যে ব্যক্তির ভক্তি অছে, তিনি আঠার প্রকার পরমাশ্চর্য্য সিদ্ধি, ভুক্তি, শাশ্বতীমুক্তি এবং নিত্যপরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যথা :—

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী;
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদেগাবিন্দ ভক্তিতঃ॥

হরিভক্তি সুধোদয়ে লিখিত আছে :—

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদা সুখদা লতা॥

"হে দেবেশ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার চরণারবিন্দে আমার দৃঢ়া ভক্তি হউক। কেননা এইভক্তিলতা অতীব সুখদা। ইনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়িনী এবং ঈশ্বরানুভবদাত্রী।"

ইঁহার আর একটী গুণ এই যে, ইনি হৃদয়ে অঙ্কুরিতা হইলে মোক্ষও অতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় :—

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।

পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ" ॥

ভক্তি-লতা অল্পমাত্র দেখা দিলেও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ চারিটী তৃণের মত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে :—

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।

ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকা বদনুব্রতাঃ ॥

যেমন চেটিকা অর্থাৎ দাসী সকল ভীতচিত্তে রাজমহিষীর অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ ভক্তি মুক্তি-প্রভৃতি অদ্ভুত সিদ্ধি সকল হরিভক্তি-মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

ভক্তি অখিলরাসামৃত মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের আনন্দশক্তি, সুতরাং ইনি আনন্দঘন-স্বরূপিণী। হরিভক্তি-সুধোদয়ে এসম্বন্ধে যে সকল শ্লোক আছে তন্মধ্যে একটী অত্যুত্তম শ্লোক এইযে :—

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।

সুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, "হেজগদ্গুরো আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ-সুখও গোস্পদতুল্য বোধ হইতেছে।" ইহার সর্ব্বোপরি কথা এইযে, ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে এসম্বন্ধে একটী প্রমাণ আছে সে প্রমাণটী এইযে :—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা

লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।

যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীনারদ-মুখে প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা

করিলেন, প্রহ্লাদই ভগবানের প্রিয়পাত্র আমরা নহি, নারদ রাজার এইরূপ মনোবৃত্তি অনুভব করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই নরলোকে তোমরাই ভাগ্যবান্, যেহেতু লোকপাবন মুনিগণ সর্ব্বদাই তোমাদের গৃহে আগমন করেন, অধিকন্তু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মানবশরীর প্রকটন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তোমাদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ আর কে আছে?"

আমাদের শাস্ত্রাদিতে সর্ব্বত্রই ভক্তির মহামহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদী মহামনীষাসম্পন্ন ঋষিগণ বিষয়-সুখের অনিত্যতা, সংসারের লাঞ্ছনা, রোগ-শোকের যাতনা, দুর্জ্জনের গঞ্জনা, অত্যাচারীর উৎপীড়না ও দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতিতে প্রতিদিন জীবের বিবিধ দুঃখ অনুভব করিয়া উহা হইতে জীবের অত্যন্ত পরিত্রাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই দুরন্ত সংসারের অত্যন্ত যাতনা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়,—ভগবৎ-সাধনা। শ্রীগোবিন্দই পরমানন্দ; তাঁহার চরণারবিন্দ-মকরন্দই জীবের একমাত্র রসায়ন। সুতরাং তাঁহার উপাসনাই পরম পুরুষার্থ। দুঃখ লইয়া নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলে দুঃখ দূর হয় না। দুঃখ দূর করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। আহারে ক্ষুধা-নিবারণ হয় কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? ছত্রও গৃহাদি দ্বারা শীতাতপ-বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতেই কি তজ্জনিত দুঃখের অত্যন্ত অবসান হয়? রোগ হইলে ঔষধ-সেবন ব্যবস্থেয় কিন্তু সেই ব্যবস্থাতেই কি জীবগণ রোগ-ভোগ হইতে অত্যন্ত মুক্তি পাইতে পারে? সহস্র সহস্র মানসিক দুঃখে হৃদয় যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, পৃথিবীর ধন, মান, সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেহই যখন সে দুঃখের প্রতিকার করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না, তখন সে শ্রেণীর দুঃখ-নিবারণের উপায় কি? ভগবৎ-উপাসনা ব্যতিরেকে মানুষ যখনই যে দুঃখের প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সহায়হীন, উপায়হীন,

দুর্ব্বল মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, মানবীয় চেষ্টায় কখনই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না ; মানুষ তখনই কোন প্রকার উচ্চসাধনায় দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় পরিচিন্তন করিয়াছে।

এইরূপে পার্থিব উপায় যতই উহার নিস্ফলতা দেখাইয়া জীবের নিকট হইতে চির বিদায় লইয়াছে, ততই জীব অপার্থিব উপায়ে দুঃখ-নিবারণের পথ খুঁজিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই প্রকারে নিরীশ্বর সাংখ্যজ্ঞান, নিরীশ্বর বৌদ্ধ-সাধনা প্রভৃতি মানুষের সম্মুখে সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইরূপেই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রেতালোকের মত আলোকবর্ত্তি লইয়া অসহায় মানুষের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, মানুষ কিয়ৎক্ষণ উহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে কর্ম্মবাদ প্রদর্শিত স্বর্গপ্রাপ্তির ছলনাময় নিস্ফলশ্রমের ন্যায় নৈরাশ্যে নির্ব্বিণ্ণ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অনেক সাধনার জটিল-কুটিল কঙ্কর-কণ্টকপূর্ণ সাধন-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময়েই মানুষের আশা-ভরসা নৈরাশ্যময় বিষাদের অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে। অবশেষে কৃপাময় দৈব-নির্দেশের মত ভক্তিবাদ মানুষের বিষাদ-বিপন্ন হৃদয়কে পুনরনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। আশাময়ী, আনন্দময়ী, রসময়ী, করুণাময়ী, ভক্তিদেবী, সাক্ষাৎ জন্মদায়িনী স্নেহবাৎসল্য-ভরা জননীর ন্যায় বিষণ্ণ হৃদয় অবসন্নকায়, ক্ষীণ-চিত্তেন্দ্রিয় নরসন্তানকে আপনকোলে তুলিয়া লইয়া উহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। সহস্র সহস্র ঋষি, ভক্তিদেবীর আশা-ভরসাময়ী বাণী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া ভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে করিতে, তাঁহারই নাম-গুণ-লীলা স্মরণ করিতে করিতে, তাঁহারই মধুময় মাহাত্ম্য-গীতি গাহিতে গাহিতে, তাঁহারই সুহৃৎ-সখিরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহারই দাসত্বে প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজকে নিযুক্ত করিতে করিতে,অবশেষে তাঁহারই আনন্দময় ও সর্ব্বসুখময় শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করিয়া দিয়া মানুষ

চিরতরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে,—তখন মানুষ তাহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রকৃত কর্ত্তব্যতা অনুভব করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে, প্রেমময়ী ভক্তিই মানবাত্মার একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্রী; ভগবৎ-চরণ-লাভের জন্য একমাত্র মহিয়সী মহানেত্রী এবং তাঁহার একমাত্র সহায়রূপিণী মহাপ্রেমদাত্রী। ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠতমা উপাসনা, ইহাই জীবের সাধকতমা মহাসাধনা।

শ্রীরূপ, তোমায় আমি আর অধিক কি বলিব? বলিয়াছি তো:—

পারাবার-শূন্য গম্ভীর ভক্তি-রস-সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥

আমি নিজেই নিরন্তর এই অকূল অতল মহাসাগরে ভাসিয়া যাইতেছি, তোমাকে যে স্থির-ভাবে কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা করি না। তুমি ভক্ত,—মহাভক্ত; তোমার প্রতি শ্রীগোবিন্দের অপার করুণা! তাঁহার কৃপায় তোমার হিতার্থ আমাদ্বারা যদি কিছু সম্ভবপর হয়, তাহাও ভক্তিরই মহিমা। শুন, মাথা তোল,—এই বলিয়া পরমকরুণাময় মহাপ্রভু স্নেহভরে দণ্ডবৎ প্রণত শ্রীরূপের চিবুক ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন,—এবার শ্রীশ্রীমতী ভক্তিমহারাণীর মহামহিয়সী মাহাত্ম্য-কথা শুন:—

শ্রীভাগবতের অজামিল উপাখ্যানারম্ভে শ্রীমৎশুকদেব পরম ভক্ত শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিতেছেন:—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিবভাস্করঃ॥

মহাত্মা সূর্য্য যেমন উদয়মাত্রে স্বীয়-কিরণ-প্রভাবে সমগ্র হিমকণা সদ্যসদ্য বিনাশ করেন, সেইরূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন মহাত্মা কেবল ভক্তিদ্বারা নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন অর্থাৎ কেবল ভক্তিদ্বারা পাপের অপ্রারব্ধ কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ প্রারব্ধ,—এমন কি পাপের সর্ব্বাদিবীজ অবিদ্যা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেন। এই যে এই শ্লোকে 'কেবলা'

পদের উল্লেখ আছে ইহাতে এই বুঝা যায়, যে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য-জ্ঞান প্রভৃতি কাহারও সাহায্য বিন্দুমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত্র ভক্তি-সাধনার প্রভাবেই ভক্তি-সাধক পাপরাশি বিনষ্ট করেন। 'কাৎ-স্ন্যেন' পদটীর অর্থ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূলতঃ ও অন্ততঃ অশেষ পাপনাশের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্যই উক্ত পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে। সূর্য্যের নিহার-নাশ ব্যাপারের দৃষ্টান্ত অতি চমৎকার। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যুগান্ত-প্রলয়ের বহ্নি-শক্তি লইয়া আকাশে বিদ্যমান। তাঁহার সমক্ষে নীহার কণার শৈত্য বা তদীয় অস্তিত্ব যেমন গণনার যোগ্য নহে, পাপ নির্ব্বারিণী ভক্তিশক্তির নিকট পাপরাশি তদপেক্ষাও তুচ্ছতর।"

শ্রীরূপ আনন্দোৎফুল্ল নয়নে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'চমৎকার,—অতি চমৎকার!!' ঔৎসুক্যসহকারে প্রভু বলিলেন, আরও শুন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভাগবতধর্ম্মে লিখিত আছে :—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ॥
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ॥

মহারাজ, অন্য ভাববর্জ্জিত, শ্রীহরিচণ-ভজনাকারী ভক্তের প্রমাদ-বশতঃ নিষিদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়-প্রবিষ্ট শ্রীহরিই তাঁহার সমস্ত পাতক বিনিষ্ট করেন।"

শ্রীরূপ, প্রিয়ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই কৃপা যে তিনি নিজেই তাঁহার প্রিয়-ভক্তের পাপ বিনাশ করেন। এই ব্যাপারটী ভগবানের করুণা বলিয়া বলিব কিম্বা ভগবৎ ভক্তির মাহাত্ম্য বলিব? আমি তো বলি, শেষেরটাই ঠিক। "স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য" একেতো বহু গুণ না থাকিলে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দ নিজমুখেই তাঁহার প্রিয়ভক্তের বহুল অনন্যসাধারণ গুণের

কথা বলিয়াছেন। তাদৃশ প্রিয়ভক্তের কোন প্রকারে পাপ হইবার কথাও নহে, ইহার উপরে যিনি শ্রীভগবানের শ্রীচরণের একান্ত ভক্ত তাঁহারই বা কি করিয়া পাপ হয়? ইহার উপরে "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম" ভগবানের এই রম্য বিশ্রাম মন্দিরে পাপের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। যদি কদাচিৎ দৈবাৎ প্রমাদবশতঃ যৎকিঞ্চিৎ পাপ প্রবেশ করে, তজ্জন্য ভক্ত অপেক্ষা ভগবানই বোধ হয় তজ্জন্য বেশী দায়ী। সুতরাং তাঁহার নিজ গৃহের সম্মার্জ্জন তাঁহাকেই করিতে হয়। এতাদৃশ ভক্ত পাপক্ষয়ের জন্য কখনও ভগবানের ভজনা করেন না। শ্রীভাগবতে আরও লিখিত আছে :—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচানপি সম্ভবাৎ।

শ্বপাক অর্থাৎ কুক্কুর ভোজী অন্ত্যজও যদি ভক্তিমান হন তাহা হইলে তিনিও অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত সার মর্ম্ম। জাত্যভিমান জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ নহে, প্রত্যুত উহাতে আত্মার অবনতিই হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি এস্থলে জাহ্নবী-সলিল হইতেও অধিকতর পবিত্রা। গঙ্গাস্নানে পাপ বিনষ্ট হয় কিন্তু অন্ত্যজ লোককে সবনযোগ্য পবিত্র করিতে জাহ্নবী-জলের সামর্থ্য নাই। কিন্তু ভক্তির পবিত্রতা-কারিণী শক্তি, মানুষের জাতি-দোষকেও বিনাশ করিতে সমর্থ।

ভক্তি দ্বারা বিষয় ভোগ দোষ নষ্ট হয়; ভক্তি পরম পাবনী, পরম ধর্ম্ম-বিধায়িনী। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, জনার্দ্দনে যাহার ভক্তি আছে, তাহার বহু মন্ত্রে ও শাস্ত্রে এবং বাজপেয়াদি বহু বহু বৈদিক যজ্ঞে কোনও প্রয়োজন নাই। কেবল এক ভক্তির মহাপ্রভাবে তিনি সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির আর একটী মহৎগুণ এই যে, বহু সাধনাতেও যে অহঙ্কার উন্মূলিত না হয়, ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় হইতে উহা চলিয়া যায়। ধ্রুবের প্রতি মনুর উক্তি এই যে :—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে
আনন্দমাত্রউপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥

"হে বৎস! সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দমাত্র. তাঁহাতে পরমাভক্তি স্থাপন করিলে তোমার অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইবে।"

মানুষের যতপ্রকার বন্ধন আছে তন্মধ্যে অহঙ্কার-বন্ধন অতীব কঠিন কিন্তু ইহার অপনয়ন অন্য কোন সাধনা দ্বারা তত সহজ না হইলেও সুখসাধ্য ভক্তিসাধনায় আত্মাকে এই মহবন্ধন হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে। শ্রীভাগবতে এইরূপ উপদেশের অভাব নাই। পৃথুর প্রতি সনকাদি মুনিগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইটী তোমায় এখন বলিতেছি, যথা :—

যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত মুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়োনিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

যাঁহার চরণারবিন্দের অঙ্গুলিবিলাস স্মরণমাত্রে ভক্তগণ কর্ম্মগ্রথিত চিত্তগ্রন্থি অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-শূন্য, বুদ্ধি নির্ম্মল, তাহারাও সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপূর্ব্বক শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি সেই সর্ব্বজন-শরণ্য ভগবানের ভজনা কর।" যোগীদিগের ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য ভক্তি যেমন সুগম উপায়, এমন আর কিছুই নহে। ভাগবতে দেখা যায় শ্রীমৎ কপিলদেব তন্মাতা দেবহূতি দেবীকে বলেন :—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে।

দ্বিতীয় স্কন্ধে ও ঐরূপ একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতোভবেৎ॥

কর্ম্ম, যোগ, সাংখ্য অষ্টাঙ্গযোগ, বৈদিক শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপার, এ সকল তো প্রধান প্রধান সাধন বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড একবারে অতি বিস্তৃত মহামহীরূহের ন্যায় অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে সাধকগণের সন্তাপহরণার্থে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সাধনার প্রতি তদ্রূপ সমাদর না দেখাইয়া ঋষিগণ ভগবদ্ভক্তির মহা-মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—ভক্তির ন্যায় আত্মসিদ্ধির এমন নির্ব্বিঘ্ন 'শিবঃ পন্থা' আর দ্বিতীয় নাই। এই পথ যেমন কঙ্কর-কণ্টকহীন তেমনি সাধন-বিপত্তিকারক পথের বিঘ্ন,—হিংস্রপশ্বাদি সদৃশ কোন মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির আশঙ্কাও ইহাতে নাই। জ্ঞানমার্গের কঠোরতা, দুঃসাধ্য ত্যাগ-স্বীকার প্রভৃতি এই পথের সাধকগণকে ভোগ করিতে হয় না। যোগের প্রধান আবশ্যক মনঃস্থৈর্য্য; তাঁহাও ভীষণ কঠিন ব্যাপার। সাক্ষাৎ ভগবানের সখা অর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীভগবানের নিকটে "চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা মনঃসংযমের কাঠিন্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং যোগের পথকেও 'শিবঃপন্থা' বলা যায় না কিন্তু ভক্তিপথ যেমন কুসুমাস্তৃত, তেমনি মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ, অথচ সর্ব্ব-সাধনার ফল অধিকরূপে ইহা হইতে লাভ করা যায়। তাই পরম কারু-ণিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—এই দুর্গম সংসারে যাহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারা যদি ইহার ভিতর দিয়া পরম শান্তিময়, পরম মঙ্গল-ময়, পরমানন্দময় ভগবৎরাজ্যের অভিমুখে গমন করিতে চাহেন, সেই মহাতীর্থের তীর্থযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই ভক্তি-পথের মত নির্ম্মল, নিষ্কণ্টক, সরল, সুখগম্য শিবপন্থা আর দ্বিতীয় কিছু নাই।

কর্ম্মের বহুবিঘ্নতা, যোগের দুষ্করতা, জ্ঞানের কঠোরতা প্রভৃতি তৎতৎ-পথের মহাবিঘ্ন এবং তৎতৎসাধনা-লভ্য ফলও, ভক্তি ও ভক্তি-লভ্য ফলের ন্যায় মূল্যবান্ নহে। সুতরাং ভগবান্ বাসুদেবে যাহাতে ভক্তি-যোগ জন্মে, সেই সাধনার পথই মঙ্গলজনক। যদিও অন্যান্য সাধনপথ ভক্তির ন্যায় সমাদর-যোগ্য নয়, তথাপি পরিচারকদের ন্যায় উঁহাদের নিকটেও ভক্তি-সাধক কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন, একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন কিন্তু ভক্তগণ জানেন, ভক্তিপথে অন্য কোন সাধনার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। যে পথে পরমানন্দময় নৃত্যগানে, পরমমঙ্গলময় স্তব-স্তুতি-বন্দনাতে, পরমরসময় বৃন্দাবনীয় কাব্য-কলার সুধাস্বাদে, সাধনার সঙ্কেত লাভ করা যায়, সে পথের তুল্য সুগম পথ আর কি হইতে পারে?

বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীমন্নারদ বলিতেছেন :—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং।
তথা সমস্ত সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥
জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ॥

যেমন জীবগণের পক্ষে জলই জীবনস্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির পক্ষে ভক্তিই জীবনস্বরূপ। যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়া সকল জীব জীবনধারণ করে, তেমনই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত সিদ্ধিগণ আপনা-দের অস্তিত্ব বজায় রাখে। ভক্তিসাধকের পক্ষে মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎ-কর। ঈশ্বর যদি হাতে তুলিয়া ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, এমন কি, চতুর্ব্বিধ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যত হন, হরিভক্ত তাহাও অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু প্রাথমিক সাধকগণের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কাম সাধক হইতে পারেন তাহা নহে, যদি কাহারও পার্থিব সুখ-সম্পদের কামনা থাকে, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শিশুমনোরঞ্জনের ন্যায় সে বাসনা পূর্ণ করেন।

যথা পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ সংবাদেঃ—

অপত্যং দ্রবিণং দারা হর্ম্যাহর্ম্যং হয়াগজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌচ ন দূরে হরিভক্তিতঃ॥

কিন্তু ভগবান্ সাধকের মঙ্গলের জন্য এই সকল তুচ্ছ পদার্থ দান করিয়া সাধকগণের চিত্তকে প্রায়শই বহির্ম্মুখ করেন না। তিনি সমস্ত কামনা-নিবর্ত্তক স্বকীয় পাদপদ্ম-নখজ্যোতির্দ্বারা ভক্ত-চিত্ত উদ্ভাসিত করেন এবং সেই নখচন্দ্র-চন্দ্রিকায় তাহার হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি এই যে, "অর্থাদি দান করিলেও যখন তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং সেই সকল প্রার্থনা-পূরণের দ্বারা উপকার না হইয়া অপকারই হয়, এমন অবস্থায় আমি তাদৃশ সাধকের মঙ্গলের জন্য, তাহার সর্ব্বেচ্ছা-নিবর্ত্তক আমার পাদপদ্মের সেবাধিকার তাহাকে প্রদান করি।" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের এমনই মহিমা যে তাহাতে সকল প্রকার অনর্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রে বহুস্থানে বহুবার এই আশ্বাসবাণী প্রদত্ত হইয়াছে :—

সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতি পানপৈশুন-পরাঃ পাপাত্মজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদার-পুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেপি হি
শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-শরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ॥

তার্কিক পণ্ডিতগণ মনে করিতে পারেন, যে বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র, স্মৃতি-ইতিহাস প্রভৃতি নিখিলশাস্ত্র পাপনাশের এবং মুক্তিলাভের জন্য শত প্রকারের সহস্র সহস্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সে সকল

উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবল এক শ্রীগোবিন্দের পাদারবিন্দ-সেবায় নিখিল সাধনার লভ্য ফল কি এত সহজে পাওয়া যাইতে পারে? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তির বিন্দুমাত্রও কিরণ-কণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের চিত্ত হইতে এই সংশয়-অন্ধকার একবারে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-লাভ,—বহু জন্মার্জ্জিত, বহু শ্রম-সঞ্চিত, মহামহাসুকৃতির ফল। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ বহুতপস্যা এবং বহু যোগ-ধ্যানাদিতে যে শ্রীচরণ-দর্শন-লাভে সমর্থ হন না, সেই চরণলাভ যে সে সাধনার ফল নহে। এই কথাটী শুনিতে যেমন সহজ ও অল্পাক্ষরযুক্ত, কার্য্যতঃ সেরূপ নহে। নিখিল বাসনা-পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর ভক্তি সহকারে উপাসনা দ্বারা ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মাদিও ভগবৎ চরণ প্রাপ্ত হন না। যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া কাহাকেও এই চরণামৃত প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি যে ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয় হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে :—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বাঽসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

ভগবানের প্রীতির জন্য দেবত্ব, দ্বিজত্ব, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, স্বধর্ম্মাচরণ, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরশক্তি, উদ্যম, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গযোগ,—ইহার কিছুই যথেষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, একটি গজেন্দ্র কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারা ভগবানের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যথা :—

মন্যে ধনাভিজনরূপ তপঃ শ্রুতৌজ-
স্তেজ প্রভাব বল পৌরুষ বুদ্ধি যোগাঃ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায় ॥

এই সকল গুণ শ্রীভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য যে যথেষ্ট নহে, শাস্ত্রকারগণ ভূয়োদর্শন দ্বারা উদাহরণসহ তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, যথা :—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কোবিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নতু গুণৈর্ভক্তি-প্রিয়োমাধবঃ ॥

পুরাণবর্ণিত হরিভক্তব্যাধের কোন্ সদাচার ছিল, ধ্রুবেরই কি বয়স ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, কুব্জারই বা কি সৌন্দর্য্য ছিল, সুদাম্না ব্রাহ্মণেরই বা কি ধন ছিল, বিদুরেরই বা কি বংশগৌরব ছিল, যাদবপতি উগ্রসেনের বা কি পৌরুষ ছিল? অথচ ইহারা সকলেই শুদ্ধভক্তি দ্বারা ভগবানের প্রিয় হইয়াছিলেন। মাধব কেবল শুদ্ধভক্তি-প্রিয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

হে পরন্তপ, কেবল অনন্যাভক্তিদ্বারা আমার প্রকৃতরূপ জানিতে দর্শন করিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে উদ্ধবকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

"সাধুলোকের প্রিয় যে আমি, কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আত্ম-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারিবে।" ভগবদ্ভক্তির অভাবে মানুষের আর কিছুতেই শান্তি হয় না। ভক্তির সাধন ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই; তাদৃশ সাধনা না করিলে যে তজ্জন্য প্রত্যবায় হয়, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে যথা :—

"যাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তা-সুধারস-বিশেষরসৈক-সারম্।
তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥

যে পর্য্যন্ত মানুষ সুধারস-সারস্বরূপ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাবৎকাল জন্ম জরামরণ প্রভৃতি অভিঘাত দ্বারা মানুষ বহুদেহ-জনিত নরকযাতনা ভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভক্তি-সাধনা।

শ্রীরূপ এখন তোমায় ভক্তি-সাধনার কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি ভক্তিদ্বারা ভগবানের সাধনা না করিলে অধঃপতিত হইতে হয়। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে :—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে চতুর্ব্বর্ণের লোক আছে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ভগবানের ভজনা না করে, তবে তাহাকে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়।

শ্রীরূপ, ভক্তির বিবিধ প্রকার ভেদ আছে। ইতঃপূর্ব্বে একাশী প্রকার ভেদের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় জানিতে হইলে ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিতে হয়। আমি তোমাকে সাধারণভাবে কিছু বলিতেছি। সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিনটী শ্রেণী প্রধানতম বিভাগ বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে সাধন ভক্তি দুইপ্রকার,

বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ভগবানের যে কোনরূপে ভজন হয়, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। সাধারণতঃ বৈধী ভক্তির অঙ্গ স্বরূপিণী ক্রিয়াগুলি তোমার নিকট বলিতেছি। উহা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে, যথা—সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কথা। ইহারা সাধনভক্তি, ইহাদের সাধ্য,—ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধন-ভক্তি দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে চিত্তে ভাবরসের উৎপত্তি হয়। সেই ভক্তি সাধ্যভক্তি নামে অভিহিতা। এ সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ ভগবদ্ভজনের জন্য নরনারীর হৃদয়ে কোন বাসনার উৎপত্তি হয় না। এই অবস্থায় গুরু-উপদেশ বা শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা কোন্ প্রকারে ভজনের প্রবৃত্তি উপস্থাপিত হয়। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। গুরুদেব, শাস্ত্র ও সাধু সজ্জনের আচার প্রভৃতির উপদেশ প্রদানে চিত্ত-ক্ষেত্রকে ভক্তিবীজের জন্য প্রস্তুত করেন। বীজ ভাল হইলেও ভূমির দোষে বা ভূমি উপযুক্তরূপে প্রস্তুত না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তজ্জন্য নরনারীগণের হৃদয়ভূমি ভক্তিবীজের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। এজগতে লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছে, চতুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ইহারা দুর্লভ মানুষ জন্ম লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত না হইলে এই দুর্লভ জন্ম একবারেই বৃথা যায়। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে:—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণ-ধারম্
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতঃ
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা

এমন সুদুর্লভ জন্ম পাইয়া ভক্তি সাধন না করিলে আত্মার অধঃপতন একবারেই সুনিশ্চিত। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে অতীব প্রয়োজনীয় একটী উপদেশ আছে, যথা:—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মবঞ্চিতশ্চিরম্।
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ।
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

যাহারা দেবগণের প্রার্থিত দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে আশ্রয় করে নাই, তাহারা চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ আত্মাকে নানাপ্রকার দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ক্রমান্বয়ে চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া মানুষ যদি শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ আশ্রয় না করে, তাহা হইলে সেই দেহাত্মাভিমানী মানবদিগের মনুষ্যজন্ম বিফল হয়।

শ্রীরূপ, আমি তোমায় প্রথমতঃই বলিয়াছি :—

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই কথাই আছে। বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণেও লিখিত আছে :—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাম দশ লক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্ব যোনিং পরিভ্রাম্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

ভক্তির সাধন ভিন্ন জীব জন্ম বৃথা। অন্যান্য জীব উচ্চ ধর্ম্ম সাধনের অযোগ্য। এ অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে কিন্তু মনুষ্য বলিলেই যে মানুষ মাত্রই মনুষ্যধর্ম্মের উপযুক্ত তাহা নহে। বনমানুষ প্রভৃতিও মানুষ নামে অভিহিত হয়, ম্লেচ্ছ যবন সাওতাল ভীল লেপ্ছা প্রভৃতি অসভ্য

শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই বা কত অধিক? ইহা ছাড়া কিরাত হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক খসাদি—ইহারাও ভক্তি-সাধনার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত আরও এতাদৃশ শত শত জাতি জগতের অন্যান্য খণ্ডে বাস করে। যদি তাহারা ভগবৎ-ভক্তি সাধনাঙ্গের কেবল একমাত্র নামাশ্রয় করে কিম্বা ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহারাও অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে। শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে :—

যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ।
শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সহস্র সহস্র কিরাতাদি অন্ত্যজ জাতি সংসার-যাতনা হইতে পরিত্রাণ পায় কিন্তু এমনই লোকের কর্ম্মভোগ যে, তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মেনা।

যাহা হউক শ্রীরূপ, আমি তোমায় সাধন-ভক্তি ও সাধ্যভক্তির বিষয় কিছু বলিতেছি। গুরুর উপদেশানুসারে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তির অনুষ্ঠান করিলে রাগানুগাভক্তির সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর। সে কথা পরে বলিব। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্" ইহার অর্থ এই যে, একশ্রেণীর ভক্তিদ্বারা অন্য একশ্রেণী ভক্তি উদিত হন, সেই ভক্তি উপাসিত হইলে ভক্তদেহে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রেমভক্তি গোপ-গোপীদিগের মধ্যে অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের ভাব ও প্রেম অতি গভীর। সে কথাও আমি তোমাকে ইহার পরে বলিব। আমি তোমায় বলিয়াছি, সাধনভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত,—বৈধী ও রাগানুগা। সাধনভক্তির উপরে ভাব ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি নামে ভক্তির আরও দুই বিভাগ আছে।

শাস্ত্র-মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া শ্রবণাদি নবভক্তি এবং চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তির সাধনাই বৈধী ভক্তি। এ সকল বিষয় তোমার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হইবে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক এই সকল ভক্তি-অঙ্গের কোন এক অঙ্গ সাধনেও ভক্ত সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন। তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বাস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণ-সেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যবিষয়ে হনূমান্, সখ্যে অর্জ্জুন ও আত্মনিবেদনে অসুররাজ বলি, ইঁহারা সকলে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কেবল এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের সেবা করিয়া ইঁহাদিগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু সদ্‌গুরুর নিকট ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্তি পরম দুর্ল্লভ। হৃদয়ে এই বীজ আরোপিত হইলেও নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেক করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ভক্তি-লতা-বীজের উন্নতি সাধন হয়। এই ভক্তি-লতার গতি ও প্রসার বহু উচ্চতম প্রদেশে। জড়রাজ্যে এই লতা আবদ্ধ থাকে না, বীরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে মহাবিষ্ণুর রাজ্য ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হয়।

"তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালি নিত্য সেঁচে শ্রবণাদি জল॥

এই যে ভক্তি-লতার সুদূরপ্রসারের কথা বলা হইল, ইহা

অতিরঞ্জন নহে। বাস্তবিকই ভক্তি-লতা-বীজের এমনই উৎকর্ষ। আনন্দময় রাজ্যই ভক্তির চরম বৃদ্ধি-স্থান। জীবের চিত্তকে পূর্ণরূপে বিভাবিত করিয়া দিয়া উহাকে আনন্দরাজ্যের নিত্য অধিবাসী করিয়া তোলাই ভক্তি-লতার অদ্ভুত কার্য্য কিন্তু ইহাকে অতীব সাবধানতার সহিত রক্ষা করাই ভক্ত-জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। ধামাদির কথা পরে বলিব। বৈষ্ণবাপরাধ ভক্তি-লতার-পক্ষে এক মহা উৎপাত।

যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তাহার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম্॥

বৈষ্ণব অপরাধ কি তাহাও এস্থলে বলা যাইতেছে, যথা :—

হন্তি, নিন্দন্তি, বিদ্বেষ্টি, বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে দর্শনে হর্ষং নো যাতি পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবে তাড়ন অর্থাৎ প্রহার করা নিন্দা অর্থাৎ দোষ কীর্ত্তন, দ্বেষ—শত্রুতা, অনভিনন্দন, অপমান এবং দর্শনে হর্ষ না হওয়া এই ছয় প্রকারে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা পতন অর্থাৎ ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুতি হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ মত্ত হস্তি-সদৃশ ভয়ানক ; ইহা সুকোমলা ভক্তিলতার পরম শত্রু। শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদ্রব-সঙ্ঘর্ষণের আশঙ্কা থাকে। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখাগুলি ভক্তি-লতার বৃদ্ধি-সাধনে ব্যাঘাত ঘটায়। হৃদয়ে ভক্তিশক্তি অতি অল্প পরিমাণেও যখন উদিত হন, তখন লোকের আদর সম্মান প্রভৃতি স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। জনসাধারণ উহাতে আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে উঠন্ত ভক্তিলতা আর বাড়িতে পায় না। তখন লোকানুরাগ-লাভে মনে হয়, নিজে যেন কত উচ্চে উঠিয়াছি। লোকের সম্মান, লোকের প্রতিষ্ঠা,

লোকের পূজা প্রাপ্তির জন্ত চিত্তের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠে, তখন ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে মুক্তির বাঞ্ছাও বলবতী হয়। ইহাতেও ভক্তির বড় হানি হয়। এই সকলই ভক্তির অত্যন্ত বিঘাতক :—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবৎ ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা পিশাচী-সদৃশ। ইহারা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে কিরূপে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে? ভোগবাসনা ও মুক্তির বাসনা ভক্তি-স্পৃহার আবরণকারিণী। এই কারিকাটীর আর একটী পাঠ আছে, যথা :—

"ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা গ্রহঃ"

এ পাঠটীও মন্দ নয়। প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় না হইলে নানাপ্রকার উৎপাত হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার বিষময় ফলে ভক্তিলতা বাড়িতে পারে না, উহা একবারেই শুষ্ক হইয়া যায়।

"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার বিরোধী ভাবও বর্ত্তমান থাকে। সাধকদিগকে এই নিমিত্ত অত্যন্ত সতর্ক হইতে হয়। ভক্তিলতার ফল,—প্রেম। উপশাখাগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধা ভক্তির সেবা করিলে

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমের সমক্ষে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তৃণতুল্য তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই শুদ্ধা ভক্তির অনেক লক্ষণ তোমায় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু উপশাখা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন।

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

শ্রীরূপ, আমি তোমায় সাধন ভক্তির কথা বলিয়াছি,—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনবিধা"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা যে ভক্তি সাধিত হয় এবং যে ভক্তি হইতে ভাব-ভক্তির উদয় হয়, তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রদীক্ষা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন-ভক্তির বহু অঙ্গ আছে। সংক্ষেপতঃ তোমার নিকট সেই সকল প্রকার ভক্তির কথা বলিতেছি :—

১। গুরুপদাশ্রয়, ২। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা, ৩। বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা, ৪। সাধু আচারিত পথের অনুগামী হওয়া, ৫। স্বধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ৬। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নতা-সাধনের জন্য ভোগাদি ত্যাগ, ৭। শ্রীধামে অথবা গঙ্গাদিমহাতীর্থে নিবাস, ৮। যাবদর্থানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ হয় না, সেই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা, ৯। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসরের যথাশক্তি সম্মান, ১০। তুলসীআমলকী অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের সম্মান করা, এই দশটী,—ভক্তির আরম্ভ-ব্যাপার। এই দশাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভক্তি-দেবীর আবির্ভাব হয়।

এখন আরও শুন :—১। ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গ-ত্যাগ, ২। অনধিকারী ও বহুব্যক্তিকে শিষ্য না করা, ৩। মঠাদি আরম্ভে অনুদ্যম, ৪। বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ বিবর্জ্জন, ৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য, ৬। শোকাদির অবশবর্ত্তিতা, ৭। অন্যদেবে অনবজ্ঞা, ৮। প্রাণিমাত্রকেই

উদ্বেগ না দেওয়া, ৯। সেবা অপরাধের উদ্ভব যাহাতে না হয় সেরূপ ভাবে আচরণ করা, ১০। কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-বিদ্বেষ ও ভক্তানিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা,—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন-ভক্তির উদয় হয় না। এই জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিংশতি অঙ্গ,—ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার হইলেও গুরুপদাশ্রয়াদি তিনটী প্রধান অঙ্গ।

আরও শুন :—১। বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, ২। শরীরে হরিনাম অক্ষর অঙ্কন, ৩। নির্ম্মাল্য-ধারণ, ৪। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য, ৫। দণ্ডবৎ প্রণতি, ৬। ভগবৎ প্রতিমূর্ত্তির দর্শন মাত্র গাত্রোত্থান, ৭। শ্রীবিগ্রহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, ৮। ভগবানের অধিষ্ঠিত স্থানে গমন, ৯। পরিক্রমণ, ১০। অর্চ্চন, ১১। পরিচর্য্যা, ১২। গীত, ১৩। সঙ্কীর্ত্তন, ১৪। জপ, ১৫। বিজ্ঞপ্তি (অর্থাৎ নিবেদন), ১৬। স্তবপাঠ, ১৭। নৈবেদ্যাস্বাদ-গ্রহণ, ১৮। চরণামৃত গ্রহণ ১৯। ধূপ মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, ২০। শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন, ২১। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, ২২। আরত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন, ২৩। গীতাদি শ্রবণ, ২৪। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-নিরীক্ষণ, ২৫। স্মরণ, ২৬। ধ্যান, ২৭। দাস্য, ২৮। সখ্য, ২৯। আত্মনিবেদন, ৩০। শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় প্রিয়বস্তুসমর্পণ, ৩১। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমুদয় চেষ্টা, ৩২। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি, ৩৩। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধীয় বস্তুর সেবন, ৩৪। ভক্তি শাস্ত্র সেবন, ৩৫। মথুরাবাস, ৩৬। বৈষ্ণবাদির সেবা, ৩৭। বৈভবানুসারে দ্রব্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সমর্পণ এবং গোষ্ঠিবর্গের সহিত মহোৎসব, ৩৮। বিশেষরূপে কার্ত্তিক মাসের সমাদর, ৩৯। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা, ৪০। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি, ৪১। রসিকগণ সহ ভাগবত অর্থাস্বাদ গ্রহণ ৪২। ভগবদ্ভক্ত, সজাতীয় আশয় বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, ৪৩। মথুরামণ্ডলে স্থিতি, এইরূপে দেহমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চৌষট্টি অঙ্গ বৈধীভক্তির সাধনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে এবং আমার কৃত রায় রামানন্দ গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের উদাহরণাদিও ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরূপ, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে উদাহরণ দ্বারা ইহার প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎতৎস্থলে দুই একটী ব্যাখ্যা অতি প্রয়োজনীয়। এখানে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

নারদীয় পুরাণে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে একটী বচন প্রমাণ আছে :—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥

এই শ্লোকটী উদাহরণরূপে উল্লিখিত না হইলে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা পদের অর্থই বুঝা যাইত না। অপিচ শ্রীপাদ শ্রীজীব, দুর্গমসঙ্গমনীনাম্নী টীকা করিয়া শ্রীপাদরূপের মনোগত ভাব অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। এই শ্লোকে যে 'স্বনির্ব্বাহ' পদটী আছে; যদি দুর্গমসঙ্গমনী টীকা না থাকিত তাহা হইলে উহার অর্থবোধ প্রকৃতই দুর্গম হইত; মনে হইত 'স্বনির্ব্বাহ' পদের অর্থ বুঝি নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কিন্তু তাহা নহে, উহার প্রকৃত অর্থ স্ব-স্ব-ভক্তি নির্ব্বাহ। ভক্তির অনুষ্ঠানে নিজের ক্ষমতার আধিক্য বা ন্যূনতা উভয়ই দোষজনক। যাহার যে পরিমাণে নির্ব্বাহ হয়, তাহার সেইরূপ ভাবেইও চলা কর্ত্তব্য। ন্যূনতা তাহার ও আধিক্যে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। কখন কখন চিত্তের আবেগে মানুষ নিজরে ক্ষমতার অতিরিক্ত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারে না। এই অবস্থায় প্রকৃত ব্যাপারে শিথিলতা, অনাদর, উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য জন্মিয়া থাকে। মনে করুন,—

যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাদৃশব্যক্তি চিত্তের আবেগে কর্জ্জ করিয়া খুব ধূমধামে ভোগারাধনার কার্য্য সম্পাদিত করিল। ঋণ,—মহাপাপ। ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় উত্তমর্ণ প্রতিদিন তাহার প্রাপ্য অর্থের জন্য গোলযোগ আরম্ভ করিল। এ অবস্থায় সাধকের মানসিক শান্তি-রক্ষা করা একবারেই অসম্ভব। ঋণ করিয়া ক্ষমতাতীত কার্য্য করার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। ঐরূপ চিত্তের আবেগ ভগবৎসেবা-মূলক হইলেও উহার পরিণাম ভজন-সাধনের বিঘাতক। কেহ বা সহসা প্রত্যহ লক্ষ নামজপের সংকল্প করিয়া বসিলেন। গৃহস্থলোকের নানা প্রকার কার্য্য, গুরুতর কার্য্যে বাধা জন্মিল, লক্ষনাম আর হইল না। তিনি মনে করিলেন পরদিবস ক্ষতিপূরণ করিবেন কিন্তু আবার এক গুরুতর কার্য্য পরদিনও উপস্থিত হইল, সে দিনও বাধা পড়িল, ক্রমশঃ নিয়ম শিথিল হইতে লাগিল। অবশেষে এমন অনাদর ঘটিল যে, তিনি রোগান্বিত হইয়াও যতটুকু নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেন, আধিক্য দেখাইতে গিয়া ততটুকু পর্য্যন্তও করিতে পারিলেন না। এইরূপ ভাবে মনের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমৎরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে,—"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা" ; ফলতঃ অনিয়মে কার্য্য-নিষ্ঠা হ্রাস হয়, এইজন্য যাবদর্থানুবর্ত্তিতা অতি প্রয়োজনীয়। অশ্বত্থ, তুলসী ও ধাত্রী (আমলকী) গো ভূমি, দেবতা, ও বৈষ্ণবগণের পূজায় মানুষের পাপক্ষয় হয়। গোব্রাহ্মণের হিতের জন্য, ভগবানের অবতার, গোবিন্দ-প্রণামেই তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ-গোপালের উপাসকদিগের পক্ষে অশ্বত্থাদি বৃক্ষের পূজাও গো-পূজা পরমাভীষ্টপ্রদা, যথা শ্রীগৌতমীয়ে :—

গবাং কণ্ডূয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং।
গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি।

অপরপক্ষে বিত্তাদি থাকা সত্ত্বেও জঘন্ত কৃপণতা দোষে ভগবৎসেবার সামর্থ্য মত অর্থ-ব্যয় না করা অন্যায়। উহা বিত্তশাঠ্যদোষ নামে খ্যাত। দৈহিক ও মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও, যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও ভগবদুপাসনায় যথাসম্ভব সময়ক্ষেপ না করা অত্যন্ত অনুচিত।

'ব্যবহারে অকার্পণ্য' পদের অর্থ এই যে, অশন বসনের অভাব হইলেও তজ্জন্য চিত্তকে উদ্বেলিত না করিয়া মনে প্রাণে ভগবান্‌কে স্মরণ করা; ইহারই নাম ব্যবহারে অকার্পণ্য। সেবাপরাধ বর্জ্জনসম্বন্ধে দুর্গমসঙ্গমনী টীকা এবং আমারকৃত শ্রীরায় রামানন্দগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা তিন প্রকার,—সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্য-বোধিকা এবং লালসাময়ী। দ্বিতীয়টীর ও তৃতীয়টীর অর্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে। প্রথমটীর অর্থ এই যে, মনের প্রগাঢ় আকর্ষণে ভগবানের প্রতি চিত্তের রতিসূচক যে প্রার্থনা, তাহাই 'সম্প্রার্থনাময়ী'—বিজ্ঞপ্তি বলিয়া অভিহিত; যুবক যুবতীর পরস্পর চিত্তাকর্ষণ ইহার উদাহরণরূপ। রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবা প্রভৃতির সুষ্ঠু চিন্তনই,—'ধ্যান' নামে অভিহিত। ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এই উভয় সাধনে চিত্ত কঠিন হওয়ার আশঙ্কা আছে। বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগি বটে, কিন্তু ভগবদ্ভজনে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানটুকুই যথেষ্ট। জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই উভয়ের দ্বারা চিত্ত কঠিন হয়। যাহারা ভগবদ্ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর রূপ গুণাদি ভাবনা দ্বারা চিত্ত সরস ও আর্দ্র করার সুবিধা হয়। সুকুমারস্বভাবা ভক্তিদ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। ভক্তযোগীদের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় নহে। শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখেই একাদশ স্কন্ধে তাহা বলিয়াছেন :—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ ॥

সুতরাং জ্ঞান-বৈরাগ্য লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের পৃথক্ সাধনার প্রয়োজন নাই। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে :--

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

এস্থলে 'অহৈতুক' শব্দের অর্থ—উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

যৎকর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে ঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ দ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা, যোগ, দান, ধর্ম্ম প্রভৃতি মঙ্গলজনক কর্ম্মসমূহ দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, একমাত্র ভক্তিযোগেই ভক্ত অতি স্বল্পে সেই সমস্ত লাভ করিতে পারেন। স্বর্গ, মুক্তি এমন কি সর্ব্বোপরি আমার ধামপর্য্যন্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য হইয়া থাকে। পরম বিরক্ত মহাবৈরাগ্যশীল মহাজ্ঞানী শুকদেব পর্য্যন্ত মায়া অতিক্রম করার নিমিত্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন। শুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়া উৎকট যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার সেই যোগ-প্রভাবে জাগতিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। শুকদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন মায়াচ্ছন্ন জগতে তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না। মায়া-প্রপঞ্চে মহাভীত হইয়া পরমযোগী শুকদেব মার্ত্তদেবে মাতৃগর্ভে থাকিয়াই কঠোর যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার তপোবললব্ধ, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বল-লব্ধ কোন শক্তিই মায়া অপসারণে সমর্থ হয় নাই। অথচ গর্ভ হইতে তাঁহার অবতরণ না হইলে জগৎব্যাপারে বিশৃঙ্খলা হয়। ভগবান্ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শুকদেব বলিলেন, করুণাময়, আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার

সময়ে জগতে মায়ার প্রভাব থাকিবে না। এ সম্বন্ধে তুমি যদি প্রতিভূ হও, তবে আমি ভূমিষ্ঠ হইব; যথা—ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে:—

ত্বং ব্রূহি মাধব জগন্নিগড়োপমেয়া
মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা ত্বদীয়া
বধ্নাতি মাং ন যদি গর্ভমিমং বিহায়
তন্নামি সংপ্রতি মুকুঃ প্রতিভূস্তনত্র।

ভগবানের মায়া যে অতি দুরত্যয়া এবং তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে আর কোন প্রকারেই যে মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, ভগবান্ গীতায় নিজেও তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন মুমুক্ষুগণ যে ফল্গু বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাহা কৃষ্ণ-সাধনের অনুকূল নহে। কৃষ্ণ-ভজনের অপ্রতিকূল বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতেও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণানুরাগ সংরক্ষণ,—যুক্ত বৈরাগ্য নামে কথিত হয়। আর ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিত্যাগে যে বৈরাগ্য অবলম্বিত হয়, তাহার নাম ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তিতে রুচি জন্মমাত্রই বিষয়ে বিরাগ জন্মে। উহাতে বিষয়-রাগ নষ্ট হয়। যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ ও ফল্গু বৈরাগ্যের লক্ষণ নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

ভোগের জন্য প্রচুর বিষয় থাকিলেও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও চিত্ত যদি তাহাতে অনাসক্ত থাকে, তবে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগেও বৈরাগ্যের অভাব হয় না। ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তু পরিত্যাগ না করিয়া যথাযোগ্য ভোগ করাই যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ। আবার অপর

পক্ষে ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করা অতি নিষ্ঠুর কঠোরতা মাত্র ; উহা ফল্গু বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয়, উহার অপর নাম মর্কট বৈরাগ্য। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমৎদাস রঘুনাথকে যে উপদেশ দিয়া ছিলেন, তাহাতে বলিয়া ছিলেন ঃ—

স্থির হঞা ঘরে রহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
না কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া॥
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-লোকাচার।
অচিরেতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

এইরূপে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে বৈধী ভক্তির বিষয় শেষ করিয়া রাগানুগা ভক্তির বিবরণ অতঃপরে বর্ণিত হইয়াছে। রাগানুগা বলিতে গিয়া ব্রজবাসিজনগণের রাগাত্মিকা ভক্তি, গোপীগণের কামাত্মিকা ভক্তি ও অপরাপরের সম্বন্ধরূপা ভক্তি বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ভক্তির বিবরণ, লক্ষণ ও উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং রায় রামানন্দ গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিবরণও উক্ত দুইখানি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভাবাঙ্কুর উপজাত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় :—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

১। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত সত্ত্বেও তাহাতে যে অক্ষোভিত চিত্ততা দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষান্তি।

২। ভগবদ্বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে দেহেন্দ্রিয়মন প্রভৃতি নিযুক্ত না

রাখা, কেবল ভগবদ্বিষয়েই নিরন্তর চিত্তকে ব্যাপৃত রাখাই,—অব্যর্থ-কালত্ব। ভক্তগণ বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করেন, মন দ্বারা তাঁহার স্মরণ করেন, দেহদ্বারা অহর্নিশ নমস্কারাদি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা দ্বারা তৃপ্ত না হইয়া রোদন করিতে থাকেন, এইভাবে তাহাদের সমগ্র জীবন হরি-সেবাতেই ব্যাপৃত থাকে।

৩। বিষয়-ভোগের প্রতি বিরাগই বিরক্তি।

৪। মানশূন্যতা—নিজে উত্তম হইয়াও নিজকে ক্ষুদ্র মনে করা।

৫। ভগবানের প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই আশাবন্ধ।

৬। নিজের অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত প্রগাঢ় লালসার নাম সমুৎকণ্ঠা।

৭। নামগানে সদারুচি। ৮। ভগবদ্ গুণাখ্যানে আসক্তি।

৯। ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

ভাবাঙ্কুর উপজাত হইলে সাধারণতঃ এই নব লক্ষণের উদয় হয়। এইরূপে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহরী পরিসমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাবের গাঢ়াবস্থাই প্রেম। উহা সম্যক্ মসৃণ চিত্তে প্রকাশ পায়। উহাতে অতিশয় মমত্ব চিত্তে অঙ্কিত হয় এইরূপে ভাব ঘনীভূত হইলেই উহা প্রেম নামে কথিত হয়। ইহাতে বৈধী রাগানুগা এবং ভগবানের অতি প্রসাদোত্থ এই ত্রিবিধ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। বৈধীভক্তি-সমাশ্রিত-ভাবোত্থ প্রেম, রাগানুগাশ্রিত-ভাবোত্থ প্রেম এবং ভগবানের অতি প্রসাদোত্থ ভাবাশ্রিত প্রেমের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ-পঞ্চরাত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥

"হে প্রিয়ে। যিনি ভগবানের ভাবভক্তিতে উন্মত্ত এবং পরমানন্দে আপ্লুত, তাঁহার নিজের সুখ দুঃখের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না।" এই

প্রেম-প্রাদুর্ভাবের অনেক ক্রম আছে তন্মধ্যে একটী ক্রম বলা যাইতেছে :—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব এবং সর্ব্বশেষে প্রেমের উদয় হয়। ইহাই সাধকগণের প্রেমোদয়ের ক্রম।

ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, ভক্ত সাধকের পক্ষে কতকটা উচ্চস্তরে অবস্থিত। ভাবের লক্ষণ এইযে :—

শুদ্ধ সত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

ইহার আর একটী লক্ষণ তন্ত্রে আছে :—

প্রেম্ণস্তু প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদির চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে :—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা ভাবের বিচার করা যাইতে পারে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিচার আছে। সে বিচার দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় দৃষ্ট হয়। প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হইয়াছে। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আরও ভিন্ন প্রকারের ভাবের উল্লেখ আছে। চরিতামৃত হইতে যে টুকু উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে দেখা যায় হ্লাদিনীর সার,—প্রেম ; প্রেমের সার, ভাব। ইহাতে পাঠকগণের মনে নানাপ্রকার অর্থের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ভাব যদি প্রেমের সার হয়, তবে উহা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিত প্রেমের প্রথম অবস্থা বলিয়া যে ভাব বর্ণিত হইয়াছে, সে ভাব হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যদি চৈতন্যচরিতামৃতের লিখিত প্রেমসার ভাব এই বাক্যস্থিত প্রেমসার পদটীকে বহুব্রীহি সমাসে অর্থ-বোধের উপায় করা হয়, তাহা হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভাবের সহিত অর্থ-সঙ্গতি হয়। 'প্রেমই হইয়াছে সার যাহার' তাহাই ভাব; কিন্তু চরিতামৃতের অভিপ্রায় সেরূপ নহে। উহাতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃই বোধ হয় এই ভাবটী প্রেমেরই উপরের অবস্থা। কেননা এই ভাবের পরম কাষ্ঠাই,—মহাভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে 'ভাব' শব্দটীর যে বহুপ্রকার পারিভাষিক অর্থ আছে, তাহা পণ্ডিত মাত্রেরই সুবিদিত। এস্থলে 'ভাব' শব্দটীর বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে না। সাধন ভক্তির উপরের স্তরে এবং প্রেমভক্তির নিম্নস্তরে যে ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

এই ভাবটী শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ-মূলক। শুদ্ধ শব্দের অর্থ এই যে, যাহা স্বয়ং প্রকাশ, যাহা তত্ত্বান্তরের দ্বারা প্রকাশিত নহে এমন যে সত্ত্ব, তাহাই শুদ্ধ সত্ত্ব। ভগবানের সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদাখ্যা বৃত্তিকেও শুদ্ধ সত্ত্ব বলা যাইতে পারে। স্বরূপ শক্তির অন্য প্রকার বৃত্তি আছে, উহার নাম,—হ্লাদিনী শক্তি। তাহা হইলে সম্বিতের সার এবং হ্লাদিনীর সার এই উভয়ের সারাংশ মিশ্রিত হইয়া ভগবানের নিত্য প্রিয়জনাধিষ্ঠানক এবং তদীয় আনুকূল্য ইচ্ছাময় পরমবৃত্তিত্বই—এই ভাবের প্রকৃত অর্থ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে হ্লাদিনীর সারবৃত্তি এবং সম্বিতের সারবৃত্তি দ্বারা এই ভাব গঠিত হইয়াছে। হ্লাদিনীর সার যে প্রেম, সে প্রেমেরও কতকটা অংশ ইহাতে আছে। সুতরাং শ্রীচরিতামৃতে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত কোনও গোলযোগ হইতেছে না। ভগবৎ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্বিতের সারবৃত্তির সহিত হ্লাদিনীর সার বৃত্তি যে প্রেম তাহারও প্রথম অবস্থা ইহাতে আপতিত হওয়ায় ইহা প্রকৃতপক্ষেই প্রেম-

সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্' বিশেষণের সার্থকতা করিয়াছে। সৌহৃদ্য-উল্লাসের দ্বারা ইহা চিত্তকে আর্দ্র করে। ইহা দ্বারা প্রপঞ্চস্থ ভক্তগণের চিত্ত মসৃণ বা আর্দ্র হয়। ইহার পরের অবস্থাই,—প্রেম।

এখন শ্রীপাদ রূপকে মহাপ্রভু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই মর্ম্ম বলা যাইতেছে। মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, প্রেম কি তাহা বলিতে হইলে পূর্ব্বে ভাবতত্ত্ব বলিতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইহার অর্থ বলিতেছি— জ্ঞানে ভগবান্‌কে জানা যায় কিন্তু ভক্তিতে সম্যক্‌রূপে জানা যায়। সুতরাং ভক্তিতে যে জ্ঞানেরও ভাগ আছে, ইহাতে তাহাই বুঝা গেল। ভক্তি প্রধানতঃ হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ, কিন্তু তাহাতে সম্বিতের কথাও শ্রীভগবানের উক্তিতেই জানা গেল। কেননা ভগবান্ বলিতেছেন—"অভিজানতি।" তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী,—এই উভয় শক্তির বৃত্তিবিশেষই সাধনভক্তির উপাদান। শুদ্ধ সম্বিৎশক্তি শ্রীভগবানেরই প্রকাশিকা স্বরূপ-শক্তি। ভাবটী সাধনভক্তিরও পরাবস্থা। সুতরাং সম্বিতের সার এবং হ্লাদিনীর সার ইহাই ভাবের উপাদান। ভাবে হ্লাদিনীর সার ভাগ প্রেম অপেক্ষা কৃত অল্পমাত্রায় থাকে, ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ বলা হইল। হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তির সারের যেমাত্রা প্রেমে থাকেন, ভাবে তত পরিমাণে ইহার অস্তিত্ব নাই। অরুণোদয় যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যের নিদর্শন, ভাবও তেমনই প্রেমোদয়ের পরিচায়ক। ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে প্রেমোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। এই ভাবই সৌহৃদ্য-রস-অভিলাষ দ্বারা চিত্তকে আর্দ্রীভূত করে। চিত্ত প্রিয়বস্তুর জন্য তারল্য-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শ্রীভগবানের প্রতি সাধন-ভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেই উহা ভাবতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। তন্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা। প্রেমের তুলনায় ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি

সাত্ত্বিক ভাবের মাত্রা অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়। অশ্রুপুলকাদি ইহার অনুভাব। পদ্মপুরাণে ইহার একটী উদাহরণ আছে 'রাজা অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাবাপন্ন হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।' শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব একটী পদ্যে তাঁহার মাতৃদেবীকে এই ভাবভক্তির কথা বলেন, যথা—নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতম্ ইত্যাদি। ভগবানের প্রতি ভাববর্জ্জিত নিরুপাধি জ্ঞানও শোভনীয় নহে।

শ্রীরূপ, এই যে ভাবের কথা বলা হইতেছে, ভক্তি-ব্যাপারে ইহা অতীব মূল্যবান্। ইহার অপর পর্য্যায় রতি নামে অভিহিত। সাধনে দৃঢ় নিষ্ঠাময় অভিনিবেশজ ভাবই রতি। শ্রীভাগবতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। এখানে একটীর উল্লেখ করিতেছি। ইহা শ্রীনারদের আত্ম-কাহিনী, তিনি বলিতেছেন, শৌনকাদি ঋষিগণ ঋষি সমাজে প্রত্যহ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন, আর আমি উহা অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর কাণ প্যাতিয়া শুনিতাম। এইরূপ শুনিতে শুনিতে শ্রবণমনোহরকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে আমার রতি উপজাত হইল। এই রতি সাধনাভিনিবেশজনিত ভাব এবং সেই ভাব শ্রদ্ধা হইতেই উৎপন্ন।" কপিলদেবও মাতাকে বলিয়াছেন, "আমার বলবীর্য্যাত্মিক সাধুগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা বাস্তবিকই হৃৎকর্ণের রসায়ন। উহা শ্রবণে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি ক্রমেই উদিত হয়।" পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব এই উভয় শব্দ একার্থবাচী। ভক্তিরসও সেই অর্থেই গৃহীত হইল। ইহা অনেক কারণে উদ্ভূত হয়, যেমন কৃষ্ণের প্রসাদ ও তদ্ভক্তের প্রসাদ হইতে রতি জন্মে। রতি বা ভাব গাঢ়তর হইলে উহা প্রেম নামে অভিহিত হয়।

শ্রীরূপ, এখন তোমায় সংক্ষেপে সারগর্ভসিদ্ধান্ত বলিতেছি :—

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।

রতি গাঢ় হইলে তাহে প্রেম নাম হয়।

ভক্তভেদে এই রতি পাঁচ প্রকার, ক্রমশঃ তোমাকে তাহা বলিব। এখন ভাবিয়া দেখ তোমায় যে ভক্তির মহিমা বলিয়াছি, এই প্রেম সেই সাধন ভক্তির কত উর্দ্ধাবস্থা। এই প্রেম ভগবৎ-সাধনের উচ্চতর সাধক। এই প্রেমের নিষ্ঠাবান্ সাধক দেহগেহ প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যান। শ্রীভাগবতে ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার বহু উদাহরণ আছে। ভক্তির লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাব ঘনীভূত হইলেই প্রেম নামে কথিত হয়। উহাতে মমতাবোধ অত্যন্ত অধিক হয়। "শ্রীভগবান্ আমার অতি আপন"—এরূপ জ্ঞান হয়। প্রেমের স্বভাব এইযে পরকে আপন করে, দূরকে নিকটে আনে, শত্রুকেও মিত্র করে—প্রেমের ক্ষমতা অত্যদ্ভুত।

এই প্রেম কোন্ ক্রমে উদিত হয়, তাহার একটা কারিকা তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীনারদ ঋষির কথায় জানা গিয়াছে, যে তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেন। শ্রীমৎ কপিল-দেবও বলিয়াছেন, ইহার প্রথম সোপান,—শ্রদ্ধা।

শ্রীরূপ, এখন তোমায় শ্রদ্ধার কথা কিছু বলিব। ভাব ও প্রেমের কথাতো কতই বলিবার আছে, উহাত অফুরন্ত; এখন শ্রদ্ধার কথা শুন। আমি বলিয়াছি,শ্রদ্ধা শব্দটী অতি প্রাচীন। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতাতে শ্রদ্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম ও ৮ম প্রপাঠকে শ্রদ্ধার বিষয় লিখিত আছে। বেদসংহিতা সমূহে ভক্তি শব্দ দৃষ্ট হয় না, প্রণা ও শ্রদ্ধা ঋগ্বেদে ভক্তির আসন জুড়িয়া বসিয়াছেন। প্রেম অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান,—শ্রদ্ধা। সুতরাং শ্রদ্ধার কথাই প্রথম শ্রোতব্য। শাস্ত্রার্থে সুদৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা; দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে কোন জ্ঞানই পরিপক্ক হয় না। যাহা সন্দেহ প্রসূত, তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে; নাও হইতে পারে। এইরূপ সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞানের উপর কোন তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা হয় না। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। যুক্তি প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভগবদ্বাক্যমূলক ঋষিবাক্যে আস্থা রাখাই শ্রদ্ধা। অনেক

কবি বলিয়াছেন, "হে চিরসুন্দর, হে চিরমধুর, আমি চর্ম্ম চক্ষুতে তোমায় প্রত্যক্ষ করি নাই কিন্তু আমার হৃদয়ের বিশ্বাস—তুমি আছ এবং তুমি চিরসুন্দর ও চিরমধুর। আমাদের প্রত্যক্ষের কোন মূল্য নাই। উহার সীমাও অতি ক্ষুদ্র। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা যাহা জানা যায় তাহা অতি সীমাবদ্ধ ও ভ্রান্তিপূর্ণ কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টি অনন্ত প্রসারিণী, অসীম ও বিশ্ববিজয়ী।" "শ্রদ্ধা হয় অন্ধকারে কৃষ্ণের কিরণ"। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি স্বার্থময়ী ও সঙ্কীর্ণ; বিশ্বাসের দৃষ্টি অসীম, অনন্তপ্রসারিণী ও বিশুদ্ধা। অতীন্দ্রিয় অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার করিয়া লইতে হইলে শ্রদ্ধাই তৎপক্ষে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। শ্রদ্ধাই নশ্বর মানুষকে অনশ্বর আনন্দধামে লইয়া যায়। শ্রদ্ধা-সোপানে সেই উচ্চতম দুনিরীক্ষ্য সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত সর্ব্বানন্দ মন্দিরে আরোহণ করা যায়। যখন ইহ জগতের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টির চক্রবালে কেবল অন্ধকারের ঘন কৃষ্ণ রেখাকে আরও ঘনীভূত করিয়া তোলে, তখন এই শ্রদ্ধাদেবীই স্বীয় সমুজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকা লইয়া সাধককে শ্রীভগবানের রাজ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া থাকেন।

সংসারের কোলাহলে, বাদবিবাদের কুতর্কে হৃদয় যখন* অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হয়, এক শ্রদ্ধাই তখন আশার আলোকে মানব হৃদয়ে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রকটিত করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের কর্কশ কুতর্কে কর্ণপাত

* এস্থলে একজন আধুনিক ইংরেজ কবির অতি সুন্দর একটুকু কাব্যাংশ আমারও মনে পড়িতেছে। কবিটী নবা; পাশ্চাত্য কাব্য পাঠকগণের অতি প্রিয়তম, নামটী.— Tennyson. সেই কাব্য-সুধা-বিন্দুটুকু এই :—

Strong son of God! Immortal Love!
Whom we, that have not seen Thy Face,
By Faith, and Faith alone embrace,
Believing where we can not prove
We have but Faith; we cannot know,
For knowledge is of things we see,
And yet we trust it comes from Thee,
A beam in darkness let it grow;

না করিয়া শ্রদ্ধার দিকেই কাণ পাতিয়া রাখা উচিত। যিনি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করার প্রথম সোপান,—শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হইতেই শান্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়। এ সংসারে মানুষের চিত্ত যখন নানাপ্রকার কল্লোল-কোলাহলে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, তখন ভগবদ্বিশ্বাসই শান্তিসুখের একমাত্র উপায়। যখন একটী একটী করিয়া প্রভাতী-তারার মত আশার কিরণগুলি নিরস্ত ও নিষ্প্রভ হইতে থাকে, কিছুতেই যখন বিষণ্ণ হৃদয়কে প্রসন্ন করিতে পারে না, তখন একমাত্র ভগবদ্বিশ্বাসই মৃতপ্রায় মানব মনে নবজীবনের সঞ্চার করে।

শ্রীরূপ, শ্রদ্ধার কথা বিশেষরূপেই বলিতে হয়। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ, অনন্তমেয়, অনুপমেয় অথচ নিত্যানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দপ্রদেশে প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সহায়,—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই জীবনের জীবন। জলভিন্ন যেমন উদ্ভিদের জীবন, সর্ব্বদাই আতঙ্কময়, ভগবানে শ্রদ্ধাবিহীন মানুষের জীবন ও তাদৃশ। নিরন্তর উদ্বিগ্ন জীবন,—নিরন্তর দুঃখের নিত্য আবাস। দুঃখদারিদ্র্য-প্রপীড়িত রোগ শোক-প্রশাসিত, ছলনা প্রবঞ্চিত মানব-জীবন,—এক মহা মরুভূমি; এই শত সন্তাপময় মরুভূমিতে ভগবৎ-শ্রদ্ধাই একমাত্র অনন্ত আনন্দ-নির্ঝরিণী। ভগবানে বিশ্বাস কর, এই মরুতেও সুখময় নিত্যবৃন্দাবন প্রকটিত হইবেন। ভগবৎ-শ্রদ্ধা সহস্র বিপদের মধ্যদিয়াও মানুষকে আনন্দ বৃন্দাবনে লইয়া যায়।

শাস্ত্রকার বলেন, "নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মাকৃত্য প্রয়োজনম্"। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ধর্ম্মকৃত্যে কোন প্রয়োজন নাই। ফলতঃ শ্রদ্ধাহীনের কোন কার্য্যে অধিকার জন্মে না। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন,—'যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্ মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস' ইতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন,—শ্রদ্ধয়াদেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্'। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন:—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্যনেহচ॥

নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাধর্ম্মস্যাস্যপরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥

শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিরা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেনা। তাহারা মৃত্যুরূপ সংসারপথে যাতায়াত করে।

অপিচ ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রদ্ধাই যে জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান ও সুখের হেতু, অতি স্পষ্টরূপেই তাহা বলা হইয়াছে। উহার অভাবে যে প্রত্যবায় হয়, তাহাও লিপিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা উপাসনা ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই ভগবদ্ জ্ঞান ও ভক্তিলাভের প্রথম সোপন বলিয়া বেদবেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হওয়ার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলেন, শ্রদ্ধাবান্ হওয়া তো প্রথমেই প্রয়োজন কিন্তু শ্রদ্ধবান্ হইয়া অলস ভাবে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধ হয়না। সুতরাং তৎপর হইতে হইবে, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। অজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিদের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবেশাধিকার হয়না কিন্তু সংশয়াত্ম লোকের ইহকালে কিম্বা পরকালে কখনও কোথা ও সুখের আশা নাই; সে এক অতিভীষণ দুঃখের অবস্থা। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

যে সকল সাধক আমাতে মন প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম। অর্জ্জুন ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, অযতি অথচ শ্রদ্ধযুক্তব্যক্তি যদি সাধন হইতে বিচলিত হন, তাহা হইলে তাঁহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—ইহকালে কি পরকালে তাহার বিনাশ হয়না; যেহেতু, হে অর্জ্জুন, শুভকারী কোনও ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হননা। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে শ্রদ্ধা নিজেই এক বিশেষ গুণ।

গীতায় ও ভাগবতে শ্রদ্ধার আলোচনা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা দ্বারা সকলবস্তু ও সকল ভাব পবিত্র হয়। উপাসনার সর্ব্বপ্রকার ন্যূনতা শ্রদ্ধা দ্বারা পরিপূরিত হয়। অপর পক্ষে শ্রদ্ধা বিহীন জপ তপ ভগবদুপাসনা প্রভৃতি নিষ্ফল হইয়া যায়। বহ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে :—

শ্রদ্ধাপূর্ব্বা ইমে ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধা মধ্যান্ত-সংস্থিতাঃ।
শ্রদ্ধানিত্যা প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্ত্তিতাঃ॥

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীগোবিন্দ তদীয়ভক্ত উদ্ধব মহোদয়কে বলিয়াছেন :—

তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা-শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

এই বিখ্যাত শ্লোকটীর দ্বারা কর্ম্মাধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ভক্তের পক্ষেও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য; ইহা জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থার বিধি। চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে জ্ঞান পথের উপাসনা এবং ভবগৎ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিলে স্মার্ত্তকর্ম্ম পরিহার করিয়া ভক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই এই উপদেশ। এস্থলেও শ্রদ্ধা

শব্দের অর্থ,—ভগবৎ লীলাদিতেদিতে দৃঢ় বিশ্বাস। এই জাতীয় আর একটী শ্লোক শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে, যথা :—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

এস্থলে 'নির্ব্বিণ্ণ' শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়-প্রতিষ্ঠা-সুখে বিরত, এই অবস্থায় সাধনাবিষয়ে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিপ্রদ। আবার অপর পক্ষে যাহারা ঐ সকল সুখের অনুরাগী এবং সুখভোগ-ত্যাগে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ। 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের অর্থ ইহ সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব, পরমস্বতন্ত্র পরমকরুণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং তজ্জাত মঙ্গলোদয় লাভ করেন, তিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

এখানেই শ্রদ্ধার আরম্ভ। উক্ত একাদশ স্কন্ধেই লিখিত হইয়াছে :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চগর্হয়ন্॥

অর্থাৎ যিনি এই সংসারের কামনা সমূহকে দুঃখময় জানিয়াও সেই সকল কামনা পরিত্যাগে অসমর্থ, কিন্তু অসমর্থ হইলেও তিনি সেই সকল কামনার নিন্দাই করিয়া থাকেন, অথচ পরিত্যাগে অসমর্থ বিধায়, সেই সকল কামনার সেবা করিতে করিতে যাবতীয় সংসারকর্ম্মে বিরাগী হন এবং আমার নাম-গুণ-লীলাদিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তিনি আমাকে ভজন

করেন। এখানে শ্রদ্ধা এইযে, ভগবদ্ভজনই শুভকর, অপরপক্ষে সংসার-সেবা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দায়িনী। ইহাতে অন্যান্য কর্ম্মে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। শ্রদ্ধা ভিন্ন অনন্যা ভক্তির উদয় হয় না। ভগবানের নাম-গুণাদি-লীলা শ্রবণে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় কিন্তু শ্রদ্ধা না হইলেও ভক্তির ফলদাতৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। নাম-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নামমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।

অজামিল অজ্ঞাতসারে পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ করা মাত্র বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে শ্রদ্ধার অভাব সত্ত্বেও ভক্তির ফল দৃষ্ট হইল। এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রোক্ত অভিধেয় অবধারণের অঙ্গ। কেননা, শ্রদ্ধাই শাস্ত্র-বিশ্বাসের হেতু কিন্তু ইহা অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত নহে। ভক্তি স্বীয় ফলোৎ-পাদনে কোন বিধির অপেক্ষা করে না। অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা না থাকুক, দাহাদিকর্ম্মে অগ্নির প্রভাব অবশ্যই থাকে। ভগবদ্ভক্তির শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফলও সেইরূপ। কেননা, উহা শ্রীভগবানের স্বরূপস্থ তাদৃশ শক্তি। সুতরাং ইহার পক্ষে শ্রদ্ধাদির কোন অপেক্ষা নাই। শ্রদ্ধা ভিন্নও স্থলবিশেষে মুদ্রাদির সিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। হেলায় ভগবানের নাম লইলে যে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হয়, তাদৃশস্থলে হেলা, অপরাধরূপে হইলেও উহা যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক না হয়, তাহা হইলে সেই হেলায় কোন দৌরাত্ম্য দোষ থাকে না। তাদৃশ দৌরাত্ম্য না থাকায় উহাতে ভক্তির বাধা জন্মায় না। অপর পক্ষে জ্ঞানবল-দুর্ব্বিদগ্ধাহেলা ভক্তির পক্ষে বাধাজনক হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও আর্দ্রকাষ্ঠে সহসা দাহ-শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ পায় না। "শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ত যদি আমাকে এক গণ্ডূষ জল প্রদান করে, সেই উপহার আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। অভক্তের অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভূরি ভূরি দ্রব্যেও আমার সন্তোষ জন্মে না।" ইহাই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি।

এইরূপ আলোচনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাটী ভক্তির অঙ্গ নয়। ইহা অনন্যা ভক্তির অধিকারিত্বের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শ্রদ্ধা ভিন্ন কর্ম্ম বা জ্ঞান ফলপ্রদ হয় না। শ্রদ্ধাই অনন্যা ভক্তির অধিকারে হেতু-স্বরূপ। উপাসকের পক্ষে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা নিখিল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ, জপ, হোম অর্চ্চন প্রভৃতি শ্রদ্ধাভিন্ন সকলই নিষ্ফল। এই শ্রদ্ধাই সমস্ত ধর্ম্মের মূল, প্রেমভক্তির পক্ষে ইহাই প্রথম সোপান, ইহাই অনন্যা ভক্তির হেতু। সুতরাং সাধক মাত্রের পক্ষেই শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধু-সঙ্গ।

অতঃপরে সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ :—এক্ষণে তোমায় সৎসঙ্গের কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি। সঙ্গের প্রভাব সকলেরই স্বীকার্য্য। সুগন্ধি কুসুম কাননে সহস্র সহস্র পুষ্প বিকসিত হয়, সেই কুসুম,-কাননসঞ্চারী বায়ু, পার্শ্ববর্ত্তী সকলকেই আমোদিত এবং আনন্দিত করে। বস্ত্রের নিজের কোন গন্ধ না থাকিলেও উহাতে যখন কোন সুগন্ধি দ্রব্য বাঁধিয়া রাখা হয়, বহুদিন পর্য্যন্ত বস্ত্রাঞ্চল সেই ঘ্রাণে সুবাসিত থাকে; এসকলই সুসংসর্গের ফল। এইরূপ সাধুসঙ্গদ্বারা মানুষের চিত্ত অতি উন্নত হয়। ইহাতে স্বাভাবিক দোষগুলি তিরোহিত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত শাস্ত্রে সৎসঙ্গের বহুলমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীরূপ, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধুসঙ্গই তাহার প্রধান সহায়। এইনিমিত্ত সাধুসঙ্গসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ জগতের হিতার্থে তাঁহার সাধুসন্তানকে এই জগতে প্রেরণ

করেন। তাঁহাদের আগমনে, তাঁহাদের চরণধূলায় এজগৎ পবিত্র হয়, সংসারের লোকের পাপ-তাপ রোগ-শোক দৈন্য-দুর্ভিক্ষ সকলই দূর হয়। শাস্ত্র বলেন :—

গঙ্গা পাপং, শশী তাপং, দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধু-সমাগমঃ॥

এখন সাধুর লক্ষণ কি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি :—

শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদগন্ধভাগ্ ভবেৎ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধু নিরন্তর পান করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর নমস্কার। কমল-মধুপানোন্মত্ত ভ্রমণশীল ভ্রমরের মুখনির্গলিত মধুগন্ধে কুক্কুরও যেমন আমোদিত হয় সেই প্রকার যে-কোন-প্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করা মাত্র কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গে কুক্কুরতুল্য হীনব্যক্তিও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া থাকেন। সাধুগণের লক্ষণ শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধুর আদর্শে ভক্তজীবন গঠন করিতে হইবে। ধন, মান, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা প্রভৃতি-সাংসারিক ব্যাপার। অনিত্য সংসারে এই সকলেরই আদর কিন্তু ভগবানের অতি প্রিয় সাধুগণের লক্ষণ শুনিলে স্পষ্টতঃই বুঝাযায় যে ইহ জগতের যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু বৈভব, সেই সকলই অতি নশ্বর এবং শত বিঘ্ন সঙ্কুল, কিন্তু সাধুগণের জীবন পরমশান্ত, পরম সুখময় ও পরমানন্দময়। এখন সাধুর লক্ষণ বলিতেছি :—

১। যথালব্ধোঽপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ॥

সাধুগণ এই দুরন্ত সংসারে নিত্য অভাবে পড়িয়াও কাহারও নিকট কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কোন কিছুর অভাবেও ক্লেশ বোধ করেন না। যখন ভগবানের ইচ্ছায় ভরণ-পোষণের জন্য যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাঁহার চিত্ত সর্ব্বাবস্থাতেই

সমান থাকে এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, অনিন্দক ও হরিপাদ পদ্ম ভক্ত,—তিনিই সাধু।

২। নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্ব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥

যিনি নির্বৈর, সদয়, শান্ত, দম্ভাহঙ্কার-বর্জ্জিত, নিরপেক্ষ, যিনি মুনি ও বীতরাগ, তিনিই সাধু। জগতে লোকের উদ্বেগ জন্মাইলেই, উদ্বিগ্ন লোকেরা প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া উঠে; সুতরাং পরস্পর বৈরভাবাপন্নতা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। পরের অপকার করিতে গেলেই শত্রুর সৃষ্টি হয়। কায়মনোবাক্যে সাধুরা কাহারও অপকার করেন না, প্রত্যুত আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করিয়া থাকেন। এইজন্য কেহই তাঁহাদের শত্রু হয় না।

যাঁহারা নিজকে তৃণাদপি নীচ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের দম্ভ অহঙ্কার থাকিতেই পারে না। সাধুগণ কোনও বিষয়ে পরের অপেক্ষা করেন না; নিজের স্বার্থের জন্য কখনও অন্যকে উদ্বিগ্ন করেন না। তাঁহারা শতক্লেশ, শত অভাব, শত যাতনা-নিগ্রহ সহ্য করিয়াও আপনার দুঃখকেও সুখ মনে করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা মান, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও ব্যস্ত হন না বা কাহারও নিকটে এই সকল প্রাপ্তির আশা করেন না কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই অপরের সাহায্য করেন।

৩। লোভ মোহ-মদ-ক্রোধ-কামাদি-রহিতঃ সুখী।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-শরণঃ সাধুঃ সহিষ্ণুঃ সমদর্শনঃ॥

সাধুগণ বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু; এই কথাটী বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। আমি তো সর্ব্বদাই এই কথাটী বলিয়া আসিতেছি,—"তৃণাদপি-সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" জগতে নরনারীমাত্রেরই সহিষ্ণু হওয়া কর্ত্তব্য। সাধুদিগকে সংসারের লোকেরা কত প্রকারে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত করে কিন্তু সাধুগণ সর্ব্বদাই তাহাদের হিত ও কল্যাণ কামনা করিয়া

থাকেন,এখানকার কোন সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না। এখানকার কোন লাভালাভও তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না।

১। সমচিত্তো মুনিঃ পূতো গোবিন্দচরণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতদয়ঃ কাঞ্চৌ বিবেকী সাধুরুত্তমঃ॥

সাধুগণ সর্ব্বদায়ই সমচিত্ত; সুখ দুঃখে, নিন্দা প্রশংসায়, লাভালাভে শীতে-গ্রীষ্মে,—সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্ত একরূপ থাকে আকাশে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখ,—

"উদেতি সবিতা রক্তো রক্তএবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥"

সূর্য্যদেব উদয়েও যেমন রক্তবর্ণ, অস্তমনেও তেমনই রক্তবর্ণ। বিষাদের কালিমা, ভয়ের পাণ্ডুরিমা, মৃত্যুর নীলিমা ইহার কিছুতেই সাধুগণের প্রসন্ন মুখচ্ছবিখানিকে বিষণ্ণ, বিপন্ন বা তমসাবৃত করিতে পারে না। মহৎব্যক্তিরা সম্পদে বিপদে সমান থাকেন, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে সাধুগণ সর্ব্বাবস্থাতেই সমচিত্ত। সাধুগণ সর্ব্বদাই পরোপকারী। তাঁহারা বিপন্ন হইয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন, এবং উৎপীড়িত হইয়াও উৎপীড়কের প্রতি প্রেম-সুধাই বর্ষণ করেন।

নান্তর্বিচিন্তয়তি কিঞ্চিদপি প্রতীপ-
মাকোপিতোপি সুজনঃ পিশুনেন পাপম্।
অর্কদ্বিষোপি হি মুখে পতিতাগ্রভাগা
স্তারাপতেরমৃতমেব করাঃ কিরন্তি॥

দুর্জ্জন দ্বারা প্রকোপিত হইয়াও সুজন তাহার প্রতি কোনরূপ প্রতিকূল পাপজনক প্রতিশোধের ইচ্ছা মনেও কখন চিন্তা করেন না। তারাপতি-চন্দ্রের অগ্রভাগীয় কিরণ রাহুমুখে পতিত হইয়াও অমৃতই বর্ষণ করে। তিনিই বাস্তবিক পরোপকারী, যিনি নিজের লাভালাভ প্রভৃতি গণনা না করিয়া জীবের দুঃখমোচনের জন্য ব্যাকুল হন।

৫। কৃষ্ণার্পিত প্রাণশরীর-বুদ্ধিঃ, শান্তেন্দ্রিয় স্ত্রী-সুত-সম্পদাদি।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদিভক্তির্যস্তেহ সাধু সততং হরের্যঃ॥

৬। কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ, কৃষ্ণেষ্টমন্ত্র স্মৃতি-পূজনীয়ঃ।
কৃষ্ণানিশং ধ্যানমনাস্বনন্যো যো বৈ স সাধুর্ম্মুনি-বর্য্যকার্য্যঃ।

এই শেষোক্ত দুইটী পদ্য একবারেই বিশুদ্ধ প্রেমিকভক্তের লক্ষণ। জীবের উন্নতি-গতির এইখানেই চরম সীমা। এই সকল কথার ব্যাখ্যা-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এই সকল প্রমাণ বচন দেখিতে পাইবে। শ্রীরূপ, আমি আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীগোবিন্দের কৃপায় তোমার চিত্ত দিনরজনী যেন এইরূপভাবেই বিভাবিত থাকে। শ্রীভগবদগীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ সাধুত্বের সম্বন্ধে কয়েকটী লক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা সাধুচরিত্র-গঠনের পক্ষে উপযোগী। সে সকল উপদেশের ফলেই উল্লিখিত পদ্যদুইটীর ভাব ক্রমে ক্রমে ভক্ত-চিত্তে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সাধু-চরিত্র গঠনোপযোগী গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী তোমার জীবনের প্রাথমিক নিয়ামক হউক। তদযথা :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

সুতরাং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে নাই, মৈত্র, করুণ, নির্ম্মম হইতে হইবে। নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার শব্দের অর্থ এই যে, নিজের ভোগ্য বলিয়া দেহ গেহাদিতে আসক্তি রাখিতে নাই; সুখেদুঃখে এক ভাব, অপকারীর প্রতিও ক্ষমা, সর্ব্বাদা সন্তোষ, সংযম ও দৃঢ়নিশ্চয়তা, আমাতে মনপ্রাণ-বুদ্ধি অর্পণ, হর্ষ-অমর্ষ-ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাকা, কাহাকেও উদ্বিগ্ন না করা এবং কিছুতেই নিজেকে উদ্বিগ্ন মনে না করা,—এই সকলই সাধুভক্তের লক্ষণ। এইরূপ চরিত্রের লোক আমার বড় ভালবাসার পাত্র। কাহারও প্রতি কোনও বিষয়ের জন্য অপেক্ষা রাখিতে নাই। সাধুরা সর্ব্বদাই অনপেক্ষ, সর্ব্ববিষয়ে শুচি, দক্ষ ও উদাসীন; কোন ব্যথার কারণ উপস্থিত হইলেও সাধুলোক তাহাতে ব্যথিত হন না। মন্দির মঠাদি কার্য্যারম্ভ-পরিত্যাগী,—শ্রীরূপ, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। যাহার কিছুতে উল্লাস নাই, কিছুতেই বিদ্বেষও নাই, প্রিয়বস্তু বিয়োগে শোক নাই, তৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও নাই, শুভাশুভ উভয়ই পরিত্যাগী—এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। মানে অপমানে সমান জ্ঞান, শত্রুতে মিত্রতে সমান ভাব, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে এবং নিন্দাস্তুতিতে সন্তুষ্ট, স্থিরমতি, গৃহসম্পত্ত্যাদি-বিবর্জ্জিত, বিষয়ে অনাসক্ত, দিনরজনী অনন্যভাবে কেবল আমাতেই আসক্ত,—এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।" ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি।

সদাচার-পরায়ণ, ধর্ম্মাত্মজীবন-পারণ, অতিথি-সেবন, পরদুঃখে নিজের দুঃখ বলিয়া বোধ প্রভৃতিও সাধুর লক্ষণ। গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীভাগবতেও সেইরূপ একাদশ

স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সাধুলক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমোঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণোমুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

একাদশ স্কন্ধের প্রায় সর্ব্বত্রই সাধুলক্ষণ ও সাধুদের কার্য্য প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। ভাগবত ধর্ম্ম, ভক্তগণের ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রভৃতি এই স্কন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি সুকবি, সুপণ্ডিত ও ভক্তিমান, এই সকল উপদেশের তুমি যোগ্যপাত্র, ঃ—

"প্রায়ঃ সন্ত্যুপদেশার্হা ধীমন্তো ন জড়াশয়াঃ।
তিলাঃ কুসুমসৌগন্ধ্য-গ্রাহিণো ন যবাঃ কচিৎ॥"

ধীমান্ ব্যক্তিগণই উপদেশের উপযুক্ত, জড়মতিদিগের প্রতি উপদেশ দিলেও সে উপদেশ কার্য্যকর হয় না। তিলই কুসুম সুগন্ধ গ্রহণ করে কিন্তু যবের সে শক্তি নাই।

কবিবর ভবভূতি উত্তররামচরিতনাটকে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ঃ—
"বিতরতি গুরুঃপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে" ইত্যাদি।

গুরু, প্রাজ্ঞে এবং জড়ে সমানভাবে উপদেশ করেন। তিনি কাহারও শক্তি বৃদ্ধি বা অপহরণ করেন না কিন্তু ফলে প্রচুর তারতম্য দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের কিরণ স্ফটিকে নিপতিত হইলে বিচিত্র সমুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হয় কিন্তু সেই কিরণরাশি মৃত্তিকায় পতিত হইয়া কোনও বর্ণের অস্তিত্ব প্রকাশ করে না।

সাধুগণের লক্ষণ অতি চমৎকার, সাধুগণের ব্যবহারও অতি চমৎকার ; তাঁহাদের ভাব সাধারণ লোকের বিপরীত।

"মনস্বিহৃদয়ং ধত্তে রৌক্ষেণৈব প্রসন্নতাম্।
ভস্মনা মুকুরঃ প্রায়ঃ প্রসাদং লভতে তরাম্॥

মনস্বিগণের হৃদয় রুক্ষ ব্যবহারেও অপ্রসন্ন হয় না বরং প্রসন্নতাই লাভ করে। দর্পণ, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত হইলে আরও উজ্জ্বলতর দেখায়।

দুঃখ সহিষ্ণুতাই সাধুত্বের পরিচয়। সাধু ভিন্ন ইতর লোকেরা দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। মহাশাণের ঘর্ষণ মণিই সহ্য করে কিন্তু উহার স্পর্শমাত্র মৃৎকণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাই কবি বলেন :—

"উত্তমঃ ক্লেশবিক্ষোভং ক্ষমঃ সোঢ়ুং নহীতরঃ।
মণিরেব মহাশাণ-ঘর্ষণং নতু মৃৎকণঃ।"

আপদে বিপদেও সাধুগণের চরিত্রের সদ্গুণ নষ্ট হয় না। কর্পূর অগ্নিদগ্ধ হইলে আরও অধিকতর সুগন্ধি দান করে :—

স্বভাবং ন জহাত্যস্তঃ সাধুরাপদ্ গতোঽপি সন্।
কর্পূরঃ পাবক-স্পৃষ্টঃ সৌরভং ভজতে তরাম্॥"

সাধুদের আপৎকালও শ্লাঘনীয়। চন্দ্র যখন রাহুগ্রাসে পতিত হন, তখনও লোকের ধর্ম্মকার্য্যের সহায় হইয়া থাকেন :—

"অপ্যাপৎসময়ঃ সাধোঃ প্রযাতি শ্লাঘনীয়তাং।
বিধোর্বিস্তুদা স্কন্নোবিপৎকালোপি সুন্দরঃ॥"

দুঃখ-বেগ অধমদিগকেই দুঃখিত করে, কিন্তু সাধুদিগকে দুঃখিত করিতে পারে না। শীতলতা হস্তপদকে কষ্ট দেয় কিন্তু নয়ন-যুগলকে কষ্ট দিতে পারে না :—

"অধমং বাধতে ভূয়ো দুঃখবেগোন তূত্তমং।
পাণিপাদং রুজত্যস্ত শীতস্পর্শো ন চক্ষুষী॥"

পরদত্তবৈভবে সাধুদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না। চন্দন-রস-বিন্দু নেত্রে

জ্বালা উৎপাদন করে, কিন্তু শরীরের অন্যত্র উহা আহ্লাদজনক।" কবি কুসুমদেব বলেন :—

ধনমপি পরদত্তং দুঃখমৌচিত্যভাজাং।
ভবতি হৃদি তদেবানন্দকারী তরেষাম্॥
মলয়জ-রসবিন্দু র্বাধতে নেত্র-মন্ত-
র্জনয়তি চ স হ্লাদমন্যত্র এব গাত্রে॥

শ্রীরূপ, বেদ বেদান্তে, তন্ত্রমন্ত্রে, সঙ্গীত সাহিত্যে সর্ব্বত্রই সাধুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি বহুদর্শী সুপণ্ডিত, তোমার তো কিছু অজ্ঞাত নাই। তথাপি দৃঢ়ীকরণের জন্য আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছ। বলা-বাহুল্য সাধুর মহিমা যেমন সমস্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সাধুসঙ্গের মহিমাও সেই প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

যৎপূজায়াং ভবেৎ পূজ্যো দৃষ্টা ন যমদর্শনম্।
পাপসংঘঃ স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ॥

যাঁহার সমাদরে সমাদরকারী নিজে সম্পূজ্য হন, যাঁহার দর্শনে যমভয় থাকে না, যাহার স্পর্শনে পাপরাশি প্রণষ্ট হইয়া যায় সেই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য আর কি বলিব? যাহারা ইহকাল ও পরকাল জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্ত বলেন :—

ভগবদ্ভক্ত-পাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্॥

যাহাদের সঙ্গ সমস্ত সাধন-সাধ্যস্বরূপ, সেই ভগবদ্ভক্তগণের পাদুকাকে আমি নমস্কার করি।

১। ভগবদ্ভক্তসঙ্গে সর্ব্বপাতক মোচন হয়, যথা বৃহন্নারদীয় যজ্ঞমালী-উপাখ্যানে :—

হরিভক্তি পরাণাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥

শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সঙ্গিগণের সঙ্গমাত্রে মহাপাতকীও পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ভক্ত সঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে বহু বহু শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে কয়েকটীমাত্র প্রমাণ দেওয়া হইল।

২। সৎসঙ্গ দ্বারা অনর্থন নিবৃত্তি হয় এবং পরমার্থ-প্রাপ্তি হয়। পদ্ম-পুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে মুনিশর্ম্মার প্রতি প্রেতগণ বলিয়াছেন :—

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনম্॥

বৈষ্ণব দর্শনই মানবদিগের অপযশ নাশ করে, বুদ্ধি নির্ম্মল করে এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করে।

যথা প্রপন্নমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
ভয়ং শীতং তমোঽপ্যেতি সাধু-সংসেবিনাং সদা॥

যেমন সূর্য্যের শরণাপন্ন হইলে শীত, ভয় ও অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ সাধুসেবী জনগণের কোন প্রকারের ভয় থাকে না।

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয় সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণব-সঙ্গমঃ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গম পা নষ্ট করে, মঙ্গল সংযোজন করে এবং যশ বিস্তার করে। এই সকলই সদ্য সদ্য ফলিত হইয়া থাকে।

জাড্যং ধীয়োহরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং।
জ্ঞানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি॥
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং।
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্॥

সাধু, সঙ্গে বুদ্ধির জড়তা নষ্ট হয়, বাক্য সত্যসিক্ত হয়, জ্ঞানোন্নতি বৃদ্ধি পায়, চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং কীর্ত্তি প্রসারিত হয়। সুতরাং সৎসঙ্গে কিনা হয়?

৩। সর্ব্বতীর্থাধিকতা—অর্থাৎ সর্ব্বতীর্থ,-সেবাপেক্ষাও সৎসঙ্গের ফল অধিক।

"গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমোবরঃ॥

কেহবা গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, কেহবা সাধুসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন, এই উভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গের ফল অধিকতর।

৪। সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা—

(ক) যঃ স্নাতঃ শান্তিশীতয়া সাধুসঙ্গতি-গঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিন্তীর্থৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যিনি সাধুসঙ্গরূপ পরমোজ্জল শান্তিময় গঙ্গাজলে স্নান করেন, তাহার নিকট দানধর্ম্ম, তীর্থধর্ম্ম, তপস্যা ও যজ্ঞাদি ধর্ম্ম অতি নিষ্প্রয়োজন।

(খ) রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্।

রহূগণ, তপস্যায়, বৈদিককর্ম্ম দ্বারা, গৃহ হইতে নির্ব্বাপণ দ্বারা, বেদাধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা জল, চন্দ্র-অগ্নির উপাসনা দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। কেবল মহৎ সেবা দ্বারাই এই সিদ্ধি লাভ হয়।

৫। সাধুসঙ্গ সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট-সাধক। এ সংসারে যাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, সাধুসঙ্গ প্রভাবে তৎসমুদয়ই লব্ধ হইয়া থাকে।

যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যানি তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ॥

৬। সাধুসমাগমে অনর্থও সার্থক হয়।

শূন্যতা পূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে॥

ভক্তজনের সমাগম হইলে বন্ধু-বিয়োগাদি জনিত শূন্য ভবন পরিপূর্ণ হয়, মৃত্যু অমৃতের ন্যায় হয়, আপৎ সম্পদের তুল্য হয়।

সঙ্গো যঃ সংসৃতে র্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তি, অসতের সঙ্গই সংসার দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। যদি সেই সঙ্গটি সাধুগণের সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহা নিঃসঙ্গবৎ কল্পিত হয়।

৭। সাধুসঙ্গে দেহও দৈহিক ব্যাপারাদিতেও বিস্মৃতি জন্মে।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদগৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্য-লুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

হে শ্রীগোবিন্দ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা আপনার পদারবিন্দের সৌরভে লুব্ধহৃদয় ও একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে যাঁহারা সঙ্গ করেন, তাহাদের অতি প্রিয় যে মানবদেহ এবং তাহার অনুগামী গৃহ, ধন, মিত্র, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাদের স্মরণ থাকে না।

৮। জগদানন্দকতা:—

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী।
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়-চন্দ্রিকা॥

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ জগতের আনন্দকর। পদ্মপুরাণে প্রেতের বাক্যে কথিত হইয়াছে,—রসায়নময়ী শীতলা, পরমানন্দদায়িনী বৈষ্ণব-আশ্রয়-স্বরূপ চন্দ্রজ্যোৎস্না কাহাকে না আনন্দিত করে?

৯। মোক্ষপ্রদায়কত্ব:—

"ভবাপবর্গ ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন, হে অচ্যুত, আপনার কৃপা বলে যখন সংসারাসক্ত জনের সংসার বিনষ্ট হয়, তখনই ভগবদ্ভক্তের সহিত সমাগম হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বসঙ্গ-নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা ও সাধুদিগের পরম-গতি-স্বরূপ পরাবরেশ-ভগবানে মতি হয় এবং তাহার ফলে সৎসঙ্গী মুক্তিলাভ করেন।

১০। সর্ব্বসারতা :—

অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তি-সঙ্গো হি হরিভক্তি-সমিচ্ছতাং ॥"

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা হরিভক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই সার।

অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধং।
হর্ষশ্চালোকপর্য্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ ॥"

সাধুগণের সমাগমই, অসাগরজাত-অমৃত, পাক-ভিন্ন আশ্চর্য্য ঔষধ, এবং নিখিল লোকের আনন্দপ্রদ, ইহা অতি নিশ্চয়।

১১। ভগবৎ-কথা-পানৈকহেতুতা :—

প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃ শ্রুতিরসায়নাঃ।
ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ ॥"

সাধুগণের প্রসঙ্গে, সাধুগণের কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কোমল কথা জীব-গণের আত্ম-মন-কর্ণের রসায়নরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি।

কপিলদেব বলিলেন, মা, সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমার বীর্য্যবিকাশক কথা কীর্ত্তিত হয়। হৃদয় ও কর্ণের সুখপ্রদ সেইকথা সেবন করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথস্বরূপ ভগবান্ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি ভক্তি উদিত হয়। ভগবৎভক্ত সঙ্গের এমনই প্রভাব!

"যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথ-শ্রবণ-ব্যগ্র-চেতসঃ॥"
তস্মিন্ মহন্মুখরিত মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষ-সরিতঃ পূরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্নস্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোক মোহাঃ॥

যে স্থানে নির্ম্মলাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ, ভগবৎ কথা শ্রবণ নিমিত্ত ব্যগ্র চিত্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, সেই স্থানেই মহাপুরুষগণের মুখ হইতে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পবিত্র কথা প্রায়ই কীর্ত্তিত হয়। ভগবানের পবিত্র কথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হয়। যাঁহারা তৃষ্ণাতুর হইয়া সাবধানে কর্ণদ্বারা উক্ত নদীর জল পান করেন তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽহর্নিদং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে।

সাধুদিগের মধ্যে পবিত্র যশঃ ভগবানের গুণানুবাদই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। গ্রাম্যকথার গন্ধও থাকে না। সেই ভগবৎ-কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে সাধুগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি উদিত হয়।

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥

সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বদাই আমার কথা কীর্ত্তিত হয় এবং সেই সকল কথা,—তৎ সেবনকারী-ব্যক্তিগণের পাতক মোচন করে।

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

যাহারা আদরের সহিত আমার কথা শ্রবণ করে, গান করে, অনু-মোদন করে এবং শ্রদ্ধা করে, তাহারাই আমাতে ভক্তি লাভ করিতে পারে।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সঙ্গ হইলেই ভগবদ্ভক্তি জন্মে, আর পূর্ব্ব জন্মে সঞ্চিত পুণ্য থাকিলেই সৎকথা-লাভ হয়।

১২। শ্রীভগবদ্বশীকারিতা:—

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎসখা।
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাহবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করে। শ্রীভগবান্ বলি-লেন, হে যদুনন্দন উদ্ধব, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা অতএব সুগোপ্য হইলেও সে গুহ্য কথা বলিব, তাহা শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিবেক, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদ-পাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ, উদ্যানাদি প্রভৃতি এই সমস্ত আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। একাদশী প্রভৃতি ব্রত, দেবার্চ্চন, রহস্য-মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম এই সকলও আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। সংসারের আসক্তি-নাশক কেবলমাত্র সাধুসঙ্গই আমাকে বশীভূত করিতে পারে।

১৩। পরম পুরুষার্থতা :—

তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গের স্বভাবতঃই পরম পুরুষার্থতা। প্রচেতাগণ বলিতেছেন, হে ভগবন্, তোমার ভক্তগণের যে সঙ্গ তাহার লেশ অর্থাৎ অত্যল্পকালও স্বর্গ এবং মুক্তির সঙ্গে তুলনা করিনা; মর্ত্যদিগের প্রার্থনীয় রাজ্যাদি সম্পত্তির সঙ্গে কি তুলনা করিব? অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক-পার্শ্বে স্বর্গ ও মুক্তি, অপর পার্শ্বে অত্যল্প কাল হরিদাসের সঙ্গ, তুলনা করিতে গেলে কিছুতেই সমান হয় না, হরিদাসের সঙ্গ,—সহস্রগুণে অধিক হইয়া দাঁড়ায়।

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

শ্রীশিব বলিলেন, হে ভগবন্, তোমার দাসের সহিত যে ক্ষণার্দ্ধ কাল সঙ্গ, তাহাও স্বর্গ ও মুক্তির সহিত তুলনা করা যায় না, আর মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের রাজ্যাদি ভোগের সহিত কি তুলনা করিব?

তথাপি সংবদিষ্যামো ভবাম্যেতেন সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥

তিনি আরও বলিতেছেন, হে পার্ব্বতে, তথাপি এই সাধুর সহিত সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু সকলের পক্ষেই সাধু-সমাগম পরম লাভ।

অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হিলোকে॥

ভক্তের দর্শনই নেত্রের সফলতা। ভক্তের অঙ্গ-সঙ্গই অঙ্গের সফলতা,

ভক্তের নাম-কীর্ত্তনই জিহ্বার সফলতা, অতএব জড়জগতে ভক্তগণই পরম দুর্লভ।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শনম্॥

দেহীর মধ্যে মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্লভ বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহার মধ্যে ভগবদ্ভক্তের দর্শন অতি দুর্লভ।

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো।
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্॥
যেনাঞ্জসোল্বণ মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং।
নেষ্যে ভবদ্গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ॥

ধ্রুব বলিলেন, হে অনন্তদেব, তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি প্রবহনশীল নির্ম্মল হৃদয় মহাপুরুষদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হয়, যেহেতু সেই সঙ্গ দ্বারা তোমার গুণ-কথারূপ অমৃতপানে মত্ত হইয়া অনায়াসে অতি দুঃখপ্রদ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃ স্নানবিধূত-পাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশালিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এব ন স্তব॥

মহাদেব বলিলেন, হে ভগবন্, আপনার যশঃ এবং তীর্থ এই উভয় দ্বারা বাহির ও ভিতরে যে সকল মানব পবিত্র হইয়া থাকে, তাঁহাদের এবং প্রাণির প্রতি দয়ালু, ক্রোধাদিরহিত ও সারল্যাদিগুণবিশিষ্ট মহৎ সাধুপুরুষদিগের সহিত যে আমার সঙ্গ তাহাই আপনার অনুগ্রহ।

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥

প্রচেতাগণ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যে বর দিতে ইচ্ছা

করিয়াছেন, বরের মধ্যে এই বর গ্রহণ করিতে পারি যে—আপনার মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া যতকাল পর্য্যন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করিব, তাবৎ কাল জন্মে জন্মে যেন আপনার দাসের সঙ্গে সঙ্গ হয়।

তস্মাদমূ স্তনুভৃতামহমাশিষোজ্ঞ।
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভব মৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ॥
নেচ্ছামি তে বিলুলিতাস্কুরুবিক্রমেণ।
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে প্রভো, প্রাণধারী ব্যক্তিমাত্রের পরিণাম যাহা হয়, তাহা আমি অবগত আছি, আয়ু, স্ত্রী, সম্পত্তি ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ও বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি সিদ্ধির প্রতিও আমার অভিলাষ নাই, যেহেতু মহাপরাক্রমশালী কালচক্রে সকলই সময়ে বিনষ্ট হয়। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার স্বীয় ভৃত্য-বর্গের নিকট যেন আমায় লইয়া যান।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রেমভক্তি।

শ্রীরূপ, আনন্দময়, রসময় ও প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা জীবের প্রধানতম কর্ত্তব্য। সেই আরাধনার একমাত্র উপায় বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধন ভক্তির আশ্রয়-গ্রহণ প্রথমতঃ আবশ্যক। প্রথমতঃ গুরুপদাশ্রয় করিয়া গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়; এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। তাই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি কিন্তু এই শ্রদ্ধাও সাধু-কৃপা ভিন্ন অঙ্কুরপ্রাণিতা ও ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না। এই-জন্য সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন। আমি তোমায় সাধুর লক্ষণ বলিয়াছি; সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তাহাও তোমায়

বলিয়াছি। ইহার পরেই ভজন ক্রিয়া ;—এই ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ বৈধী ভক্তির শাস্ত্রসম্মত শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার এবং চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একাদশ অধ্যায়ে এবং সপ্তবিংশ অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের উপদেশ আছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে ভক্তরাজ উদ্ধবকে এই সকল উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে চিত্ত সুমার্জ্জিত হয়, ভগবদোন্মুখ হয় এবং উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে। ধীরে ধীরে ভগবৎকৃপায় অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠা অর্থ,—নিশ্চয়রূপে স্থিতি। এই অবস্থায় ভগবানের সেবা ছাড়িয়া চিত্ত অন্যদিকে বিচলিত হয় না। ইহাকে চিত্তের স্থিরতাও বলিতে পার। এই স্থিরতা হইতেই ভগবৎ সেবায় রুচি জন্মে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া করা হয়, এই অবস্থায় সেই কর্ত্তব্যতা ভাব চলিয়া যায়। ভগবৎসেবার দিকে চিত্তের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে। এই অবস্থাকে রুচি বলা যাইতে পারে। এই রুচিটী ক্ষুৎপিপাসার মত একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পেটের অসুখ না থাকিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লোকের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, জীবের সাংসারিক অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে ভজন-ক্রিয়ায় নিষ্ঠা জন্মিলে চিত্তের স্বভাবতঃই ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে, এই রুচিই আসক্তির হেতু। এই অবস্থায় চিত্ত সততই ভগবৎসেবায় নিরত থাকিতে চায়। সেবা ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে চিত্তের প্রবৃত্তি থাকে না কিন্তু সর্ব্বদাই চিত্ত ভগবদ্বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। এই আসক্তি হইতে ভাব জন্মে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা, —ভাব, প্রেমসূর্য্যের অরুণোদয়-অবস্থা। ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, প্রেম-প্রকাশের আর বিলম্ব নাই। রসশাস্ত্রে ভাব অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ভাবভক্তি, প্রেমভক্তিরই পূর্ব্বাবস্থামাত্র। ভাব,—প্রেমেরই প্রথম

অবস্থা, ভাবেতে প্রেমেতে মাখামাখি সম্বন্ধ। প্রাণ-প্রিয় ও হৃদয়ের সতত আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীদের প্রথম সম্মিলনের পূর্ব্বাবস্থাই,—ভাব।

আমি চণ্ডীদাস হইতে তোমায় ভাবের দুই একটী পদ শুনাইতেছি। সে বড় মধুর ব্যাপার! মধুর বটে কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষার দারুণাবেগে এই অবস্থায় চিত্তের যে কত তীব্র দশা ঘটে তাহা বলা যায় না; কখনও বা অতি চাঞ্চল্য, কখনও বা ধ্যান-মজ্জিত মহাযোগীর স্থির, ধীর, গম্ভীরতা, নীরবতা ও নিস্পন্দতা! আমি দুই একটী পদ তোমায় গাহিয়া শুনাইতেছি:—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়।

শ্রীরূপ, শ্রীমতীর ভাবের চাঞ্চল্য ইহা হইতেই বুঝিতে পার। রসশাস্ত্রে লিখিত আছে,—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।" শ্রীমতী বাল্যাবস্থায় শান্তচিত্ত ও নির্ব্বিকার ছিলেন। তখন তাঁহারচিত্তে কোন উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনিতে ও চিত্রপটে তাঁহার ভুবনমোহনরূপ-সন্দর্শনে,—এমন কি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নাম শুনিয়াই তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন:—

পহিলা শুনিলুঁ যবে শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কৈল।

শ্যামের নাম শুনিয়াই শ্রীমতীর ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সখীরা বলিতেছেন:—

রাই এমন কেন বা হ'ল,
গুরু দুরজন- ভয় নাহি মনে
কোথা বা কি দেবে পাইল।

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসায়ে পড়ে॥

ইহাই ভাব, এই ভাব হৃদয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আবার দেখা যায়, সমুদ্রের তরল-চঞ্চল-তরঙ্গ-লীলা একবারেই মহাধ্যানের মহাগাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। ভাবের প্রচাপে দেহ-মন-ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া গিয়াছে :—

রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পড়ে
যেমন যোগিনী পারা॥

ইহাও ভাবের কোন এক গম্ভীর অবস্থা। এই ভাব ভাষায় বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণানুরাগের এই ভাব-চিত্র বুঝিবা কেবল চণ্ডীদাসের ভাষাতেই কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এই এক মহাযোগীর ধ্যানের ব্যাপার, পার্থক্য এই যে, যোগীর ধ্যান সাত্ত্বিক বটে কিন্তু নীরস। কিন্তু শ্রীরাধার এই ধ্যান-ব্যাপার মধুর রসের ধ্যান-ছবি,—কি সুন্দর, কি মনোহর !!

শ্রীরূপ, চিরসুন্দর চিরমধুর ভগবান্‌কে ভাবিতে হইলে এইরূপ ভাবে ভাবিলেই বুঝিবা চিত্তে পরিতোষ জন্মে! এরূপ না হইলে আর ভাব কি? চিত্ত যদি প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের চরণে আসক্ত হয়, তবে এই অশান্তিময় কল্লোল-কোলাহলময় সংসার আর কি ভাল লাগে? আর

কি জগতের লোকের সহিত বিষয়-সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা হয় ? আর কি তখন সংসারের গোলযোগে দশজনের মধ্যে একজন হইয়া দশের মত চলিতে ফিরিতে পারা যায় ? কি বল শ্রীরূপ ?

শ্রীরূপের তখন অশ্রুজলে নয়নযুগল পূর্ণ হইয়া ছিল। তিনি বলিলেন, প্রভো, তাহাও কি কখনও হয় ? এ ব্যথা যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে ; অপরে বুঝিতে পারে না। দয়াময়, শ্রীচণ্ডীদাস—মহাকবি,—কবিই বা বলি কেন, তিনি ব্রজলীলার,—ব্রজের নিকুঞ্জ-লীলার লীলা-ময়ীর যেন সাক্ষাৎ সহচরী। সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে অনুরাগের এই ধ্যানচিত্র কেহ কি কখনও ভাষায় লিখিয়া পরিস্ফুট করিতে পারে ?

প্রভু বলিলেন, শ্রীরূপ, তুমিও পারিবে। এখন আরও শুন। ভাবের এই অবস্থায় কেবল নির্জ্জনতাই ভাল লাগে। বিজাতীয় লোকসঙ্গ অতি ক্লেশকর ; এমন কি নিজের প্রিয়জনের সহিত,—যাহারা দুঃখের কথা বুঝিতে পারে, তাহাদের সহিতও কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল ধ্যান,—কেবলই ধ্যান ! কিছুতেই চিত্ত সেই ধ্যান ছাড়িতে চাহে না। ভাবের প্রভাব দেখ। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া দিয়া, দেহের স্মৃতি বিতাড়িত করিয়া ভাব কেবলই আপন প্রভাব বিস্তার করে। ভাবে ভাবে শ্রীমতীর জনসঙ্গ তিরোহিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি কেবলই শ্যাম-জলদের রূপের ধ্যানে বিভোর হইলেন ; গগনের গায় নবনীরদ দেখা দিল, উহা শ্রীমতীর ধ্যানে শ্যামের রূপে পরিণত হইল। তিনি অনিমিক নয়নে মেঘকে শ্যাম ভাবিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া রহিলেন। তখন—"না চলে নয়ন তারা" কি প্রগাঢ় ধ্যান-গাম্ভীর্য্য ! তারপরে—

হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি।

এই এক জগৎ ছাড়া ভাব। ভাবে ভাবে পূর্ণ সাক্ষাৎকার ? শ্রীমতী আকাশের মেঘে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ভাব তখন

প্রেমে পরিণত হইল, তিনি হাস্যমুখে হাত তুলিয়া শ্যামসুন্দরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরূপ, ইহাই ভাবের সৃষ্টি, এখানেই ভাবের পূর্ণতা। তিনি আরও বলিতেছেন,—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পীতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

ইহারই নাম ভাব-প্রভাবে নিমিষাসহিষ্ণুতা। শ্রীরূপ, এই ভাব-সাগরের অনন্ত তরঙ্গ, কুল-কিনারা জানে না, ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সে এক সীমাহীন অগাধ অফুরন্ত ব্যাপার! এখন এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না, ইহা হইতেই তুমি বুঝিয়া লও।"

এই বলিয়া ভাবময় মহাপ্রভু নীরব হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইল, তিনি আর ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, নয়নের কপাট স্বতঃই বন্ধ হইয়া গেল, তিনি ভাবধ্যানে নীরব, নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, ভাবরসের তরঙ্গ-লহরী হৃদয়ে উঠিলে সম্বরণ করা কঠিন,—কোথা হইতে কোথায় যে ভাসিয়া যাই, ঠিক করিতে পারি না। মনে করিয়াছি, তোমায় ভক্তিরসের কথা কিছু বলিব কিন্তু কি যে বলিব, কিরূপে বলিব, তাঁহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই রসসাগরে ঝাঁপ দিয়া নিজেই এখন অকুল সাগরে ভাসিতেছি। তুমি আমার সাথী হইবে?

শ্রীরূপ বলিলেন দয়াময়, এ অধম কি সে কৃপার যোগ্য? কোথায় এ নরকের কীট, আর কোথায় আপনি গোলোক-বৃন্দাবনের পরমারাধ্য রসময় মহাপুরুষ, আমি কি আপনার সহচর হইবার যোগ্য? দাসানুদাস

করিয়া যে চরণান্তিকে স্থান দিয়াছেন, ইহাই এ অধমের মহাসৌভাগ্য। যদি শ্রীমুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণের যোগ্য হই তবে সেই কৃপা করুন।

প্রভু বলিলেন, তবে যতটুকু বলিতে পারি,—শুন। রসতত্ত্বের পার নাই। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন,—"রসো বৈ সঃ।" প্রথমতঃ এই কথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তিদেবীর শরণাগত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে অনন্ত আনন্দ-লীলা-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই এই রসঘন-বিগ্রহ—অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। চিত্ত যখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চ ছাড়িয়া,—বিরজার পরপারে মহাব্যোম ছাড়িয়া ভক্তিদেবীর সাহায্যে গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, সেই চিন্তামণিময় রাজ্যে রত্নবেদিময় সিংহাসনে অনন্ত লীলাময় শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজমান, তিনিই অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি। তখন শ্রুতির অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। রস যে কি বস্তু তাহা তো বুঝাইবার যো নাই। কোন কোন সিদ্ধ-পুরুষের পক্ষে উহা কেবল অনুভাবানন্দ স্বরূপ, কিন্তু আমার মনের আশা তাহাতে মিটিল না, আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে বাসনা করিলাম। চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিতে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে উধাও হয়, আমার চিত্ত-চকোর শ্রীগোবিন্দের চরণ-চন্দ্রিকা-রসসুধা-পানের জন্য তেমনি আকুল হইয়া উঠিল। মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই, লোকে কথায় বলে "বামন হইয়া চাঁদে হাত,"—আমার ঠিক সেইদশা ঘটিল। আমি ব্যাকুল হইয়া,—ব্যাকুলই বা বলি কেন—পাগল হইয়া উঠিলাম। আমাকে এইরূপ নিরুপায় দেখিয়া শ্রীমতী ভক্তিদেবী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, তুমি রসিকশেখর রসরাজ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি দেখিতে লালায়িত হইয়াছ? জগতে এ বাসনা তো আর কেহ করে না, তুমি মহাভাগ্যবান্, তাই তোমার এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। যাঁহার রসে এই গোলোক-বৃন্দাবনের মহাসৌন্দর্য্য,—মহা-মাধুর্য্য, সেখানকার গো-গোপ-গোপীগণ, বিহগাদি কীটপতঙ্গ, তরুলতা

উদ্ভিদ্‌গণ,—সচ্চিদানন্দরসের মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান, তোমাকে আমি দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্র-যোগীন্দ্র-শিবশুকব্রহ্ম-নারদ প্রভৃতিরও দুর্দ্দর্শ সেই স্থানে আনিয়াছি। তুমি ঠিক স্থানেই আসিয়াছ। এবার তোমার চতুর্থ নয়ন প্রদান করিলাম। ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি!"

আমি জানিতাম সাধারণ লোকের দুই চক্ষু, মহাযোগী মহাদেবের তিন চক্ষু, তিনি ত্রিনয়ন, ঐ তৃতীয়নয়নেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই চতুর্থ নেত্রের অস্তিত্ব শ্রীমতী ভক্তিদেবীর প্রভাবেই জানিতে পারিলাম। কেবল এই নয়নের প্রভাবেই রসরাজ মূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার ঘটে। আমি বিজলি চমকের ন্যায় সেই ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিলাম,—কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মনে করিলাম, আমি আনন্দ-রসসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়াছি।

শ্রীরূপ, তোমায় কি বলিব? মানুষের ভাষা চিরদিনই অপূর্ণ। ভাবের কথা ভাষায় ফোটে না। তুমি নিজে কবি; জানতো—এ সকলই মূকাস্বাদনবৎ। কিন্তু ভক্তি মহারাণীর কৃপার কথা তোমায় আর কি বলিব। ইনি যোগমায়ারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইনি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। আমি গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে ইঁহার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতেই জানিয়াছিলাম,—একমাত্র ইনিই রসরাজের সমক্ষে লইয়া যাইতে সমর্থা। ইনি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি সম্বিতের ও হ্লাদিনীর সার-সমবেত-অংশ-রূপিণী, ইঁহার কৃপা ভিন্ন সচ্চিদানন্দ-ঘন-রসসান্দ্র শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন-লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। দর্শন দূরে রহুক, কিঞ্চিদ্ বুঝিবারও উপায় নাই। নিজের কথা তোমায় অনেক বলিলাম, ইহা ভাল নয়; কিন্তু তথাপি ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য,— না বলাও অকৃতজ্ঞতা। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। আমি যতটুকু পারি, তোমায় বলিতেছি।

শ্রীরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন দয়াময়, এ অধম

অত উচ্চতম তত্ত্ব শ্রবণের একান্ত অযোগ্য। আপনার স্বকীয় লীলা-সুধা বিন্দুমাত্র পান করিতে পারিলেও পরম কৃতার্থ হইব। আপনার শ্রীগোবিন্দ কে এবং কেমন, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার প্রাপ্তিরই বা উপায় কি, তাহা আপনি জানেন। সে সকল কথা শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমি জানি আপনিই আমার সাক্ষাৎ আনন্দরস-সুধাময় শ্রীগোবিন্দ। ইহার উপরে আর যে কোন তত্ত্ব আছেন, সে ধারণাই আমার নাই। সুতরাং তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি স্বয়ংই নিখিল-রসসুধা-মাধুর্য্যময় শ্রীমূর্ত্তি। আপনার উপরে আর কোনও তত্ত্ব নাই; আমার বিশুদ্ধ চিত্তই আমার এ ধারণার সাক্ষী। দয়াময়, এ দাসানুদাসের নিকট নিজের কথা নিজে বলিয়া এ অধমকে কৃতার্থ করুন।

পঞ্চম অধ্যায়—ভক্তি-রস-তত্ত্ব।

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, অমন কথা বলিতে নাই। তুমি ভক্তি-রস-তত্ত্ব শুনিতে ব্যাকুল হইয়াছ। শ্রীগোবিন্দ আমার মুখেও তাঁহার প্রিয়তমভক্তকে ভক্তি-রস-তত্ত্ব শুনাইতে পারেন, ইহা কিছু অসম্ভব নয়; বনের পাখী ও কৃষ্ণকথা বলিয়া ভক্তচিত্তে আনন্দ দেয়। যাহা হউক, তবে শুন। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রসই একমাত্র তত্ত্ব, রসই গোলোকের ধন, রসই জগতের জীবন,—সর্ব্বত্রই রসের তরঙ্গ। ঐ যে তোমার নয়ন-সমক্ষে নয়নানন্দকর শ্যামল দূর্ব্বাদল দেখিতে পাইতেছ, উহার সমস্ত অবয়ব রসে পরিপূর্ণ। তুমি এই জগতে যাহা রস বলিয়া মনে কর তাহা খাটি রস নহে, দুগ্ধও রস নহে, ইহা সকলই সচ্চিদানন্দরসের নিগূঢ় রসশক্তির প্রাকৃতিক বিকার, কিন্তু ইহাই জীবের জীবনের মূল। ঐ যে দূর্ব্বাদল দেখিতেছ উহাও জীব। রসই উহার জীবন,—"জীবানাং

জীবনং রসঃ"। উদ্ভিদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মবৃত্তিসমূহ আছে। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে :—"তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাৎ জিঘ্রন্তি পাদপাঃ," ইহাদের দর্শনেন্দ্রিয়বৃত্তিও স্পর্শেন্দ্রিয় বৃত্তি অদ্ভুতরূপে বিদ্যমান। ফলতঃ এই রসই জীবনের মূল। বেদ-সংহিতাতেও ইহার প্রমাণ আছে। যেখানে রস, সেখানেই জীবন ; যেখানে রসের অভিব্যক্তি নাই, সেখানে জীবনেরও অভিব্যক্তি নাই। রসব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি, জীবন ও সর্ব্বত্রই বিরাজমান, কিন্তু সকলেরই একটা ব্যক্ত-অব্যক্ত অবস্থা আছে। ঘোরতর নিদাঘের মরুভূমিও জীবন-শূন্য নহে কিন্তু সেখানে জীব ও জীবনের ক্রিয়া অব্যক্ত ; রসের পরিমাণের তারতম্যে জীবনী-ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, চিচ্ছক্তির তারতম্য ঘটে, হ্লাদিনীশক্তির তারতম্য ঘটে। যে রসে জীবনের চিদানন্দ শক্তির তারতম্য ঘটায়, তাহা প্রাকৃতিক বা প্রাপঞ্চিক রস নহে ; তাহা সেই "রসো বৈ সঃ" বস্তুরই কণ-লব-লেশাভাস। যে জীবনে সে রস নাই সেখানে আনন্দও অতিবিরল। সেই রসে হৃদয় পরিষিক্ত হইলে নরনারী প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। শ্রুতি মাতা বলেন,—"রসো বৈ সঃ" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি," জীব সেই অখিলরসামৃত মূর্ত্তির চরণামৃত-প্রভাবে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিরসই আনন্দদায়ক।

শ্রীরূপ, এখন তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ ভক্তির রসত্ব কোথায়। ভক্তি যখন শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি সার-সমবেত-বিশেষ, আর স্বয়ং ভগবান্ যখন সেই "রসো বৈ সঃ," তখন সংক্ষেপেই বুঝা গেল যে,ভক্তি অখিলামৃতরস-মূর্ত্তির স্বরূপশক্তি-বিশেষ। এই রসের ক্রিয়া-প্রভাব অনন্ত। যাহাতে হৃদয় বিদ্রাবিত হয়, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দে বিগলিত হয়, তাহাই ভক্তিরস। ভাব, অনুভাব, বিভাবদ্বারা রস নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-রতি একটী স্থায়িভাব, ইহা ভক্তিরস ; ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের রস-সুধা আনয়ন ইহারই কর্ত্তৃত্ব-প্রভাব। যাহার পূর্ব্বজন্মের এবং ইহজন্মের

ভগবদ্ভক্তিবিষয়িনী বলবতী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে, তিনিই ভক্তিরসাস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। যখন ভক্তিদ্বারা হৃদয়ের নিখিল দোষ নিঃশেষরূপে বিনিঃসৃত হইয়া যায়, অতঃপরে যখন হৃদয় প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, তখন ভাগবত-রসবিজ্ঞ রসিক সঙ্গিগণের সঙ্গই তাঁহাদের পরমানন্দজনক হয়। শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম-ভক্তিসুখ-লক্ষ্মীই যাঁহাদের জীবন-স্বরূপিণী, প্রেমান্তরঙ্গভূতা ক্রিয়াসকলই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠান, তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়েই প্রাক্তনিক ও আধুনিক সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা এই আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি,—রসের উদয় করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ, তোমাকে একথাটা একটু বিশেষরূপে বলিতেছি:—শাস্ত্রে নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ,—এই ত্রিবিধ ভক্তের কথা শুনা যায়। আমি তোমায় সাধনসিদ্ধ ভক্তের কথাই বলিব। আত্মা জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম-সংস্কার লইয়া আবির্ভূত হয়। ভক্তিবাসনা ও অন্যান্য বাসনার ন্যায় সংস্কাররূপে চিত্তে বর্ত্তমান থাকে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এবং ইহ জন্মার্জ্জিত সদ্ভক্তি-বাসনা যাহাদের চিত্তে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিরসাস্বাদন অপেক্ষাকৃত সহজ। সদ্ভক্তিদ্বারা জীবের নিখিল পাপরাশি নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত তোমায় বলিয়াছি। ভক্তির দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলে চিত্ত যে প্রসন্নোজ্জ্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শ্রীভাগবতে বহুস্থলে তাহা বলা হইয়াছে। আত্মার এই প্রসন্ন অবস্থাকেই যোগসূত্রকার পতঞ্জলি তদীয় যোগসূত্রে 'প্রসাদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার এই প্রসাদগুণের কথা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও এই চিত্ত-প্রসাদ জনিত আত্মার উন্নত অবস্থার কথা বহুবার বলা হইয়াছে। ভক্তিদ্বারা চিত্ত প্রসন্নোজ্জ্বলরূপ ধারণ করে।

শ্রীরূপ, তুমি তোমার নয়ন-সমক্ষে প্রসন্ন সলিলা ভগবতী ভাগীরথীর বিমল প্রবাহ দেখিতে পাইতেছ,—কেমন স্নিগ্ধ, কেমন শীতল, কেমন

পবিত্র ও কেমন সুন্দর! কিন্তু ভগবৎ-শক্তিরূপিণী ভগবতী ভক্তিরাণীর প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব-প্রবাহ মানস নয়নে নিরীক্ষণ করিলে প্রকৃতই চমৎকৃত হইবে। আত্ম-প্রসাদনী ভক্তিপ্রভাবে যাহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল ও সুপ্রসন্ন হয়, সেই সকল ভক্তের চিত্তে ভগবদ্ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারাই ভক্তি-রসাস্বাদনে অধিকারী হন। মানুষ সুখ-সম্পত্তির অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু প্রকৃত সুখ-সম্পত্তি কি এবং তাহার অনুসন্ধান স্থলই বা কোথায় তাহা তাহারা জানে না। মোহের ছলনায়, অবিদ্যার বঞ্চনায়, সুখসম্পত্তি-লাভ করিতে যাইয়া এই মায়া প্রপঞ্চের কেবল দুঃখই সঞ্চয় করে, কিন্তু লোকে কথায় বলে,—"যে জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"। এই সুচতুর ব্যক্তিগণ তন্ন তন্ন করিয়া সুখের অনুসন্ধান করেন, প্রপঞ্চে 'নেদং নেদং' ভাবে,—ইহা সুখ নয়,—এখানে সুখ নাই, এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে, অবশেষে গুরুকৃষ্ণের কৃপায় দেখিতে পান, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তিই প্রকৃত সুখসম্পত্তি। এই ভক্তিই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহারাই ভক্তি-রসাস্বাদনের অধিকারী।

প্রত্যেক রসেরই বিষয় ও আশ্রয় আছে। ভক্তিরসের বিষয়,—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই বিষয়কে বিভাব বলা যাইতে পারে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও সঞ্চারীভাব, এই চারিভাবে রসাস্বাদন হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বিভাব সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে :—

বিভাব্যতে হি রত্যাদিযত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।

যাহাতে ভক্তিরস বিভাবনীয় হয়, অথবা যাহাকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করা হয়,—তাহাই বিভাব। বিভাবে দ্বিবিধ,—আলম্বনা ও উদ্দীপনা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত ভক্তিরসের আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিরসের বিষয়, কেননা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই ভক্তিরস প্রবর্ত্তিত

হয়। লীলাপরিকরগণ বা ভক্তগণ এই ভক্তিরসের আশ্রয়। ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশেষ-কল্যাণ-গুণময়। তাঁহার প্রত্যেক গুণই ভক্তচিত্তাকর্ষক। গুণগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্ যথাঃ—সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, রুচির, তেজঃশালী, বলীয়ান্, বয়সান্বিত, বিবিধঅদ্ভুত ভাষাবিৎ, সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদুক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমাণকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান, শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধি-মান্, বরীয়ান্, ঈশ্বর, সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য নূতন, সচ্চিদানন্দ, সান্দ্রানন্দ, সর্ব্বসিদ্ধি, নিষেবিত, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, দিব্য-সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদি মোহন, ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস, কোটিব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, অবতারা-বলীবীজ, হতারিগতিদায়ক, আত্মারামগণাকর্ষী, লীলাধিক্য ও প্রেমের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।

শ্রীরূপ, নন্দের আঙ্গিনায় যে পরব্রহ্ম ক্রীড়া করেন, তিনি এইরূপ অশেষ-কল্যাণ-গুণের মহাসিন্ধু। জগতে চিৎ অচিৎ যত কিছু আছে, সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট, তাঁহার গুণ-মুগ্ধ। ব্রজবৃন্দাবনে তাঁহার আনন্দ-চিন্ময়-রস-বিভাবিতা হ্লাদিনী শক্তিবৃন্দ তাঁহার প্রতি যে প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহার লীলা-পরিকরবর্গ তাঁহার সে সকল সদ্গুণের কিয়দংশে তাঁহার চরণে বিশুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করেন। এ জগতে বিশুদ্ধ-ভক্তি সাধকগণ তাহারই কণ-লব-লেশাভাস প্রাপ্ত হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করেন।

আধুনিক ভক্তগণের ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ তথ্য তোমাকে বলিতেছি। ভক্তির লক্ষণ-মাহাত্ম্যাদি ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রসতত্ত্ব সম্বন্ধেও

যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভাব হইতেই রসের সূচনা হয়, এই অবস্থায় ভাবই রতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানে রতির উদয় হয়, চিত্ত শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্ত কোন বিষয়ে যাইতে চাহে না। জীবের আত্মা তখন বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়-নিরত হয়,—ইহাই রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়। এ অবস্থায় চিত্ত অতীব মসৃণ হইয়া উঠে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে সাধকের যথাসর্ব্বস্ব, এই ধারণা তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হয়, সাধক তখন মনে করেন ইহকালে কি পরকালে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মমতাধিক্য দৃঢ় হইয়া উঠে, পূর্ব্ব লক্ষণান্বিত ভাব ঘনীভূত হয়,—ইহাই প্রেমের লক্ষণ।

শ্রীরূপ, রসশাস্ত্রটী অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। ইহার ভাষা আছে, পরিভাষা আছে। ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহার সূক্ষ্ম বিচার-সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমের উপরে ক্রম, আবার তাহার উপরে ক্রম,—চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশে প্রেমের উৎকর্ষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। তোমায় ভাবের লক্ষণ ও প্রেমের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমরাণী ঠাকুরাণীদের রাজ্যে সংজ্ঞাগুলির অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়। তাহা পরের কথা, এখন এখানকার কথা শুন।

প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে নামভেদ আছে,—

"প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে নাম,—স্নেহমান প্রণয়।"

সাধারণ সাহিত্যে 'স্নেহ' শব্দটী যেরূপ অর্থে বা যেরূপ স্থলে ব্যবহৃত হয় এখানে সেরূপ প্রয়োগ হয় না। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ করে, পুত্রকে স্নেহ করে, ভগিনীকে স্নেহ করে; নিজ হইতে কনিষ্ঠ-সম্পর্কে প্রেমের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে স্নেহ শব্দ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কিন্তু এই পরিভাষায় ইহার অর্থ, স্বতন্ত্র। প্রেম গাঢ়তর

হইয়া চিত্ত দ্রব করিলে স্নেহ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও বিরহ সহ্য হয় না। ইহার লক্ষণ এই :—

সান্দ্রশ্চিত্ত দ্রবং কুর্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা॥

আবার এই স্নেহ যখন প্রগাঢ় হয়, তখন পূর্ব্বের অননুভূত মাধুর্য্য চিত্তবৃত্তিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কিছু কুটিল হয়, তখন তাহার নাম হয়,—মান। ইহার লক্ষণ এইরূপ :—

স্নেহস্তুৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
বোধয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

শ্রীরূপ, মানের আদর্শ এই প্রপঞ্চে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু ইহার প্রকৃত আদর্শ গোপীরমণী-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে দেখা যায়। যে মান ভাঙ্গিবার জন্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরাধার চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া নয়নজলে শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদ-পদ্ম বিধৌত করিতে হইয়াছিল এবং প্রেম গদ্ গদ কণ্ঠে বলিতে হইয়াছিল :—

রাধে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।

শ্রীরূপ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। "ব্রজ-গোপীর মান হয় রসের নিদান"। আমার মনে হয়, মানে যে প্রেমমাধুর্য্য আছে, মিলনে বুঝিবা সেরূপ নাই। অদম্য বেগবতী ভগবতী ভাগীরথীর তীব্র প্রবাহ কোথাও কথঞ্চিৎ বাধা পাইলে উহা যেমন উদ্দীপ্ত গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, অবশেষে দুকূল ভাসাইয়া সুনীল সাগরে সম্মিলিত হয়, ব্রজ-গোপীদের প্রেমও মানে মানে উচ্ছ্বসিত হইয়া অবশেষে কলহান্তারিতার পরে শ্যাম-সাগরে মিলিয়া মিশিয়া আত্মসমর্পণ করে,—এদৃশ্য অতি সুন্দর, অতিমধুর!

ইহার পরে প্রণয়ের কথা। চলিত ভাষায় যে অর্থে প্রণয় শব্দ ব্যবহৃত হয়, রসশাস্ত্রে পরিভাষায় প্রণয়ের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে; তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণে প্রগাঢ়তর ও গম্ভীরতর। মান যখন প্রগাঢ় হইয়া বিশ্রম্ভ ভাব ধারণ করে, তখন উহা প্রণয় নামে অভিহিত হয়। প্রিয়জনের সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করাই বিশ্রম্ভ। প্রেমের চরম প্রগাঢ়তার আত্ম-বিস্মরণে প্রণয়ীর প্রতি ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। যাহাকে বড় ভালবাসা যায়, তাহার চরণে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইলেও মনে হয় যেন উহা আমারই পদে বিদ্ধ হইয়াছে। প্রেমের আতিশয্যে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। প্রেমের রাসায়নিক আকর্ষণে ভিন্ন পদার্থদ্বয় ঐক্য প্রাপ্ত হয়।”

মহাপ্রভু এই কথা বলিতে না বলিতেই শ্রীরূপ বলিলেন দয়াময়, রসময়, এবার আমি ঠিক বুঝেছি।

মহাপ্রভু। কি বুঝ্‌লে,—শ্রীরূপ?

শ্রীরূপ। তবে বলি,—শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক :—

> রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি-হ্লাদিনী-শক্তিরস্মা-
> দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
> রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

এই বলিয়া শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন শ্রীরূপ, দুগ্ধের মধ্যে গোচনা-মিশ্রণ কেন? এখন রাগের কথা শুন। এই প্রণয় আবার গাঢ়তা বশতঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া রাগসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সে অবস্থায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্ম যত দুঃখই হউক না কেন, কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা বা সম্ভাবনা থাকিলে সে দুঃখগুলিও সুখ বলিয়াই অনুভূত হয়। ইহার লক্ষণ এই :—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

এখন ভাবিয়া দেখ, প্রেমের পরিমাণের কত আধিক্য হইলে ইষ্টবস্তু লাভ-নিমিত্ত দুঃখগুলিও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। মনে কর, জ্যৈষ্ঠ-মাসের ভীষণ নিদাঘ; স্থান,—গোবর্দ্ধনতট; বেলা—দিবা আড়াই প্রহর। পর্ব্বতের সানুদেশের কণ্টক কঙ্করময় ভূমি প্রতপ্ত লৌহের ন্যায় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, পর্ব্বতের গাত্রে পদ-রাখা অতি বড় সহিষ্ণু শ্রমজীবীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। এই অবস্থায় এই সময়ে এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীমতী রাধিকা উপস্থিত হইলেন। নবনীর ন্যায় মৃদু কুসুমকোমল চরণ দুখানি এই প্রতপ্ত ভূমির উপরে ন্যস্ত করিতে করিতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন এই আশায় তাঁহার কোনও ক্লেশ অনুভূত হইল না, অথচ আহ্লাদে উল্লাসে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইহাই রাগের লক্ষণ। অন্যত্র রাগের আর একটা লক্ষণ আছে, সেইটী এই :—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ"

'ইষ্টে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা রাগো ভবেৎ।' অর্থাৎ তীব্র প্রেমতৃষ্ণা বশতঃ ইষ্টবস্তুতে চিত্তের যে পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগ নামে অভিহিত। প্রবল প্রেম তৃষ্ণাই ইহার হেতু। এই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। এতাদৃশী ভক্তি, ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপরিকরেই দৃষ্ট হয়। যে ভক্তি এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করে, তাহা রাগানুগা নামে কথিত হয়। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত রাগই লক্ষ্য। ইহার পরে আবার অনুরাগ। এই রাগ যখন প্রগাঢ় হইয়া ঘনীভূত হয়, তখন প্রিয়তম প্রণয়ী সর্ব্বদাই নব নবায়মান্ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন। এ সংসারে দেখা যায়, ভালবাসার প্রথম-উদ্যমে প্রণয়ীকে যেমন সুন্দর ও মধুর বলিয়া মনে হয় কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আর পূর্ব্ববৎ অনুভূত

হয় না। পর্য্যুসিত খাদ্যের ন্যায়, পর্য্যুসিত ফুলের ন্যায় তাহার সেই সৌস্বাদ্য, সৌন্দর্য্য ও সৌরভ্য আর অনুভূত হয় না। এ সংসারে মানব প্রকৃতির এই এক স্বভাব। পুরাতনে আর তেমন প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের তৃষ্ণা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের অনুরাগ সেরূপ নহে। উহা ব্রজ-বৃন্দাবনের অমল অমর স্পর্শে চিরদিনই নূতনবৎ প্রতিভাত হয়। "নিতুই নূতন" বলিয়া মনে হয়। গোপীপ্রেম এক অদ্ভুত অলৌকিক আনন্দসুধা, ইহা চিরপুরাতনকে নূতন করিয়া দেখায়। ইহার রাজ্যে কালের অধিকার নাই, কিছুই পুরাতন হইতে জানে না। শ্রীমতী বলিতেছেন, ললিতে, তুমি আমায় কি বলিতে চাহ? আমার চিত্তে এমনই ভাবের উদয় হয় যে আমি, আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা প্রাণ-বল্লভকে যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বিরাজমান দেখি।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া পরশ না গেল॥

শ্রীরূপ, এই এক অসীম, অবিতৃপ্ত, অফুরন্ত তৃষ্ণা।

"পহিলুঁহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥"

ইহা পুরাতন হইতে জানে না। এ ভাবের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই নব-নবায়মান!

শ্রীরূপ, এই প্রেমরস-সিন্ধু যেমন অগাধ, তেমনই ইহার বিস্তার অসীম, ইহার তরঙ্গও অনন্ত বৈচিত্র্যময়। কি বলিব তোমায়! এই প্রেমসিন্ধু মহাচমৎকারময়, অনন্তব্যাপারময়। অনুরাগের লক্ষণটী শুনিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে, উহা এই :—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

তোমায় এখন আর একটী ভাবের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমের প্রথম অবস্থা ভাব নামে অভিহিত, কিন্তু এই ভাব শব্দের আর এক প্রকার অর্থ হয়, সে অর্থ অতি প্রগাঢ়। এই ভাব প্রেমের অতীব উচ্চতর অবস্থা। যে প্রেম বাড়িতে বাড়িতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ এবং অনুরাগ দশা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়া থাকে, সেই প্রেম আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই 'ভাব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। একই পদার্থ ক্রমবিকাশের ফলে ভিন্ন আকারে ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইলেও মূলতঃ স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না। বিশ্ব-সৃষ্টির সকরাজে এই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এই যে আমাদের নয়ন-সমক্ষে ভূপৃষ্ঠে সমাস্তৃত শৈবাল-গুলি মৃত্তিকায় হরিদ্বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, উহারাও উদ্ভিদ্‌জাতীয়, আবার অশ্বত্থও সেই উদ্ভিদ্ জাতীয়। আমাদের পদদলিত ভূপৃষ্ঠাস্তৃত দূর্ব্বাদল, আর ঐ শতহস্ত-পরিমিত-সুদীর্ঘ সমুচ্চ গগনস্পর্শী, অই বংশশ্রেণী উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের বিচারে এই উভয়ই এক জাতীয়। সেইরূপ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ইহা সকলই শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির অবস্থা বিশেষের নাম ভেদ মাত্র।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার,—ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম,—মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

কোথায় ভূপৃষ্ঠাস্তৃত শৈবাল, আর কোথায় বা বন-বিটপী রাজাধিরাজ অশ্বত্থবৃক্ষ! ভগবানের যে শক্তি, ভাসা-ভাসা-রূপে এই জগতে আহ্লাদকত্বের পরিচয় প্রদান করে, তাহা মহাভাবেরই চরম অধস্তন শক্তি বিশেষ। উহাই ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে প্রেম, স্নেহ, মান,

প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নামে অভিহিত হয়। যাহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে মানসিক বৃত্তিবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায়, তাহার মূলে সর্ব্বব্যাপিনী মহা মহীয়সী মহাশক্তি বিরাজমানা। এই প্রপঞ্চে যাহা কিছু আনন্দজনক বা আনন্দ দায়িনী বলিয়া মনে হয় তৎ সমস্তই নানাবিধ পরিমাণে সেই মহাশক্তিরই পরিক্ষীণ ছায়াভাস মাত্র। প্রথমতঃ যে ভাবের কথা বলিয়াছি সে ধারণা সবিশেষ কঠিন নহে কিন্তু প্রেম অনুরাগ অবস্থায় উন্নতি হইয়া শেষে যে ভাবদশা প্রাপ্ত হয়, তাহা ধারণা করা কঠিন। উহার লক্ষণটী এইরূপ :—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ আত্মবেদনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যাদবাশ্রয়বৃত্তি হইলে ভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তুমি হয়তো একথাটা বুঝিতে পারিতেছ কিন্তু জনসাধারণ ভাবের এই লক্ষণটী বুঝিতে পারিবে না; কাজেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। অনুরাগ যে প্রেমের কি অবস্থা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রেম স্বীয় প্রগাঢ়তায় আপনার ভাবে আপনি সমুচ্ছ্বসিত হইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে। প্রণয়ীর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি থাকায় প্রেমের বিষয়কে নিত্য নব নব ভাবে অনুভূত করাইয়া দেওয়াই অনুরাগের কার্য। এই ভাবের প্রকর্ষই, অনুরাগের আত্ম জ্ঞাপনীয় অবস্থা। প্রেম এই অবস্থায় কালপরিপাকে পুনঃপুনঃ দর্শনজনিত অভ্যাসজাত পুরাতনত্ব-বোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া স্বীয় প্রভাব-প্রকর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তখন মহাভাবই ইহার একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠে। তখন ইহার গতি মহাভাবের নিকটস্থ হয়। এই অবস্থাই এস্থলে ভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ভাবটী মহাভাবেরই প্রথম অবস্থা। ইহার পরেই মহাভাব। মহাভাব প্রেমের অতি

চরম অবস্থা। ইহা ব্রজদেবীগণেরও সুলভ নহে, ইহা কেবল শ্রীমতী রাধিকাতেই স্পষ্টতঃ বিরাজমান,অথবা শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাব-স্বরূপিণী।

শ্রীরূপ, মানুষের ভাষা অতি অসম্পূর্ণা। ভাষা, ভাবেরই পরিচারিকা। কিন্তু ভাষা, ভাবের সকল আদেশ সম্পন্ন করিতে পারে না। মহাভাব বস্তুটী কি, ভাষায় তাহা প্রকাশ পায় না। রসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণন করার জন্য যে সকল লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লক্ষণই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, এই সকলের লক্ষণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ বস্তু-তত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পান কিন্তু তাহাতে বস্তুজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। ভাব,—ব্যাপক, ভাষা,—ব্যাপ্য। সুতরাং ভাষা ভাবকে সর্ব্বপ্রকারে আকড়িয়া ধরিতে পারে না। মহাভাবের স্বরূপ-লক্ষণ রস-শাস্ত্র-বিদ্‌গণ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ভাবের স্বরূপ লক্ষণ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া বলিতে পারেন না। অনুরাগের স্বসংবেদ্য দশাটা কি, তাহা আপন হৃদয়ে বুঝিতে হয়। যাবদাশ্রয় বৃত্তিই বা কি তাহাও আপন আত্মায় অনুভব করিতে হয়। মানুষের উচ্চতম অনুভবের প্রগাঢ় অবস্থায় ভাব প্রকৃত বস্তুতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞেয়, ধ্যান ও ধ্যেয় এক হইয়া যায়। জ্ঞান তখন জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, ধ্যানী তখন ধ্যানের বস্তু প্রত্যক্ষ করেন। ইহার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই জ্ঞানী, জ্ঞান, জ্ঞেয়,—ধ্যানী, ধ্যান, ধ্যেয় একাকার হইয়া যায়। সে অবস্থায় এক অখণ্ড অদ্বিতীয়তার কূলকিনারাবিহীন, সীমা সংখ্যাবিহীন প্রেমানন্দ রসের এক মহাসিন্ধুতে আত্মা নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। এখানে জ্ঞান ও ভক্তি আত্ম-পরিচায়ক বিভিন্ন লক্ষণ পরিহার করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন "কেন বা কং পশ্যেৎ" ইত্যাকার এক অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়, কি-জানি-কেমন এক ভাবে ইহা আপন অস্তিত্ব হারাইয়া

ফেলায়। এই অত্যন্ত নিরুপাধি অবস্থায় জ্ঞান, ধ্যান, ভাব, মহাভাব, কিছুরই পার্থক্য সূচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আনন্দলীলা-বিহারী শ্রীগোবিন্দের মধুময়ী বৃন্দাবন-লীলায় যে ভাব-মহাভাবের সন্ধান প্রেমিক ভক্তগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা অচিন্ত্য হইলেও রসানুভবের সীমা-বহির্ভূত হয় না। আমি তোমায় মহাভাবের আভাস অন্য সময়ে অন্যভাবে বুঝাইব। ভাষার সাহায্যে তাহা বুঝাইতে পারিব না।"

এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন। শ্রীরূপ চাহিয়া দেখিলেন, প্রভু কেবল নীরব নহেন,—অতি নিস্পন্দ; নয়নের তারা উত্তানভাবে অবস্থিত,—কথা বলিতে বলিতেই প্রভু যেন ভাব-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরূপ অতীব মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ভাই বল্লভ, একি হলো! প্রভু যেন একবারেই সংজ্ঞাহীন!" বল্লভ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তাইতো দাদা, একি হলো! একি হলো!" এই কথা বলিতে না বলিতেই মহাপ্রভু বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। শ্রীরূপ অতি ব্যস্তভাবে প্রভুর শ্রীমস্তক আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। শ্রীমুখমণ্ডলে প্রগাঢ় আনন্দ, আপন প্রভাব বিস্তার করিল; নাসায় নিশ্বাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল অধিকতর প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্রীবল্লভ ব্যজন করিতে লাগিলেন, অন্যান্য ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ অতি মৃদুস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রভু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, এবং অতি মৃদুল মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—শ্রীরূপ, আমার এই এক রোগ! শ্রীরাধাগোবিন্দ-কথা বলিতে গেলেই কখন কখন এই দশা ঘটিয়া থাকে। কি করিব উপায় নাই। নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-বুদ্ধির উপরে আমার কোন হাত নাই, সহসা অতর্কিতভাবে এই এক প্রকার ব্যাপার মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। তোমায় যে কি বলিতেছিলাম,—এখন আর তো মনে নাই, বলিতে বলিতে ভুলিয়া গেলাম।

শ্রীরূপ করযোড়ে বলিলেন, এখন না হয় সে কথা থাকুক, কেমন একটুকু আনমনা দেখিতে পাইতেছি। মহাভাবের কথাতো—না হয় অতঃপরে শুনিব। আপনার কৃপায় বোধ হয় কিছু সন্ধানও পাইয়াছি। আমার বলিতে ইচ্ছা হয়ঃ—

এমন ভাব ধরালো কোন্ ভাবিনী
বল দেখি তাই চিন্তামণি।

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ আমি এক বাতুল, আমার ভাব দেখিয়া উপহাস করিও না। সময়ে সময়ে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বড়ই ব্যস্ত করিয়া তুলি। শ্রীরূপ আবার করযোড়ে বলিলেন, এ তো ব্যস্ত করা নয়, ঐ ভাবেই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া। এ সকল ব্যাপার, ভাবে না দেখাইলে কি ভাবায় কোটে ?

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, শ্রীরাধিকার প্রেম এক অনির্ব্বচনীয় অসীম অফুরন্ত সমুদ্র। এই মহাপ্রেম-সিন্ধুতে চিত্ত নিমগ্ন হইলে আর অন্যকিছু জানিবার, শুনিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই ভাবই, মহানুভব জীবের সাধনার চরম লক্ষ্য। শ্রীগোবিন্দের কৃপায় হৃদয়ে এই অনুভব অঙ্কুরিত, বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত :— * * * *

এই, বলিয়াই আর তিনি বলিতে পারিলেন না। ভাব-গম্ভীর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আবার সহসা নীরব হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি মহাভাবামৃত-রসসিন্ধুতে আবার নিমজ্জিত হইয়া প্রেমানন্দ-লীলারস-সমাধিতে নীরব ও নিস্পন্দভাবে নিমজ্জিত হইলেন। শ্রীরূপ অতীব ব্যস্ত হইয়া তাঁহার শ্রীমস্তক আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। শ্রীমদ্ বল্লভ প্রভুর চরণ দুখানি আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। অপর এক ভাগ্যবান্ ভক্ত তাল-ব্যজনে মৃদু মৃদু ভাবে বাতাস করিতে লাগিলেন।

আমরা এখন কিছুকালের জন্য প্রভুর এই আনন্দ-সমাধি ভঙ্গ করিব না। প্রভু শ্রীপাদরূপকে যে প্রগাঢ় উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছিলেন,

তাহা ধারণাতেই আনিতে পারিব না,—অনুভব করা তো দূরের কথা। তবে এ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে যাহা লিখিত আছে এ সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তৎপরে শ্রীপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশের তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় ভক্তিরসের আলোচনা দৃষ্ট হয়। উহাতে লিখিত আছে:—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

এইস্থলে 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব' এই যে কথাটী লিখিত হইয়াছে শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ইহার মূল প্রমাণ দৃষ্ট হয় যথা:—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্-
জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যহি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

হে অচ্যুত, অনাদি কাল হইতে এই সংসারে ভ্রমণশীলজনের যখন সংসার-নাশের সময় উপস্থিত হয়, সেইকালে তোমার ভক্তের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। যে কালে সৎসঙ্গপ্রাপ্তি হয় সেইকালে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তর-কার্য্য-কারণের নিয়ন্তৃরূপী তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সদ্ভক্ত সমাগম বা সদ্ভক্ত-সন্দর্শন পরম সৌভাগ্যেরই ফল।" অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে "গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ" এস্থলে 'গুরুকৃষ্ণ' পদের অর্থ কি,—শ্রীচরিতামৃতেই তাহারও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয় যায় যথা,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষা গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী,—ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপ॥

এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে—

১। আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্যা বুদ্ধ্যা স্যূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ শ্রীভাগ ১১। ১৭।২২।

২। নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ শ্রীভাগ ১১। ২৯। ৬।

প্রথম শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট, দ্বিতীয় পদ্যের অর্থ এইযে হে ঈশ, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার প্রত্যুপকাররূপ আনৃণ্য লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা আপনার কৃত উপকারকে স্মরণ করিয়া পরমানন্দে বিভোর হয়েন। উপকার এই—আপনি বাহিরে গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে দেহধারীদিগের বিষয়বাসনা নিরাশ করিয়া নিজরূপকে প্রকট করেন।

অতঃপরে লিখিত আছে:—

মালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥

তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥

ভাগ্যবান্ সাধক গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তিকে লতা বলিয়া প্রকল্পনা করিলাম কেন? লতিকা স্বভাবতঃই কোমলা ও পরাশ্রয়া। লতিকার গতি নিরন্তরই আশ্রয়ের অভিমুখে। কি প্রকারে আশ্রয়কে অবলম্বন করিবে, লতিকার দিবানিশি কেবল সেই চেষ্টা। ভক্তি-লতিকার পরম আশ্রয়,—শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ। সাধকভক্ত ভক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে গুরু পদাশ্রয় করেন, গুরুর কৃপায় ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় হৃদয়ে উক্ত বীজ বপন করেন। জল-সেচন না করিলে ভূমি সরস হয় না, বীজ অঙ্কুরিত হয়না, শ্রবণকীর্ত্তনই জল-সেচন। শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলসেচনে হৃদয়ভূমি আর্দ্র হয়, চিত্ত সরস হয়, তাহার ফলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রবণকীর্ত্তনাদি জলসেচনে ভক্তিলতা দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভক্তিলতা অনুক্ষণ বাড়িতে থাকে। ভক্তিলতার গতি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধসীমায় বা তদুপরিস্থিত পরব্যোমেও স্থগিত হয় না। মায়াতীত গোলক বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরুই উহার একমাত্র আশ্রয়। ভক্তিলতিকা তদ্ব্যতীত অপর কোনও আশ্রয় স্বীকার করেন না। প্রেমই ভক্তিলতিকার ফল। পর ব্যোমাদির কথা পরে বলা যাইবে।

ভক্তিলতিকার এইরূপ প্রকৃতি হইলেও ইহার পোষণে ও সম্বর্দ্ধনে বহুল বাধাবিঘ্ন আছে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তারে, শুকি যায় পাতা॥

বৈষ্ণব অপরাধ ভক্তিলতার সম্বন্ধে প্রমত্ত হস্তিস্বরূপ। ভীষণ অনিষ্ট কর প্রমত্ত হস্তী যেমন দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কাননের লতা প্রভৃতি

উৎপাটিত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই বৈষ্ণবাপরাধ হস্তীও তদ্রূপ ভক্তিলতিকাকে বিনাশ করিয়া থাকে। যাহাতে ভক্তিলতায় অপরাধরূপ হস্তীর প্রভাবপাত না হইতে পারে, সাধক-মালীকে তজ্জন্য আবরণ প্রদান করিতে হয়।

কিন্তু ভক্তিলতিকার পক্ষে কেবল যে বৈষ্ণবাপরাধই একমাত্র বিঘ্ন তাহা নহে, ইহার আরও বহুল বিঘ্ন আছে। উপশাখা লতিকা-বৃদ্ধির এক প্রধান বিঘ্ন। মুক্তিবাঞ্ছা, ভুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসা, লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভক্তিলতার উপশাখা। বিশুদ্ধ ভক্তির সম্বর্দ্ধনের পক্ষে এই সকল ব্যাপার অতীব বিঘ্নকর।

বেদে লিখিত আছে "স্বর্গাকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামনার জন্য যজন করিবে। স্বর্গ কেবল ভোগের স্থান মাত্র। ভুক্তিকাম লোকেরাই স্বর্গের জন্য যজ্ঞাদি করিয়া থাকে, উহাদ্বারা ভক্তির উদয় দূরে থাকুক, উহাতে ব্রহ্ম-সাধনোপায় জ্ঞানের উদয় পর্য্যন্ত হয় না। মুক্তিবাসনাও ভক্তির বিঘ্ন। মুক্তি কি? এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি।" বৈষ্ণবের অভিধানে এইরূপ মুক্তির অপর পর্য্যায়,— স্বার্থপরতামাত্র। নিখিল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্যই এতাদৃশী মুক্তির প্রয়াস। যেখানে দুঃখ, সেইস্থল হইতে দেহ মন ও আত্মাকে সরাইয়া লওয়াই এই মুক্তির প্রথম ও প্রধান সাধন। ইহাও ভক্তির অন্তরায়। উপাস্যদেব, বৈষ্ণবের আত্মার অন্তরতম দেবতা, তিনি জীব হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, কেন না তিনিই আত্মার আত্মা। তাঁহার সহিত প্রগাঢ় প্রেমের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে দুঃখও সুখ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এইরূপ অনুভূতির নামই অনুরাগ। অনুরাগ শত দুঃখকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়, কেবল একমাত্র প্রাণেশ্বরকেই হৃদয়ের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়া দিনযামিনী তাঁহার সহিত প্রিয়জনকে সম্মিলিত করিয়া রাখিতে চাহে। সাধারণ লোকে যাহাকে মুক্তি বলে, তাহা

কামেরই নামান্তর সুতরাং এই মুক্তি, শুদ্ধ ভক্তির বাধক। নিষিদ্ধাচারও ভক্তির বিঘ্নকর। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে॥

অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিধি ব্যতীত যে আত্যন্তিক হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতস্বরূপ। নিষিদ্ধাচারে কখনও বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হয় না। দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক আচরণ ভিন্ন সাত্ত্বিকগুণের আবির্ভাব হয় না। সাত্ত্বিকগুণের অভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় অসম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজনের আবার এমনই গুণ, যে দুরাচার ব্যক্তিও যদি কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সহজেই তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই সদাচারের ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অগ্নি সংযোগে শীতল জল যেমন উষ্ণ ও দাহক হইয়া উঠে, শ্রীভগবানে মনোনিবেশে দুরাচারের হৃদয়েও যে সদাচারের সঞ্চার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিই জীবের প্রধানতম সাধন। তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গল-লাভের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর যোষিদ্ ব্রতাদির ন্যায় বিষয়ে উপাসনাবৃত্তির প্রেরণা—তাহাই কুটিনাটী। এই সকল কুটিনাটীও ভক্তির বিঘ্নকর। লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার আশায়। ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া,—ভক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এই সকল উপশাখা বৃদ্ধি পাইলে, ভক্তিলতার ঊর্দ্ধগতির বিঘ্ন হয়। লতিকা স্বীয় মূলদ্বারা যে রসাকর্ষণ করে, সে রস যদি অগণ্য উপশাখার পোষণে ব্যয়িত হয়, তবে মূল লতাটী আর বাড়িতে পারে না। লতিকার গতি তখন স্তব্ধ হয়। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হৈঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

আমরা উদ্ভিদ্-কাননেও দেখিতে পাই, লতার উপশাখা বাড়িলে মূললতা অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারে না। যদি মূল লতিকাকে সুদূর প্রসারিত করিতে হয়, তবে মালী প্রথম হইতেই উপশাখাগুলিকে ছিন্ন করিতে আরম্ভ করে। লতিকার মূল অতি ক্ষুদ্র, ইহা দ্বারা আকৃষ্ট রসে উপশাখাগুলি পুষ্ট হইলে মূল লতিকা অধিকতর বিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং উপশাখা দেখিতে পাইলেই মালী উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যিনি ভক্তি-লতিকার উৎকর্ষ এবং উচ্চতম পরমাশ্রয় প্রাপ্তি দর্শন করিতে আশা করেন, তাদৃশ সাধক-মালীকেও উপশাখার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে উপশাখা উপজাত হইয়া মূল লতিকার গতি স্তব্ধ না করে, তৎপ্রতি অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ এই যে :—

প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমরস ফল করে আস্বাদন॥

সুতরাং সাধক ভক্ত মাত্রকেই উপরোল্লিখিত উপশাখাগুলির বিনাশে যত্নবান্ হইতে হইবে। মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে শ্রীকৃষ্ণচরণ-লাভই জীবের প্রয়োজন। ভক্তিলতিকার আশ্রয় করিলেই সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমই এই কল্পবৃক্ষের সুস্বাদ সুপক্ব ফল। শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার উপদেশের সার কথা এইরূপে লিখিত হইয়াছে যথা :—

এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।

যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

মহাপ্রভুরই উপদেশের সারমর্ম্ম শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় তদীয় ললিতমাধব নাটকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন যথা :—

ঋদ্ধা সিদ্ধি-ব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-

র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়েত্তাবৎ।

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং

গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধি-স্বরূপ প্রেমের গন্ধলেশও অন্তঃকরণের পথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত্যধর্ম্মোপেত সমাধি এবং উহার ফল স্বরূপ গুরুতর ব্রহ্মানন্দ সাধকদিগের চিত্ত চমৎকার করিতে সেই পর্য্যন্তই সমর্থ হয়, যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণের সিদ্ধৌষধি-স্বরূপ প্রেমসমূহের লেশও অন্তঃকরণে উদিত না হয়। অর্থাৎ প্রেমের উদয়ে ব্রহ্মানন্দও অতি তুচ্ছ হয় সুতরাং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমের প্রকাশ হয়।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্য' জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই উত্তমাভক্তি। ইহা কিন্তু শ্লোকটীর বঙ্গানুবাদ মাত্র। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা বহুল অর্থমূলক। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী উক্ত শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে উহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। এই শ্লোকোক্ত অনুশীলন শব্দটী অনুপূর্ব্বক শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শীল ধাতুটী ভ্বাদি ও চুরাদি-গণীয়। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ উপধারণ (অভ্যাস) ইহা প্রবৃত্ত্যা-

র্থক। আবার ভ্বাদিগণীয় শীল ধাতুটী "সমাধি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা নিবৃত্ত্যর্থক। রতি বা প্রেমাদিস্থায়িভাবরূপ সেবা, নিবৃত্ত্যর্থক। এস্থলে প্রবৃত্ত্যর্থক শীল ধাতুর অর্থ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণার্থ কায়িক মানসিক ও বাচিক চেষ্টাই কৃষ্ণানুশীলন। অথবা কৃষ্ণ-বিষয়ক মানসিক সমাধিই কৃষ্ণানুশীলন। এই অনুশীলন যে ভক্তিমূলক, এই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত "আনুকূল্যেন" পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। বৈরীভাবেও শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে। কংসাদিও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন, কিন্তু সেই অনুশীলন অনুকূল নহে, উহা শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি নহে। অনুশীলনের ভক্তিত্ব নাই। অনুকূল অনুশীলেরই ভক্তিত্ব। অনু উপসর্গটি 'হীন' 'পশ্চাৎ' 'সহ' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা :—

অনু হীনে সহার্থেচ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি
লক্ষণেত্থভূতাখ্যানভাগবীপ্সাদনুক্রমঃ ॥

এখানে "অনু" শব্দটীও অনুকূল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ কৃষ্ণানুশীলন কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে তদ্ব্যতীত অপর কোন অভিলাষ থাকে না। অপরন্তু ইহা জ্ঞান ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত। অর্থাৎ এই অনুশীলনের সহিত জ্ঞান কর্ম্মাদির কোনও সংস্রব থাকে না। "কর্ম্মাদি" পদের "আদি" শব্দটী বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতিকে বুঝায়। এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান। কিন্তু ভগবৎতত্ত্বানুসন্ধান জ্ঞান বুঝিতে হইবে না। কর্ম্ম শব্দের অর্থ স্মৃতি-সম্মত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্য কিন্তু ভজনীর পরিচর্য্যাদি নহে। কেন-না, সে সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। যে হেতু ঐ সকল ব্যাপার ও কৃষ্ণানুশীলনরূপ। ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। এই শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিরহিত এবং উপাস্যদেবতা-পরত্ব-জনিত নির্ম্মল ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সমূহ দ্বারা কৃষ্ণসেবাই ভক্তি। এই শ্লোকোক্ত "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত"পদের অর্থ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, "তৎপরত্বেন" পদের অর্থ আনুকূল্যে; "নির্ম্মলং"পদের অর্থ জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত, "হৃষীকেন" পদের অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা, আর "সেবনম্" পদের অর্থ "অনুশীলন" দেহেন্দ্রিয়ান্তঃককরণের অভ্যাসই অনুশীলন। কেহ কেহ বলেন 'হৃষীক' পদদ্বারা দেহান্তকরণও বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতিকে ভক্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে সেই শ্লোকগুলি হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। গুণ ত্রিবিধ—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ। গুণভেদে ভক্তিরও বিভিন্নতা আছে এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যকটী আবার পরস্পর মিশ্রণের তারতম্যে নয় সংখ্যায় বিভক্ত। ইহদের উত্তরোত্তরেই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিভেদে ভক্তি নয় প্রকার। এই নয় প্রকার ভক্তি প্রত্যেকে আবার উক্ত নয় প্রকার ভক্তির দ্বারা শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং সগুণ ভক্তি ৮১ ভাগে বিভক্ত। কিন্তু নির্গুণ ভক্তির আর কোন প্রকার ভেদ নাই, উহা একবিধ। সেই নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ প্রকটনার্থই উদ্ধৃত শ্লোকের অবতারণা। এই সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তবে একটুকু বিশেষত্ব আছে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন আমি সকলের হৃদয়স্থিত। আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে যাহার মনোগতি, সাগরে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় নিরন্তর

অবিচ্ছিন্ন, তাহার সেই মনোবৃত্তিই নির্গুণা ভক্তি। এস্থলে অবিচ্ছিন্না পদের অর্থ সন্ততা অর্থাৎ যাহা গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর গতিশীলা। অহৈতুকী শব্দের অর্থ ফলাভিসন্ধানরহিতা। অব্যবহিতা বিশেষণটীর অর্থ ভেদ-দর্শনরহিতা। "গুহাশয়ে" পদের অর্থ গুহা অর্থাৎ আশ্রয় ঘর, অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণবর্ত্তী, এই নিমিত্ত তিনি সুখধ্যেয়, অর্থাৎ অতি সুখে তাঁহার ধ্যান সম্পন্ন হইতে পারে। এস্থানে অম্বুধিতে গঙ্গা-প্রবাহের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর। পর্ব্বাবর্ত্তিত জল-প্রবাহ বিবিধ আবর্ত্তনে যেমন এক সাগরেই প্রবাহিত হয়, নির্গুণ ভক্তিও সেই প্রকার শ্রীভগবানের পাদপদ্মের অভিমুখেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। পারমেষ্ঠ্য, সার্ষ্টি সালোক্যাদি ফলদ্বারা প্রলোভিত হইলেও নির্গুণ ভক্ত এই সকল প্রলোভনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণ-চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিরত থাকেন। অন্য জলপ্রবাহের পরিবর্ত্তে এই উদাহরণ অর্থ চমৎকারিত্বসূচক হইয়াছে। গঙ্গাপ্রবাহ যেমন দ্রুতগামী সুশীতল, অতি পবিত্র ও জগৎপূজ্য, নির্গুণ ভক্তিও তাদৃশী।

শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাস, সালোক্য ; তাঁহার সমান ঐশ্বর্য্য সার্ষ্টি ; তাহার সমানরূপই,—সারূপ্য এবং তাঁহার সহিত একত্বই সাযুজ্য। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন আমার গুণ-শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বগুহাশয়-স্বরূপ আমাতে সাগরগামী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় যে অনবচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে, তাহাই নির্গুণ ভক্তি। আমার গুণ শ্রবণমাত্র কেবল আমার লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে নির্গুণ ভক্তের মতি আমাতে প্রবর্ত্তিত হয় না। আমিই সকল প্রকার প্রাকৃত কারণনিচয়ের কারণস্বরূপ। এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিদ্‌গণ আমায় গুহাশয় নামে অভিহিত করেন (গুহায়াং শেতে নিশ্চলতয়া তিষ্ঠতি যঃ তস্মিন্—গুহাশয়ে)। মনোগতি পদের বিশেষণ,—অবিচ্ছিন্না। অবিচ্ছিন্না ; পদের অর্থ এই যে বিষয়ান্তর দ্বারা যাহা ছিন্ন হয় না, তাহাই অবিচ্ছিন্না এইরূপ শ্রীভগবানে

অনবচ্ছিন্ন অনুরাগই নিগুর্ণ ভক্তির লক্ষণ। শ্রীগোপাল তাপনীতে লিখিত আছে :—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্" এইলক্ষণ দ্বারাও ভক্তির নৈষ্কর্ম্য প্রতিপাদিত হইল। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে :—

"সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তৎপুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা যে আত্মহিত হয়, তাহা স্বকীয় কামনার অন্তর্গত নহে, সুতরাং ইহা নিগুর্ণ ভক্তির লক্ষণ। এই নিগুর্ণ ভক্তি অকিঞ্চনা ও আত্যন্তিকী ভক্তি নামে খ্যাত। বৈধী ও রাগানুগাভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বার যে ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই বৈধীভক্তি, এই বৈধী-ভক্তি আবার দ্বিবিধ। ১ম বৃত্তিহেতু, অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান হেতু। শাস্ত্রকার বলেন—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।

দ্বিতীয় প্রকার—অর্চ্চনা-ব্রতাদি-গত। শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে :—

মামৈব নৈরপক্ষ্যেণ ভক্তিযোগন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥

একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিব্রত ইহার উদাহরণ-স্বরূপ। এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা ভক্তিসন্দর্ভ ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছাদ্বারা এই বিশুদ্ধভক্তি কলুষিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভগবৎসাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির প্রকর্ষ সাধক যে সকল ক্রমের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকল, ক্রমাবলম্বন বৈষ্ণব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় মনস্তত্ত্বের উচ্চতম তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রভু বলেন :—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥

বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধন ভক্তি যে দ্বিবিধ, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এই সাধনভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে রতি কাহাকে বলে? আলঙ্কারিকগণ বলেন :—

"রতিশ্চেতোরঞ্জকতা সুখভোগানুকূল্যকৃৎ।"

ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে :—'চিত্তস্য রঞ্জনং, দ্রবীভাবস্তজ্জনকধর্ম্ম বিশেষ এব চেতো রঞ্জকতা সা এব সম্প্রয়োগচিত্তদা রতি রুচ্যতে। ইয়মেব চিত্তকঠোরত্বং দূরীকৃত্য কোমলত্বং দ্রবীভাবঞ্চোৎপাদয়তি॥ অর্থাৎ চিত্তের রঞ্জকতাই রতি। এই রতি সুখভোগের আনুকূল্যকরী। যে ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, চিত্তের কঠোরতা দূরীভূত হইয়া যদ্দ্বারা চিত্তের কোমলতা জন্মে, তাহাই রতি।

ভাবভক্তিই রতি নামে প্রসিদ্ধ। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে প্রিয় পদার্থের আকর্ষণে প্রথমতঃ যে বিলোড়ন বা বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই ভাব। অমরও বলেন "ভাবো মনসো বিকারঃ"। মনের বিকারই ভাব। ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত আছে :—

স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতোশ্রবণাদিভিঃ
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ।

ভগবৎকথা শ্রবণাদি দ্বারা হৃদয়ে আনীতা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতি ভক্তগণের স্বাদ্য। "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা" পদটী রতির বিশেষণ। এই পদে বিন্যস্ত শুদ্ধ শব্দের অর্থ দোষরহিত। এই শুদ্ধত্ব কেবল স্বানুভব-বোধগম্য। যদি তর্কস্থলে বলা যায় যে অনুভব অন্তঃকরণের বৃত্তি; এই বৃত্তি স্থূলসূক্ষ্মদেহবিকারময়ী। সুতরাং এতদ্দ্বারা সেই বিশুদ্ধ পদার্থের বোধ কি প্রকারে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, এই অনুভব, তৎতৎবিকার-রহিত। আরও একটী আপত্তি এই যে অনুভবটি বিষয়াকার, ইহাতে

বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে। শুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান অনুভব সিদ্ধ নহে, কেন না উহা প্রত্যগ্-রূপ। কিন্তু কথা এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আবেশ, বিষয়াকার-রহিত হইলে স্বয়ং শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ও চিন্ময় হয়। অনুভবও চিদ্বৃত্তিময়। সত্ত্ব শব্দ দ্বারাও স্বপ্রকাশত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতি,শুদ্ধ সত্ত্বময়ী সুতরাং স্বপ্রকাশস্বরূপা। শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতির উদয় হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন :—

আবির্ভূত মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং।
স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদি-কর্ম্মকাস্বাদহেতুতা প্রতিপদ্যতে॥

শ্রীচরিতামৃতকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন :—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করায় উদয়॥

রতিদ্বারা জীবের চিত্ত, ভগবদভিমুখ হয়। এই অনুভব অন্তর্বহিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণবিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া এই রতি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে স্থায়ীভাব নামে অভিহিত হইয়াছে। এই রতি মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধা। শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষাত্মা রতিই মুখ্যা। স্বার্থা ও পরার্থা ভেদে মুখ্যারতি দ্বিবিধা। স্বার্থা ও পরার্থা আবার শুদ্ধ প্রীতি, সখ্য বাৎসল্য ও প্রিয়তাভেদে পাঁচ প্রকার। সামান্যা, স্বচ্ছ ও শান্তি, শুদ্ধা রতির এই ত্রিবিধ ভেদ। এইরূপে রতি বিষয়ে বহুল সূক্ষ্মালোচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের ৫ম লহরীতে দ্রষ্টব্য। এই রতি গাঢ় হইলে উহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। যথা :—

রতিঃ প্রগাঢ়ঃ কান্তভাবঃ সাধারণী সমঞ্জসা।
কিঞ্চিদ্ বিশেষ মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ॥

রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে।
সাদৃঢ়েয়ং রতিপ্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহক্রমাদয়ম্ ॥
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই উপদেশামৃতের প্রতিধ্বনি। শ্রীচরিতামৃতকারও এই সকল উপদেশের সার সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা উহাতে দেখিতে পাই।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর ॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব।
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব।
যৈছে দেখি সিতামৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর ॥

শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি এই জগতের কোনও প্রেমের সহিত তুলিত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ প্রীতিসন্দর্ভকার এই সম্বন্ধে সুমধুর ভাষায়,—শব্দালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্ ও প্রীতি-বিষয়ক যে মহাসিদ্ধান্ত প্রীতি সন্দর্ভে লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে পাদটিপ্পনীতে উদ্ধৃত করা গেল। * উহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তাঁহার প্রীতির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উহার মর্ম্মানুবাদ এই যে :—

---

*"নিখিল পরমানন্দচন্দ্রিকা-চন্দ্রমসি, সকল ভুবনসৌভাগ্যসার-সর্ব্বস্বসদ্গুণোপজীব্যানন্ত-বিলাসমন্থামাধিক বিশুদ্ধ সুখবানন্দবরস্তোল্লাসাদাসমোর্দ্ধ মধুরে, শ্রীভগবতি কথমপি চিন্তাবত্তা য়াদনপেক্ষিত বিধিঃ স্বরসতঃ এব সমুল্লসন্তী বিষয়াশ্রয়ৈরনবচ্ছেদ্যা তাৎপর্য্যান্তরমসহমানা হ্লাদিনী সারবিশেষরূপা ভগবদানুকূল্যাত্মকতদনুগততৎস্পৃহাদিময়জ্ঞানবিশেষাকারাতাদৃশ

শ্রীভগবান্ নিখিলপরমানন্দচন্দ্রিকার চন্দ্রস্বরূপ এবং সকলভুবন-সৌভাগ্যসারসর্ব্বস্ব। তিনি সত্ত্বগুণোপজীব্য অনন্তবিলাসময় অমায়িক বিশুদ্ধ সত্ত্ববান্, অনবরতউল্লাসজনিত অসমোর্দ্ধ মধুর। এতাদৃশ শ্রীভগবানে জীবের প্রীতি সঞ্চার যে কত উচ্চতম চিত্তবৃত্তির প্রেরণা তাহা বুঝাইয়া বলার আর প্রয়োজন কি? ভগবৎপ্রীতি-বিষয়ান্তর দ্বারা অনবচ্ছিন্না, তাৎপর্য্যান্তর-অসহমানা, হ্লাদিনীর-বৃত্তি-বিশেষ স্বরূপা, ভগবদানুকূল্যাত্মকতদনুগত-তৎস্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষা-কারা, তাদৃশভক্তমনোবিশেষদেহা, ভক্তকৃত্যরহস্যসঙ্গোপগুণময়বাসনা-বাষ্পমুক্তাদিব্যক্তপরিষ্কারা, সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা, দাসীকৃতাশেষার্থ সম্পত্তিকা, ভগবৎপাতিব্রাত্যব্রতচর্য্যাপর্য্যাকুলা, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়-হারিরূপা—এই ভাগবতী প্রীতি ভগবতী। এই প্রীতি প্রকৃতি ভক্ত চিত্তের উল্লাস সাধন করেন, মমতা দ্বারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সংযোগ করেন, বিশ্রম্ভ জন্মান, প্রিয়ত্বাতিশয় দ্বারা অভিমান জন্মান, চিত্তকে দ্রবীভূত করেন, প্রত্যভিলাষ দ্বারা স্ববিষয়ে মনোযোগের সঞ্চার করিয়া দেন, প্রীতির বিষয়ে মনকে নব নব অনুরাগী করেন, অসমোর্দ্ধচমৎকার গুণে ভক্তহৃদয় উন্মত্ত করেন। এই প্রীতি-রতি উল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা। এই রতির উদয় হইলে অন্যত্র তুচ্ছ বুদ্ধির উদয় হয়। মমতাশয়াবির্ভাব দ্বারা সমৃদ্ধা রতি প্রেমা নামে অভিহিতা। এই মমতা অন্যত্র মমতাবর্জ্জিতা। বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমাই প্রণয়। প্রণয়, ক্রীড়াপারতন্ত্র্য। অনুগ্রাহ্য-তাভিমানময়ী প্রীতি,—ভক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ।

ভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা পীযূষপূরতোঽপি সরসেন স্বৈনৈব স্বদেহং স্বরসয়ন্তী ভক্তকৃতাত্মরহস্য সঙ্গোপগুণময়রসনী-বাষ্পমুক্তাদিব্যক্তপরিষ্কারা সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা দাসীকৃতাশেষাপুরুষার্থ-সম্পত্তিকা ভগবৎপাতিব্রাত্যব্রতচর্য্যাপর্য্যাকুলা ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা ভগবতী ভাগবতী প্রীতি স্বমুপসেবমানাবিরাজত ইতি সেয়মথণ্ডাপি নিজালম্বনস্য ভগবত আবির্ভাব-তারতম্যেন স্বয়ং তারতম্যেনৈবাবির্ভবতি তদেবং সতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বেন তত্ত্বসন্দর্ভে দর্শিতত্বাৎ তত্রৈব তস্যা পরাপ্রতিষ্ঠা।

শ্রীচরিতামৃতের অপর একটী পয়ার এইযে—

"যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।"

এই পয়ারটী একটী শ্লোকের অনুবাদ। সে শ্লোকটী এই :—

বীজমিক্ষুঃ স চ রস সগুড় খণ্ড এব সঃ।

স শর্করা সিতা সাচ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥

রসশাস্ত্রে রতি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে লিখিত আছে :—

রতিশ্চেতো রঞ্জকতা সুখভোগানুকুল্যকৃৎ।

সা প্রীতি মৈত্র সোহার্দ্দ্য ভাবসংজ্ঞাঞ্চ গচ্ছতি॥

যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।

বিষয়াসম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষব্যবহারঃ সতাং মতঃ।

অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈবপ্রীতি নিগদ্যতে॥

রতি আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি-বিশেষ। ইহার মাত্রা-বিশেষে অনন্ত ভাবের উদ্গম হয়। সুতরাং সেই সকলও অসংখ্য নামে অভিহিত হইতে পারে।

এস্থলে রতি ও প্রেমাদির কথা আরও একটুকু বলা যাইতেছে। শ্রবণদর্শনাদিনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণে মন আকৃষ্ট ও লগ্ন হয়, উহাই রতি নামে খ্যাত। এই রতি হইতেই প্রেমের উদ্ভব হয়। বিঘ্নের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও রতি যদি দৃঢ় হয় অর্থাৎ রতির কিছুমাত্র হ্রাস না হয়, তবে তাহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার প্রেমের যে দার্শনিক লক্ষণ করিয়াছেন তাহা প্রসঙ্গান্তরে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এইস্থলে কেবল রতির পরিপাকজনক প্রেমলক্ষণই উক্ত হইল। ভরতমুনি বলেন :—

বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্রস-নিস্পত্তিঃ।

অর্থাৎ বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী প্রভৃতির সংযোগে রসনিস্পত্তি হইয়া থাকে।

বিভাব—বিভাবয়তি উৎপাদয়তীতি বিভাবঃ—এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে বিভাব,—কারণস্বরূপ।

অনুভাব—অনুপশ্চাদ্ভাবো ভবনং যস্য অনুভাবো কার্যম্; সুতরাং এই অনুভাব কার্য্য-স্বরূপ।

ব্যভিচারী—বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্যেতি ব্যভিচারী—অর্থাৎ সহকারী।

ইহাদের সংযোগেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কার্য্যকারণও সহচারিত্ব দ্বারাই রসনিষ্পত্তি হয়। বিভাবকে যে 'কারণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে উহা নিমিত্ত অর্থদ্যোতক। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দ্বিবিধ। আলম্বন ও উদ্দীপন এই দুইটীই অনুভাবের হেতু-স্বরূপ,—অনুভাব ইহাদেরই কার্য্য। সমবায়ী কারণই স্থায়ী নামে খ্যাত। আলম্বন ও উদ্দীপন এই দ্বিবিধ নিমিত্ত-কারণ মাত্র। অলঙ্কার শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবের যে লক্ষণা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

আস্বাদাঙ্কুরো কন্দোহস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজোস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধতত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈ বিভাবস্য পৃথকৃতয়া।
পৃথক্‌বিধত্বং যা স্বেষ সামাজিকতয়া সতাং॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে রজস্তমবিহীন শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট চিত্তের নিত্য ধর্ম্মবিশেষই স্থায়ী রস নামে অভিহিত। এই রসাস্বাদক-চিত্ত-নিষ্ঠধর্ম্ম, হ্লাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিক-বৃত্তিস্বরূপ, উহা জড়ীয় নহে।

এখন একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে স্থায়ীভাব এক ও নিত্য। ইহার মধ্যে আবার উৎসাহজনক বীররস, শোক-রস করুণরস, বিস্ময়জনক অদ্ভুত রসের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর। যেহেতু এইসকল ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ।

একটুকু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার সহজ সিদ্ধান্ত লাভ করা যাইতে পারে। স্থায়ীভাব এক ও নিত্য। ইহার মধ্যে অন্যান্য পরস্পর বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট রসের উদ্ভব হইলেও ইহাকে অস্থায়ী বলা যায় না। যেমন একই শুভ্রস্ফটিক জবাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট কুসুমের সঙ্গগুণে কখনও লাল, কখনও পীত এবং কখনও শ্যামাদি বর্ণ প্রকাশ করে। স্থায়ীভাবও বীররসাদি পোষকবর্গের সঙ্গনিবন্ধন নানা ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার লিখিয়াছেন :—

অবিরুদ্ধানবিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আপন আয়ত্তাধীন করিয়া সুরাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ীভাব। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতিই এই স্থায়ীভাব। মুখ্য ও গৌণীভেদে স্থায়ীভাব দ্বিবিধ। শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষাত্মা রতিই মুখ্য রতি। স্বার্থা ও পরার্থভেদে মুখ্যারতি আবার দ্বিবিধ। এতৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্ষুধা যেমন অন্নব্যঞ্জনাদির ভোজন সুখানুকুল্য করিয়া থাকে, রতিও সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি আস্বাদন সুখোপভোগের অনুকূল কারণরূপে প্রতিভাত হয়। রতিমান্ ব্যক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় পরিলক্ষিত হয়। রতিশূন্য ব্যক্তিদিগের সে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। দ্রৌপদীতে ও শ্রীকৃষ্ণে যে সখ্য বর্ত্তমান, তাহা প্রীতি নামে অভিহিত। স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর যে সখ্যভাব হয় উহা,—মৈত্রী। পুরুষে পুরুষে এইরূপ সখ্যও মৈত্রী নামে অভিহিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ, অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি। তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে হইলে, রসশাস্ত্রের প্রগাঢ় গূঢ় রহস্যের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া তদীয় রাজ্যে প্রবেশ করার উপায় করিতে হয়। এই নিমিত্ত ভক্তিরসামৃত-

সিন্ধুকার, ভক্তি রসের দার্শনিক বিবৃতি করিয়া রাখিয়াছেন। রসময় রসিকশেখরের বিন্দুমাত্র তথ্য জানিতে হইলেও এই ভক্তিরসের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোনও রূপে তাঁহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, এই নিমিত্ত আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রতি একতান দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবদর্শনে ভগবৎপ্রীতিই পরম পুরুষার্থতা বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ প্রীতিসন্দর্ভকার শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, এই প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ বিষ্ণুপুরাণে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের মুখে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥

অর্থাৎ অবিবেকী লোকদিগের বিষয়-সম্ভোগে যে প্রকার শাশ্বতী প্রীতি বর্ত্তমান থাকে, হে ভগবন্, তোমার প্রতি সেই প্রকার প্রীতি যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসারিত না হয়। আমি এখন যেমন তোমায় স্মরণ করিতেছি, সর্ব্বদা সর্ব্বথা যেন সেই প্রকার তোমায় স্মরণ করিতে পারি, কখনও যেন আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি প্রীতি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়। প্রীতি শব্দে মুদ্, প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ ইত্যাদি পর্য্যায়ভুক্ত সুখকে বুঝায়। আবার প্রিয়তা শব্দে ভাব, হার্দ্দ এবং সৌহৃদাদি বুঝায়। উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষই সুখ কিন্তু সুখ-অপেক্ষা প্রিয়তায় একটুকু বিশিষ্টতা আছে। প্রিয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ-বোধ কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় প্রীতিসন্দর্ভে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা,—"বিষয়ানুকূল্যাত্মক-স্তদানুকূল্যানুগত-তৎস্পৃহা-তদনুভবহেতুকোল্লাসময়োজ্ঞানবিশেষঃ", —প্রিয়তা। এইরূপ শাব্দ বোধ দ্বারা স্পষ্টতঃই দেখা যায়, প্রিয়তা কোন বিষয়কে অবলম্বন করে, অর্থাৎ প্রীতি বা প্রিয়তার বিষয় আছে। রস মাত্রেই বিষয় এবং আশ্রয় দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন মাতৃবাৎসল্য একটী

রস ; ইহার আশ্রয়, মাতা ; ইহার বিষয়,—পুত্র। এই বাৎসল্য-রসটা কিন্তু মায়া-শক্তির বৃত্তি মাত্র। বিশুদ্ধ প্রীতির বিষয়,—যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; ইহার আশ্রয়,—লীলাপরিকরগণ এবং প্রেমিক ভক্তগণ। এই প্রীতিভক্তি শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীমতী গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" যে ভক্তি ভগবানকে স্বানন্দে প্রমত্ত করেন, তাহার লক্ষণ কি ? ভক্তি অবশ্যই আনন্দময়ী কিন্তু সেই আনন্দ, সাংখ্যগণের স্বীকৃত প্রাকৃতি সত্ত্বময় মায়িকানন্দ নয়। কেননা, ভগবান্ কখনও মায়ার অভিভাব্য নহেন, তিনি আত্মতৃপ্ত। নির্ব্বিশেষবাদীদিগের স্বীকৃত ভগবান্ স্বরূপানন্দ নহেন, কেননা, উহাতে অতিশয়ত্ব নাই, অপিচ জীবনিষ্ঠ আনন্দের মতও নহে, কেননা তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

তাহা হইলে এই ভক্তির স্বরূপ কি ? ইহার স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা এইযে ;—ভগবৎ স্বরূপশক্তির সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিনটী বিভাগ আছে। শেষ-উভয়ের সার-সমবেতাত্মিকা সর্ব্বানন্দ-দায়নী শক্তি-বিশেষই ভক্তি। এই শক্তি ভক্তবৃন্দের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রীতি,—ভক্ত এবং ভগবান্ উভয়েরই আস্বাদ্য। এই প্রীতি সুখে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ই আনন্দানুভব করেন। তাই ভগবান বলেন ;—

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুরাই আমার হৃদয়, আমিও তাহাদের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ভিন্ন কাহাকেও জানেন না, আমিও তাহাদের ভিন্ন কাহাকে জানিনা।

ইহাই হ্লাদিনী শক্তির লীলা। ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের এই সম্বন্ধ। ইহার অর্থ এই যে, যাহারা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ-চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, গোবিন্দ ও তাঁহাদেরই আপন হন।

শুধু আপন নহেন,—একবারেই বশীভূত হইয়া পড়েন। শ্রীভাগবতে শ্রুত্যধ্যায়ে লিখিত আছে :—

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতা স্তেপি চ ভজতা সকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥

অর্থাৎ হে অজিত, জগতে তুমি অপরাজিত কিন্তু তুমি অন্যের অজিত হইলেও সাধু ভক্তগণের দ্বারা তুমি পরাজিত হও। তুমি স্বাধীন হইয়াও অধীন হও। অর্থাৎ তুমি তোমার স্বজনের অধীন হও। কেননা, তুমি অতি করুণ। যাহারা তোমার নিকট কিছুই কামনা না করিয়া তোমার সেবার্থ তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমি আত্মদান ভিন্ন আর কিরূপে তাঁহাদের ঋণ, শোধ করিতে পার? এই নিমিত্ত অতি করুণের যে কার্য্য, তুমি তাহাই করিয়া থাক,—অর্থাৎ সেবামাত্রৈক-পরায়ণ নিষ্কাম ভক্তেরা যেমন তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমিও তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞ ও অঋণী হও। প্রিয় পাঠক, ভগবানের আদান প্রদান ব্যাপারটা শুনিলেন ত? এখন আরও কিছু শুনুন।

হরিভক্তি সুধোদয়গ্রন্থে প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি, এই :—

সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ।
নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু, স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্ক প্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥
সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহন্তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চমে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ॥

এই এক অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার। জগতে সকল প্রভুই সম্ভ্রম

চাহেন কিন্তু এই প্রভুটী অন্য রকমের। ইনি বলিতেছেন, বৎস, তুমি মদ্গৌরব কৃত সভয় সম্ভ্রম ত্যাগ কর। আমার ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি ভীত-ভীত ভাবে আমার ভজনা করে, সে আমার প্রিয় নহে। তুমি আমার প্রতি স্বাধীন প্রণয়ী হও। যাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমরে সহিত কথা বলে এবং নিঃশঙ্ক নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করে, তাহারাই আমার প্রিয়। আমি পূর্ণকাম; মানসম্ভ্রম লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা কামনা আমার কিছুমাত্র নাই। যেহেতু আমি আত্মারাম ও প্রাপ্তসর্ব্বকাম।

আমি মুক্ত হইয়াও শুদ্ধ ভক্তগণের স্নেহ-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, এবং অজিত হইয়াও তাদৃশ ভক্তগণের নিকট পরাজিত এবং অবশ্য হইয়াও তাঁহাদের বশীকৃত হই। যে ভক্ত বন্ধুজন-স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আসক্ত হয়, আমি তাহার আপনজন হইয়া থাকি এবং তাদৃশ ভক্তও আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানেন না। সুতরাং ভক্তও আমার, আমিও ভক্তের।

শ্রীচরিতামৃতের আদির চতুর্থেও এই রূপকথা লিখিত আছে :—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেম-বশে আমি না হই অধীন॥
আপনাকে বড় মানে আমার সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

ইন্দ্র-শত্রু বৃত্রেরও বিশুদ্ধা প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভাগবতে বৃত্রের প্রার্থনাটী এইরূপ :—

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ।
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ॥

প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা।
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥

এই শুদ্ধ প্রেমপ্রকাশনয়নের জন্যই বুঝি ভাগবতে শ্রীমৎ বৃত্র বধের বিলক্ষণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই এক বিশিষ্টতা যে, ইহাতে ভীষণ দৈত্য বৃত্রেরও বিশুদ্ধ প্রেমচ্ছবি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদরূপের নিকট ভক্তিরসের উপদেশকালে বলিয়াছিলেন,—

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে নাম স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥

শ্রীপ্রভু রসশাস্ত্রের এই সকল পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান বিস্তৃতরূপেই করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব, তদীয় জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহোদয়ের কৃত শ্রীহরি ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ পাঠে মহাপ্রভু-প্রদত্ত শিক্ষার কৃপাকণা-লেশাভাস ইঁহাদের চরণতলে বসিয়া লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ ও সনাতন স্ব স্ব-গ্রন্থে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বিশুদ্ধ ভক্তির উপদেশ-পীযূষসম্পুটমাত্র।

শ্রীরূপ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অবতরণিকার মঙ্গলাচরণে স্পষ্টতঃই তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, যথা :—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্য ॥

সুতরাং শ্রীজীব, পূজ্যপাদ ভগবৎপার্ষদ পিতৃব্যদ্বয়ের শ্রীমুখে এবং মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদ-স্বরূপ তৎপ্রদত্ত উপদেশ-সম্পুটরূপ গ্রন্থনিচয়ে প্রেম স্নেহাদির লক্ষণ অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ভক্তিরসামৃত

সিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী-টীকা এবং উজ্জ্বলনীলমণির লোচন-রোচনী টীকা শ্রীজীবেরই কৃত। ইনি প্রীতি-সন্দর্ভে প্রেম-স্নেহ-মানাদির সম্বন্ধে স্বল্প কথায় যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল, যথা:—

প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদয়তি চ। তত্রোল্লাসমাত্রাধিকা-ব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ যস্যাং জাতায়াং তদেকতাৎপর্য্যমন্যত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধিশ্চ জায়তে।

অতি সংক্ষেপে এস্থলে প্রীতি-স্নেহ-মান প্রভৃতির লক্ষণ বলা হইয়াছে। প্রীতি, ভক্তচিত্ত উল্লাসিত করে, প্রণয়ীর হৃদয়ে মমতাতিশয় যোজনা করে, প্রণয়ীদের মধ্যে একত্বভাবের সঞ্চার করে, ইত্যাদি।

প্রীতি বা প্রেম, প্রাকৃত কাব্যের প্রণালী-অনুসারে বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল প্রীতি, হর্ষ, মাত্র-বোধক কিন্তু এই প্রীতি, বিষয়, আশ্রয়, আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির সহিত মিলিয়া রস-নিষ্পত্তি করিয়া থাকে, তখন ইহাকে প্রীতি-রস বলা হয়; তখন ইহা স্থায়ীভাব নামে উক্ত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব প্রীতি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"এষা চ প্রীতি লৌকিক কাব্যবিদাং রত্যাদিবৎ কারণ-কার্য্য সহায়ৈ মিলিত্বা রসাবস্থামাপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ীভাব উচ্যতে। কারণাদ্যাশ্চ ক্রমেণ বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ উচ্যন্তে। তত্র তস্যা ভাবত্বং প্রীতিরূপত্বাদেব।" এই রসের কথা অতি প্রাচীন। পূর্ব্বকালে আমাদের এইদেশে এক ভরতমুনি ছিলেন। তিনি নাট্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তন করেন। তিনি রসশাস্ত্রের আদি গুরু। প্রথমে ব্রহ্মা তৎপুত্র নারদকে নাট্যশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন; নারদ, ভরতমুনিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। এই বিষয়ে সাধারণ একটুকু ইতিহাসও আছে। তাহাতে জানা যায়, চতুর্ব্বেদ হইতে নাট্যাখ্য পঞ্চমবেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ

হইতে গান, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ব্ব বেদ হইতে রস গ্রহণ করিয়া নাট্যবেদ প্রকাশ করা হয়। ইহাতে আমরা এই জানিতে পারিতেছি যে, অথর্ব্ব বেদ হইতেই রস-ব্যাপার গ্রহণ করা হইয়াছিল। মহেন্দ্র বিজয়োৎসবে সর্ব্বপ্রথমে দৈত্য পরাজয়ের অনুকরণ করা হয়। ক্রমেই রসনিষ্পত্তির জন্য ভরত অনেক প্রকার নিয়ম উদ্ভাবিত করেন। ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতির সহযোগে রস আস্বাদনের সুবিধা উদ্ভাবিত হয়। ভরতের নাট্যসূত্রাবলম্বনে পরবর্ত্তী সময়ে বহুল রসশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছিল। লৌকিক কাব্যাদিতে এই রস শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা আলোচিত হইত। ভগবদ্বিষয়ে এই সকল শাস্ত্রের ব্যবহার কোন্ সময় হইতে আরব্ধ হয়, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থে লৌকিক কাব্যরসকে ভগবৎরসে ব্যবহৃত করিয়া প্রকৃত পক্ষেই এক অভিনব যুগের অনয়ন করিয়াছেন। স্বয়ং পরমতত্ত্ব, তৈত্তিরীয় উপনিষদে '**রস**' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাহা হইতেই বিশ্ব ও বিশ্বপ্রাণীর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং তিনিই রসের বিষয়, তিনিই রসের আশ্রয়; তিনিই রসের আলম্বনা, তিনিই রসের উদ্দীপনা, তিনিই বিবিধরূপে রস নিষ্পাদন করেন, তিনিই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি রূপে নিজের আনন্দ-চিন্ময়-রসভাবিত মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তিবর্গ সমূহ এবং পার্ষদ পরিকরবর্গ সহ এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবর্গের চিত্তে প্রেমানন্দ-রস বিতরণ করেন। ভজননিষ্ঠ ভগবৎ পার্ষদ শ্রীমৎ সনাতন-রূপ গোস্বামি-প্রমুখ পরম দয়ালু গোস্বামিমহোদয়গণ ভগবদ্বিষয়ে কাব্যরসের অবতারণা করিয়া প্রকৃতপক্ষেই রস-ব্যাপারটীকে উপযুক্ত স্থানেই বিন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা ইহাঁদের কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, উপনিষদের ব্রহ্ম-বীজীভূত রস লোকলোচনের অগোচর অতি সূক্ষ্ম রসতত্ত্ব মাত্র। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে অখিল রসামৃত শ্রীকৃষ্ণরূপ

পর ব্রহ্মই রসব্রহ্মের পূর্ণতম প্রকাশ। ইনি বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা প্রেমিক ভক্তগণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ মহা আস্বাদ্য বস্তু। প্রীতিই রস এবং প্রীতিই স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ীভাবের লক্ষণ এই যে:—

"বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকরঃ॥"

স্থায়ীভাবটী লবণ-সমুদ্রের মত। লবণ সমুদ্র যেমন উহার স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত জলকেই লবণাক্ত করে, স্থায়ী ভাবও বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সকল ভাবকেই আত্মভাবে আনয়ন করে। প্রীতি বা ভক্তিকেই এখানে স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতিই এস্থলে স্থায়ী ভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। হাস্যাদির ভাব ইহার অনুকূল, ক্রোধাদি ভাব ইহার প্রতিকূল। এই স্থায়ী রতি মুখ্যা ও গৌণী এই দুই ভাগে বিভক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা রতিই মুখ্যারতি, এই মুখ্যারতি আবার স্বার্থা ও পরার্থা ভাবে দ্বিবিধ।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই স্থায়ী ভাবটীর নানাপ্রকার বিভাগ ও উপ-বিভাগ করিয়া অতীব বিস্তার করা হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটীর উদাহরণ দিয়া ভক্তগণের আস্বাদ-বাহুল্যের ভাণ্ডার করিয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতি কারণাদির স্ফূর্ত্তিতে ভগবৎ প্রীতি রসময়রূপ ধারণ করিয়াছে। "প্রীতিময়ো রসঃ প্রীতিরসঃ"—"ভক্তিময়ো রসঃ ভক্তিরসঃ" এইরূপ ভাবে ভক্তিরস পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। তাই রসশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসরূপতাম্"

অর্থাৎ ভাব,—বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। রসত্ব প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার সামগ্রী আছে, যথা,—স্বরূপ-যোগ্যতা, পরিকর-যোগ্যতা ও পুরুষ-যোগ্যতা। লৌকিক রসে এবং ভগবৎ প্রীতিতে পার্থক্য অনেক বেশী। ভগবৎ প্রীতিতে

অশেষ নিত্য সুখ-তরঙ্গ বর্ত্তমান, উহা ব্রহ্ম-সুখাস্বাদ হইতেও অশেষ গুণে অধিকতম। স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিকতর আনন্দময়। সুতরাং ভগবৎ-প্রীতিরস-আস্বাদনে আনন্দও অত্যন্ত অধিক, ইহা স্বরূপ-যোগ্যতারই ফল। ভগবানের পরিকরগণও লৌকিক পরিকর-সামগ্রী অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-বিশিষ্ট। সৎকবিগণের লিপিচাতুর্য্যে তাহাদের অলৌকিকত্বই প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব পরিকর-যোগ্যতা উপযুক্তই হইয়া থাকে, আর পুরুষ-যোগ্যতা সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণই তাদৃশ প্রীতির প্রার্থী, সেইরূপ প্রীতি-প্রাপ্তির বাসনা ভিন্ন লৌকিক কাব্যেও রস-নিষ্পত্তি অসম্ভব। রস-শাস্ত্রকার বলেন :—

পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রস-সন্ততিম্।
ন জায়তে তদাস্বাদো বিনারত্যাদি-বাসনাম্॥"

পুরুষের রত্যাদি-বাসনা ভিন্ন লৌকিক রসের উৎপত্তি হয় না। সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে :—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে।

শ্রীপাদ শ্রীজীব প্রীতি-সন্দর্ভে, সাহিত্যদর্পণে লিখিত এই রস-লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু শেষ পঙক্তিটী উদ্ধৃত করেন নাই। রসের এই লক্ষণটী প্রাকৃত কাব্যের জন্য লিখিত হইলেও ইহা বেদান্ত-নিরূপিত পরম তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। সত্ত্ব শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই এই রসতত্ত্ব আলোচনার পরম ধ্রুব চরম লক্ষ্য। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে,—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং" ইত্যাদি।

এই রস যে অপ্রাকৃত, ভগবৎসন্দর্ভে তাহা বলা হইয়াছে এবং এই রস যে ব্রহ্ম-স্বাদ হইতেও অধিকতর উপাদেয়, শ্রীভাগবতে "যা নিবৃতি স্তনুভৃতাং" ইত্যাদি—শ্লোকে তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্" ইত্যাদি পদ্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রজস্তম এই দুই গুণকে অভিভূত করিয়াই সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়া থাকে। সত্ত্বোদ্রেক না হইলে অলৌকিক কাব্যার্থ-পরিশীলন হয় না। অখণ্ড শব্দের অর্থ—এক। এই একমাত্র রসই বিভাবাদি রতি প্রভৃতি প্রকাশ-সুখ-চমৎকারাত্মক। এই রস স্বপ্রকাশ,—কেননা, ইহার মূল, সেই সচ্চিদানন্দময় রসিক-শেখর শ্রীভগবান্ বিরাজমান। চিন্ময় পদে স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়'—রসেরই বিশেষণ,—ইহা স্বরূপ বিশেষণ।

অতঃপরে বলা হইয়াছে "লোকোত্তর চমৎকারপ্রাণঃ"। ইহা একটী আস্বাদনের প্রকার, ইহাকে তটস্থ লক্ষণও বলা যাইতে পারে। লোকোত্তর চমৎকারত্বই এই রসের প্রাণ। জনসাধারণের মধ্যে এই চমৎকার অসম্ভব। যে রস লাভ করিলে মানুষ চিরতরে 'আনন্দী' হয়, তাহা যে লোকাতীত হইবে বা অলৌকিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? চমৎকার শব্দের অপর পর্য্যায় চিত্ত-বিস্তাররূপ বিস্ময়। শ্রীভাগবতেও এই চমৎকারত্বের প্রমাণ আছে যথা—"বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ"। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—'রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার"। শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ দেখিয়া আপনিই চমৎকৃত হইলেন। পদাবলী কাব্যের কবি লিখিয়াছেন,—"আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর"। শ্রীললিত মাধব নাটকে লিখিত আছে :—

> অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
> স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ।
> অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
> সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

"নববৃন্দাবনের মণি ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই যে আমার সম্মুখে আমার চমৎকারকারী অনির্ব্বচনীয় রূপ-মাধুর্য্য পরিস্ফুরিত হইতেছে; ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, শ্রীরাধিকার ন্যায় লুব্ধ হৃদয়ে আমি ইহা উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

অপিচ এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে বহু শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি পদ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।

চরম রসের চমৎকারিত্ব মনোবৃত্তি ও ভাষার অগোচর। 'কেন' উপনিষদে লিখিত আছে,—"ন তত্র চক্ষু গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি" ইত্যাদি। সুতরাং সেই পরম ব্রহ্ম এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড অমৃত। লৌকিক কাব্যরস উহারই আভাস, সুতরাং ইহাও চমৎকার পূর্ণ। অতি প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্ শ্রীমন্নারায়ণও ইহাই বলেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে লিখিয়াছেন,—"তৎপ্রাণত্বঞ্চাস্মদ্বৃদ্ধপ্রপিতামহসহৃদয়গোষ্ঠীগরিষ্ঠক-বিপণ্ডিতমুখ্য শ্রীমন্নারায়ণপাদৈরুক্তম্। তদাহ ধর্ম্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে :—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্।

ভাষার অভিধা বৃত্তি দ্বারা রসজ্ঞান,—প্রকাশই হয়না। ব্যঞ্জনা শক্তিতে রসজ্ঞান কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে,— ভট্টলোল্লট প্রভৃতি রসশাস্ত্রবিদগণের ইহাই অভিমত কিন্তু রসজ্ঞ হৃদয়ই নীরবে নীরবে ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা স্ববাসনানুরূপ রস-সমানাকারপ্রত্যয় সাক্ষাৎকার করেন।

ভক্তিরস সম্বন্ধে উপদেশ-শ্রবণই শ্রীপাদরূপের প্রধানতম প্রার্থনীয় বিষয় ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি ও রস এবং ভক্তিরস সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রতি

যথেষ্ট কৃপা-উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থ তাঁহারই অক্ষয় অফুরন্ত কৃপা দান। ভক্তি-রস-তত্ত্ব যে অফুরন্ত অসীম ব্যাপার, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়। আট প্রকারের সাত্ত্বিক ভাব, আলম্বন উদ্দীপনার বহু-প্রকারতাও বিভাবের শাখা-প্রশাখা কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বিবিধ প্রকারে অনুভাব কার্য্য-প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার সহিত রস শাস্ত্রের নিরূপিত তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারী-ভাবের বৃত্তি একত্র হইয়া ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুর অনন্ত কল্লোল-কোলাহলময় তরঙ্গ-রঙ্গ প্রেমিক ভক্তগণের মানস-নেত্র-সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাচ ভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ, শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে শান্তাদি পঞ্চরসের উদাহরণ-প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা :

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

রঙ্গ-সভায়, সমাগত মহিলাদের মধুররস, সমানবয়স্ক গোপগণের হাস্য-শব্দ-সূচিত নর্ম্মময় সখ্যরস, বৃষ্ণিগণের ভক্তিরস, নৃপতিগণের সামান্য প্রীতিময়রস, মল্লগণের রৌদ্ররস, কংসের পক্ষে ভয়ানক রস ও রাজাদের পক্ষে অদ্ভুত রস নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন, অদ্ভুত রসই সকল রসের প্রাণ। রসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-ভেদ আছে। ভোজরাজ প্রভৃতি বলেন, লৌকিক রসের মধ্যে বাৎসল্য রসই প্রধান, আবার কেহ কেহ স্নেহকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে দম্পতি যুগলের মধ্যে যে সখ্যরস দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রধান, যথা :—

যদেব রোচতে মহ্যং তদেব কুরুতে প্রিয়া।
ইতি বেত্তি ন জানাতি তৎপ্রিয়ং যৎকরোতি সা॥

আবার শুদেবাদি কোন কোন রসশাস্ত্রবিদ্ ভক্তিরসকেই প্রধান বলিয়াছেন। বীভৎসরস সকলকেই অনাদৃত, উহার নিন্দা এবং ভগবৎরসের প্রশংসা শ্রীভাগবতোক্ত নারদবাক্যে জানা যাইতে পারে যথাঃ—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো।
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ॥
তদ্বায়সং তীর্থ মুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়া॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধব॥

যে বাক্যে জগৎ পবিত্র হরিগুণ বর্ণিত না হয়, তাহার বিবিধ বাক্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও উহা সৎলোকগণের অনাদৃত নহে,উহা কাকতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হয়। উহা মানস-সরোবর বিচরণশীল পরমহংসগণের রমণীয় নহে। যে বাক্য সম্বন্ধে ভাষা বৈভব নাই, অথচ ভগবান্ অনন্তের নাম যশঃ বর্ণিত হয়, সাধুগণ অতি আদর পূর্ব্বক সেই সকল বাক্যের নানাপ্রকারে সমাদর করেন। তাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন এবং সর্ব্বদাই সেই সকল বাক্য পাঠ করিয়া আনন্দিত হন।

এইরূপ ভগবৎরসের সমাদর এবং তদ্ভিন্ন অপরাপর রসের প্রতি অনাদর শ্রীমতী রুক্মিণীর বাক্যেও জানা যায়, যথা:—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

ইহাই বীভৎস রসের উদাহরণ। এই জুগুপ্সা রতি বিবেকজাও প্রায়কীভেদে দ্বিবিধ। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার রতি-রসের বিবরণ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার রসের যে প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় প্রায় সেইরূপ রস-লক্ষণ লিখিয়াছেন, যথা :—

পরমানন্দতাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি॥

ইহাতেও সেই 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর' স্থলে 'পরমানন্দতাদাত্ম্য' মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বপ্রকাশত্ব ও অখণ্ডত্ব উভয় গ্রন্থেই একরূপ আছে। এই রতি বা ভাব গৌণ ও মুখ্য ভেদে দ্বিবিধ এবং শান্ত প্রীতি প্রেয়ান্ (সখ্য), বৎসল্য ও মধুর ভেদে পাঁচ প্রকার। সাধরণ কথায় আমরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচভাগে বলিয়া থাকি কিন্তু ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ. এইরূপে মধুরা আর রতিতে অন্য চতুর্ব্বিধ রতি পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত। উপসংহারে তাহা বলা যাইবে। এই পাঁচপ্রকার ভক্তি,—মুখ্য

গৌণ ভক্তিরস সাত প্রকার,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরস একত্রযোগে দ্বাদশ প্রকার। ইহাদের সবিস্তার বর্ণনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখন বিভাবের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দ্বিবিধ,আলম্বনও দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ-পরিকর এবং কৃষ্ণভক্তগণ। কৃষ্ণভক্ত বহুপ্রকার যথা,—সাধক ও সিদ্ধ ; সিদ্ধগণের মধ্যে চতুর্ব্বিধ সিদ্ধই প্রধান যথা,—প্রাপ্তসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ,কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ;

এখন উদ্দীপনার কথা বলা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, রূপ, প্রসাধন প্রভৃতি প্রধান উদ্দীপন। এতদ্ব্যতীত পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও ভগবদ্বাসর প্রভৃতি উদ্দীপনার মধ্যে গণ্য। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সৌন্দর্য্য ও মোহনতা, উদ্দীপনার পক্ষে পরম সহায়। মেঘ ময়ূর-পুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের স্মারক। বংশীধ্বনি উদ্দীপনার প্রধান সাধক, এইজন্য বাঁশ, বেণু, মুরলী, বংশী, শৃঙ্গ ও শঙ্খ উদ্দীপনার অন্তর্গত। বসন ভূষণ স্মিতমণ্ডন প্রভৃতি বিষয়ও উদ্দীপনার অন্তর্গতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন অনুভাবের কথা বলা যাইতেছে। নৃত্য, বিলুণ্ঠিত, গীত, ক্রোশন, অঙ্গমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, শ্বাসভূমা, লোকাপেক্ষা পরিত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এইসকলগুলি অনুভাব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার, যথা,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, কম্প, অশ্রু ও প্রলয়।

অতপরে সঞ্চারী ভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকার যথা,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল নিদ্রা ও বোধ। এইরূপে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে ভক্তিরসের বিবিধ প্রকার আলোচনা করা হইয়াছে।

এক্ষণে শান্ত দাস্যাদি প্রভৃতি রতির পঞ্চ ভেদের কথা বলা যাইতেছে। শ্রীচরিতামৃতকার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতিদাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥

বাৎসল্যরতি, মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ॥

ভক্তভেদে রতি পাঁচ প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রতি মূলতঃ এক। যেমন স্ফটিক-পাত্রে সূর্য্যকিরণ বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, রতিও তেমনি পাত্রভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রতিফলিত হয়। তদ্‌যথা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে :—

বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ্ রতিরেষোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু॥

শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রতি এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। শান্ত ও যে রতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বিচারপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা এই :—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা।

অর্থাৎ শান্তরতি ভিন্ন কৃষ্ণনিষ্ঠা দুর্ঘট। ইতর তৃষ্ণা দূরীকৃত করিয়া কৃষ্ণনিষ্ঠার উৎপাদনই এই রতির কার্য্য। সুতরাং অপর রতি চতুষ্টয়েও শান্তরসের গুণ নিত্য বিরাজমান। মনের নির্ব্বিকল্পতাই শম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথা-শ্রবণে কাহারই বা সাত্ত্বিক বিকার সঞ্চার না হয়? শাস্ত্র বলেন, নারদের বীণা গানে হরি গুণগান শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মানুভাবী সনকেরও অঙ্গ-কম্পন হইত তদ্‌যথা :—

দেবর্ষিবীণয়া গীতে হরিলীলামহোৎসবে।
সনকস্য তনৌ কম্পো ব্রহ্মানুভাবিনোঽপ্যভূৎ॥

এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্রই সুলভ। সন্দর্ভেও ইহার যথেষ্ট বিচার আছে। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত প্রীতি-সন্দর্ভ হইতে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে সারোদ্ধার করা যাইতেছে তদ্‌যথা—রতির তারতম্যে দ্বিবিধ ভক্ত দৃষ্ট হয়

ইহাদের মধ্যে শান্ত ভক্ত নিশ্চয়। ইহারা জ্ঞানী ভক্ত নামেও প্রসিদ্ধ। সনকাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পরমতত্ত্ব, ব্রহ্মভাবে ইঁহাদের আনন্দনীয়। চন্দ্র দর্শন করিলে মমত্ব বুদ্ধি ভিন্নও যেমন চন্দ্রের আনন্দত্ব অনুভব করা যায়, ইহাদের শমতাও সেইরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠান্বিত ভক্তিরসপূর্ণ বটে কিন্তু উহা নির্মম হইলেও উহা আনুকূল্য-বিবর্জ্জিত নহে, তাহা হইলে আর উহা ভক্তিরসে স্থান পাইত না। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন :—

আনুকূল্যং যত্র তৎপ্রবণত্বতৎস্তুত্যাদিনা জ্ঞেয়ং এষাং প্রীতিশ্চ জ্ঞান-ভক্ত্যাখ্যা। জ্ঞান হং—ব্রহ্মঘনত্বেনৈবানুভবাৎ। এষৈব শান্ত্যাখ্যয়োচ্যতে,—শম-প্রধানত্বাৎ, শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ভগবদ্‌বাক্যাৎ।"

সুতরাং শান্তরতিও ভক্তির মধ্যে গণ্য। এই রতি শমপ্রাধান্যনিবন্ধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিনামে অভিহিত। দাস্যপ্রীতি আরাধনাপ্রধানা। দাস্য-রতি ন্যূনান্যূন শক্তিজ্ঞানময়ী। দাস্যরতি আরাধনাত্মক জ্ঞানময়ী। "শ্রীহরি আমার আরাধ্য, তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস" এইরূপ জ্ঞান হইতেই দাস্যরতির উৎপত্তি। সখ্যরতি তুল্যত্ব জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ভেদে এই সখ্যরতি ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। সখ্যরতি সম্বন্ধে পরমমাধুর্য্যময় প্রণয়বিহারলালিত্য-প্রধানা। সখ্যরতিতে সারল্য অধিকতর, সরলতা-ভিন্ন সখ্য ভাবের সঞ্চার হয় না। সখ্যরতি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য। প্রীতিসন্দর্ভ হইতে এস্থলে এই বিষয়ের বিচার যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথা :—

"মৎসমমধুরশীলবানয়ং নিরুপাধিমৎপ্রণয়াশ্রয়বিশেষ ইতি ভাবেন মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিঃ।"

এই প্রীতি দ্বিবিধ—সৌহৃদাখ্য ও সখ্যাখ্যা। পরস্পর নিরুপাধিক উপকারময়ী ও রসিকতাময়ী প্রীতির নাম সৌহৃদাখ্যা প্রীতি; সহবিহরণ

শালি প্রণয়মগী প্রীতি,—সখ্যপ্রীতি নামে অভিহিত। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের মিত্র সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীদাম ও অর্জ্জুনাদি তাঁহার সখা।

গুরুত্বাভিমানময়ী লালনপালনাদি ক্রিয়াগত প্রীতিই বাৎসল্য রতি নামে অভিহিত। বিস্তৃত বিবরণ রসামৃতসিন্ধুতে দ্রষ্টব্য। এখানে কেবল নামোল্লেখ করা হইল মাত্র।

অতঃপরে মধুরা রতি :—

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সংভোগস্যাদিকারণং
মধুরা পরপর্য্যয়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।

মৃগনয়না গোপীদের সহিত শ্রীহরির যে রতির প্রভাবে সম্ভোগাদি ঘটে উহাই প্রিয়া রতি নামে অভিহিত। উহার অপর পর্য্যায় মধুরা রতি। ইহাই ভাব-তারতম্যে ভক্তহৃদয়ে মধুরাখ্য ভক্তিরস নামে খ্যাত হয় যথা :—

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিঃ রসোঽসৌ মধুরা রতিঃ।

অর্থাৎ মধুরাখ্যা রতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সাধুগণের হৃদয়ে পুষ্টিলাভ করিয়া মধুরাখ্য ভক্তিরস নামে খ্যাত হয়। যে সকল ভক্তের চিত্ত ব্রজসুন্দরীগণের কান্তাভাবের মধুর রসে সংস্পৃষ্ট হইয়া ভক্তজনোচিত বিভাবের দ্বারা সম্পুষ্ট হয়, তাহারাই মধুর ভক্তিরসের আধার বলিয়া খ্যাত হয়।

এই মধুর রতি সম্বন্ধে এস্থলে সবিশেষ আলোচনা করা অসম্ভব। এসম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এত অধিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রীতিসন্দর্ভে ও শ্রীভাগবতের তোষণী টীকায় মধুর রসের আলোচনায় সমুদ্রতরঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থখানি কেবল মধুর রসের আলোচনা ও বিবৃতির জন্যই লিখিত হইয়াছে।

টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই গ্রন্থের টীকায় এই বিষয়ের যথেষ্ট বিচার করিয়া রাখিয়াছেন।

রসময় শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হইলে মধুর রসে ভজনই ভজন-প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মধুর রসের দার্শনিকতত্ত্ব অতীব প্রগাঢ়। অখিলরসামৃত পরমব্রহ্মের আনন্দঘনমূর্ত্তির সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই মধুর রসের ভজনপ্রণালী একদিকে যেমন নিরতিশয় সরস ও সুখময়, অপরদিকে উহা অতীব সূক্ষ্মদার্শনিকতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ। এদেশে অনেকেই উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানতত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, কিন্তু রসের তত্ত্ব কেবল সাহিত্যিকদিগের উপরেই সংন্যস্ত করিয়া রাখিয়া এই সকল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকগণ শুষ্কজ্ঞান লইয়াই সময় যাপন করিতেন এবং উহাই ব্রহ্মানুসন্ধানের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শ্রুতিতে যে তিনি "রসো বৈ সঃ" নামে অভিহিত হইয়াছেন,সুনির্ম্মল মধুর রসের ভাবপ্রবাহে যে তাঁহার সরস উপাসনা হয়, দার্শনিকগণের অনেকের হৃদয়ে সে জ্ঞানের লেশাভাসেরও উদয় হয় নাই। দয়াময় শ্রীগৌরশশী এই রসের ভজনের সুধাধারা বর্ষণ করিয়া প্রেমিক ভক্ত চাতকগণের প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর এই পঞ্চ ভক্তিরসের উদাহরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পয়ারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

> শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর।
> দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
> সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
> বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥
> মধুররস ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
> মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অশেষ গণন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আমরা এই নবযোগেন্দ্রের পরিচয়

পাই। তদ্‌যথা :—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, অবির্হোত্র-দ্রবীড়, চমস ও করভাজন। সনকাদির পবিত্র নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তদ্‌যথা :—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

অতঃপরে গৌণ রতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।
সঙ্কচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণীরতি রুচ্যতে॥
হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধঃ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ॥

অর্থাৎ সঙ্কোচন্তী রতিদ্বারা বিভাবোৎকর্ষজ যে ভাব বিশেষ অনুগৃহীত হইয়া থাকে, উহাই গৌণীরতি নামে খ্যাত। এই গৌণীরতি সাতটী আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা :—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা।

টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন "বিভাবস্তমত্রালম্বনত্বম্"। অর্থাৎ এই শ্লোকটীর প্রারম্ভে যে বিভাবের কথা লিখিত হইয়াছে উহার অর্থ "আলম্বন" বলিয়া বুঝিতে হইবে। সঙ্কোচনী রতি-দ্বারা উদ্ভূত যে ভাববিশেষ প্রকটীকৃত হয়, সে ভাবও রতি নামেই খ্যাত। কিন্তু উহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক রতি।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

হাস্যাদ্ভুত বীরকরুণ রৌদ্রবীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥

এই গৌণীরতি ঔপচারিকা বা আগন্তুক। ইহারা কারণ পাইয়া প্রাদুর্ভূত হয়; আবার কারণের অপগমে ইহাদের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে হাস্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।*

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, "শ্রীরূপ, রতির আরও প্রকার ভেদের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র ও কেবলা ভেদে রতি দুই প্রকার। কেবলা রতি কেবল গোকুলেই পরিলক্ষিত হয়, মথুরায় দ্বারকাতে এবং বৈকুণ্ঠাদিধামে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা রতির লক্ষণ এই যে উহাতে প্রীতির পূর্ণ বিকাশ নাই, যে প্রীতি দ্বিকুলসংপ্লাবনী পদ্মার প্রবাহের অনন্ত-ন্যায় বেগে উন্মত্ত ভাবে প্রবাহিত হয়, তাদৃশী প্রীতি ঐশ্বর্য্যপ্রধানা রতিতে নাই। বিশুদ্ধ প্রেমের প্রবল প্রবাহে শ্রীভগবানের বিশাল ঐশ্বর্য্য ভাসিয়া যায়, মমত্বের সর্ব্বাকর্ষী টানে শ্রীভগবান্ আপনার অতি প্রিয়-সুহৃদ্রূপে প্রতিভাত হন। কেবলা রতি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য মানে না, ইহাই উহার

* অধুনা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র শারীরক্রিয়াবিজ্ঞানশাস্ত্রের উপরেই অধিক পরিমাণে স্থাপিত। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া মনোতত্ত্ব শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থ মনস্তত্ত্বের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদগণ মানসিক যে শ্রেণীর ক্রিয়াকে 'ইমোশন' নামে অভিহিত করেন, এই দুইখানি গ্রন্থে সেই বিষয় এমন বিশদ, বিস্তৃত ও সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে যে মনস্তত্ত্বের পাঠকগণই এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভুত উপকৃত হইতে পারেন। কোন্ ভাব দেহে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, দেহের কোন্ স্থান কোন্ ভাবের প্রভাবে কিরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য কোথায় কি কি চিহ্ন সকলের সঞ্চার হয় তৎসকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুনা ইংলণ্ডে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত। প্রফেসার বেন্ তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে ডাক্তার বেলের গ্রন্থের কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ও উজ্জ্বলনীলমণিতে যেরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা তদ্রূপ ভূয়োদর্শনের ফল নহে। বিশেষতঃ ভাবশাবল্য প্রভৃতিতে বহু ভাবের একত্র সমাগমে এবং কিলকিঞ্চিতাদিতে যুগপৎ ভাবরাশির চমৎকারিত্ব ও বৈচিত্র্য সহসা যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপীয় কোন গ্রন্থেই তাহার আলোচনা দৃষ্ট হয় না।

রীতি। শান্তরসে ও দাস্তরসে ঐশ্বর্য্যের উদ্দীপনা স্বাভাবিক, কিন্তু বাৎসল্যে সখ্যে ও মধুর রসে ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজবিশিষ্ট নারায়ণরূপ দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, শ্রীমতী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বদন-বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেভাব মুহূর্ত্ত মাত্র ছিল। দ্বারকাতে ও মথুরাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণপ্রভাব, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব অতি অল্প। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা হইয়াও তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, ধার্ষ্ট্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আসল কথা এই যে,শান্তরসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রভাবে কৃষ্ণনিষ্ঠার বৃদ্ধি হয়। দাস্তভক্তিরসেও ঐশ্বর্য্যের প্রাবল্যে দাস্যভক্তিরসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সখ্যে বাৎসল্যে, ও মধুর রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিলে মমতার ভাগ হ্রাস হয়, স্বসম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া অতি প্রিয়জনের হৃদয়েও ঈশ্বর-বুদ্ধি উৎপাদিত হয়। ইহার ফলে মমতাময়ী প্রীতির সঙ্কোচ হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এসম্বন্ধে বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য-ভক্তি-প্রীতির —অর্জ্জুনের সখ্যপ্রীতির—এবং শ্রীরুক্মিণীর মধুর প্রীতির সঙ্কোচের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলা রতি এই ত্রিবিধ সম্বন্ধের মমতা হ্রাস না করিয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি করে, ঐশ্বর্য্যের প্রভাব

আসল কথা এই যে রস ব্যাপারটা যে কি, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার বেশী সন্ধান জানিতেন না। রস মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি। সুতরাং ইয়োরোপীয় কাব্যাদিতে রসের অঙ্গবিশেষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইলেও ভারতবাসীরা স্বীয় কাব্যে উহার যেরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগতের আর কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। ভারতবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরা এই রসের চরমতত্ত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণই এ সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয়। রসাত্মা রসরাজকে বা "রসোবৈ সঃ" পদার্থকে কিরূপ ভাবে ভজন করিতে হয়, বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই জগতে প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহারই প্রামাণিক গ্রন্থ।

তড়িল্লেখার ন্যায় কচিৎ কুত্রচিৎ প্রাদুর্ভূত হইলেও উহা তৎক্ষণাৎ মমতার সুপ্রসন্ন নীলাকাশে সহসা মিলিত হইয়া যায়। মমতাই মাধুর্য্যের প্রসূতি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাবল্যে মমতার ভাগ হ্রাস হয়। উহার ফলে কৃষ্ণ-সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতারও হ্রাস হয়।

অতঃপরে শান্তাদি ভক্তিরসের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে অতি বিশদ ও সুবিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি রসগ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

শান্তঃ সমঃ স্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ॥
অনিত্যাদিনাশেষবস্তু নিঃসারতা তু যা।
পরমার্থস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥
পুণ্যাশ্রম হরিক্ষেত্র তীর্থরম্যাবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথাস্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্ব্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতাদয়াদয়ঃ॥

* * * *

নিরহঙ্কাররূপত্বাৎ দয়াবীরাদিরেষো নঃ॥

শান্তস্ত সর্ব্বপ্রকারেণাহঙ্কারপ্রশমৈকরূপত্বায় তত্রান্তর্ভাবমর্হতি। অতশ্চ নাগানন্দে শান্তরস-প্রধানত্বমপাস্তম্। নতু

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা
ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা
রস সঃ শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ
সর্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ।

ইত্যেবং রূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপাপত্তি লক্ষণায়াং

প্রাদুর্ভাবাৎ তত্রসঞ্চার্য্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্ব মিত্যুচ্যতে? যুক্তবিযুক্ত-দশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ স এব যতঃ। রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্য্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে এসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের শান্তিরসের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে।

শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা।

শ্রীভগবানে রতি মাত্রেরই রসত্ব স্বীকার্য্য। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন— আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধির নামই শম, যথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ে:—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষোজিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ১১।১৯।৩৬॥

শ্রীধর স্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন:—

শমোমন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে—র্নতু শান্তিমাত্রম্।

শ্রীভগবানে নিষ্ঠা উপজাত না হইলে কেবল শান্তিমাত্রই শম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ বীররাঘব শ্রীমদ্ভাগবতের স্বকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা টীকাতেও শ্রীধরেরই প্রতিধ্বনি করিয়া রাখিয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণতৃষ্ণা ব্যতীত শান্তরসের ভক্তগণ অন্য সকলপ্রকার তৃষ্ণাই ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহারা স্বর্গ এবং মোক্ষকেও নরক বলিয়া মনে করেন। শান্ত ভক্তগণের মধ্যে দুইটী প্রধানতম গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই:—(১)প্রবলতম কৃষ্ণনিষ্ঠা। (২) কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগ।

ভক্তমাত্রেই এই দুই গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই দুইটি গুণ দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রতিতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং শান্তরতি মধুর রতিতেও বর্ত্তমান। কিন্তু শান্তরতিতে মধুর রতি নাই।

শান্তরসে শ্রীভগবানের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান উপজাত হয় এবং তদনুশীলনে ভগবন্নিষ্ঠা জন্মে। দাস্যভক্তি রসে শ্রীভগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রভু বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। কৃষ্ণের সুখার্থে দাস্যরসের ভক্তগণ কৃষ্ণদাসরূপে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। দাস্যে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা আছে অধিকন্তু শান্তে সেবার ভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দাস্যে সেই ভাবটাই বিশিষ্টতা। সুতরাং দাস্য-রসে দুই গুণ। সখ্য-ভক্তিরস বিশ্রম্ভ প্রধান, সুতরাং উহা গৌরব সম্ভ্রম বিবর্জ্জিত, সখ্যরসের ভক্তগণ কৃষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন এবং কখনও বা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করেন। ইঁহারা কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলেন, কৃষ্ণও ইঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন। সখ্য ভক্তগণ কৃষ্ণকে আপন সমজ্ঞান করেন। সখ্যরসে মমতার যথেষ্ট আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ বিদ্যমান থাকে।

বাৎসল্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার অল্প কথায় অতি সারগর্ভ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥

মধুররসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতির গুণ বিদ্যমান থাকে যথা :—

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥

আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই কথা লিখিত হইয়াছে যথা :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মধুর রসের আশ্রয়ে অর্থাৎ মধুর রসের ভক্তে শান্তের ভগবন্নিষ্ঠা, দাসের দাস্য-সেবা, সখার সখ্য, পিতামাতার বাৎসল্য এই সকল প্রকার সেবাই পরিলক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ মধুরা রতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় উজ্জ্বল নীল-মণি গ্রন্থে মধুরা রতির অশেষ বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। ভজনের পরিপাকদশা, প্রেমের চরম অবস্থায় মধুরারতির অনুশীলনই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে মধুরাভক্তিকে ভক্তিরস-রাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্য, রসের বর্ণনায় মধুর রসের অতিগূঢ়তা-নিবন্ধন তৎতৎ অধিকারীদের জন্য এই গ্রন্থে উহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই রসের অপর নাম উজ্জ্বলরস। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধগুণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নায়ক লক্ষণ যথা :—অনুকূল, ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট প্রভৃতি নায়ক-লক্ষণ লেখা হইয়াছে। নায়ক

সহায় বিট, বিদূষক, পিঠমর্দ্দ, প্রিয় সখা নর্ম্মসখা প্রভৃতি ; কন্যকা পরোঢ়া, সাধনপরা, যৌথিক্য, মুনি, উপনিষদ্, দেবীগণ এবং নিত্য প্রিয়াদের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের বহুগুণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,এই গ্রন্থেও তেমনি শ্রীরাধিকার বহুগুণ-বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। নায়িকাদের সম্বন্ধে বহু লক্ষণ এই গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়, যথা—মুগ্ধা, মধ্যা, ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, প্রগল্ভা, ধীরাপ্রগল্ভা, অধীরা, প্রগল্ভা, ধীরাধীর প্রগল্ভা প্রভৃতি নায়িকার বিষয় সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নায়িকার অষ্টাবস্থা যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, উত্তমা মধ্যমা কনিষ্ঠা নায়িকা এবং মৃদুত্বপ্রখরা নায়িকা দূতিপ্রকরণ, যাচ্ঞা, অঙ্গলক্ষণ, ভাবলক্ষণ, ইন্দ্রিয়-লক্ষণ, চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন দূতীর প্রকরণ, সখী-প্রকরণ, দৌত্যকার্য্য, সখী-কার্য্য, সুহৃৎপক্ষ, অসুহৃৎপক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য্য, লাবণ্য, বিবিধ প্রকার নিত্য ভাবহাব হেলা প্রভৃতি নায়িকালঙ্কার, নায়িকাদের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, নায়িকাগণের সঞ্চারীভাব, সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থাবিচার, স্নেহ মান প্রণয় বিচার, নীলিমা প্রভৃতি রাগ বিচার, অনুরাগভাব, রূঢ়ভাব, মহাভাব প্রভৃতির লক্ষণ, নিমেষ-অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ় মহাভাব, মোদন, মাদন, মোহন, দিব্যো-ন্মাদের বিবিধ লক্ষণ, নানাপ্রকার জল্প-বর্ণন, বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, দশ দশা, অভিমান, মান-বিচার, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সম্ভোগ, স্বপ্ন, গোষ্ঠী, নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং নায়ক নায়িকার রস-মাধুর্য্যময় ভাবোত্থ বিবিধ-প্রকার দৈহিক, বাচিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক বিবিধ চেষ্টাও রসাভি-ব্যক্তি ইত্যাদি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীরূপের শিক্ষায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই। যে সকল ভক্ত ব্রজের কামাত্মিকা-ভাবাত্মিকা ও রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করেন তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থে আলোচিত

বিষয়ানুসরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই সকল বিষয় অতি গূঢ় ও প্রগাঢ় রসপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য উপদেশ করা হয় নাই। শ্রীরূপের রচিত নাটকদ্বয় সমালোচনায় সেই সকল রসমাধুর্য্যে সিন্ধুর বিন্দু বিন্দু কচিৎ ভগবৎইচ্ছায় আলোচিত হইতে পারে। জন সাধারণের পক্ষে ভক্তজনোচিত ভাবের সাধনাই মঙ্গলজনক। সুতরাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-প্রতিপাদ্যভক্তি পথই জনসাধারণের অনুসরণীয়। শ্রীপাদরূপ বলেন :—বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবৎ নতু কৃষ্ণবৎ" গ্রন্থের এই অংশে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবৃতি আলোচনা করা হইল। সাধন ভক্তির বিবিধ বিষয় শ্রীরামানন্দ গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা-কীর্ত্তনই শ্রীপাদরূপের শিক্ষার প্রধানতম মুখ্য অঙ্গ। এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

কাব্য-মাধুরী।

শ্রীরূপ শৃঙ্গাররস-কাব্যের মহাকবি। চরিত-কথায় শ্রীরূপের কাব্য গ্রন্থাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরূপের কাব্য-রসমাধুর্য্যের আস্বাদন বহু সুকৃতির ফল। সে সৌভাগ্য আমাদের নাই। সিদ্ধমহা-পুরুষ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপের কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতাভাস দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার লোভের উদয় হয়। নিজের শক্তি-সামর্থ্যের বিচার সেই লোভে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অবশেষে নির্লজ্জবৎ এরূপ কার্য্যে দুঃসাহসিক হইয়া প্রবৃত্ত হই। অপ্রাকৃত ধামের রসমাধুর্য্য প্রাকৃত জীবের অত্যন্ত দুর্বিভাব্য, তথাপি শ্রীপাদ কবিরাজের আস্বাদিত মহামাধুর্য্যের" প্রসাদ-কণা আত্মতৃপ্তির জন্য কিঞ্চিদাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ একটী পদ্যের কথাই বলিতেছি।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া ব্রহ্ম হরিদাসের ভজনকুটীরে আশ্রয় লইলেন। কিয়দ্দিন পরে রথযাত্রার সময় আসিল, সমগ্র জগন্নাথক্ষেত্র সে আনন্দে মাতিয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়জনগণ শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইলেন, কীর্ত্তনানন্দে শ্রীধাম মুখরিত হইয়া উঠিলেন, মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ মহাকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। প্রথমতঃ শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইতেছিল। মহাপ্রভু নাম-কীর্ত্তনে কিয়ৎক্ষণ শ্রীনামানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন; সেই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যের সময় শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন, প্রভুর নয়নযুগল রথস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে বিভোর,—এই অবস্থায় তিনি গাহিতেছিলেন,—

সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।

এই ধুয়া ধরিয়া প্রভু গাহিতে এবং নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে বাহ্যজ্ঞান হারা হইলেন এবং সেই অবস্থায় একটী কবিতা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে পদ্যটী এই :—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

এই পদ্যটী কাব্য-প্রকাশে লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে,—কোন নায়িকা নর্ম্মদা-নদীতটে, ক্রীড়ন-নিমিত্ত তৎস্থানের-প্রতি সমুৎসুকা হইয়া গৃহে নিজ সখীকে কহিয়াছিলেন, যিনি "কৌমার হর" তিনিই আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই এখন আমার পতি"। এখনও সেই সময়ের সেই চৈত্ররজনী, সেই মালতী কুসুমের সুগন্ধবাহি কদম্ববনবায়ু

বিদ্যমান থাকাতেও আমার চিত্ত সুরত-ব্যাপারলীলা-বিষয়ে সেই নর্ম্মদা-তটের বেতসী-তরুতলের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ সেই স্থান অভিলাষ করিতেছে।

গান গাহিতে গাহিতে প্রভু এই পদ্যটী উচ্চারণ করিতেছেন কেন, ভক্তগণের মধ্যে কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, প্রভুর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরূপ, প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই পদ্য নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল, মহাপ্রভু গম্ভীরা মন্দিরে আগমন করিলেন, ভক্তগণ আপন আপন বাসায় গমন করিলেন। শ্রীরূপ, ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরে আসিয়া একখানি তালপত্র লইয়া কিছু লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে, তালপত্রখানি ভাঁজ করিয়া ঘরের বারেন্দার চালায় গুঁজিয়া রাখিলেন এবং স্নানার্থে সমুদ্রতটে গমন করিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভু তাঁহার প্রাত্যাহিক নিয়মানুসারে হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহার কুটীরে আসিয়া দৈবাৎ চালার দিকে চাহিয়া সেই গোঁজা তালপত্র দেখিতে পাইলেন এবং উহা খুলিয়া শ্রীরূপের লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া আবিষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িলেন। ইতোমধ্যে শ্রীরূপ, কুটিরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু সানন্দে শ্রীরূপকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তুই আমার মনের কথা কি ভাবে জানিলি? আমি যে "যঃ কৌমারহর" শ্লোক পড়িতেছিলাম, সে শ্লোকের অর্থ এক স্বরূপ ভিন্ন আর কেহ তো জানে না। স্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, স্বরূপ, রূপ আমার মনের কথা কি ভাবে জানিল? স্বরূপ বলিলেন, "যখন তোমার মনের কথা শ্রীরূপ জানিতে পারিয়াছেন, নিশ্চয়ই শ্রীরূপ তোমার কৃপাভাজন।" প্রভু বলিলেন, প্রয়াগে যখন রূপের সহিত আমার দেখা হইল, তখন উহার চরিত্রে আমি সন্তুষ্ট

হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলাম। ব্রজের উজ্জ্বল রস-বিচারে শ্রীরূপ যোগ্য পাত্র। তুমিও ইহাঁকে রস-ব্যাখ্যান শুনাইও। স্বরূপ বলিলেন, শ্রীরূপের এই শ্লোক দেখিয়াই আমি তোমার কৃপার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। শ্লোকটী এই :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ।
তথাহং সা রাধা-তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চম-জুষে,
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইয়া, শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, ওগো সহচরি, সেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমি সেই রাধা, সেই এই উভয়ের সঙ্গমসুখ, তথাপি যেখানে মধুর মুরলী পঞ্চম স্বরে রব করে,সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিনের জন্য মন অভিলাষ করিতেছে।"

কবিরাজ গোস্বামী ইহার ভাবার্থ লিখিয়াছেন :—শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন কিন্তু কালিন্দী-তটবর্ত্তী নিকুঞ্জ-নিবাসিনী শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্র-রাজধানীর বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার প্রাণরাম হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বৃন্দাবনের ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিতে লাগিলেন,—

রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে॥

মহাপ্রভু সুভদ্রার সহিত রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলেন কিন্তু মাথায় সেই চূড়া নাই, হাতে সেই বাঁশী নাই, সেই ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনের

গোবিন্দ মূর্ত্তি না দেখিয়া মহাপ্রভুর মন বিচলিত হইল। বৃন্দাবনের শ্যামল যমুনাতটে, শ্যামলবনে শ্যামল লতাকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের দর্শনে গোপীদের যে আনন্দ, রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর রথস্থ জগন্নাথের রূপে ও বৃন্দাবন-বন-শোভার কিছুই না দেখিয়া "যঃ কৌমারহরঃ" পদ্যটী আবৃত্তি করিতেছিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি পদ্যটী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর দৃষ্টির জন্য চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন।

স্থান-ভেদে ভাবোদ্দীপনার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের ইহাও একটী রীতি। অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই এস্থলে রসের বিষয়, শ্রীরাধা, মধুর রসের সমাশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, কিন্তু স্থানভেদে রসাস্বাদনের এত পার্থক্য হইল যে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য শ্রীরাধা উন্মাদিনীবৎ ব্যাকুল হইলেন, কুরুক্ষেত্রে সেই শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন পাইয়াও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না, তিনি সেই আনন্দ পাইলেন না। শ্রীবৃন্দাবনই শ্রীরাধাপ্রেমের উদ্দীপনা-স্থল। কালিন্দী-তটবর্ত্তী নিভৃত নিকুঞ্জে রসময় রসিকশেখর শ্যামসুন্দরের রাখালবেশ—হাতে বাঁশী,—মাথায় শিখিপুচ্ছ চূড়া, পরিধানে রাখালিয়া—ধটী; এই স্থান ও এই বেশ,—শ্রীমতী রাধার রসাস্বাদনের অনুকূল। রাজবেশ ও হাতীঘোড়া-পূর্ণ রাজপথে কোন ক্রমেই সে মাধুর্য্য-উদ্দীপনার অনুকূল নহে। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ের "আহুশ্চতে নলিননাভ" শ্লোক-টীতে গোপীদের মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অভিলাষবতী। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, যদি কৃষ্ণ বলেন যে তোমরা দ্বারকায় চল, সেখানে আমার নিত্য সম্ভোগ প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে গোপীদের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিতে পারিব না—আমরা শ্যামল যমুনার শ্যামল তটে কলকণ্ঠ বিহগ-কুজিত ললিত লবঙ্গ লতাদি-রচিত নিভৃত নিকুঞ্জে তোমার শিখিপুচ্ছ চূড়া

ও মোহন-মুরলী-বিভূষিত মধুময়ী শ্রীমূর্ত্তিতে যে আনন্দ পাই, দ্বারকার রাজধানীতে তোমার রাজবেশ দর্শনে কিছুতেই সে আনন্দ পাইব না—প্রাণেশ্বর এখান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চল।

শ্রীপাদ কবিরাজ বলিতেছেন,—

ভাগবতের এই শ্লোক গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

তথাহি শ্রীললিত-মাধবে দশমাঙ্কে ৩৬ শ্লোক :—

যা তে লীলাপদ পরিমলোদগারি বন্যাপরীতা ;
ধন্যা ক্ষৌণীবিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুবিহারম্॥

শ্যাম, সুন্দর তোমার দ্বারকাস্থ এই নব বৃন্দাবনে আমাদের কোনও স্ফূর্ত্তি নাই, কোনও উল্লাস উদ্যম আনন্দ নাই। মথুরা হইতে দেড়ক্রোশ দূরে যে শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে তুমি আমাদের সহিত রাসবিলাসাদি চিত্তাকর্ষি-লীলা করিয়াছিলা, আমরাও সেখানে চটুল চপল ও হিতাহিত বিবেক শূন্যা হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে হৃদয়ের পূর্ণ উল্লাস-উদ্যমে তোমার সহিত আমোদ উপভোগ করিয়াছি, চল সেই মধুময়ী লীলাবিহার ভূমিতে চল, সেখানে আবার সেইরূপ রাসলীলা দানলীলা নৌলীলাদি দ্বারা আমাদের সহিত সেই সকল বিহার কর—চল শ্রীবৃন্দাবনে চল। দ্বারকার এই নববৃন্দাবনে আমাদের কোনও সুখ নাই।"

শ্রীমতী ব্রজবালাদের এই ভাবাত্মক আমার রচিত একটী গান এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

"সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে মনোমাঝে কি বনমাঝে"
মোহন মুরলী মধুর তানে
পঞ্চমে যথা বাজে।

ফুটে ফুল রাশি পুঞ্জে পুঞ্জে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জে,
মঞ্জু কুঞ্জ বেড়িয়া বেড়িয়া
ময়ূর ময়ূরী নাচে।
কালিন্দী-পুলিন-বিপিন-মাঝে শ্যামল সুন্দর বঁধুয়া রাজে
শিখি পুচ্ছ চূড়া, ধটি কটি বেড়া,
হেরি ফুল ধনু পালায় লাজে।
ডাকছে বাঁশী আয় আয় আয়; আমার আপন যে আছিস যথায়
তোরা যে আমার অতি আপনার ;—
সাজে কিগো লোক লাজে।

এ মাধুর্য্য কোথাও নাই, শ্রীক্ষেত্রে নাই কুরুক্ষেত্রে নাই, দ্বারকায় নাই, বৈকুণ্ঠে নাই, মর্ত্ত্য ভূমেও নাই, পরব্যোমেও নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী, তিনি আছেনও সর্ব্বত্র—কিন্তু এই মাধুর্য্যটি কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই আছে। ব্রজের ব্রজকিশোরীরা দ্বারকায় গিয়া রাজকন্যাও রাজমহিষী হইয়াছিলেন, সহস্র সহস্র গোপকুমারী দ্বারকায় বসুদেব সুতকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেন। সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী সেই সকলেই কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের সে মাধুরী কোথায়?

নীলাচলে এই ব্রজমাধুরী-আস্বাদন, শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অভিবাঞ্ছিত। শ্রীপাদরূপ মহাপ্রভুর এই মনোগত ভাব বুঝাইয়া মহাব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্ত পদ্যটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অনেক বৎসর পরে শ্রীললিত মাধবে আবার প্রকারান্তরে ঐ ভাব প্রতিধ্বনিত করিয়া আলোচিত পদ্যটির অবতারণা করিয়াছিলেন। গোপীপ্রেম, মাধুর্য্যের লব-লেশ হৃদয়ে উদিত না হইলে এ মাধুর্য্যের অনুসন্ধান পাওয়া অসম্ভব। সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য স্বর্ণসিন্ধুতে ইহা এক চমৎকার তরঙ্গরঙ্গ!!

বিদগ্ধ-মাধব নাটক

শ্রীরূপের লিখিত গ্রন্থ সমূহ ভক্তরসে পরিপূর্ণ। সে বিষয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত চরিত-কথায় বলিয়াছি। শ্রীরূপ-কৃত তিনখানি নাটকের মধ্যে শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটকখানি সর্ব্বপ্রথমে রচিত। গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থ-প্রণয়নের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধ মাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৫৮৯ সম্বৎগত হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী গোকুলে বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনা সমাপন করেন। শকাব্দ গণনায় ১৪৫৪ শক গত হইলে এই নাটক-বিরচন সমাপ্ত হয়। ১৪৫৫ শাকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ললিতমাধব নাটক লেখা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, যথা :—

নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দীনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ম্ ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥

শ্রীরূপ বলিতেছেন, চতুর্দ্দশ শত একোনষষ্ঠি শকাব্দীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবাসরে হরিপাদপদ্মে প্রণত হইয়া ভদ্রবনে আমি এই প্রবন্ধ সমাপন করিলাম।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বর্ষে বিদগ্ধ মাধব সমাপ্ত হয় এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানের চার বৎসর পরে ললিত মাধব নাটক রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। দানকেলী-ভাণিকা ইহার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই খানি নাটক রচনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট কালে আরম্ভ হয়। নীলাচলে শ্রীমদ্ ব্রহ্ম হরিদাসের ভজন-কুটীরে শ্রীরায় রামানন্দাদি পার্ষদ

সহকারে, শ্রীপাদ শ্রীরূপের নিজমুখে এই নাটকদ্বয়ের সূচনা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ করেন। ভক্ত সমাজে সেই সময়ে এই নাটকদ্বয়ের যে মধুময়ী সমালোচনা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় তাহার উল্লেখ আছে। এই নাটকদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধেও শ্রীচরিতামৃতে কিঞ্চিৎ রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥

শ্রীরূপ ব্রজধামে অবস্থানকালে একখানি নাটক লেখার সূচনা করিয়াছিলেন। উহার প্রধান প্রধান কতিপয় ঘটনার বর্ণনা-লিপি শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিবার সময় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই বার্ত্তা কেহই জানিতেন না কিন্তু প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীরূপ, লোক লোচনের অন্তরালে নীরব-নির্জ্জন-নিভৃতে থাকিয়া যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির তাহা অবিদিত ছিলনা। শ্রীরূপ একখানি নাটকে ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেমানন্দ-মাধুর্য্য-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীযশোদা-নন্দনকে দ্বারকায় অবস্থিত করাইয়া নাটকীয় ব্যাপারে বিরাজমান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ রস-বিরোধ হইত। শ্রীকৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই কিন্তু স্থান-গুণে লীলা ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈচিত্র্য ও ভাব-বৈবিধ্য অতি স্বাভাবিক। প্রেমাতিশয্যে ব্রজধামে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম; মথুরায় শ্রীদেবকী-নন্দন পূর্ণতর, দ্বারকায় তিনি পূর্ণ। লঘুভাগবতামৃতে এই সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার আছে। ঐ গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা-বর্ণনায় দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত যে একটী যামল বচন আছে তাহা এই :—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥

ইহার অর্থ এই যে, যদুকুল-সম্ভূত বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ভাববিচারে পৃথকবৎ প্রতীয়মান হন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পদও অন্যত্র গমন করেন না। এই সিদ্ধান্তটী লইয়া বহু বাদ বিচার আছে। প্রথমতঃই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন হইতে এক পদও অন্যত্র না যান তবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে এরূপ বিপুল বর্ণনা কি একবারেই অলীক ও কাল্পনিক? কিন্তু তাহাতো নহে। তবে এই সিদ্ধান্তের অর্থ কি? ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র গমনই বা গুরুতর হানির কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত হইলেও যোগ-মায়ার বা লীলাশক্তির অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্য্য প্রভাবে বিরহ সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায় ব্রজেন্দ্র নন্দনই কার্য্য-বিশেষ বা লীলাবিশেষ-সাধনার্থ মথুরায় ও দ্বারকায় গমন করেন, তাহাতে কি হানি হইতে পারে? এ সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক ভক্তগণের অলৌকিক সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেম-মাধুর্য্যময় শ্রীগোবিন্দের স্বয়ং রূপ নিত্য বিদ্যমান। অন্যত্র এই আকার, এই বেশ ও এই ভাব অতীব অস্বা-ভাবিক। যিনি সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের নেতা ও নিয়ন্তা, দ্বারকায় তাঁহার রাখালবেশ বিশিষ্ট স্বরূপ ধ্যানানুকূল নহে। আবার অপর পক্ষে আভীর পল্লীর রাখাল বালকের ক্ষত্রিয় রাজবেশও অযোগ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ভাবুকের ভাব-অনুসারে ভগবানের ধ্যানভেদ হইয়া থাকে। ভাব-ভেদেই ধ্যান-ভেদ হয়। এই নিমিত্ত ব্রজের মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময় স্থানে অধিষ্ঠিত করিলে ভাব-বিরোধ ও রস-বিরোধ ঘটে। সেই নিমিত্ত ভাব-রসাধীশ্বর আনন্দলীলা-রসময়-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের সতর্কতার জন্য এই উপদেশ করিলেন। শ্রীযশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিও না। অর্থাৎ ব্রজ রাখালকে মাধুর্য্য

ভূমি হইতে বাহির করিয়া দ্বারকার ঐশ্বর্য্যে স্থাপন করিও না। শ্রীবৃন্দাবনের বনশোভা, বিহগকুলের কলকূজন, শ্যামল যমুনার মৃদুলতরঙ্গ ময়ূর ময়ূরীর নিত্য নৃত্যরঙ্গের মধ্যে শিখিপুচ্ছ-মোহন-চূড়ালঙ্কৃত মোহন মুরলী ধারী, বন্যপত্রপুষ্পে পরিশোভিত মহামাধুর্য্যের শ্রীমূর্ত্তি, আর দ্বারকার রাজবেশ,—ইহাতে ভাবরসের অনন্ত পার্থক্য বর্ত্তমান। একস্থানের বস্তুকে অন্য স্থানে রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাব বিরোধ ও রস-বিরোধ একবারেই অনিবার্য্য। উহাতে স্বাভাবিকতা ভীষণরূপে বিনষ্ট হয়। দেবমন্দিরের নিরীহ ভক্ত পূজককে সৈনিক সিপাহীর বেশে সজ্জিত করিয়া দেবপূজার কুশাসনে উপবিষ্ট করাইলে উভয় পক্ষেই অশোভনীয় হয়। প্রেমার্ত্ত প্রেমবিবশ ঢল ঢল সজল নয়ন উদ্ভ্রান্ত প্রেমিককে সেই ভাবে ও সেই বেশে সমরাঙ্গনে রণরঙ্গের রুদ্রতালে নর্ত্তনের জন্য নিযুক্ত করিলে উহা অত্যন্ত শোচনীয় দৃশ্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং মহাপ্রভু শ্রীরূপকে অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই সারগর্ভ স্বল্পাক্ষর উপদেশ শ্রীরূপের নাটক বর্ণনার ঘটনা পরিবর্ত্তনের যুক্তিযুক্ত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

> এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
> রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্মিত হইলা॥
> পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
> জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল॥
> পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
> দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা।
> দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
> পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা॥

ইহাই বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের উৎপত্তি-রহস্য। প্রথমতঃ শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীরূপ ব্রহ্মহরিদাসের ভজন-কুটিরে বসিয়াগ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে হরিদাসকে দেখিবার জন্য এই কুটীরে আগমন করিতেন। তিনি একদিন আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরূপ কি এক গ্রন্থ লিখিতেছেন। শ্রীরূপের হস্ত হইতে একখানি পাতা তুলিয়া লইয়া বলিলেন শ্রীরূপ, "কি পুঁথি লিখিতেছ ? তোমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর যেন মুক্তার পঙ্‌ক্তি,"—এই বলিয়া সেই পাতাখানি পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে পড়িতে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, হরিদাস বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন, হরিদাস শুনিবে ? ইহা তোমারই প্রাণের কথা।" হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, শ্রীরূপ কি লিখিয়াছেন, প্রভু ? মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলেন :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥

হরিদাস শ্লোক শুনিয়া শ্লোকের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, বলিলেন,—কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সাধুমুখেও শুনিতে পাই। কিন্তু শ্রীনামের এমন মধুময় মহিমা আর কোথাও কখনও শুনি নাই। প্রভু, এ অতি চমৎকার নাম-মহিমা, অতি যথার্থ। কৃষ্ণনাম কোন লোকের মুখে একবার উচ্চারিত হইলেই মনে হয়, বিধাতা যদি কোটি কোটি মুখ প্রদান করিতেন তাহা হইলে কোটি মুখেও কৃষ্ণনাম করিয়া মনের তৃপ্তি হইত কিনা বলা যায় না,—নাম এতই মধুর ! কর্ণ-কুহরে এই দুই অক্ষর প্রবেশ করিলে নাম-সুধা-পানের জন্য কোটি কোটি কর্ণ পাইতে সাধ হয়। কাণের ভিতর দিয়া শ্রীনামসুধা-তরঙ্গ চিত্তপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া

যায়, চিত্ত সমস্ত জগৎ ভুলিয়া নামসুধায় মাতিয়া পড়ে। কোন্ অমৃত ছানিয়া কৃষ্ণ এই দুইটী অক্ষর রচিত হইয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই পদ্যটী শ্রীরূপ-কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌর্ণমাসীর উক্তি। ইনি নান্দীমুখীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রারম্ভে পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখীর কথোপ-কথনে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণানুরাগ সম্বন্ধে নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলেন দেবি, যখন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধা "কৃষ্ণ" এই নামটী শ্রবণ করেন, তখন রোমাঞ্চিতা হইয়া এক রমণীয় ভাব ধারণ করেন। কৃষ্ণনাম শুনিলেই সহসা তাঁহার এই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য-সূচক এই মাধুর্য্যময় পদ্যটী বলিয়াছিলেন। ভক্তিরসময় শ্রীরূপের কবিত্ব অজরস-সুধার অফুরন্ত প্রস্রবণ। ইহার আলোচনা করাও মহা সুকৃতির এবং মহাসৌভাগ্যের পরম অমৃতময় ফল। বাঙ্গালার সুবিখ্যাত কবি শ্রীমৎ যদুনন্দন দাস ঠাকুর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পদ্য-বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই শ্লোকটীর তৎকৃত পদ্য-বঙ্গানুবাদ এই :—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়য়ে অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহিব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা,
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥ ধ্রু॥
আপন মাধুরি-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে,
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম,
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥

কৃষ্ণ তু আঁধর দেখি, যুড়ায় তপত আঁখ,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম উনমাদ॥
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম,
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণ নাম,
এ যতুনন্দন দাস কয়॥

শ্রীরূপের এই শ্লোক শ্রবণের পর হইতেই ইঁহার গ্রন্থের শ্লোক-মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিতে এবং অপরকে আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভুর বলবতী বাসনা হয়। অন্য এক দিবস তিনি সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ এবং স্বরূপাদি সহচরগণ সহ শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইবার জন্য হরিদাসের ভজন-কুটীরে আগমন করিলেন, পথে পথে শ্রীরূপের গুণ ইঁহাদের নিকটে সবিশেষরূপে বলিয়াছিলেন। যথাসময়ে ইঁহারা হরিদাসের ভজন-কুটিরে আগমন করিলেন, সহচরগণ সহ মহাপ্রভু পিণ্ডার উপরে উপবিষ্ট হইলেন, শ্রীরূপ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অনুরোধ-সত্ত্বেও পিণ্ডার উপরে না বসিয়া বিনয় নম্রভাবে পিণ্ডার তলে বসিয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, তোমার সেই "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" পঁগুটী পাঠ কর। রূপ স্বভাবতঃ অতি লজ্জিত ছিলেন, তাঁহার উপরে আজ আবার সুবিজ্ঞ পরমভক্তগণের সমাগম। শ্রীরূপ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন,

কোনও কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। শ্রীপাদস্বরূপ, রূপের শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

অতঃপরে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে তাঁহার লিখিতব্য নাটকের সেই "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন। লজ্জাশীল শ্রীরূপ কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া শ্রীরূপ "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটী পাঠ করিলেন। শ্রীমৎ রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীরূপের রচিত শ্লোক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, নাম-মাহাত্ম্য শ্লোক অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি কিন্তু এমন মধুর নাম-মহিমা আর কখনও শুনি নাই। শ্রীরায় রামানন্দ বলিলেন, শ্রীপাদ, আপনার কোন্ গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তপূর্ণ সুমধুর নাম-মাহাত্ম্যটী আছে? শ্রীরূপ ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ইনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা ও দ্বারকালীলা এক গ্রন্থে বর্ণনা করিতে ইঁহার অভিপ্রায় ছিল, সেইরূপ লিখিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় এখন উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইখানি নাটক লিখিতেছেন :—

বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥

শ্রীপাদ রামানন্দ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ইহা অতীব আনন্দের কথা। শ্রীপাদ, আপনি আপনার কৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকের নান্দী-শ্লোকটী একবার পাঠ করুন ;— আমরা সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইব। শ্রীরূপ অতি মৃদু মধুর কণ্ঠে সলজ্জ নয়নে বদন অবনত করিয়া পড়িলেন :—

সুধানাং চান্দ্রীনামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরি-লীলা-শিখরিণী ॥

গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের শিষ্ট ব্যবহার অনুসারে বিদগ্ধ মাধব নাটকের এই নান্দী পদ্য-পাঠ শুনিয়া ভক্তশ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিলেন। নিদারুণ নিদাঘে তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা প্রায় সকলেই জানেন। ইহা দৈহিক তৃষ্ণার কথা। এই বিষম সংসারে ভীষণ নিদাঘে আমাদের হৃদয়ে সময়ে সময়ে অতি বলবতী তৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। উহা দৈহিক তৃষ্ণা। সুরস, সুমিষ্ট শিখরিণী নামক পানীয় দ্রব্যে সে তৃষ্ণার শান্তি হয় কিন্তু নিদারুণ সংসারে অনন্ত বাসনাময়ী তৃষ্ণা-প্রশমনের জন্য হরিলীলা-রূপ-শিখরিণী একমাত্র উপায়। সেই জন্য সাধক-সুহৃৎ প্রেমিক কবি বলিতেছেন,—যে হরিলীলা-শিখরিণী চন্দ্র সুধার মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কার দমনকারিণী এবং রাধাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্যধারিণী, তিনি তোমার নিরন্তর অধ্যাত্মি-কাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারিণী সংসার-পদবী ভ্রমণ-জনিত-তৃষ্ণা হরণ করুন।” রসময়ী মধুময়ী ও আনন্দময়ী হরিলীলা ভিন্ন তৃষিত হৃদয়ে শান্তিদায়িনী আর কিছুই নাই। নরনারী মাত্রেই ত্রিতাপের কশাঘাতে সততই ক্লেশ ভোগ করে। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার লীলাই জীব-গণের অনর্থ প্রশমন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী লীলার ন্যায় জীবের ভবতৃষ্ণা-হারিণী আর দ্বিতীয় নাই। সুকবি, নান্দী শ্লোকেই সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের জন্য নাটকাকারে যে লীলা-রস-শিখরিণী ভব-তৃষ্ণা-তৃষিত জীবের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য সামাজিক মাত্রেই তাঁহার নিকটে চিরঋণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

নাটকে প্রস্তাবনার প্রারম্ভে মঙ্গলসূচক যে পদটী বিরচিত হয় তাহার নাম নান্দী। নান্দীতে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তু-নির্দ্দেশ উদ্দিষ্ট হয়। এই পদ্যটী আশীর্ব্বাদসূচক। ইহা জীবের বাসনাজনিত তৃষ্ণার শান্তিকারক।

নান্দী প্রায়শঃই অষ্টপদা, দশপদা কিম্বা দ্বাদশপদযুক্তা হইয়া থাকে। এই পদ্যটীতে দ্বাদশটী পদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নান্দী-লক্ষণানুসারে চন্দ্র নামে অঙ্কিত এবং মঙ্গলার্থ পদদ্বারা উজ্জ্বলিত করিয়া নান্দী লিখিত হয়। নাটকে ত্রিবিধ রূপ নায়কের একতম নায়ক থাকা সুসঙ্গত। এই নাটকে ধীরোদাত্ত ও লালিত্য গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নায়ক। সুতরাং নাটকীয় লক্ষণানুসারে এমন নায়ক আর ত কেহই হইতে পারে না? লালিত্য এবং উদাত্তগুণের সমধিক ও প্রচুর শোভা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সম্যক বিরাজমান এবং শৃঙ্গার-রস-প্রধান এই নাটকের শ্রীকৃষ্ণই উপযুক্ত নায়ক। নাটকের তিন প্রকার ইতঃবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—খ্যাত, ক্লিপ্ত এবং মিশ্র। এই তিনের মধ্যে ক্লিপ্তই রমণীয়। যাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ তাহাই খ্যাত, এবং যাহা সুকবি-কল্পিত ও বিরচিত, তাহাই ক্লিপ্ত। বিদগ্ধমাধব নাটকখানির ইতঃবৃত্ত কল্পনায় গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তির অতি নিপুণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সাতটী অঙ্কের প্রত্যেক অঙ্কে নানাবিধ কল্পনাকুশলতায় নাটকখানিকে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধক করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে—বেণুনাদবিলাস, দ্বিতীয়-অঙ্ক—মন্মথলেখ, তৃতীয় অঙ্কে—রাধা-সঙ্গম, চতুর্থ অঙ্কে—বেণুহরণ, পঞ্চম অঙ্কে—শ্রীরাধা-প্রসাদন, ষষ্ঠ অঙ্কে—শরদ্বিহার এবং সপ্তম অঙ্কে—গৌরীতীর্থ-বিহার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একতঃ শ্রীরূপের কবিত্ব-মাধুর্য্য, দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের অনন্ত সৌন্দর্য্যময় রসসিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গ,—উজ্জ্বলে মধুরে অতি অপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারজনক উপভোগ্য বস্তু এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে নায়ক,—শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা-সর্ব্বনায়িকা ললামভূতা-মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী।

অতঃপর শ্রীরাম রায় বলিলেন, আপনার ইষ্টদেব-বর্ণন পাঠ করুন। শ্রীরূপ আগ্রহের সহিত উহা বলিতে আরম্ভ করিয়াও কুণ্ঠিত হইলেন

তাঁহার সঙ্কোচের কারণ এই যে, পাছে প্রভু বা কি মনে করেন। সদাশয় সরল প্রভু বলিলেন, সঙ্কোচের কারণ কি, লজ্জারই বা কারণ কি? বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থের পদ শুনাইতে কোন সঙ্কোচ বা লজ্জার কারণ নাই। তুমি ইষ্টদেব বর্ণন-শ্লোক পাঠ কর। তখন শ্রীরূপ সানন্দচিত্তে পড়িতে লাগিলেন :—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী স্বকীয়ভক্তি জগতে অপ্রচারিত ছিল। জীবদিগকে সেই উজ্জ্বলভক্তি প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন, সেই স্বর্ণকান্তি সমুজ্জ্বল কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি আমার হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন।

শ্রীরূপের শ্লোক পাঠ শেষ হইতে না হইতেই, মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট ভাবে রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি স্তুতি,—অতি স্তুতি! ভক্তগণ উচ্চস্বরে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি ঠিক্,—অতি ঠিক্। মহাপ্রভুর বাক্য ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহলে ডুবিয়া গেল, তাঁহারা শ্রীপাদ রূপকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধন্য আপনার কবিত্ব, যেমন মধুর তেমনই মহাসত্য। এ শ্লোক শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।" শ্রীরূপ করযোড়ে ভক্তগণ-সমক্ষে স্বীয় দীনতা প্রকাশ করিলেন

অতঃপরে রায় মহাশয় শ্রীপাদ রূপের নিকট অপর প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, আপনি কোন্ মুখে পাত্র-সন্নিধান করিয়াছেন।" শ্রীরূপ বলিলেন, কালসাম্যে প্রবর্ত্তকমুখে এই নাটকের পাত্র-সন্নিধান করা হইয়াছে। এই স্থলটী সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে একটুকু কঠিন মনে

হইতে পারে কিন্তু মহাপ্রভুর এবং তৎপ্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপের কৃপায় সে কাঠিন্ম এখনই সহজ হইবে। আমুখ শব্দটী নাটকীর পরিভাষা। সূত্রধার নটীর প্রতি যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই আমুখ। উহাতে প্রস্তাবিত বিষয় বাক্য বৈচিত্র্যসহ সূচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সূত্রধার নটীর নিকট স্বীয় প্রস্তাবনার বাক্য-বৈচিত্র্যের সহিত প্রকাশ করেন, উহাই আমুখ নামে কথিত হয়। এই আমুখ তিন প্রকার—কথোদ্ঘাত, প্রবর্ত্তক ও প্রয়োগাতিশয়। এস্থলে প্রবর্ত্তক আমুখই পাঠকগণের জ্ঞাতব্য। সূত্রধার বলিলেন, কোন কালের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি কাল-বর্ণনার মধ্যে কালের সমতায় পাত্রকে (অভিনেতাকে) রঙ্গস্থলে আনয়ন করাহয় এবং সেই বর্ননা-কৌশলে অভিনেতা রঙ্গস্থলে আনীত হন, তবে সেই আমুখ 'কালসাম্যে প্রবর্ত্তক' নামে অভিহিত হয়। এস্থলে শ্রীপাদ নাটককার প্রবর্ত্তকামুখেই পাত্র-সন্নিধান করিয়াছেন, যথা :—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহরাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥

"সেই বসন্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গুপ্তগ্রহা পৌর্ণমাসী (পুর্ণিমা তিথি) শোভা সম্পাদনার্থ রজনীতে পূর্ণতমীশ্বরকে (পূর্ণচন্দ্রকে) লাবণ্যবতী রাধার সহিত (বিশাখা নক্ষত্রের সহিত) মিলিত করিবেন।"

শ্লেষ পক্ষে :—সেই বসন্ত কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে রজনীতে পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করিবেন।

এস্থলে প্রবৃত্তকাল-বর্ণনের সাদৃশ্যাবলম্বনে পাত্রের প্রবেশ নির্ণীত হইয়াছে। এই বর্ণনায় শ্লেষ আছে। শ্লেষের দ্বারা সূত্রধারের বাক্যে চমৎকারত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পৌর্ণমাসীর আগমনই এখানে লক্ষ্য। সূত্রধার শ্লিষ্টার্থে কালসাম্য দেখাইয়া পূর্ণিমা রজনীর পৌর্ণমাসী পদ দ্বারা পূর্ণিমা তিথি যোগমায়াকে বুঝাইয়াছেন। পূর্ণতমীশ্বরপদে পূর্ণ-চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়াছেন; রাধা শব্দ দ্বারা শ্রীরাধা ও বিশাখা নক্ষত্র উভয়কেই বুঝাইয়াছেন। ফলতঃ এই প্রবর্ত্তনা-মুখদ্বারা বাক্য কৌশলে পৌর্ণমাসী যোগমায়াকে রঙ্গস্থলে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের চমৎকারীত্ব সর্ব্বাংশেই প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপরে রায় মহাশয় প্ররোচনাদির কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরূপ তখন আর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন যথা:—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লবধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে বৃন্দাটবী গর্ভভূ
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডল পরিপাকোঽয় মুন্মীলতি॥

স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চরিত্রবিশিষ্ট ভক্তবর্গ এইস্থানে উপস্থিত হইয়া-ছেন। এই নাটকও গোপবধূবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। রাসস্থলী রঙ্গস্থলীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, আমার মত ব্যক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল।

ইহাই এই নাটকের প্ররোচনা। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে, —"প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্তান্মুখীকরণং,—প্ররোচনা।" প্রসংসা দ্বারা প্রস্তাবিত অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তি উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে। এস্থলে নাটকের নায়ক,—শ্রীকৃষ্ণ; শ্রোতা,—উজ্জ্বল চরিত্রবান্ ভক্তবর্গ; স্থান,—রাসস্থলী। গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সুচরিত দ্বারা এই নাটক অলঙ্কৃত,—ইহার সকলই সামাজিকদিগের চিত্ত-

বৃত্তি অভিনয়ের প্রতি উন্মুখ করণে সমর্থ। প্ররোচনার আর একটী পদ্য অতি সুন্দর। এইটী প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ শ্লোক।

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্যজনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ কলুষতাম্॥

"হে সুহৃদয় সভ্যবৃন্দ, আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ হইলেও আমা হইতে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবে। অতি নীচজাতি পুলিন্দও যদি কাষ্ঠ সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সে অগ্নি স্বর্ণরাশির অন্তর্মল অপহরণ করে না কি?"

শ্রীপাদ রূপের নাটকে বহু বহু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তময় পদ্য বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই সকল পদ্য একদিকে যেমন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়, অপরদিকে তেমনই ভক্তি-সিদ্ধান্তের পূর্ণতম মহাভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার হইতে শ্রীপাদ রূপের সম সাময়িক এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ প্রচুর ভব-রূপ মূলধন সংগ্রহ করিয়া আপন আপন গ্রন্থ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। সময় ও সুবিধা বুঝিয়া অবান্তর ভাবে এই নাটক পরীক্ষা কালে দুই একটী বহির্বিষয়ও উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে প্রীতি-উপহার রূপে প্রদান করিব। উদাহরণরূপে একটী পদ্য এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। সূত্রধার বলিতেছেন, এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই মনে আশঙ্কা হইতেছে। রস-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হয়ত এই অভিনয় বুঝিতে না পারিয়া ইহার প্রতি বিমুখ হইবেন। ইহা শুনিয়া সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই :—

উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ
কৃতৌ তবাস্মিন্ রসিকাঃ স্ফুরন্তি।

ক্রমেণকৈঃ কামমুপেক্ষিতেঽপি
পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে :—

অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি করিতে ভয় সে যদি না শুনে।
ইহাঁ বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥

যাহাহউক রায় রামানন্দ এবার ব্রজ-রসের অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্বের কথা উত্থাপন করিলেন, যথা—প্রেমোৎপত্তির হেতু—পূর্ব্বরাগ, বিকার-চেষ্টা, কামলেখ ইত্যাদি। শ্রীচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়, ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটক হইতে সার-গর্ভ বহুল পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহা ভক্তমাত্রেরই আস্বাদ্য।

শ্রীরাধিকার রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি গূঢ় গভীর বিষয় গুলি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় তদীয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলীতে উদাহরণরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই সকল পদ্য অতি সারগর্ভ। এস্থলে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত রসমাধুর্য্যময় শ্লোকগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

রায় মহাশয় বলিলেন শ্রীপাদরূপ, আপনি বিদগ্ধ মাধব নাটকে প্রেমোৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীরূপ বলিলেন, আপনার নিকট আমি অধিক আর কি বলিব ?

এখানে স্বয়ং ভগবান্ উপবিষ্ট আছেন, আপনারা সকলেই তাঁহার প্রিয় পার্ষদ এবং পরম বিদ্বান্। গ্রন্থে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমি নিবেদন করিতেছি। ভ্রমপ্রমাদ পরিশোধন করিলে আমি কৃতার্থ হইব। নিত্য-শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম যদিও উৎপন্ন হয় না, উহা চিরদিন আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু উদ্দীপনার কারণ উপস্থিত হইলেই প্রেম হৃদয়ে উত্থিত হয়। শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক হইতে শ্রীমতী রাধিকার অবস্থা বলা যাইতেছে। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি চেতনা অপেক্ষা মূর্চ্ছাকেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন সখি, এখন মলয়বায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, কোকিলগুলি তাহাদের স্বভাব-সুলভ ক্রীড়া পরায়ণ হইয়া সুমধুর শব্দ করুক। ইহাদের কার্য্যে আমার চেতনা বিনষ্ট হইবে। মূর্চ্ছিত হইলে চেতনাপেক্ষা আমি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিব। শ্রীমতীর এইভাব শ্রীপাদ গোস্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রভুতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, অবশেষে মূর্চ্ছিত হইতেন। পার্ষদগণ তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন,—

কেন বা জাগালে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥

শ্রীমতী রাধা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিতেছেন সখি, আমার হৃদয়-ব্যথার জন্য তোমারা ব্যাকুল হইয়াছ কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইবে না। এ ব্যথা বিমোচনের কোন উপায় নাই, ইহা চিকিৎসার অসাধ্য। আমি এখন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না। মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই।

ললিতা বিশাখা সমবেদনা জানাইয়া বলিলেন সখি, এরূপ কথা আমাদের নিকট বলিও না, উহা শুনিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমরা নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

শ্রীরাধা।—সখি, তোমরা এই মৃতপ্রায় রাধার হৃদয়-বেদনা জান না।

ললিতা ও বিশাখা। সখি, অমাদের নিকট সকলইত বলিয়াছ ?

শ্রীরাধা। না না সকল বলা হয় নাই ; বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, দারুণ লজ্জা আসিয়া বাধা দেওয়ায় সব কথা বলিতে পারি নাই।

ললিতা ও বিশাখা।—"রাধে আমরা জানি আত্মা অপেক্ষাই আমাদের প্রতি তোমার স্নেহ অধিক। আমাদের নিকট মনের কথা বলিতে লজ্জার বাধা মানিবে কেন ?

শ্রীরাধা। সখি, তাহাতে একটু লজ্জার কথা আছে বটে মনের কথা বলি, শুন :—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং।
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্ত বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

"সখি, মনোবেদনার কথা বলিতে লজ্জা হয়। আমি কুলবধূ, সহসা একদিন কোন পুরুষের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শ্রবণ মাত্রেই আমার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, অন্তদিন, অন্ত পুরুষের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শুনিয়াই আমি যেন উন্মাদিনী হইলাম। আবার অপর এক দিন এই চিত্রপটস্থিত স্নিগ্ধ নবঘন কান্তি অপর একপুরুষের মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া পড়িল,আমি কিছুতেই তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। একি লজ্জার কথা! এ কি যাতনা! সেই কৃষ্ণ-নামশীল একজনে এবং মুরলী বাদক অন্য জনে এবং নবঘন স্নিগ্ধ শ্যামসুন্দর রূপ তৃতীয় পুরুষে,—আমার এক মন যুগপৎ এই তিন পুরুষে আকৃষ্ট হইল, একি লজ্জার কথা! ইহা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল ; বল দেখি এখন আমি কি করি ?"

শ্রীপাদ রূপ-রচিত এই পূর্ব্বরাগ লক্ষণের অতি চমৎকার রসপূর্ণ পদ্যটী অবলম্বনে বাঙ্গালার কোন কোন পদকর্ত্তা অতি সুন্দর সুন্দর পদ গান

রচনা করিয়াছেন। এস্থলে বিদগ্ধ মাধব নাটকের পদ্যানুবাদক শ্রীমৎ-যদুনন্দন দাস ঠাকুরের পদ্যটী প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

কৃষ্ণ দুআঁখর, অতি মনোহর,
পহিলে শুনিল কার।
তাহে গরাসল, মতি যে সকল,
ধরম করম আর॥
সই গো কহিল এ তোহে সার।
এ তিন পুরুষে চিতের আরতি,
কি কাজ জীবনে আর॥ ধ্রু॥
আন পুরুষের, বংশী মনোহর,
শুনিল মধুর গান।
তাতে পরমাদ, চিত উনমাদ,
আন না শুনয়ে কান॥
এ চিত্র পটেতে নবীন মূরত,
নব ঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে, পরম হরষে,
মগ্ন ভেল মন জনু॥
এ সব শুনিয়া, সখীগণ হিয়া,
হরষ পায়ল অতি।
এ যদু নন্দন, দাস তঁহি ভণ,
ভালে সে চিন্তিত মতি॥

সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা অমর কবি গোবিন্দ দাসও এইরূপ একটী পদ লিখিয়াছেন :—

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥ ধ্রু॥

পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনি মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর যিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহাঁ যাহাঁ ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী
অতয়ে করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥

অতঃপরে ললিতা ও বিশাখা বলিলেন রাধে, এই ভাবিয়া তুমি লজ্জিত হইয়াছিলে? তোমার ন্যায় রমণীর পক্ষে গোকুলেন্দ্র-নন্দন শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে অনুরাগ কখনও কি সম্ভাবিত হয়? তবে শুন, তুমি যার নাম শুনেছ, বংশীধ্বনি শুনেছ এবং চিত্রপটে স্নিগ্ধ সজল-জলদ-রুচি শ্যাম সুন্দর-রূপ দেখেছ, সেই তিন জন ভিন্ন পুরুষ নহেন,—একই মহানাগর গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ।

শ্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, আবার তোমার জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল।"

ইহার পূর্ব্বে প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ শ্রীরাধার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন বিশাখা শ্রীমতী রাধিকাকে স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন :—

চিন্তাসন্ততিরন্ত রুন্ততি সখি স্বান্তস্য কিন্তে ধৃতিং
কিম্বা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতি স্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ॥

কন্দর্পচম্পক-গৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্য্যং কথং বা বলাৎ ॥
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥

সখি, তোমার হৃদয়ে কি যাতনা উপস্থিত হইয়াছে—বল, শুনি। আমার মনে হইতেছে যেন চিন্তার পরে চিন্তা আসিয়া তোমার হৃদয়ের ধৈর্য্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ঘামে ঘামে তোমার অঙ্গাবরণ ভিজিয়া গিয়াছে। ওগো চম্পকগৌরি, বল দেখি, তোমার দেহ কাঁপিতেছে কেন? তুমি ঠিক্ কথা বল। আপন জনের নিকট মনের ভাব গোপন করা ভাল নয়; তোমার কি হইয়াছে, ঠিক্ কথা বল।

শ্রীরাধা। নিষ্ঠুরে বিশাখে, তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? একথা বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?

বিশাখা। (শঙ্কার সহিত) সখি, কবে আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, তাহাতো স্মরণ হয় না!

শ্রীরাধা। নিষ্ঠুরে, কেন একথা বল; স্মরণ করিয়া দেখ।

বিশাখা। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কই আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।

শ্রীরাধা। উন্মাদিনি, তুমি আমাকে এই ভীষণ বনে অতি ভয়ানক অনঙ্গ কুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছ; এখন বলিতেছ, "স্মরণ হয় না"!

বিশাখা। সখি, কি প্রকারে?

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত) "ও রূপ করিয়া আর সরলতা দেখাইও না, ওগো চিত্রপটস্থ ভুজঙ্গিনি,—থাক, থাক।" এই বলিয়া শ্রীমতী যেন একটুকু বিবশের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'সেই মরকত রুচি-বিনিন্দি শিখি-শিখণ্ডধারী নব যুবা,—এই কথা বলিতে না বলিতেই বাক্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ললিতাও বিশাখা বিস্ময়ের সহিত পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরাধা অতি মৃতুস্বরে বলিলেন, আমার বোধ হইল চিত্র-পট হইতে ঐ যুবা বাহির হইয়া যেন আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে আমি উন্মাদিনী হইয়া পড়িলাম। এখন চন্দ্র আমার পক্ষে অনলস্বরূপ এবং অনলই চন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ললিতা বলিলেন মুগ্ধে, একি স্বপনের কথা ? শ্রীরাধা অধীরভাবে বলিতে লাগিলেন সখি, আমিতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কি ঐ রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, দিনে দেখিলাম, কি রাত্রে দেখিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। শ্যামচন্দ্রের সুধাক্ষরণে আমার বুদ্ধি যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। "বিশাখা বলিলেন, ইহা তোমার চিত্ত-বিভ্রমের ফল। এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিবে না।" বিশাখার এই উক্তিতে শ্রীরাধিকা দুঃখিত হইয়া আরও অনেক কথা বলিলেন।

এ সকলই পূর্ব্বরাগের লক্ষণ। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে :—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতে প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনিত যে রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন। এই অবস্থায় নানাপ্রকার চিত্ত-বিভ্রম ঘটে। সাত্ত্বিক বিকার ইহার আনুসঙ্গিক ফল। স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ। এই সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার যথা—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। প্রগাঢ় অনুরাগে চিত্ত-বিভ্রম অতি স্বাভাবিক। উত্তর রামচরিত নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত-বিভ্রমের একটী পদ্য আছে। শ্রীরাম-চন্দ্র বলিতেছেন, "প্রিয়তমে, তোমার স্পর্শে স্পর্শে প্রগাঢ় আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল এমন বিভোর হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কি সুখে আছি, কি দুঃখে আছি, একি জাগরণ কি নিদ্রা, একি আনন্দ-সুধা কিম্বা বিষ-বিসর্প,—আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ইহা প্রীতি-জনিত চিত্ত-বিভ্রমেরই লক্ষণ। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ-জনিত হৃদয়-যাতনা ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন সখি, আমার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর? এ রোগের প্রতিকার নাই।

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্য রাধা-হৃদয়-বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি॥

"সখি, রাধার এই হৃদয়-বেদনা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগ যখন দুঃসাধ্য হয় তখন চিকিৎসকগণ অপযশের ভয়ে তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন না, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারে ফলের আশা নাই।"

পৌর্ণমাসী ও মুখরার কথোপকথনে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ জনিত হৃদয়ের ভাব ও দৈহিক চেষ্টা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাম রায় যে পূর্ব্বরাগ জনিত বিকার চেষ্টা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পদ্যে তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে :—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটন-ক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ॥

মুখরা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, ভগবতি, শ্রীরাধার অবস্থা শ্রবণ করুন। শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূর-পুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্পিত হইয়া উঠে, গুঞ্জাপুঞ্জ দর্শন মাত্রেই মুহুর্মুহু সজল নয়নে চীৎকার করিতে থাকে। এই বালিকার চিত্ত ভূমিতে এক অদ্ভুৎ নটন-ক্রীড়া-চমৎকরিতা উৎপাদন করিয়া কোন্ এক নবীনগ্রহ ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতো বলিতে পারি না?

পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার নবানুরাগ-চেষ্টা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিলেন কিন্তু মুখরা বলিলেন "কংসানুচরী কোন স্ত্রী-গ্রহই হয়ত এই বালি-

কার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।" পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে সঙ্গোপনে বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। দুর্ব্বার-অনুরাগ-বীরের অতি দুর্ব্বোধ কোনও গভীর-বিক্রম-বৈচিত্র্য রাধার হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীরাধা কোনও প্রকারে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রভাব দেখ :—

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তি-লবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তি মাকাঙ্ক্ষতি॥

নান্দীমুখী, আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কি না তাঁহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে! হা কষ্ট! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তি-লেশ-নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিনা তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে।"

নান্দীমুখী বলিলেন "ভগবতি, শ্রীরাধার এই ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও অধিকার হইবে না। ইহার গূঢ় গভীর ভাব আমার বুদ্ধির অতীত। পৌর্ণমাসী বলিলেন, ঠিক্ বলিয়াছ। এই প্রগাঢ় অনুরাগ-বিবর্ত্ত প্রকৃতই বুদ্ধির দুর্গম। আমি আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

পীড়াভির্নবকাল-কূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন, সুন্দরি, নন্দ-নন্দন-নিষ্ঠ প্রেম

যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেইজন এই প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম অবগত হয় মাত্র, কিন্তু প্রেম বাচক-শব্দের অভাবপ্রযুক্ত সে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজনিত পীড়া উপস্থিত হয় তৎকালে এই প্রেম, নবকালকূটের কটুতা-গর্ব্ব নির্ব্বাসিত করে। আবার যখন কৃষ্ণ-সংযোগউপস্থিত হয় তখন উহা অমৃত-মাধুর্য্যের অহঙ্কার সঙ্কোচ করে।"

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন সখে, শ্রীরাধিকায় নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ মহিমা রহিয়াছে। মহাজ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় সহসা যেমন সমুদ্রজল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাপ্রবাহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, শ্রীরাধার দর্শনমাত্রেই আমার চিত্ত সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শন হইতেই আমি অভিনিবেশ দ্বারা শ্রীরাধাতে মহিমাধিক্য অনুভব করিয়াছি :—

> যত্র প্রকৃত্যা রতিরুত্তমানাং
> তত্রানুমেয়ঃ পরমোহনুভাবঃ।
> নৈসর্গিকী কৃষ্ণমৃগানুবৃত্তি
> র্দেশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশস্তিম্॥

উত্তম পুরুষদিগের স্বতঃই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে কোন পরম পদার্থ আছে এরূপ অনুমান করিতে হইবে, কারণ স্বভাবতঃই কৃষ্ণসার হরিণ যে দেশে বিচরণ করিয়া থাকে, সে দেশের প্রশস্ততা অবশ্যই অনুমিত হয়।

অতঃপরে ললিতা, মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। ললিতা শ্রীরাধা-রচিত কর্ণিকা-কুসুম-কোরক-পত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ করিয়া পত্রের প্রতিকূলে নৈরাশ্য-ভাব-সূচক কথা ললিতার নিকট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে কখনও নারী-বার্ত্তায় উন্মুখ হয় না, তথাপি যদি এই সকল স্বেচ্ছা-চারিণী গোপবালা এখানে আসিয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করেন, তবে বৃদ্ধ

গোপদিগকে এই সকল কথা নিশ্চয়ই আমাকে জানাইতে হইবে। ললিতা এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে শ্রীরাধার নিকটে প্রত্যাগমন করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার প্রত্যাগমনের পর নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন এবং অনুতাপ করিয়া বলেন :—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিম্বা পামরকাম-কার্ম্মুক-পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা।

আহা! সেই ইন্দুবদনা আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয়ত প্রেমাঙ্কুর ছেদন পূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করিয়া ব্যথিতা হইবেন, না হয় পামর কন্দর্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জ্জন করিবেন। হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, আমি মূঢ়তা প্রযুক্ত কোমল ফলবতী মনোরথ-লতাকে একবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম।"

অতঃপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও খেদ বর্ণিত হইয়াছে। বিশাখার নানা সান্ত্বনাতেও তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না। তিনি বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

যস্যোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী।

হে সখি, যাঁহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ সুখাশায় গুরুজন সকাশাৎ লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম তথাপি তোমাদিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্ ধর্ম্মকেও আমি গণনা করি নাই; হায়, এই পাপীয়সী আমি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত

হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার ধৈর্য্যকে ধিক্।" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীযত্নন্দন দাস ঠাকুর ইহার নিম্ন-লিখিত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, ইহাও অতি মধুর।

যার সঙ্গ-সুখ-আশে কৈনু ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশে,
তেয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ।
যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোর
দুঃখ দিলুঁ যাহার কারণ॥
সখি হে দূরেরহু ধৈরজ আমার।
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, তভু রহে পাপ প্রাণী,
কিবা চাহে করিবারে আর॥ ধ্রু॥
যাহার লাগিয়া সতী- ধর্ম্ম তেয়াগিনু অতি,
না গণিনু দুর্জ্জন বচন।
দুকূলে কলঙ্ক হৈল, তাহা নাহি মনে কৈল,
সে রূপে মগন কৈনু মন
যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জনা যত,
করিয়া লইনু হিয়া-হার।"
এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা পাইঞা সেই ঠাঞি,
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর॥
বিশাখা সম্ভ্রমে যাইঞা, তাঁরে কহে ধরি লঞা,
ধৈর্য্য হও,—না ভাব অসার।
ইহা শুনি পোড়ে মন, দাস যদুনন্দন,
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার॥

"বিশাখা ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলে ব্যবহৃত রঙ্গনফুলের মালা রাধিকার নাসায় অর্পণ করিয়া বলিলেন, সখি, স্থির হও, স্থির হও।" রঙ্গন মালার আঘ্রাণে শ্রীরাধা চেতনা পাইয়া বলিলেন, একি আশ্চর্য্য বস্তু! আমি

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহাতে আমার চেতনা হইল।" বিশাখা শ্রীরাধাকে মালা দিয়া বলিলেন :—

অঙ্গোত্তীর্ণবিলেপনং সখি সমাকৃষ্টিক্রিয়ায়াং মণি-
র্মন্ত্রো হন্ত মুহুর্বশীকৃতিবিধৌ নামাস্য বংশীপতেঃ॥
নির্মাল্যস্রগিয়ং মহৌষধিরিহ স্বান্তস্য সংমোহনে
নাসাং কস্তিস্রণাং গৃণাতি পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীম্॥

সখি, বংশীবদনের অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন আকর্ষণ ক্রিয়ায় মণিস্বরূপ নাম,—বশীকরণ-বিষয়ে মন্ত্রসদৃশ, আর এই নির্ম্মাল্য মালা অন্তঃকরণের মোহন-বিষয়ে মহৌষধিস্বরূপ, অতএব হে রাধে, মণি মন্ত্র মহৌষধির এই তিনের পরম আশ্চর্য্য প্রভাব কে না কীর্ত্তন করে?

"অতঃপরে শ্রীরাধা কালিয়দহে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করিয়া বিশাখাকে বলিলেন সখি, তুমি গুরুজনদিগকে জানাও যে আমি দ্বাদশাদিত্য তীর্থে যাইয়া সূর্য্য-দেবের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করি। বিশাখা বলিলেন, সে প্রস্তাব মন্দ নয়।" এই সময়ে শ্রীরাধা একরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মোহের ভাবে আপন মনে বলিলেন, যদিও মুকুন্দ আমাকে পরি-ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তথাপি বিরোধিনী আশা আমায় দগ্ধ করিতেছে। এখন আর আমার অন্য আশ্রয় নাই, গভীর জলশালিনী যমভগিনী-যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গলসহ উদ্বিগ্নচিত্তে ভানুতীর্থে উপস্থিত হইলেন, এবং বনান্তর হইতে জানিতে পারিলেন, বিশাখাসহ শ্রীরাধিকা ভানুতীর্থে সমাগতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, লতাকুঞ্জের অন্তরাল হইতে অতি গোপনে শ্রীরাধার ও বিশাখার কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন, "শ্রীরাধা সজল নয়নে বিশাখাকে বলিলেন, সখি আমি এ জন্মের মত তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও।"

"বিশাখা অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিলেন, তুমি ধৈর্য্যগুণশালিনী, এত উদ্বিগ্না হইতেছ কেন?" শ্রীরাধা আকাশের দিকে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া বলিতেছিলেন :—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজ সহজ বাল্যস্ত বলনাদ্
অভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যাষ্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীন-পদবী॥

গৃহের ভিতরে, হরিষ অন্তরে,
খেলিয়ে বিবিধ খেলা।
সহজে আপন, বয়স যেমন,
নবীন কুলের বালা॥
হরি হরি হেন না বুঝিয়ে তোরে।
গৃহ ছাড়াইয়া, কুপথে ফেলিয়া,
উদাসীন হৈলা মোরে॥ ধ্রু॥
ভাল মন্দ আমি কিছু নাহি জানি,
হেন দশা কৈলে কেনে।
অতি অবিচার, দেখিয়া ব্যভার,
চমক লাগয়ে মনে॥
উদাসীন কৈলে পুন তেয়াগিলে,
তুমি নিদারুণ-রাজ।
তোহে নাহি দুঃখ; মোর কাটে বুক,
জীবনে লাগয়ে লাজ॥
শয়ন ভোজনে, তনু বেশ জনে
তিলেক না লয়ে চিত্ত।

এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণে,
নবীন লেহক রীত ॥

বনান্তিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বলিলেন, জীবনেচ্ছু কোন্ ব্যক্তি জীবনঔষধি-স্বরূপ সিদ্ধঔষধি লতাকে উপেক্ষা করিতে পারে ? শ্রীরাধা নিজের দেহ হইতে ভূষণাদি তুলিয়া লইয়া সখীদের করে সমর্পণ করিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য,—চির বিদায় গ্রহণ করা। বিশাখা বাধা দিয়া বলিলেন, কেন আমায় দগ্ধ করিতেছ ? আমি কেবল ললিতার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছি।" এই বলিয়া বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধিকা যখন নিজের দেহের ভূষণ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কালিয়দহে প্রাণত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে চেষ্টা অবশ্যই দেখিতে পান নাই, দেখিতে পাইলে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এই বিরহ-যাতনার প্রশমন করিতে পারিতেন। কিন্তু এই অবস্থায় বিশাখার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি কাঁদিতেছিলেন।

শ্রীরাধা, বিশাখার নয়নজল নিজ হাতে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন :—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর-কৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথাবৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥

সখি, কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, সখি, তোমরা চিরদিনই আমার কত উপকার করিয়াছ, এখন আরও একটী কাজ করিও, যাহাতে চিরকাল আমার দেহ এই শ্রীবৃন্দাবন মাঝে অবস্থান করে তাহার জন্য তমাল-শাখায় আমার মৃত দেহ বাঁধিয়া রাখিও।"

শ্রীরাধার এই অন্তিম দশার ব্যাপার পাঠক মাত্রেরই হৃদ্‌বিদারক।

শ্রীরূপ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তীব্র ঝঙ্কার সৃষ্টি করার শক্তিশালী মহাকবি। তাঁহার এই ভাব লইয়া পদ-কর্ত্তাদের অনেকেই মর্ম্মদাহি পদগীতি রচনা করিয়াছেন ; নিম্নে উহার দুই একটী পদ সংকৃত শ্রীনীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থ হইতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"মহাপ্রভু। আঃ কি যাতনা! কি মর্ম্মস্পর্শী—এই শ্রীরাধা-অনুরাগের পদ! কি নিদারুণ বিরহ!' এই বিরহেও কি জীবন ধারণ করা যায়? তারপর স্বরূপ?

স্বরূপ। তারপর শ্রীমতী প্রাণত্যাগের জন্যই প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—

শীতল তছু অঙ্গ বলি পরশ রস-লালসে
করল কুলধরম গুণ নাশে।
সো যদি সখি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি দেহ, বরজকি মাঝে॥
হামারি দুনো বাহু ধরি সুদৃঢ় করে বাঁধবি
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে।
ললাট হৃদি বাহু মূলে শ্যাম নাম লেখবি
তুলসী-দাম দেয়বি মঝু গলে॥
ললিতা লহ কঙ্কণ বিশাখা লহ অঙ্গুরী
চিত্রা লহ—

স্বরূপের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। মহাপ্রভু অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্বরূপের নয়নজল মুছাইয়া তাঁহাকে নিজের কোলের সম্মুখে টানিয়া লইলেন। রামরায় মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "শেষ হয় নাই প্রভু, আর দুই একটী গান গাইব।" স্বরূপের কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়; তিনি গাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গান ফুটিল না। কণ্ঠ যেন স্তম্ভিত, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া গানের তান আসিতেছে; স্বরূপের বক্ষে প্রবল চাপ। করুণাময় মহাপ্রভু স্বরূপের বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিলেন, স্বরূপ আবার গান ধরিলেন:—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখী থেকে মনু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখ মোর অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শু'নে॥
না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
সেই সে তমাল-তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়।
অচেতন তনু মোর তাহে যেন রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ দরশ না পাব।
বিরহ-অনলে মাহ তনু তেয়াগিব॥

এই গানের প্রারম্ভেই মহাপ্রভুর নয়ন উত্তান হইয়া উঠিল, নয়নতারা স্থির হইয়া গেল। রামরায় ভাব বুঝিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, তিনি অর্দ্ধেক গান শুনিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে রাম রায়ের কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বরূপ নিজের হৃদয়ের ভাবে চাপা দিয়া গান ধরিলেন—

কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল।
ধাই বিশাখা তারে কোলে করি নিল॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস।
নাসাগ্রেতে তুল ধরি দেখয়ে নিশ্বাস॥"
শ্রবণে বদনে দেই কহে কৃষ্ণ নাম।
চেতন পাইয়া কহে কাহা ঘনশ্যাম॥
সম্মুখে তমাল হেরি করি নিরীক্ষণ।
উন্মাদিনী হয়ে যায় দিতে আলিঙ্গন॥
ঐছন ধনীর দশা করি নিরীক্ষণ।
গোবিন্দদাস ভেল সজল নয়ন॥"

নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই হৃদ্‌বিদারক চিত্র উল্লিখিতরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এখন আবার বিদগ্ধ মাধবের কথা বলিতেছি।

শ্রীরাধা কালিয়দহে ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য কল্পনা করিলেন, বিশাখাকে ছল পূর্ব্বক বলিলেন সখি, আমি সূর্য্যদেবকে অর্চনা করিয়া কোন কামনা করিব। আমি যাবৎ যমুনায় স্নান না করিয়া আসি তাবৎ তুমি ফুল চয়ন কর।" এই বলিয়া বিশাখার নিকট হইতে শ্রীরাধা যমুনায় প্রাণ ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই শ্যামসুন্দরের মুখখানি মনে পড়িল, আর তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না,—ভাবিলেন, মরিব নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে আবার সেই ত্রৈলোক্য মোহন মুখখানি আর একবার দেখিয়া তবে মরিব। এই ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া অতি উৎকণ্ঠার সহিত বিশাখাকে বলিলেন সখি, প্রাণের সখি,—আবার সেই চিত্র-পট খানি একবার আমায় দেখাও, আমি একবার ভাল করিয়া দেখি।

বিশাখা। এখানে তো সেই চিত্র-ফলক নাই!

শ্রীরাধা ব্যথিত ভাবে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, 'তবে ধ্যান করিয়াই আমি সে মুখখানি দেখিয়া লই,' এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ভাই মধু মঙ্গল,এমন চিত্তোন্মাদক মধুমাখা কথা আরতো কখনও শুনি নাই? চল, একবার শ্রীরাধাকে দেখি গিয়া।" এই বলিয়া উভয়ে রাধিকার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। বিশাখা ইহাঁদিগকে অবলোকন করিয়া আনন্দ সম্ভ্রম সহকারে বলিলেন সখি, কি ভাগ্যের বিষয়? তোমার ধ্যান যে সফল হইল, একবার চেয়ে দেখ।" শ্রীরাধিকা ঈষৎ নয়নোন্মীলন করিয়া বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন। বিশাখা বলিলেন সখি, এইদেখ। তোমার মদনমোহন, তোমার জীবন সর্ব্বস্ব তোমার সম্মুখে! শ্রীরাধ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, অহো! স্বপ্নের কি আশ্চর্য্য মাধুরী!

বিশাখা। অবিশ্বাসিনি, তোমার স্বপ্নও আশ্চর্য্য। নিদ্রা ব্যতিরেকেও তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ!

শ্রীরূপের এই নাটকীয় চিত্র সহৃদয় পাঠকের প্রাণে স্বভাবতঃই বিবিধ ভাবের সৃষ্টি করে। শ্রীরাধিকার অদ্ভুত ভাব! তিনি মরিতে গিয়াও শ্যামসুন্দরের মুখের কথা ভাবিয়া মরিতে পারিলেন না। প্রণয়ি-হৃদয়-দুঃখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করে না, যদি কখনও তাহার ভালবাসার ধনকে একবার দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীরূপ অতীব নিপুণতার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে আসন্ন মরণ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। এইরূপ নাটকীয় লিপিকলা-নৈপুণ্য অতি বিরল। আশাবদ্ধ প্রণয়ি-হৃদয় আশায় আশায় জীবন রক্ষা করেন। আশা,উৎকণ্ঠায় ও ব্যাকুলতায় পরিণত হয়; সেই উৎকণ্ঠা আবার ধ্যানে পরিণত হয়। ধ্যানে দূরের বস্তু নিকটবর্ত্তী হয়,নিত্য সত্য বস্তু মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে পরিস্ফুট হন। এই ভাবের প্রথম অবস্থাটী অতি সুন্দর। আলোক ও ছায়ার মিশামিশির ন্যায় কল্পনা ও সত্য যুগপৎ চিত্তের দ্বারে সমুপস্থিত হয়, তখন কখনও বা

ধ্যানই খাটী সত্য হইয়া দাঁড়ায়, কখনও বা খাটি সত্য কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীরাধিকা নিরাশ প্রাণে কৃষ্ণের মুখখানি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্যানেই ধ্যানের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে সাধকের মনে বড় আশা হয়। কোন-না-কোনদিন হয়ত ধ্যানের ঘন-গভীর আবেশে চিরবাঞ্ছিত শ্রীগোবিন্দ দেখা দিলেও ও দিতে পারেন।

এই প্রেম-লীলায় তুর্দ্দৈব দেখ। এই শুভমিলন-মুহূর্ত্তে জরা-পাণ্ডুর-বর্ণা-প্রেমবিবাদিনী জটিলা আসিয়া দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বলিলেন হায়, চকোর, চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা পান করিতে উন্মত্ত হওয়া মাত্রই শারদীয় শ্বেত মেঘ আসিয়া চন্দ্রকলা আচ্ছাদিত করিল!

চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়াশ্চকোরে পাতুমুদ্যতে।
পিধানং বিদধে হন্ত শরদম্ভোধরাবলী॥

জটিলা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের অন্তরায়। তাহার আগমনে উভয়ের সতৃষ্ণ অবিতৃপ্ত বাসনা আবার বিরহ-বাধা প্রাপ্ত হইল। অমা প্রতিপদী চাঁদের রেখা উদয় মাত্রেই আঁধারে ডুবিয়া গেল।

এইরূপে এই স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যবৎ নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকার পতন হইল।

তৃতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিলেন সখি, শ্রীরাধার প্রেমলক্ষণ কি প্রকার শুনিতে ইচ্ছা হয়। বিশাখা বলিলেন :—

দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্।
আঃ কিম্বা কথনীয়মন্তদসিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি॥

কৃষ্ণ, প্রসঙ্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অমনি খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধা উন্মত্ত ভাবে চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত

হইতে থাকেন। হা কষ্ট! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ যদি কৃষ্ণবর্ণ নব জলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তদালিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা করেন।

অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুয়া নাম শুনইতে,
খঞ্জন নয়নী ধনি রাই।
অতি উন্মত্ত হইয়া কান্দে বহু বিলপিয়া,
পুন পুন কাঁপে, ক্ষমা নাই॥
শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে।
অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি সুবাউরি,
যেন ভেল কুলটা চরিতে॥ ধ্রু॥
বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল,
উড়িবারে চাহে পাখা করি।
দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝরয়ে আঁখি,
শ্যাম সখী নিজ ক্রোড়ে করি॥
গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা,
মনে মানে তোমা কৈল্প কোর।
অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে,
ধনী রহে হইয়া বিভোর॥
সুনীল বসন পড়ে, নীলমণি হার ধরে,
নেহারয়ে কালিন্দীর নীর।
এইরূপে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্য মন,
তিলেক না রহে গৃহে স্থির॥
সদাই কদম্ব বন, করইতে নিরীক্ষণ,
পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে।

বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ,
অকারণে হাসে কত ভঙ্গে ॥
অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত,
বরণ হইল যেন আন।
কেহ লখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে,
কেবা জানে নিগূঢ় বিধান ॥
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাঙ এবে আমি,
তেঞিসে তাঁহার হেন কাজ।
কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তার,
দুকুলে হইয়া গেল লাজ ॥
না করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্ত স্থান,
না শুনয়ে বচন কাহার।
এ যদুনন্দন ভণে, না জানিয়ে এতক্ষণে,
কি জানি হইয়া রহে আর ॥

তৃতীয় অঙ্কে ললিতা বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে শ্রীরাধিকার অনুরাগ এবং পরস্পর ভাবানুকূলতার বহুল চিহ্ন বিবৃত হইয়াছে। কবি অতি সংযতভাবে এই অঙ্কে শ্রীরাধাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই অঙ্ক 'রাধাসঙ্গ' নামে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে রসজ্ঞ টীকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবৃর্ত্তি মহাশয় একটী ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইযে, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নাটকের পক্ষে রসপ্রদ হয়। এই রীতিতে পূর্ব্বরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষীয় রস বিবৃত করিয়া চতুর্থ অঙ্কে বিপক্ষ ভেদ দেখাইবার জন্য এবং রস-বিলাস প্রদর্শন করিবার জন্য বৈশাখী-পূর্ণিমা হইতে চার রাত্রির লীলা এই অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। এই অঙ্কের প্রথমেই শ্রীরাধার বিপক্ষ চন্দ্রাবলীর আগমন এবং তাঁহার সহিত নান্দীমুখীর কথোপকথন, কিয়ৎক্ষণ পরেই

চন্দ্রাবলীর আগমন, সুবল সহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন, চন্দ্রাবলী কর্তৃক মুরলী বর্ণন এই অঙ্কের প্রথম বিশিষ্টতা। এই অবসরে এস্থলেও শ্রীরূপ-লিখিত শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণন এবং মুরলী নিঃস্বন-বর্ণন ও রাধাগোবিন্দ-বর্ণন-সম্বন্ধে কতিপয় পদ্যের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের নাটক সমালোচনায় শ্রীপাদ রায় রামানন্দ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, যথা :—

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার॥

সুগন্ধৌ মাকন্দ প্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥

হে সখে মধুমঙ্গল, বৃন্দাবন আম্র-মুকুল-ক্ষরিত সুগন্ধি এবং মধুর মকরন্দ-কারাগারে মধুপশ্রেণীকে নিবদ্ধ করিয়া এবং মলয়াচলের মন্দবায়ু কর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া আমার অনুপম আনন্দ সংবর্দ্ধন করিতেছেন।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্প-স্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥

হে সখে, এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত, সেই লতা সকলের

অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুসুম শ্রেণীতে মধুকরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত।

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতং কচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা,
কচিদ্বল্লীলাস্যং কচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
কচিদ্ধারাশালী করক-ফল-পালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্॥

কোন প্রদেশে মধুকরীগণের সুমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে দাড়িমী ফল পরম্পরার রসপূর বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিত-রত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল জাম্বূনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী॥

যাঁহার শির এবং পুচ্ছভাগে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, যাঁহার শির ও পুচ্ছের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পর ও পূর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণ বর্ণমণি দ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভয় পরিসরের মধ্যভাগ হীরক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, সেই এই বিশুদ্ধ জম্বূনদময়ী কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের করে বিলাস করিতেছে।

এই গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলী মুরলী দেখিয়া বলিতেছেন :—

সখি মুরলী বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনাত্মা নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকর-পরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥

হে সখি মুরলি, তুমি বিশালছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয়

কঠিনাত্মা, গ্রন্থিলা এবং নীরসা, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে হরিকরের নিবিড় আলিঙ্গনে এবং চুম্বনে পরমানন্দ লাভ করিতেছ।

বংশীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ মাধবের নিম্নলিখিত শ্লোকটী অতি বিখ্যাত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে এই শ্লোকটী উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলরাম ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি শুনিতে পাইলেন, আকাশ হইতে একটী পদ্য বায়ুর স্তরে স্তরে ভাসিতে ভাসিতে নামিয়া আসিতেছে যথা —

রুন্ধন্নম্বুভৃত শ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভি র্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

জলধরের গতিরোধ, তুম্বরুর চমৎকারিতা, সনন্দনাদির সমাধি-ভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ঔৎসুক্য পরম্পরা দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা নাগরাজের আঘূর্ণন এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

প্রথম অঙ্কে নান্দীমুখীকে পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিয়াছিলেন সে পদ্যটী এই :—

অয়ং নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীক-প্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণি-মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥

যাঁহার নয়ন শোভায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরিহিত পীতাম্বর দ্বারা নব কুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশে দিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে, এবং মরকত মণির ন্যায় কান্তি দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষা করিবার জন্য পৌর্ণমাসীদেবী

শ্রীমতীকে ঈর্ষাদৃষ্টিতে বলিলেন মুগ্ধে, তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হও কেন, প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় নয়ন, বদন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভয়ানক মুদ্রা দেখাইয়া তাঁহার ধৃষ্টতার প্রতিবিধান করিতে পার না কি ? এই কথায় শ্রীরাধা ক্রুদ্ধের ন্যায় ভাব দেখাইয়া বলিলেন :—

ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্।
পাদাস্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দ্দষ্টাধরায়াং রুষা,
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভি রক্ষ্যঃ কথম্ ॥

হে মাতঃ, আপনাকে আর কি বলিব ? আমি যদি উচ্চ রব করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্ শিখণ্ডচূড় অমনি কর-পল্লব দ্বারা আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আমার অগ্রে আসিয়া পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে ঐ মধুরিপু ক্রোধভরে বারম্বার আমার অধরে দংশন করেন, অতএব হে চণ্ডি, আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছেন কেন ? আপনিই বলুন, কি প্রকারে শিখণ্ডচূড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব।

এই রকম ভাবের শ্রীরাধার উক্তিতে প্রাকৃত ভাষায় আর একটী পদ্য আছে :—

ধরিঅ পরিচ্ছন্ন গুণং,
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহ জহ চহদা পলাএম্হি ॥

হে সুন্দর, তুমি প্রচ্ছিন্নগুণ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছ; আমি ভীত হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি তুমি সেই সেই স্থানে আমাকে বলপূর্ব্বক রোধ করিতেছ।

গোবিন্দ দাস শ্রীরূপ-কৃত "একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি" পদ্যের পদ্যানুবাদে "সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি" ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ পদটী লিখিয়াছেন, উহারই শেষ ভাগে লিখিত আছে,—

না জানিয়ে কোঐছে পটে দরশায়লি
নবজলধর যিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি॥

ধৃষ্টনাগর শ্রীকৃষ্ণের ইহা এক বেজায় বেআইনী ধৃষ্টতা! চণ্ডীদাসের একটী পদের শেষে লিখিত আছে :—

আমি চাই ছাড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে
উপায় করিব কি।
তখন কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিলে রাজার ঝি॥

নিরুপায় নিঃসহায় অনুরাগিনীর অনুপায়টা দেখুন! পৌর্ণমাসীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, শ্রীরাধার হৃদয়ে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-তরু বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রকাশ্যে বলিলেন :—

ত্বয়া নীতো বামঃ ফলকমিলদঙ্গো মধুরিপুঃ,
সুখাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি কুতো নেত্রপদবীম্।
কুকূলাগ্নিজ্বালা-পটল-কটুকেলি র্যদধুনা,
দশেয়ং হন্ত ত্বাং জ্বলয়তি হিমানীব নলিনী॥

হে ক্রীড়াকুতুকিনি, তুমি সুখ-প্রত্যাশায় চিত্রপটে লিখিত সেই প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেত্রপথে আনয়ন করিয়াছিলে। হা কষ্ট! এক্ষণে তোমার যে প্রকার দশা দেখিতেছি, ইহাতে এই অনুমান হইতেছে, যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয়, তাহার ন্যায় ঐ বাম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ তুষানল জ্বালায় তোমাকে দগ্ধ করিবেন।*

শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীর বাক্য শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে আপন মনে বলিতে লাগিলেন :--

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতঃ,
পরিজন গিরাং বিশ্রান্তাত্বং বিলাস-কলকাঙ্কিতঃ।
শিব শিব কথং জানীম ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং,
নিবিড়বড়বা বহ্নিজ্বালা-কলাপ বিকাশিনম্ ॥

হে কৃষ্ণ, পরিবারবর্গ আমাকে উপদেশ দিয়াছিল যে রাধে, যদি কৃষ্ণে নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অন্তর-তাপ দূরীভূত হইবে. আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তোমার লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল এবং মূর্ত্তিটী নবকৈশোর রূপেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল; শিব শিব! আমার সরল বুদ্ধি, তুমি যে নিবিড় জ্বালা-সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব।

অনুরাগ, উভয়তঃই প্রদর্শিত না হইলে রস-পুষ্টি হয় না। তাই শ্রীপাদ গ্রন্থকার পরক্ষণেই শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ প্রদর্শিত করিয়াছেন, যথা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেগভাবে আপন মনে বলিতেছেন :—

যদবধি তদকস্মাদেব বিস্মাপিতাক্ষং
নবতড়িদভিরামং ধাম সাক্ষাদ্বভূব।
তদবধি চিরচিন্তা-চক্রাসক্তা বিরক্তিং
মম মতিরুপভোগে যোগিনীব প্রযাতি ॥

অকস্মাৎ যে অবধি শ্রীরাধার নেত্র-বিস্মাপনকর, বিদ্যুৎসদৃশ মনোরম রূপ-মাধুর্য্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে, সেই অবধি আমার মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায় উপভোগ বিষয়ে বিরক্তিভাবধারণ করিয়াছে।

এই প্রগাঢ় প্রেমিকের প্রেম, লীলাক্ষেত্রে বহুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধার সম্বন্ধে যিনি চিত্তের এত উৎকণ্ঠাময় প্রেমাতিশয্য প্রকাশ করিলেন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিয়াও তিনি সেইরূপ ভাবই প্রকাশ

করিলেন,—"স্বয়ং মম লোচনেন্দী-বর-চন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী" অর্থাৎ এই যে আমার নয়নেন্দীবরের চন্দ্রিকা-স্বরূপ চন্দ্রাবলী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" ইহা প্রেমিক প্রবর রস-রাজ শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি!

কিন্তু বলা বাহুল্য ইহা একপ্রকার শঠতা মাত্র। চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন,—প্রিয়ে, আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসন্ন হইতেছিলাম। অকস্মাৎ বনমধ্যে মধুররসক্ষালিনী শীতলস্পর্শা অমৃতময়ী রাধা মিলিত হইয়া তদ্বিরহ জনিত তাপ হরণ করিয়া লইলেন। (এই বলিয়া সভয়ে 'ধারা ধারা' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন)

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া অসূয়ার সহিত বলিলেন, যাও যাও, রাধাকে গিয়া সেবা কর।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি 'ধারা' বলিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। কি করিয়া বর্ণদ্বয়ের বৈপরীত্য হইল?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, বর্ণদ্বয়ের হউক বা কর্ণদ্বয়ের হউক, বিপরীত ঘটিয়াছে ইহাতে কোন বিচার নাই।" এইরূপে পদ্মা, চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের বিদগ্ধতা-পূর্ণ প্রণয়-কলহ আরম্ভ হইল। অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের কথোপকথন। কেশর কুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য সুবলকে প্রেরণ, শ্রীরাধিকার কেশর কুঞ্জে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের চতুরতাপূর্ব্বক বনমধ্যে আত্মগোপন, ক্রীড়াকুঞ্জে শ্রীরাধার বাসক সজ্জা নির্ম্মাণ। কিন্তু রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল, শ্রীরাধিকার হৃদয়ে ক্রমেই উৎকণ্ঠা বাড়িল, তিনি নানাপ্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর হৃদয়ে নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীরাধিকার আশঙ্কা হইতে লাগিল, চন্দ্রাবলীর হিতৈ-ষিণী পদ্মা বুঝি শ্রীকৃষ্ণকে কোথাও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরাধার এই বিপ্রলব্ধা-ভাব কবি যদুনন্দন দাস অতি মধুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। পদটী অতীব চিত্তাকর্ষি ও সুমধুর, যথা :—

নবীন কেশর কুঞ্জ, ঝঙ্কারে ভ্রমর পুঞ্জ,
পরিমলে ভুবন ভরিল।
শেফালিকা পুষ্প যত, খসিয়া পড়িল কত,
তবু কৃষ্ণ তথা না আইল॥
সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি।
কোন সখি-হিতগণ, ভুজ পাশে সুবন্ধন,
করিয়া রাখিল কৃষ্ণ-করি॥ ধ্রু॥
কেন আইনু এত দূর, লঙ্ঘিয়া আপন কুল,
ধিক্ জিউ কুলের কামিনী।
কেনে বানাইনু বেশ, কুসুমে রচিয়া কেশ,
কেন কৈনু ভূষণ সাজনি॥
সন্দেশ পাইয়া সার, না গণিলাঙ সারাৎসার,
ভাল মন্দ বিচার হৃদয়।
এ ঘোর রজনী কালে, বিষধরগণ খেলে,
তাহারে ঠেলিয়া আইনু পায়॥
মনোরথ কত শত, করিয়া আইল যত,
সকলি হইল মোর আন।
বিধি বৈরী হৈল মোরে মিলিতে না দিল তারে,
ধিক্ রহু বিধির বিধান॥
কৃষ্ণের অসঙ্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিদ্রা সখী,
এত দোষ গুণ গণ মিতে।
রজনি চলিয়া গেল, আশা মোর না তেজিল,
ঘুরে মন তাহারে মিলিতে॥
ক্ষীণ হইল সব দেহ, ভাবিতে নবীন নেহ,
অনুরাগ তভু না ছাড়য়।

অতেব জানিল কাজ, কি আর করিলে লাজ,
শুন সখি মনে যেই লয়॥
সাজহ কুসুম শেজ, তাহাতে আনল ভেজ,
হরণ করহ মলয়জে।
কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ, পড়হ পাবন কাজ,
দেহ দিব সে অনল মাঝে॥
যাতে কৃষ্ণ-গুণগান, কি জানি করিছে প্রাণ,
করিব যমুনা পরবেশ।
দাস যদুনন্দন, কহে ধৈর্য্য কর মন,
মিলাইব শ্যাম নাগরেশ॥

বিরহ-ব্যাকুল শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন পরিহাস বাক্যাদি আরম্ভ হইল; তাহা অতি মধুর। অতঃপরে চন্দ্রাবলীর কথা-উত্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শ্রীরাধার অসূয়া উপস্থিত হইল কিন্তু শ্রীরাধিকার সম্মোহনরূপ কটাক্ষ-বাণে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প-পুটিকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বসনের অঞ্চলে প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীরাধিকা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও মুরলী-মাহাত্ম্য, যথা :—

যা নির্ম্মাতি নিকেত-কর্ম্মরচনারম্ভে করস্তম্ভনং,
রাত্রৌ হন্ত করোতি কর্ষণ-বিধিং যা পত্যুরঙ্কাদপি।
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যানীবি বিধ্বংসনং
ধূর্ত্তা গোকুল মঙ্গলস্য মুরলী সেয়ং মমাভূদ্বশা।

ব্রজনারী কর, যেই করে জড়,
করিতে গৃহের কাজ।

আগে গুরুজন, এ নিবী-বন্ধন
ছাড়িয়া যে দেয় লাজ ॥
রজনী সময়ে, আপন আলয়ে
পতি কোলে থাকে নারী
তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল,
যতনে রাখহ ধরি ॥
যে বেণু সঘন, করে বিড়ম্বন,
খসায় কুন্তল পাশ।
হরয়ে যুবতি- গণের যে মতি,
পাশরায়ে গৃহবাস ॥
হরিণী সকল, মুখের কবল,
খাইতে না দেয় যেই।
নদীগণ জল, যে করে পাথর,
শীলা করে জলময়ী ॥
যাহার ধ্বনিতে, নারীগণ-চিতে,
করয়ে মদন-জ্বালা।
ধৈরজ ধরম, করম ভরম,
হরয়ে কুলের বালা ॥
সে বেণু পাইলা, মঙ্গল হইলা,
অমঙ্গল দূরে গেলা।
এ যতুনন্দন, দাস তহিঁ ভণ,
সতী কুল বহি গেলা ॥

এই অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে একটী পদ্যে কবি কাব্য-প্রতিভার এক বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরাধার রূপ বর্ণনাচ্ছলে দশাবতারের সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। উহার ভাব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন মানিনি,

তোমার লোচন চঞ্চলমীন সদৃশ, কমঠপৃষ্ঠ অপেক্ষাও তোমার স্তন সুকঠিন, দীপ্তিশালি ক্রোড়দেশে তুমি মিলিতা হইয়াছ, তোমার অধর-বিম্ব প্রহ্লাদকে (আনন্দকে) সম্বৰ্দ্ধন করিতেছে, মধ্যদেশে বলিবন্ধন অর্থাৎ ত্রিবলিরেখায় সুশোভিত, মুখকান্তি দ্বারা রামাগণকে জয় করিয়াছ, তোমার অঙ্গে নিবিড় শোভা ধৃত হইয়াছে এবং তুমি মনোমধ্যে কল্কিকে অর্থাৎ কলহকে স্থান দিয়া বিরাজ করিতেছ।" ললিতার প্রত্যুত্তর যথা :—

ললিতা। কৃষ্ণ, তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে, কারণ ঐ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি। তোমার অরণ্য মধ্যে চাঞ্চল্যই মীনাবতার, কঠিনতাই কূৰ্ম্মাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুর্য্যই পরশুরামাবতার, স্ত্রীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ-বিধ্বংসন অর্থাৎ রামাবতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদিরাদিজনিত মত্ততানিবন্ধন চপলতাই বলরামাবতার, সুহৃদ্গণ রূপ আমাদের দুঃখদায়িত্ব অথবা যজ্ঞ-বিধ্বংসনই বুদ্ধাবতার এবং খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণলীলাই কল্কি অবতার, এইরূপে মৎস্যাদি দশ অবতারের অংশ স্পষ্টরূপে তোমাতেই বিরাজমান।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই মুখরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রসোল্লাসে বাধা পড়িল। এইরূপে চতুর্থ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাতঃকালীন মান ও বেণু হরণাদি লীলা বর্ণনান্তে ঐ দিবসেরই অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা-প্রতারণা, মান-ভঞ্জন ও বন-বিহারাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চমাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই পৌর্ণমাসীর মুখে মধুমঙ্গলের প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ জানা যায়। পৌর্ণমাসী বলিতেছেন :—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস-শ্রিয়ং বিভ্রতি।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্য চিদয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া।

যাহাতে প্রশংসা করিলে ঐ প্রশংসা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া মনোবেদনা উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে ঐ নিন্দাও পরিহাসরূপে পরিণত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, অপরন্তু দোষে যাহার অল্পতা ও গুণে যাহার অধিকতা হয় না, তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে।

অতঃপরে কৃষ্ণের শঠতায় কিয়ৎকালের জন্য যদিও ললিতার বাক্যকৌশলে শ্রীরাধার হৃদয়ে মানের ভাব আসিয়াছিল এবং তিনিও সেই মান-ভাব দেখাইয়াছিলেন কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমের প্রবল বন্যায় শ্রীরাধার সেই মানের বাঁধ ভাসিয়া গেল; কলহান্তরিতার অনুতাপ তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। তিনি অনুতাপ করিয়া নিজের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চতুরা ললিতা শ্রীরাধাকে মানত্যাগের জন্য একটুকু মৃদুমধুরভর্ৎসনা করিলেন। শ্রীরাধার অকৈতব প্রেমভরা প্রাণ, কৃষ্ণ-সঙ্গমের জন্য আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই তাঁহাকে কৃষ্ণের নিকট গমন করার জন্য দূতীভাবে টানিয়া লইতেছে। তখন সহসা তাঁহার কৃষ্ণ-বিভ্রম উপস্থিত হইল, তাঁহার মনে হইল কৃষ্ণ যেন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। এইজন্য তিনি কালিন্দী-কূলবর্ত্তী কদম্ব তরু সকলকে সাক্ষী করিতেছেন। এই সময়ে ললিতা আসিলেন, শ্রীরাধার চিত্ত-বিভ্রম-জনিত স্ফূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, নান্দীমুখী একটী কথায় শ্রীরাধার চরিত্র আঁকিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন-রাধে, তুমি স্বভাবতঃ মৃদুলা, তবে কেন মাধবের প্রতি কঠিনা হইতেছ? বুঝিয়াছি তোমার কোন দোষ নাই। হিমদ্রবে নবনীত স্বয়ই কঠিন হইয়া উঠে। এইস্থলে শ্রীরাধা আবার বংশীর প্রশংসা করিয়া কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন। সে পদ্যটি চরিতামৃতেও আছে, "সংশতস্তব জনি" ইত্যাদি শ্লোকটীর কথাই বলিতেছি। বিশাখা বলিলেন, বাঁশীর আশ্চর্য্য গুণ আছে, বায়ুমুখে ধরিলে এ বাঁশী আপনিই বাজে। শ্রীরাধা উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিলেন।

বংশীধ্বনি জটিলার কর্ণে প্রবেশ করিল, জটিলা বাঘিনীর মত লম্ফে ঝম্ফে আসিয়া শ্রীরাধার হস্তে কৃষ্ণের মুরলী দেখিতে পাইলেন, অমনি ক্রোধভরে উহা কাড়িয়া লইলেন। লোকে কথায় বলে,—"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত হয়"। জটিলার তর্জ্জন-গর্জ্জনে বন মুখরিত হইয়া উঠিল, শ্রীরাধার হৃদয় দুর দুর কাঁপিতে লাগিল, চতুরা ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতি কখনও ঘুমায় না,—সদাই সজাগ! ললিতা সভয়ে জটিলার নিকটে গিয়া বলিলেন, আপনি মিছামিছি কি আশঙ্কা করিতেছেন? আমরা কালিন্দী-তটে উহা কুড়াইয়া পাইয়াছি।' জটিলা সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন। সুবল জটিলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? ঐ দেখুন দধিলম্পট বানরীটা আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। জটিলা মুরলী নিক্ষেপ করিয়া বানরীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

এ দিকে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রকৃতই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। ধ্যানের তীব্রতায় সমাধি হয়, সমাধিতে জগতের সর্ব্বত্রই ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রেম তাঁহাকে মহাযোগীর ন্যায় রাধাভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই রাধারূপ দেখিতে লাগিলেন এবং ঔৎসুক্যভাবে বলিলেন :—

> রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
> রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
> রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনেচ রাধা
> রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

জটিলার ভগিনী-পুত্রী সারঙ্গী অভিসারিকা শ্রীমতী রাধিকাকে দেখিয়া বলিল, অভিমন্যু দাদা তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি এখানে কেন? সারঙ্গীর মুখে শ্রীরাধার অভিসারের স্থলে গমনের কথা শুনিয়া জটিলা ভীষণ ক্রোধে শ্রীরাধিকাকে গালি দিতে দিতে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন,—ওরে! কুলাঙ্গার কালমুখি, প্রত্যহ তুই আমাকে বঞ্চনা করিস্?"এই বলিয়া শ্রীরাধিকাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাহার হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেলেন। প্রেমের গগনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইতে না হইতেই অমনি রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। শ্রীকৃষ্ণ বিষন্ন হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,— হায়! আমায় রহস্য-কেলি প্রকাশ পাইলে লঘু হৃদয় অভিমন্যু অতিশয় রুষ্ট হইয়া হয়ত শ্রীরাধাকে নিরুদ্ধ করিয়া গোপনভাবে গৃহে রাখিবে, না হয় যদুরাজধানী মধুপুরীতেই বা লইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ করিতেছেন :—

হাহা রাধে তোমার লাগিয়া। নিরবধি পোড়ে মোর হিয়া॥
না জানি কি জানি হয় আজ। বেকত বা হয় সব কাজ॥
তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা। গোকুলে বেকত ভৈগেলা।
অভিমন্যু লখিলে আশয়। বান্ধিয়া বা রাখে নিজালয়॥
কিবা তোমা লুকাইয়া রাখে। তবে আমি দেখিব কাহাকে॥
কিবা সে মথুরা লইঞা যায়। তবে আমি কি করি উপায়॥
এ যদুনন্দন দাস কহে। না ভাবিহ মঙ্গল আছয়ে॥

এস্থলে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এক চমৎকার ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। ললিতা ও শ্রীরাধাকে লইয়া জটিলা যখন গমন করিলেন, তখন মধুমঙ্গল কুতূহলাক্রান্ত হইয়া উহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন সখে, তোমার রাধিকা এক আশ্চর্য্য বিদ্যা জানে। যখন জটিলা তাহাকে তাড়না করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষেই সুবল হইয়া দাঁড়াইলেন।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর কি হইল?' মধুমঙ্গল সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, 'তারপর সকলেই জটিলাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। জটিলা লজ্জায় অবনত বদনে পলায়ন করিলেন এবং শ্রীরাধা ললিতার কর্ণে মন্ত্র

পাঠ করিয়া তাহাকে বৃন্দা করিয়া তুলিলেন।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখে, আমার মনে হইতেছে ইহা শ্রীরাধার বিদ্যা নয়, অভিমন্যুর আশঙ্কায় বৃন্দারই ঐরূপ ছলনা। মধুমঙ্গল বলিলেন, ইহাও হইতে পারে। আমি পুনর্ব্বার দেখিয়াছি, সুবল বৃন্দানির্ম্মিত রাধাবেশে মুখরার গৃহে প্রবেশ করিলেন।”

সখীদিগের চিত্ত-চমৎকার-নৈপুণ্যে ব্রজলীলা বাস্তবিকই সময়ে সময়ে চিত্ত-চমৎকারিত্বময় অদ্ভুত রসের লীলাস্থলী হইয়া দাঁড়ায়। মধুমঙ্গল বলিলেন সখে, ঐ দেখ সুবল ও বৃন্দা ঐ আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ঠিক তাইত বটে, এস, এস, সুবল এস। শ্রীরাধিকা সহাস্যে মুখে হস্তাবরণ দিয়া ললিতাকে বলিলেন, তোমার সখা কৃষ্ণ, আমাকে সুবল বলিয়া মনে করিতেছেন।” শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন সখে, শিল্পের আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব দেখ, সুবলকে ঠিক রাধিকার মত দেখাইতেছে।”

এস্থলে ললিতাও বৃন্দা সাজিয়া আসিয়াছেন। রাধাতে যেমন সুবল ভ্রান্তি, ললিতাতেও সেইরূপ বৃন্দা-ভ্রান্তি হইতেছে। ললিতা যখন রাধাকে রাধা বলিতেছেন, মধুমঙ্গল তখন বলিতেছেন “সুবল, তুমি রাধা নাম স্বীকার কর কেন? সরল কথা বল। আকার ও নাম গোপনের কি প্রয়োজন?” শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিলেন, তুমি সুবলকে ওকথা বলিও না। আমি রাধা নামটী বড় ভালবাসি। তবুত আমি রাধা নামটী শুনিতে পাইতেছি? আমিও সুবলকে রাধা নামে সম্বোধন করিব।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে গিয়া বলিলেন, এস আমি তোমায় আলিঙ্গন করিয়া মুহূর্ত্তের তরেও রাধা আলিঙ্গন-জনিত সুখ উপভোগ করিব।” শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া ললিতা কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, নাগর, যেখানে সুবল আছে, সেখানে গিয়া সুবলের সহিত আলিঙ্গন কর, এখানে দম্ভ প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই।” মধুমঙ্গল ক্রোধ করিয়া বলিলেন, “বৃন্দে, তুমি যথার্থই ললিতার মত ব্যবহার করিতেছ।”

এই সময়ে প্রকৃত বৃন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, সখি রাধে, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন কর।' মধুমঙ্গল বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, ইন্দ্রজালিনি বৃন্দে, তুমি ধূমরাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া বিদগ্ধ চাতককে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইবে না!" বৃন্দা হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুর, তুমি মেঘ ও ধূম চিনিতে পার না। এই মেঘের কণ্ঠে বিদ্যুৎমালা আছে, ইহার আকর্ষণ করারও শক্তি আছে; এ সুবল নয়, রাধা!" শ্রীকৃষ্ণ রাধার কণ্ঠে রঙ্গন মালা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, মধুমঙ্গলের সে বিশ্বাস হইল না। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শ্রীরাধার নিকটে অনুনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধা ঈষৎ মানভরে বলিলেন—থাক, থাক, তোমার ও সকল শঠতা জানা গিয়াছে।" শ্রীরাধার মান-প্রশমনের জন্য বৃন্দা তাঁহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন না, কৃষ্ণ কাতরকণ্ঠে বলিলেন :—

নিষ্ঠুরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥

রাধে, কঠোরা হও বা মৃদ্বীই হও কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ। যেমন চন্দ্রলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্য গতি নাই, তদ্রূপ তোমা ভিন্ন আমার জীবনে অন্য উপায় নাই।" শ্রীরাধা অতি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, সত্য সত্যই তুমি মায়াবীদিগেরও বিমোহনকারী, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ললিতা বলিলেন :—

ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং লোকস্য নির্মিৎসতঃ
প্রেমাস্মিন্নিতি নন্দনন্দন রতং লোভাত্মনো মাকৃথাঃ।
ইত্থং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মদ্বাচি সাচীকৃত-
ভ্রূবন্দা নহি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাদ্য রোদিষ্যসি ॥

সুন্দরি! তোমাকে বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কখনও অশ্রুধারার বিরাম

হয় না, তুমি লোভ বশতঃ ঐ প্রেমে মনঃ-সংযোগ করিও না, হে তরলে, এই প্রকার বারম্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার বাক্যে ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই, তবে কেন আজ রোদন না করিবা?"
এস্থলে শ্রীগোবিন্দদাসের পদটী রসপোষক হইবে।

শুনইতে কানু- মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণ নিবারলোঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলোঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সজনি তইখনে কহল মো তোই।
ভরমিহ ওসঞে নেহ বাঢ়াঅবি
জনম গোঙাঅবি রোই॥ ধ্রু॥
বিহু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজদেহা।
দিনে দিনে খোঅসি হেন রূপলাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো নিজ নয়ন- নীরে করু সেচন
কহ তুহুঁ গোবিন্দ দাসে॥

অবশেষে শ্রীরাধা সুপ্রসন্না হইলেন এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন-জনিত আনন্দোল্লাসময় কথোপকথন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা ভীত-ভীত ভাবে ললিতা ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান করিলেন। জটিলা শ্রীরাধাকে দেখিয়া মনে করিলেন যে ইনি প্রকৃত রাধা নন,—সুবল। তাই বলিলেন, ওরে সুবল, কেন তুই সর্ব্বদা বধূবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করিস্?

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন এবারও জটিলার শ্রীরাধায় সুবল বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। তখন শ্রীরাধা, ললিতা ও বৃন্দার সহিত অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন "জটিলে, আমি গুরুবর্গের শপথ করিয়া বলিতেছি, শ্রীরাধাই যাইতেছেন, সুবল নয়। জটিলা নিজের বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওরে ধূর্ত্ত, আমি বিচক্ষণা, সকল বিষয়ই পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আমার আছে। আর ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিস্ না—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল গোকুলে গমন করিলেন। এইরূপে পঞ্চমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমেই জটিলার প্রবেশ। জটিলা তাহার ভগিনী-তনয়া সারঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলেন, শ্রীরাধা তাঁহার নীল সাড়ীর পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না-হইতেই জটিলা শ্রীরাধার গৃহে আসিয়া সেই বস্ত্র লইয়া এক মহা গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বিশারদা বিশাখা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহা কৃষ্ণ-পরিহিত বস্ত্র নয়। এইরূপে জটিলা ও বিশাখার কথোপকথনের পর ললিতা ও পদ্মা উপস্থিত হইলেন। জটিলা চলিয়া গেলেন। ললিতা বিশাখা ও পদ্মা আপন আপন পক্ষের যূথেশ্বরীদ্বয়ের গৌরব-কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরাধা আপন প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সখীদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে পদ্মা চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশাখা একটী পদ্যে আবার বংশী-নিঃস্বনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, যথা :—

> ত্রপাস্তিচরণক্রমে পরম সিদ্ধিরাথর্ব্বণী
> স্মরানল-সমিন্ধনে সপদি সামধেনী-ধ্বনিঃ।
> তথাত্মপরমাত্মনোরুপনিবন্ময়ী সঙ্গমে
> বিলাস-মুরলীভরা বিকৃতিরদ্য বৈরায়তে॥

রাধে, মুরলীধ্বনি তোমার লজ্জারূপ অভিচার যজ্ঞে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রবিশেষ কন্দর্পানল প্রজ্বলনবিষয়ে সামধেনী মন্ত্রপাঠ-স্বরূপ, তথা আত্মা পরমাত্মার সঙ্গমে অর্থাৎ একীকরণে অর্থাৎ প্রেমমূর্চ্ছার্থ তত্ত্বমসী বাক্যময়ী উপনিষৎ-বিশেষ, অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সম্বন্ধে বৈরতা বিধান করিতেছে।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল, শ্রীরাধা ললিতা ও বিশাখার সম্মিলন ও কথোপকথন। ইহার মধ্যে শ্রীরাধা অপাঙ্গদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। একতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সার-নির্য্যাস, তাহাতে আবার মহানুরাগিনী শ্রীরাধার দৃষ্টি। তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগতঃ ভাবে বলিতে লাগিলেন :—

নব মনসিজ লীলাভ্রান্ত-নেত্রান্তভাজঃ
স্ফুট কিশলয়ভঙ্গী-সঙ্গিকর্ণাঞ্চলস্য।
মিলিতমৃদুলমৌলের্মালয়া মালতীনাং
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্য॥

যাঁহার নবকন্দর্পলীলাবশতঃ নেত্রান্ত-ভ্রান্তি হইয়াছে, যাঁহার কর্ণপ্রান্তে স্ফুটকিশলয়ের রচনা বিরাজ করিতেছে এবং যাঁহার মালতীমালা দ্বারা মৃদুল শিরোভূষণ শোভা পাইতেছে, সেই মাধব-মাধুরী আমার বুদ্ধিকে মত্ত করিয়াছে।"

এই অঙ্কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমবিলাসময় কথোপকথন অতি মধুময়। ললিতা ও বিশাখার বাক্য-সংমিশ্রণে উহা আরও মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মধুমঙ্গলকে বলিলেন "সখে, শ্রীরাধা কোথায় ?' মধুমঙ্গল আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সত্বরেই তাঁহার দর্শন পাইবে। আপাততঃ এই পত্র গ্রহণ কর," এই বলিয়া একখানি পত্র দিলেন, তাহাতে 'রাধা' এই দুইটী বর্ণ মাত্র আছে, আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাহা পাইয়া আহ্লাদের

সহিত প্রকাশ্যে বলিলেন সখে, আমি অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছি।"
এই বলিয়া হাসিমাখা মুখে বলিলেন :—

ক্রমাৎ কক্ষামক্ষ্ণোঃ পরিসর ভুবং বা শ্রবণয়ো-
র্মর্ণাপথ্যারূঢ়ং প্রণয়ি-জন নামাক্ষর পদং।
কমপ্যন্তস্তোষং বিতরদবিলম্বাদনুপদং
নিসর্গাদ্বিশ্বেষাং হৃদয়-পদবীমুৎসুকয়তি॥

যেহেতু, প্রণয়িজনের নামাক্ষর ক্রমশঃ নয়ন ও শ্রবণ দ্বয়ের প্রান্তে সমারূঢ় হইলে কাহার না শীঘ্র সন্তোষ বর্দ্ধন করে? অধিক কি বলিব প্রণয়িজনের নামাক্ষর স্বভাবতই সকলের হৃদয়কে উৎসুকান্বিত করিয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর, অতি মধুর, যেমন প্রাণ-স্পর্শী তেমনি খাঁটি সত্য!

যাকে বড় ভালবাসি ভাবি তার রূপরাশি,
ধ্যানে দেখি তার হাসি; যাতে তাতে প্রাণ।
নাম তার জাগে মনে দিবানিশি অনুক্ষণে
ভাবি ধ্যানে, জপি মনে, করি নাম গান॥
যেই নাম সেই জন নাম-রূপে এক হন
নাম ভিন্ন নহে নামী,—শাস্ত্রের লিখন।
নাম পড়ে সদা মনে, জাগে মূর্ত্তি তার সনে
নামে নামে পাই শেষে নামি-দরশন॥

শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষা মন্ত্র কি, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু কাব্য পুরাণে-পদ-গানে এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলানুধ্যানে মনে হয় যেন মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার অনন্ত মাধুর্য্যময় সুমধুর নামই শ্রীকৃষ্ণের মহামন্ত্র। আবার অপরাপর পদে বিশেষতঃ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে জানাযায়, শ্রীকৃষ্ণ নামই শ্রীরাধার মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রৌষধি। চণ্ডীদাসের অক্ষয় অমৃতময় পদে লিখিত আছে :—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পসিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥
না জানি কতেক ম শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তাঁরে॥

শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেন, নাম-জপ, এবং নাম-গান,—মহাসাধনা-স্বরূপ। ইহার যথার্থতা সাধকমাত্রই অল্পপ্রয়াসে নিজ জীবনে অনেক সময়ে অনুভব করিতে পারেন। জপের-ক্রিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ফল প্রদা।

যাহা হউক এই অঙ্কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কথোপকথন-বিলাস কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ। সুনিপুণ গ্রন্থকার অতি সংযত ভাবে উভয়ের সম্ভোগেরও কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে দিয়াছেন। আর একটী কথা এই যে, যেখানে প্রেম অতি প্রগাঢ়, সেখানে কথায় কথায় প্রণয়িনীর অভিমান পরিলক্ষিত হয় এবং সময়ে সময়ে সুমধুর প্রণয়-কলহও রসের মাত্রা সম্বর্দ্ধিত করে। শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় সখীদের প্রস্তাব, প্রসার ও প্রতিপত্তি খুবই বেশী। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ রামানন্দ বলেন:—

রাধা কৃষ্ণ-লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুমতি॥

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার ললিতা বিশাখার উক্তিতে এই নাটক খানিকে অধিকতর সুন্দর, সরস, সজীব ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধা রস-কৌতুকের জন্ত বনান্তরে লুকাইয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাকে বাহির করিলেন। শ্রীরাধাকে দেখামাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত বলিলেন, "তোমার লুকান-চাতুরী এখন কোথায় রহিল? পেয়েছি তো তোমায়?" শ্রীরাধা প্রণয়-ঈর্ষার সহিত বলিলেন, তোমার জন্যেই তো পালাইয়া ছিলাম, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়ম্বিত করিতে এসেছ! এখন যাই কোথা?

শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-শ্লাঘার সহিত বলিলেন, "আমার গভীর বুদ্ধিপটুতার প্রভাব দেখ্‌লে তো? তোমার লুকান বিদ্যাটী পরাজিত হইয়াছে তো?

সুচতুরা বাগ্‌বিন্যাস-নিপুণা ললিতা তখন আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; সগর্ব্বে বলিলেন হে বাঙ্মাত্রজিতকাসিন্, হে বাক্যবীর তুমি কেবল কথায় বড়াই জান, কথার বড়াই লইয়াই আত্মশ্লাঘা কর কিন্তু কাজে কিছুই নয়। এই বলিয়া ললিতা, সংস্কৃত পদ্যে বলিলেন :—

অস্মিন্নেক সরোজসম্ভব-কৃতস্তোত্রোঽসি বৃন্দাবনে,
রাধা ভূরিহিরণ্যগর্ভরচিত-প্রত্যঙ্গকান্তিস্তবা।
হস্তোদস্ত-মহীধর স্মসকৃন্নেত্রান্তভঙ্গীচ্ছটা-
কৃষ্টোচ্চৈর্ধরণী-ধরা মম সখী তস্মীন্ন নাহঙ্কথাঃ॥

অহে, এই বৃন্দাবনে এক ব্রহ্মামাত্রই তোমারই স্তব করিয়াছেন, তাহাতেই তোমার এত অহঙ্কার! কিন্তু বহু বহু হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) শ্রীরাধার প্রত্যঙ্গকান্তিকে স্তব করিতেছেন। তুমি হস্তে একবার মাত্র মহীধর (পর্ব্বত) ধারণ করিয়া অহঙ্কৃত হইয়াছ, কিন্তু আমার সখী শ্রীরাধার নেত্রান্তচ্ছটা, তুমি যে ধরণিধর তোমাকে কতবার আকর্ষণ

করিয়াছে, অতএব হে বীর, আর অহঙ্কার করিও না।" শ্রীরাধার পরাজয় ললিতার অসহ্য।

সখি-জীবনে ইহাই মহাব্রত, ইহাই আনন্দ। তাঁহারা আত্মসুখ-বৈভবের কামনা করেন না, আত্ম-তুষ্টিও তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে। নিজ জীবনের নিখিল স্বার্থ-ভোগ-সুখ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা অহর্নিশ শ্রীরাধার সেবায় তনু-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন। ইহার একটা দৃষ্টান্ত এই অঙ্ক হইতেই দেখাইতেছি। ললিতার চাতুর্য্য-রসময় আপাতপ্রতীয়মান কাঠিন্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ললিতে, তুমি কাঠিন্য পরিত্যাগ কর। ললিতা তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, আমাকে কিছু উৎকোচ দিবে তো?" একথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, শ্রীরাধাকেও বঞ্চনা করিয়া সন্ধ্যাকালে তোমাতে সঙ্গত হইব।" এই কথা শুনা মাত্র ললিতা পদদলিতা ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ ভীষণ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, অতীব কর্কশ স্বরে ক্রোধ-কম্পিত ভাবে তিনি বলিলেন, দূর হও বিদূষক, দূর হও।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, সত্যসত্যই ললিতা ক্রুদ্ধা ও অপমানিতা হইয়াছেন। তখন তিনি কোমল-কাতর কণ্ঠে বলিলেন, তবে তোমায় কি ক্রিয়া সন্তুষ্ট করিব? ললিতা বলিলেন, 'যদি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, তবে আমার প্রিয় সখীকে সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত কর।" সখি চরিত্রের এই এক মহাবিশিষ্টতা; তাই কবিরাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন:—

> সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
> কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
> কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
> নিজ কেলি হইতে তাহে কোটী সুখ পায়॥

এই অঙ্কের শেষেও পূর্ব্ববৎ জটিলার আগমনে সুখ-সম্মিলনের সহসা বাধা উপস্থিত হয় কিন্তু এখানে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগলীলার আভাস শ্রীপাদ গ্রন্থকারের সংযত ভাষায় যথাসম্ভব প্রকটিত হইয়াছে।

সপ্তম অঙ্কে পৌর্ণমাসী ও অভিমন্যুর কথোপকথন। অভিমন্যু রাধামাধবের চাপল্যের কথা লোকমুখে শুনিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইতে অনেক প্রকার বাধা দিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে মথুরায় শ্রীরাধাকে সঙ্গোপনে রাখার জন্ত পরামর্শ স্থির করিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন, তুমি গোবর্দ্ধন মল্লের কুটিল চক্রে পড়িয়াছ, তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়াও অবোধের ন্তায় কার্য্য করিতেছ; রাধার অপবাদ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন মিথ্যাকথা বলিয়াছে।"

অভিমন্যু। দেবি, এই অপবাদতো প্রসিদ্ধই আছে। সকলের মুখেই তো রাধার এই অপবাদের কথা শুনিতে পাই।

পৌর্ণমাসী। বৎস, খলেরা তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া তোমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত করিতেছে। তুমি আমার কথা শুন। যে লাবণ্য-গন্ধে লুব্ধ হইয়া কংস-ব্যাঘ্র স্বয়ং রাধা-মৃগী অন্বেষণ করিতেছে সেই নিদারুণ কংসের হস্তে তুমি স্বয়ং শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছ, ইহা তোমার কিরূপ বুদ্ধি?

অভিমন্যু নিজে নির্ব্বোধ অথচ নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করে। সে আশুক্রোধী, কেহ তাহাকে বুঝাইলে কিছু কালের তরে প্রতিনিবৃত্তি হয়, কিন্তু তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

পৌর্ণমাসীর কথায় অভিমন্যুর মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। পৌর্ণমাসী বলিলেন, তুমি মৎসর লোকের কল্পিত কথায় বিশ্বাস করিও না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা করিতে হয়, করিও।" এইরূপে অভিমন্যু পৌর্ণমাসীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শ্রীরাধাকে মথুরায় প্রেরণের প্রস্তাব স্থগিত

করিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্য পূর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল। ব্রজ-গোপীরা সৌভাগ্য-পূর্ণিমা-উৎসবে প্রমত্ত হইলেন।

ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কথোপকথন চলিল, পৌর্ণমাসী ও বিশাখা নিষ্ক্রান্ত হইলে পর ললিতা ও বৃন্দা মানসগঙ্গা পারে চলিয়া গেলেন।

অতঃপরে চন্দ্রাবলীর সহচরী পদ্মা ও শৈব্যার মধ্যে চন্দ্রাবলীর অভি-সারের কথা চলিতে লাগিল। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের এবং শৈব্যা ও পদ্মার কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার সখী ললিতা ও বৃন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এবং চন্দ্রাবলী সম্বন্ধীয় অনুকূল আলাপে শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ ঔদাসিন্য পরি-লক্ষিত হইল। এস্থলে ললিতা ও পদ্মার কথোপকথন উল্লেখযোগ্য। পদ্মা ও শৈব্যা, চন্দ্রাবলীর সহচরী। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণকে পাইয়া পদ্মা দর্পের সহিত ললিতাকে বলিলেন, ললিতে, লোকে তোমাকে অনুরাধা বলিয়া থাকে, তবে কেন আজ রাধার উদয় না হইতে তুমি উদিতা হইলে!

ললিতা তৎক্ষণাৎ ইহার একটী জবাব দিলেন,—পদ্মে, ভ্রমরীগুলি হস্তীর কর্ণাঘাতে মুহুর্মুহু বিতাড়িত এবং অবমানিত হইয়াও তৃষ্ণাকুলচিত্তে করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে কিন্তু সেই করীন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সরসীর প্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু সরসী কখনও করীন্দ্রের নিকট আগমন করে না। তোমরা যেমন কৃষ্ণ দ্বারা অনাদৃত হইয়াও বারম্বার রতি প্রার্থনায় কৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু তাঁহাকে সুখী করিতে পার না; প্রত্যুত তাঁহার উদ্বেগই বৃদ্ধি কর; শ্রীরাধা প্রভৃতি সেরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণই পরম সুখ লাভের জন্য শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া থাকেন।" পদ্মা, শব্যা, ললিতা, বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যখন এইরূপ কৌতুক-কলহ চলিতেছিল সেই সময়ে হঠাৎ চন্দ্রাবলীর অভিভাবিকা করালা করাল বেশে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। করালা কৃষ্ণকে নানা

প্রকার রাজভয় দেখাইতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সুশীল সুবোধ বালকের মত করালার নিকট অবনত হইলেন, করালা চন্দ্রাবলীকে ও পদ্মাকে গালি গালাজ করিয়া চন্দ্রাবলীর হাত ধরিয়া শৈব্যা সহ প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রাবলীর গমনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কট দূর হইল। চন্দ্রাবলী প্রস্থান করার পরে শ্রীরাধা অভিসারিতা হইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। দুই এক কথা হইতে না হইতেই কৃষ্ণ "প্রিয়ে চন্দ্রা" এই কথার অর্দ্ধ উচ্চারণ করিয়াই একটু ভীতভীতভাবে নীরব হইলেন। চন্দ্রার নাম শুনিয়াই শ্রীরাধার হৃদয়ে অসূয়ার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, হা ধিক্ হা ধিক্, একথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার কাণ ফাটিয়া গেল না কেন?" শ্রীকৃষ্ণ চতুরতার সহিত কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন প্রিয়ে, চন্দ্রাননে, অকারণে বিমনস্কা হইলা কেন? শ্রীরাধা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রকাশ্যে বলিলেন, বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ কি ডিণ্ডিম বাদ্যে সম্বরণ করা যায়? 'চন্দ্রে' এই সম্বোধন কি, চন্দ্রাননে বলিয়া গোপন করা যায়?" শ্রীরাধা বিমনা হইলেন, বদনমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল কিন্তু স্থায়িভাব ত্তো প্রীতি বই আর কিছু নয়? শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির ক্রোধরূপ সঞ্চারীভাব দেখিয়া আনন্দ পাইলেন। শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল চঞ্চলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'প্রিয়ে, বসন্তনিশার মধুর ভাবে যাপন কর।" শ্রীরাধা ক্রোধের সহিত এক পা গমন করিয়া বলিলেন সখি বৃন্দে, বলদেখি আর কত বিড়ম্বনা সহ্য করিব?

মানিনী শ্রীরাধার চিত্তপ্রসন্ন করার জন্য বৃন্দা চেষ্টা করিলেন, ললিতা বিশাখা দুঃখিতা হইলেন কিন্তু তাঁহাদের মনে একটী কথা উঠিল তাহা এই যে,এই সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রাবলী-পক্ষ শ্রীরাধার মনোমালিন্য-বার্ত্তা পাইলে আনন্দিত হইয়া উঠিবে। শ্রীরাধা সহজেই একথা বুঝিয়া একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের ঈর্ষা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার

মত হতভাগিনীর পক্ষে এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। বৃন্দা রাধার প্রসাদন-জন্য চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ক্রোধের জলন্ত আগুনে মধু প্রক্ষেপ করিলে সে আগুন আরও বাড়িয়া উঠিবে। আমি উত্তম স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে প্রসন্না করিতে চেষ্টা করিব। এই বলিয়া তিনি বৃন্দার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বৃন্দার ভগিনী বলিয়া 'নিকুঞ্জ-বিদ্যা' নামে এক সুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গৌরীগৃহের গম্ভীরিকার অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃন্দা নিকুঞ্জ-বিদ্যাকে সুন্দররূপে সাজাইয়া ললিতা বিশাখা ও শ্রীরাধার সমীপে আগমন করিলেন। ললিতা বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, কৃষ্ণ কোথায়?

বৃন্দা। গৌরীগৃহে গম্ভীরা মন্দিরে নিকুঞ্জ বিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন।

ইঁহারা বলিলেন নিকুঞ্জ-বিদ্যা কে?

বৃন্দা। তোমরা অতি মুগ্ধা। বৃন্দাবনে বাস কর, নিকুঞ্জ-বিদ্যা যে কে তাহাই জান না?

ইঁহারা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, বাস্তবিকই আমরা তাহাকে জানি না।

বৃন্দা। এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ বালিকা কে আছে যে আমার ভগিনী ভাণ্ডীর দেবতা নিকুঞ্জবিদ্যাকে জানে না?

ললিতা। বৃন্দে, একটা বুদ্ধি দাও যাহাতে আমাদের সখী রাধিকার মনোবেদনা প্রশমিত হয়। নিকুঞ্জ-বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় বিশ্রম্ভমণি-মঞ্জুষা অর্থাৎ বিশ্বাসের পেটারীকা। নিকুঞ্জ বিদ্যার দ্বারা অবশ্যই ইহার উপায় হইতে পারে।

অতঃপরে শ্রীরাধা ললিতা ও বৃন্দা গৌরীগৃহে গম্ভীরা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধা নিকুঞ্জবিদ্যাকে দেখিয়াই বলিলেন—বৃন্দে, হঠাৎ কেন নিকুঞ্জবিদ্যার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহযুক্ত হইতেছে?

বৃন্দা। সখি, আমি যথার্থই জানি, নিকুঞ্জবিদ্যাও তোমার প্রতি অনুরক্তা।

শ্রীরাধা। (সানন্দ নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্জবিদ্যে, তোমার নিকুঞ্জ-নাগর কোথায়? তুমি বৃন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ করিতেছ না কেন?" তখন নেপথ্য হইতে একটী পদ্য উচ্চারিত হইল:—

বিধিঃ পদ্মে পাদৌ নবকদলিকে সক্থিযুগলং
মৃণালে দোর্দ্বন্দ্বং তথ শশিনমাপাদ্য বদনম্।
মৃদূনামর্থানাং ন কঠিনমবষ্টম্ভকমৃতে
স্থিতিঃ স্যাদিত্যন্তর্ব্যধিত হৃদয়ং নূনমশনিম্॥

রাধে, বিধাতা পদ্ম দ্বারা তোমার পদদ্বয়, নবকদলীর দ্বারা উরুযুগল, মৃণাল দ্বারা বাহুদ্বন্দ্ব এবং চন্দ্র দ্বারা বদন নির্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন, মৃদু পদার্থ কঠিন বস্তু অবলম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাকিতে পারে না, অতএব হে সখি, বোধ হয়, এই কারণেই বিধাতা তোমার হৃদয়কে বজ্র দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা। বৃন্দে, দেখ্‌লে তো? নিকুঞ্জ-বিদ্যা আমাকে পরিহাস করিলেন।

শ্রীরাধা নিকুঞ্জবিদ্যার নিকটে যাওয়া মাত্রেই তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। ললিতা বিশাখা তাহা দেখিতে পাইলেন। বিশাখা শঙ্কার সহিত বলিলেন বৃন্দে, তোমার ভগিনী কি লজ্জাহীনা? ইনি শ্রীরাধার বক্ষে পুরুষের ন্যায় নখাঘাত করিলেন!

বৃন্দা। (হাস্যের সহিত) ইহাতে অসূয়া করিও না। প্রেমাৎকর্ষ-বিলাসে এইরূপই হইয়া থাকে।

শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক বলিলেন বৃন্দে, আমাদের প্রতি তোমাদের কুটিলতা যুক্তই বটে, যুক্তই বটে!!

বৃন্দা। (হাস্য করিয়া) সখি, তোমার কথার ভঙ্গি বুঝিতে পারিলাম না।

ললিতা ও বিশাখা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) "বন্দে, তোমার মোহিনী-স্বরূপ নিকুঞ্জবিদ্যার নিকুঞ্জ বিদ্যা ভালই জানা গেল।"

এই সময়ে অভিমন্যু ও জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী-গৃহে শ্রীরাধা গোবিন্দ আছেন বলিয়াই ইহাঁদের ধারণা ছিল। ইহাদের কথা শুনিবার জন্য অভিমন্যু ও তাহার মাতা দেওয়ালে কাণ পাতিয়া রহিলেন। অভিমন্যু বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওরে সাহসিনি, আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে হাতে ধর্‌লেম।' অভিমন্যুর এই সিংহ-গর্জ্জন শুনা মাত্রেই শ্রীরাধা বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

জটিলা বিস্ময়ের সহিত অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন ঐযে লোকাতীত লাবণ্য-প্রবাহে গৌরী-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে,—এ কে? অভিমন্যু তখন বিস্মিত ভাবে মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন মা, তবে ইহাকেই বুঝি 'দেবিপ্রসীদ দেবিপ্রসীদ'বলিয়া শ্রীরাধা স্তুবং করিতেছে? আমি তো স্পষ্টই দেখিতেছি ইনি দিব্যরূপধারিণী মহেশমহিষী! "শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, গৌরী-বেশ ধারণ করিয়া কল খুব ভালই হইল।

ললিতা ও বিশাখা। (আনন্দের সহিত) ওহে গোপশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু, তুমি বারম্বার বলায় আমরা গৌরীপূজা করিতে আসিয়াছিলাম, ঐ দেখ, গৌরী আমাদের পূজায় প্রসন্ন হইয়া প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

অভিমন্যু। বিশাখে, শ্রীরাধা, দেবীর পদে কি সুদুর্লভ বর প্রার্থনা করিল?

গৌরীরূপধারিণী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধে অভিমন্যুর কথার উত্তর দিয়া বলিলেন, তোমার কোন নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই নিবারণের জন্য আমাকে প্রার্থনা করিতেছে।

অভিমন্যু। (শঙ্কিত ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে) ভগবতি, না, মহামায়ে, কিরূপ সঙ্কট?

গৌরী। বৃন্দে, সেকথা বলিতে আমার বাক্য কুণ্ঠিত হইতেছে, তুমি প্রকাশ করিয়া বল।

বৃন্দা। হে মান্যাস্পদ অভিমন্যু, কংসরাজ পরশ্ব সন্ধ্যাকালে ভৈরবের নিকট তোমায় বলি দিবে।

জটিলা। (ব্যাকুলতার সহিত) দেবি, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও, আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।

রাধিকা। (সহর্ষে উত্থিত হইয়া) দেবি, প্রসন্না হউন, প্রসন্না হউন।

গৌরী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অসম্ভব, তোমার এ প্রার্থনা ফলবতী হইবার উপায় নাই।

শ্রীরাধা। (মিনতির সহিত প্রণাম করিতে করিতে) হে গোপী-কুল-দেবতে আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই। আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, অনাথা করিবেন না।

গৌরী। (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) রাধে, আমাকে মুনীন্দ্রগণও বশী-ভূত করিতে পারেন না, কিন্তু আজ তোমার নবভক্তি রজ্জুতে আমি বশীভূত হইয়াছি। তুমি যদি গোকুলে থাকিয়া সতত আমার আরাধনায় রত থাক, তাহা হইলে তোমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

অভিমন্যু। (আনন্দের সহিত) অই ভক্তজন-বৎসলে, আমি কখনো শ্রীরাধাকে মথুরাভিমুখিনী করিব না, আপনি এই স্থানে অবস্থিত থাকুন, আপনাকে শ্রীরাধা আরধনা করিবে।

জটিলা। (শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) বৌমা, তুমি আজ আমার দুইকুল রক্ষা করিলা।

বৃন্দা। (অভিমন্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) অভিমন্যু, ভক্তি-গ্রাহিণী, পরদেবতা গৌরী বলিতেছেন, পতিব্রতা পত্নীর প্রতি অপবাদ দিলে ঐ অপবাদে পুরুষের পরমায়ু বিনষ্ট হয়।

গৌরী। তুমি ধন্যা; তোমার এই রাধিকা পরম কল্যাণ-সাধিকা। ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিও না।

অভিমন্যু। দেবি, সুবল রাধাবেশ ধারণ করিয়া আমার মাতাকে উপহাস করে, তাই দেখিয়া অনভিজ্ঞ-সংসরী -লোকেরা মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতেছে।

ললিতা। অভিমন্যু, ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছিলা বলিয়া স্বয়ং দেখিয়া বিশ্বাস করিলা।

অভিমন্যু। মা, চল মথুরা-প্রস্থানের বন্দোবস্ত স্থগিত করি গিয়া" এই বলিয়া মাতা পুত্রের প্রস্থান।

ললিতা বিশাখা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিলেন, এই পামর তোমাকে মথুরা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।" পৌর্ণমাসী এই সময়ে আগমন করিয়া করযোড়ে প্রণতি পূর্ব্বক সানন্দ হাস্যে বলিলেন,—

অঙ্গরাগেণ গৌরাঙ্গী হিরণ্যদ্যুতিহারিণা।
মামগ্রে রঞ্জয়ত্বেষা নিকুঞ্জ-কুলদেবতা॥

যাহার অঙ্গরাগ-সৌন্দর্য্যে কনককান্তিও তুচ্ছীকৃত হয়, সেই নিকুঞ্জ-কুল-দেবতা অগ্রে আমার চিত্তে সুখ দান করুন।

এই ঘটনার পরেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়।

বিদগ্ধ মাধব নাটক প্রেমানন্দ-রসের উত্তালতরঙ্গময় মহাসাগর। আমি বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া এই মহাসাগরের কণিকাবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহার অগাধ গাম্ভীর্য্য ও অনন্ত বিস্তার দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত ভাবে ভক্তিভরে ইহার সমক্ষে দণ্ডবৎ

প্রণত হইলাম। বঙ্গানুবাদ প্রায় সর্ব্বত্রই মুর্শিদাবাদের ৺রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। স্থানে স্থানে যথাযথ ভাবরক্ষা ও ভাষা-মাধুর্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও দানকেলি-কৌমুদীর বহুল পদ্য উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেমন সুকবি, তেমনই আলঙ্কারিক পণ্ডিতবর্য্য ভগবৎ-পার্ষদ। তাঁহার নিজ রচিত রসালঙ্কার গ্রন্থে নিজ-রচিত উদাহরণ প্রভৃতি অতীব যথাযথ হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিদগ্ধমাধবের পদ্য-সংখ্যা বোধ হয় ললিতমাধব নাটকের প্রায় সমান সংখ্যকই হইতে পারে কিন্তু নাটকচন্দ্রিকায় ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ললিতমাধবের উদাহরণ বিদগ্ধমাধব অপেক্ষা বেশী। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই দুইখানি নাটকেরই টীকা করিয়াছেন। তাঁহার টীকার সাহায্যেই এই নাটকদ্বয়ের বহু দুর্ব্বোধ্য স্থান সহজ ও সুখ-বোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা এই দুইখানি নাটক যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন এবং রস-শাস্ত্রের লক্ষণ সহ পদ্যগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে বাসনা করেন, তাঁহারা অতি সহজেই উজ্জ্বলনীলমণি ও উহার টীকাদ্বয়ের সাহায্যে অতি আনন্দের সহিত এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

ললিতমাধব নাটক।

ললিতমাধব নাটকখানি বিদগ্ধমাধব হইতে আয়তনে বড়। ইহা দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংখ্যাও অধিকতর। ক্রমশঃ তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইবে। প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসী, গার্গী, কৃষ্ণ, মধুমঙ্গল, কুন্দলতা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, রোহিণী, যশোদা, শ্রীরাধা,

ললিতা এবং অবশেষে জটিলা,—এই সকল পাত্রী এবং পাত্রের যথাযথ কথোপকথন দ্বারা এই অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকের ন্যায় গোপীশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাবির্ভূত আদেশে নীপান্বিতা মহোৎসবে গোবর্দ্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে সমাগত বৈষ্ণবগণের উপাসনার্থ এই নাটকখানিরও অভিনয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভে এই নাটকের পাত্র পাত্রীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের অবিদিত বহুল পৌরাণিক গুহ্যতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই সকল রহস্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি।

সুবিখ্যাত কলানিধির বিবাহ ব্যাপার লইয়া এই পৌরাণিক প্রসঙ্গের আরম্ভ। তিনি আভীর-কুলনন্দন, তাণ্ডব-সুপণ্ডিত, বহুসদ্গুণশালী, নবযৌবনান্বিত, ক্ষিতিমণ্ডলে সুপ্রসিদ্ধ, ও সমরে শত্রুবিজয়ী। এই কলা-নিধির অপর নাম শ্রীকৃষ্ণ। ইহার সহিত রাধা ও চন্দ্রাবলার বিবাহ প্রসঙ্গে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিন্ধ্যপর্ব্বতের বরপ্রাপ্তি-রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। বিন্ধ্য দুইটী কন্যার জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে বিন্ধ্য দুইটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মার আরও বর ছিল যে বিন্ধ্যের কন্যাদ্বয়ের বর, ধূর্জটিবিজয়ী হইবেন এবং অশেষ কল্যাণগুণ দ্বারা ত্রিভুবনকে বিস্মাপিত করিবেন। বিন্ধ্য জামাতৃ-সম্পদ-গর্ব্বিত গৌরী-পিতা হিমা-লয়ের সৌভাগ্য দেখিয়াই কন্যাবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কংস-পরিচারিকা পুত্রহারিণী পূতনা বিন্ধ্যকন্যা শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করেন। শ্রীরাধার নাম ছিল,—তারা। যশোদা-গর্ভসম্ভূতা যোগমায়া দেবী বসুদেব দ্বারা নন্দ-গৃহ হইতে আনীতা হইয়া এবং তদ্বধ-প্রয়াসী কংসহস্ত হইতে উৎক্ষিপ্তা হইয়া বলিয়াছিলেন, "রে কংস আমা হইতে উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যশালিনী অষ্টমহাশক্তি ব্রজে দুই এক দিনের মধ্যে আবির্ভূতা হইবেন। ইহাদের নাম—রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা,

পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা। ইহাদের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই ভগিনী যূথেশ্বরী হইবেন এবং এই দুই ভগিনীর যদি যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাজিত করিবেন।"

ইহার মধ্যে আরও একটুকু রহস্য আছে। বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস-নাশক মন্ত্র পাঠ করেন। পুতনা ইহাতে বিত্রস্তা হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশগামিনী একটী নদীর স্রোতে পতিত হন। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মক চন্দ্রাবলীকে নদীর স্রোতে পাইয়া নিজগৃহে আনয়ন করেন ও প্রতিপালন করেন। যখন চন্দ্রাবলীর পাঁচ বৎসর বয়স, বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে জাম্ববান্ বিদর্ভ নগর হইতে তখন চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করেন। এই চন্দ্রাবলীই করালার নাতনী। গার্গী বলেন, তিনি তাঁহার পিতা গর্গের নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, দুর্ব্বাসা মুনির বরে বৃষভানুর ঔরসে শ্রীরাধার জন্ম হইয়াছিল। পৌর্ণমাসী গার্গীকে বুঝাইয়া দিলেন ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবন্মায়া ভগবতী চন্দ্রভানু ও বৃষভানুর স্ত্রীদ্বয়ের গর্ভ হইতে চন্দ্রাবলী ও রাধাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বতের স্ত্রীরগর্ভে সংস্থাপন করেন। পৌর্ণমাসী পুতনার ক্রোড় হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্দ্রার সখী মনোজ্ঞা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামাকে প্রাপ্ত হন। পৌর্ণমাসী আরও বলেন যে যশোদার ধাত্রী মুখরাকে আমি বলিয়াছি যে এই বহুগুণশালিনী শ্রীরাধা তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।"

বিশাখার জন্ম গোকুলে নয়। বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলা তাঁহাকে তুলিয়া আনেন। গার্গী বলেন, আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি, চন্দ্রভানু ও বৃষভানু প্রভৃতি গোপগণের কন্যাগণ ক্ষত্রিয়রাজ ভীষ্মকাদির কন্যাগণের সহিত একই তত্ত্ব, কেবল দেহমাত্র ভেদ। এবিষয় অতঃপরে ব্যক্ত হইবে। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কেবল মায়ারই ছলনা, উহা বাস্তবিক নহে। এই সকল কন্যা

গোপদিগের স্পর্শযোগ্যও নয়, উঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী। এই রহস্যটুকু ললিতমাধবনাটক পাঠার্থীদিগের পক্ষে প্রথমতঃ জানিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে।

শ্রীমতী সত্যভামার স্বপ্নাদেশে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশে শ্রীরূপ ব্রজ-লীলা ও পুর-লীলা পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করেন। বিদগ্ধ-মাধবে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে,ললিতমাধবে পুর-লীলার চমৎকারিত্বময় বর্ণনা করিয়া পূজ্যপাদ কবিপ্রবর অত্যদ্ভুত কল্পনা-কুশলতার পরিচয় প্রকটন করিয়াছেন। এই নাটক খানিতে ঘটনার চমৎকারিত্ব ও বহুলত্ব প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, রস-পুষ্টি ও নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ভগবৎপার্ষদ শ্রীপাদ শ্রীরূপের অতি স্বাভাবিক বৈভব, এই নাটকের পদে পদেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীচরিতামৃতে ললিতমাধবনাটক-পরীক্ষণ-ব্যাপারে শ্রীরামানন্দ ও শ্রীপাদ রূপের কথোপকথনও এখানে উল্লেখ যোগ্য।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসমভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত-প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদন।
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥

* * * * *

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিল সুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃ শশী মুদং বঃ॥

এই নাটকের টীকাকার, পরমপূজ্য শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয়

এই পদ্যের টীকায় লিখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপা-পাত্র শ্রীপাদরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য এই নাটকের অবতারণা। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মহাশক্তিশালী সুকবি, সকল বিষয়েই সুপণ্ডিত। শ্রীভগবানের নিরতিশয় প্রিয়জন। লৌকিক গণনাতেও দেখাযায়, তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী। তিনি যখন বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য,ইহার উপরে আমরা আর কি বলিতে পারি? তবে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ ব্যাপারটা কি আমাদের পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার লক্ষণ এই যে :—

দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥

পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নায়ক নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে এবং তাহাদিগের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

এই সম্বন্ধে এস্থলে সূত্র-স্বরূপ যাহা বলা হইল, পাঠকগণ নাটকমধ্যে তাহার প্রমাণ পাইবেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা লইয়া আরও একটুকু অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। শ্রীরায় মহাশয় অভীষ্ট দেবের স্তুতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীরূপ একটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন; অবশেষে অবনত মস্তকে ভক্তিভরে মহাপ্রভুর চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন :—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজ-স্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততি র্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃত জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

যিনি পরম করুণায় ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় নিজপ্রেমামৃত–

বিকিরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ,যিনি জগতের তমোরাশি নিঃসারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুত নামা শশী আমার অনির্ব্বচনীয় কোন সুখ সম্পাদন করুন।

প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, একি করেছ :—

কাঁহা তোমার কৃষ্ণ রস-কবিত্ব-সুধা-সিন্ধু।
তার মধ্যে কেন মিথ্যা-স্তুতি-ক্ষার-বিন্দু॥

রায় মহাশয় বলিলেন, দয়াময়, শ্রীরূপ ভালই করিয়াছেন ;

রূপের বাক্য হয় অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছেন কর্পূর॥

প্রভু বলিলেন, রাম রায়,ইহাতেও তোমার চিত্তে উল্লাস হইল ? কিন্তু ইহা শুনিতেই লজ্জাজনক এবং লোকের উপহাসাস্পদ।" শ্রীরাম রায় বলিলেন, অভীষ্টদেবের স্তুতি ও মঙ্গলাচরণ-শ্রবণে লোকের আনন্দ উল্লাসই হইয়া থাকে, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না।

অতঃপরে রাম রায় বলিলেন, শ্রীপাদ, কোন্ অঙ্গে পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন ? শ্রীরূপ বলিলেন, উদ্ঘাত্যক নামক আমুখবিধি অঙ্গে পাত্র প্রবেশ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। শ্রীরূপ এই বলিয়া পাত্র প্রবেশ শ্লোক পাঠ করিলেন যথা :—

নটতা কিরাতরাজং নিহত্যরঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারা-কর-গ্রহণম্॥

কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজকে বধ করিয়া পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে তারার কর গ্রহণ করিবেন।

এই কথার পর নেপথ্যে বলা হইল, কি আশ্চর্য্য ! কংস ভূপতির ভয়ে সুস্পষ্টভাবে বলিতে না পারিয়া, নৃত্য করিতে করিতে "কিরাত রাজ" এই শব্দচ্ছলে যিনি শ্রীরাধামাধবের পাণিগ্রহণ বুঝাইয়া দিলেন, এই ধন্য ব্যক্তি কে ? আমি চিন্তাকুল ছিলাম, আমাকে ঐ বাক্যে আশ্বাস

প্রদান করিলেন, এই কথায় পৌর্ণমাসীর প্রবেশ হইয়াছে। (এখানে ক্রিয়াতন্ত্রাক কংস, তারা শ্রীরাধা এবং করগ্রহণ অর্থে পাণিগ্রহণ; সুতরাং অপরের ভিন্নার্থ শব্দকে নিজাভিপ্রায় বোধক করা হইল বলিয়া ইহা উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা হইল। (নাটকচন্দ্রিকার এই উদ্ঘাত্যক লক্ষণ সাহিত্য-দর্পণ হইতে উদ্ধৃত) ।

শ্রীপাদরূপ বলিলেন, রায় মহাশয়, আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনার সমক্ষে আমার মত অজ্ঞের এই সকল কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত অশোভনীয়। রায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, বিনয়ই যে ভক্তের ভূষণ তাহা আমি জানি। তাহার উপরে আবার প্রভুর শক্তির সঞ্চার! সে যাহা হউক, অতঃপর আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। এখন এই নাটকের অঙ্গের সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীরূপ তখন পরিকর নামক মুখ-সন্ধি অঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিস্‌ষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী॥

ললিত মাধব নাটকে প্রথম অঙ্কে গার্গী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন,—যিনি লজ্জা অপহরণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই নিপুণা উৎকৃষ্ট মুরলীর কাকলীরূপনিস্‌ষ্টার্থা দূতী জয় যুক্তা হউন।

এই শ্লোক পরিকর নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ। যথা নাটক চন্দ্রিকাতে :—

বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ং পরিকরোবুধৈঃ।

বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই শ্লোকে বনাকর্ষণাদি দ্বারা অনুরাগ বীজের বিস্তার করা হইয়াছে।

উজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে নিস্‌ষ্টার্থা দূতীর যে লক্ষণ আছে উহা এই :—

গৃহীতকার্য্যভারা স্যাৎ যুক্ত্যোরেকতরেণ যা
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিস্‌ষ্টার্থা নিগদ্যতে।

উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে এই পদ্যটী নিসৃষ্টার্থা দূতীর উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীরূপের নাটক পরীক্ষণে নাটকীয় লক্ষণ ও তাহার উদাহরণ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করেন, তন্মধ্যে অতি সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটী মাত্র উদাহরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধরণের আলোচনা করিলে কেবল নাটকের লক্ষণ ও উদাহরণ বিচারে বৃহৎ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। চরিতামৃতে সেই বিচারের প্রণালী মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটক চন্দ্রিকায় যে সকল নাটকীয় লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণের উদাহরণ বিদগ্ধমাধবে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে সে বিষয়ের সুদীর্ঘ আলোচনার অবসর নাই। এই নাটকে আলোচিত ঘটনা ও তন্নিহিত কাব্য চমৎকারিত্বের কিঞ্চিৎ আদর্শ প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য।*

এই নাটকের প্রথম অঙ্কে—সানন্দ উৎসব, দ্বিতীয় অঙ্কে—শঙ্খচূড় বধ, তৃতীয় অঙ্কে—উন্মত্ত রাধিকা, চতুর্থ অঙ্কে—রাধাভিসার, পঞ্চম অঙ্কে—চন্দ্রাবলী লাভ, ষষ্ঠ অঙ্কে—ললিতা-উপলব্ধি, সপ্তম অঙ্কে—নব-বৃন্দাবন-সঙ্গম, অষ্টম অঙ্কে—নববৃন্দাবন-বিহার, নবম অঙ্কে—চিত্র-দর্শন এবং দশম অঙ্কে—পূর্ণমনোরথ,—এই কয়েকটী বিষয় এই নাটকে আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবী দধিমন্থনের সুদীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অঙ্কে শঙ্খচূড় বধই প্রধান ঘটনা কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত হইয়াছে। এই অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও শঙ্খচূড়,—এই তিনজন পাত্র এবং বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, মুখরা, জটিলা, শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা ও কুন্দলতা,—এই কয়েকটী পাত্রী আছেন। উপনন্দের পুত্রবধূ শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃবধূ কুন্দলতা এই অঙ্কের রসময়ীপাত্রী। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিতেই রসময় বচন-চাতুর্য্য পাঠকগণের হৃদয়ে প্রেমরসানন্দের উদ্রেক ও সঞ্চার করিয়া দেয়। শঙ্খচূড় এবং কুন্দলতা ব্যতীত অন্যান্য সকল পাত্র পাত্রীই

বিদগ্ধমাধব পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। ইঁহাদের চরিত্রে সবিশেষ কোন নূতন ভাবের অবতারণা এই অঙ্কে দৃষ্ট হইল না। পাত্র ও পাত্রী-গণের প্রেমরসাত্মক ভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই অঙ্ক হইতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রূপানুরাগজনক দুইটী পদ্য পাঠকগণের আস্বাদনের জন্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বিহার-সুর-দীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বর তটস্য চাভরণ চারু তারাবলী
ময়োন্নত মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা।

শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিয়া হস্তাবরণপূর্ব্বক বলিলেন, যিনি আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী, যিনি নয়ন-চকোরের শারদীয় পূর্ণচন্দ্রপ্রভা এবং যিনি হৃদয়াকাশের নক্ষত্রমালা, সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথ দ্বারা লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকটী নাটকীয় গুণ-কীর্ত্তন নামক ভূষণ। এই শ্লোকে সুরদীর্ঘিকাদি শব্দ দ্বারা শ্রীরাধিকার গুণ-কীর্ত্তন করায়, ইহাকে গুণকীর্ত্তন নামক নাটকের ভূষণ বলে যথা :—

লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনাং যত্র নামভিঃ।
একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনম্।

অতঃপরে শ্রীরাধা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষদ্ অবলোকন করিয়া হস্তা-বরণ পূর্ব্বক বলিলেন,—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি,
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভি র্দৃগঞ্চলতস্করৈ,
র্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

"হে সহচরি, যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং মদমত্ত

মত্তগজের ন্যায় যাঁহার বিলাস, সেই এই নিরাতঙ্ক যুবা কে, এবং কোথা হইতেই বা ব্রজমণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন? যিনি আমাদিগের সমক্ষে চঞ্চল এবং ভ্রমণশীল কটাক্ষ-তস্কর দ্বারা আমার চিত্ত ধনাগার হইতে ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছেন।" এইটী বিধান সন্ধির উদাহরণ। মুখ-সন্ধির যে অঙ্গ সুখদুঃখকর হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বিধান নামে অভিহিত করেন।

শ্রীচরিতামৃতে এইরূপে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের পরীক্ষণের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহা দিগ নির্দ্দেশমাত্র। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দুই নাটকের প্রায় সকলগুলি উক্তিই নাটকীয় লক্ষণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ। তদুপরি প্রেমরসের ভিন্ন ভিন্ন বহু অবস্থার উদাহরণও এই দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপাদ রূপের নাটকগুলি প্রেম রস-সুধার অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার। রসিক, ভাবুক, প্রেমিক ভক্ত নরনারী মাত্রেরই ইহা নিত্য পাঠ্য ও শ্রাব্য। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ রামরায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা :—

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥

* * * *

কিং কাব্যেন কবে স্তস্ত কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

"সেই কবির কাব্য রচনায় প্রয়োজন কি এবং সেই ধনুর্দ্ধারীর বাণ নিক্ষেপেরই বা প্রয়োজন কি, যদি উহারা পরহৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তক

ঘূর্ণিত না করায়।" ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ রূপের কাব্য সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ সুপ্রেমিক রস-শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ শ্রীপাদ রাম রায়ের অভিমত। শ্রীপাদ রায় মহাশয় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ও প্রিয় পার্ষদ। ইনি ব্রজলীলার সেই সুধীরা গভীর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী বিশাখা দেবী। শ্রীরাধার নর্ম্মসখীগণের মধ্যে ইঁহার আসন অতি উচ্চতম। ইহার উপরে স্বয়ং রসিক-শেখর রসরাজ প্রেমানন্দ-রস-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু এতৎ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন:—

প্রভু কহে প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজ-লীলা-প্রেম রস বর্ণে নিরন্তর॥

মহাপ্রভুর কৃপা-আশীর্ব্বাদে এবং ভক্তগণের স্বারসিক আন্তরিক কল্যাণকামনায় শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজ-লীলা প্রেমরসসম্বন্ধে যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়ী বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা গোলোক-বৃন্দাবনেরই অগাধ, অপরিসীম প্রেমানন্দ-তরঙ্গ-রঙ্গ-কল্লোলময় মহা মহা সিন্ধু।

তৃতীয় অঙ্কে শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ। এই ব্যাপার শ্রীপাদ রূপের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ এই গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মহাঘটনা। শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ বিরহ ও বিরহ-বিভ্রমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিধুরা শ্রীরাধার প্রলাপ উদ্ঘূর্ণন বিবিধ উন্মাদ চেষ্টা প্রভৃতির বর্ণনা গৌর-ভক্তগণের মানসনেত্র-সমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ সমুজ্জ্বল ভাবে সমুপস্থাপিত করিয়া দেয়। সুবিখ্যাত "ক নন্দকুল-চন্দ্রমা" পঙ্ক্তী এই অঙ্ক হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপী-দিগের বিরহ-বর্ণন পাঠে বাস্তবিকই হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু উহাতে হৃদয় পবিত্রতা এবং ব্রজরসধারণার যোগ্যতা লাভ করে। উহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা ও আকুলতা বৃদ্ধি পায়। এই অঙ্কের পদ্যগুলি বাস্তবিকই মহাপ্রভুর কৃপা-প্রসাদের সমুজ্জ্বল নিদর্শন; "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" পদ্য শুনিয়া যিনি শ্রীরূপের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিয়াছিলেন, "মোর মনের ভাব তুই জানিলি কেমনে," এই অঙ্কের সকল গুলি পদ্যই তাঁহারই মনের ভাব এবং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে এই কথা বলাই যথেষ্ট। এই অঙ্কের কোন পদ্য আস্বাদনের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইলে সমগ্র অঙ্কের সকল পদ্যই উদ্ধৃত করিতে হয় কিন্তু তাহা করা অপেক্ষা প্রিয় ভক্তগণ-সমক্ষে আমাদের এই নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্রজ-রসের সিদ্ধকবি শ্রীপাদরূপের এই নাটক গ্রন্থাবলীর রসসুধা,—সুরসিক প্রেমিক ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করেন। তৃতীয় অঙ্কের উপসংহার বিয়োগান্ত ব্যাপার। বৃন্দাবনের রসময়ীগণ যেন বিরহ-শোকে প্রকট লীলা হইতে অপ্রকট হইলেন!

চতুর্থ অঙ্কে দ্বারকায় ব্রজ-লীলা নাটক, উদ্ধব ও পৌর্ণমাসীর প্রযত্নে অভিনয় হইতে আরব্ধ হইয়াছে। এই অঙ্কের প্রথমে উদ্ধব ও গার্গীর কথোপ-কথনে জানা যায় যে পৌর্ণমাসী, সঙ্গীত বিদ্যার বিধাতা ভরত মুনির নিকট প্রার্থনা করিয়া একখানি অপূর্ব্ব রূপক নাটকের সৃষ্টি করেন। দেবর্ষি নারদ উহা তুম্বরুর হস্তে প্রদান করেন। তুম্বরু আবার গন্ধর্ব্বগণকে ঐ নাটক শিক্ষা দিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ব্রজ-লীলা নাটক অভিনয় করি-বার জন্য দ্বারকায় রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে সমাগত হইয়া ব্রজ-লীলা নাটক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই নাটক অভিনয়ের দর্শক। তিনি তাঁহার রূপ-মাধুর্য্য দেখিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইলেন এবং উহা আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধা-রূপ ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন।

এই ব্রজলীলা নাটক অভিনয়ে রসের তরঙ্গ-রঙ্গে পাঠকগণের চিত্ত নিরতিশয় আনন্দ রসাস্বাদনে নিমজ্জিত হয়। ইহার স্থানে স্থানে এমন রসময়ী উক্তি আছে যে পাঠের সময়েও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। একটী উদাহরণ দিতেছি। "যখন মাধব শ্রীরাধিকার প্রতি নয়ন কোণে দৃষ্টি-পাত করিতেছিলেন, তখন মনে মনে বলিতেছিলেন, যাহাতে মনের অতিশয় আসক্তি হয়, সেখানে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এ প্রবাদ মিথ্যা নয়।" এই সময়ে জটিলা আসিয়া নাসাগ্রে তর্জ্জনা বিন্যাস পূর্ব্বক মস্তক কম্পিত করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত, হইয়া বলিলেন, ওরে বালিকা-ভুজঙ্গ, কাহাকে দংশন করিবার জন্য এখানে ভ্রমণ করিতেছিস্?

মাধব। লম্বোষ্ঠি, গোষ্ঠ-পিশাচি, তোমাকেই?

ইহা শুনিয়া উদ্ধব হাসিতে লাগিলেন। নর্ম্মক কৃষ্ণ বলিলেন, সখে, গোকুল-কুল বৃদ্ধাদিগের কঠোর বাক্যে যেরূপ আমাকে আনন্দিত করে, মহামুনিগণের মধুরপদ সম্বলিত স্তুতিবাক্য তদ্রূপ আনন্দ প্রদান করে না। এইরূপ পদ্য বিল্বমঙ্গলকৃত কোষকাব্যেও আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদ স্তুতি হতে তাহা হরে মোর মন॥

বৃন্দা বলিলেন, যে কৃষ্ণের চরিতামৃত পান করিয়া ধার্ম্মিকগণ জীবন ধারণ করেন, সেই কৃষ্ণ চন্দ্রে কামুকত্ব দোষারোপ করা উপযুক্ত নয়।" এইরূপ রসময় ও সিদ্ধান্তময় বহুল সংক্ষিপ্ত প্রত্যুক্তি এই অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিমন্যুকে কৃষ্ণ মনে করিয়া জটিলা যেরূপ অকাণ্ডে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অভিমন্যু তাহাতে যেরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহা পাঠে হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব। মাতার উন্মত্ততা দেখিয়া অভিমন্যু পালাইতে চেষ্টা করিলেন, জটিলা দৌড়াইয়া গিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ

পূর্ব্বক খুব স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন,ওরে চোর তোকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি, আর কিরূপে পলায়ন করিবি ?" অভিমন্যু লজ্জায় অভিভূত হইয়া বলিলেন, আমার মাকে কি ভূতে পাইয়াছে ?" সকলেই তখন হাসিতে লাগিলেন। জটিলা তখন বুঝিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। ভারুণ্ডা বলিলেন "বৎস, তোমার মা যথার্থই উন্মাদিনী, যেহেতু তোমাকে মাধব বলিয়া মনে করিয়াছে। অতঃপরে যখন প্রকৃত মাধব, সময়ও সুবিধা মত জটিলার আঙ্গিনায় আসিলেন, তখন জটিলা তাঁহাকে আপন পুত্র অভিমন্যু মনেকরিয়া রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম-সহায় হইলেন। এইরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের অনুষ্ঠিত কল্পিত ব্রজলীলা নাটক শেষ হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ অঙ্কের যবনিকার পতন হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধা-চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে চন্দ্রাবলীর চরিত্র বর্ণন। দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্মিণী রূপে এবং শ্রীরাধা সত্যভামারূপে প্রকাশিতা। পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য স্থান—ভীষ্মকের রাজধানী বিদর্ভ নগর। রুক্মিণীর বিবাহ এই অঙ্কের প্রাথমিক ঘটনা।

ললিত মাধব ক্লিপ্ত নাটক। শ্রীমদ্ভাগবতে রুক্মিণী দেবীর বিবাহের ঘটনার সহিত এই নাটকের মূল ঘটনায় মিল আছে।

ষষ্ঠ অঙ্কে রুক্মিণীরূপিণী চন্দ্রাবলীর বিবাহ। এই বিবাহ-ব্যাপার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত রুক্মিণী বিবাহ-ব্যাপারেরই প্রায় অনুরূপ। এই অঙ্কের শেষভাগে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহ-বিধুরা। তীব্র ঔদাসিন্যে এবং বিরহ-যাতনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। তিনি নির্জ্জন স্থানে বাসের বাসনা প্রকাশ করেন, তদনুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত দ্বারকায় নববৃন্দাবন শ্রীরাধার অবস্থান-স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ষষ্ঠ অঙ্কের অন্যান্য ব্যাপারের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা না করিয়া সুমধুর সপ্তম অঙ্কে রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

সপ্তম অঙ্কটি পাঠের সময় মনে হয় যেন একটি স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধা দ্বারকার নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে সেই শ্রীবৃন্দাবন, 'সেই সব,' 'সেই সব', অথচ প্রাণে শান্তি নাই, সেই বৃন্দাবনের দৃশ্যাবলী, তরুলতা, বনের ফুলপাতা, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বাড়ীঘরপথঘাট, সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী কদম্ববীথী সেই লতা-বিতানে রচিত কেলিকুঞ্জ,—সকলই শ্রীবৃন্দাবনের মতই শ্রীরাধার মনে হইতেছে, অথচ সে আনন্দ নাই, চিত্ত উদাস, গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নাই। কিছুতেই মন বসিতেছে না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

লতাশ্রেণী সেয়ং সহচরি চিরসেবিতচরী
পুরস্তেঽমী ভূয়ো ধৃতপরিচয়াঃ কুঞ্জনিচয়াঃ।
অমুত্রা বানুত্যো মৃদু রচিতা পূর্ব্বা স্তটভুবো
ব্যাথামেব ক্রূরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্।
যেন সেই বৃন্দাবন সেই লতা কুঞ্জবন
অই সে যমুনাতট,—চির পরিচিত।
কিন্তু বিনা শ্যাম রায় কিছুই মনে না ভায়
শূন্য শূন্য মনে হয় উদাসীন চিত॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—সূর্য্য মণ্ডল হইতে যখন শ্রীরাধা দ্বারকায় প্রেরিত হন, তখন সূর্য্যদেব বলিয়া দিয়াছিলেন দ্বারকার নববৃন্দাবনে চিত্তের ব্যাথা প্রশমিত হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ ঘটিবে। কিন্তু হরি তো মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আমি এই দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

এই নববৃন্দাবনে, নববৃন্দা ও বকুলা শ্রীরাধার সখীরূপে নিকটে রহিয়াছেন। নব বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীরাধা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের

গাত্রগন্ধও যেদিকে প্রবাহিত হয়, আমি তাহা হইতে কত সুদূরে পড়িয়া রহিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এক নিমেষ সময়ও আমার নিকট কল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। আশাময় ঘৃতে আমার প্রাণের আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। সখি বল দেখি এখন আমি কি করি, কাহার শরণ গ্রহণ করি? বকুলা বলিলেন, আমাদের সুন্দর শেখর রাজেন্দ্র ত্রিলোক শাসন করিতেছেন। তিনি রুক্মিণীর পতি, আমি রাজ-মহিষী রুক্মিণীর প্রতিকূল-বর্ত্তিনী হইয়াও আমাদের রাজেন্দ্রের নিকট আপনার কথা জ্ঞাপন করিতে পারি।

শ্রীরাধা অতীব অসন্তোষের সহিত বকুলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, এক ব্রজেন্দ্রের পাদপদ্ম ভিন্ন আর কোন রাজেন্দ্রে এ চিত্ত কখনই আকৃষ্ট হইবে না। বকুলা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তাহা হইলে কিসে আপনার হিত হয়, তাহা নব বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শ্রীরাধা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন, হায় হায়! বিধাতা আমাকে এখন এমনই পরাধীন করিয়া ফেলিলেন; আমি এখন কি করি?

নববৃন্দা আসিয়া বলিলেন, সরলে, ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও। এই কথা বলিতে গিয়া নববৃন্দা এসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। তাহার শপথের কথা মনে হইল। দ্বারকার রাজেন্দ্রই যে ব্রজেন্দ্র,—শ্রীরাধাকে এসম্বন্ধে না বলার জন্য তাঁহাকে শপথ করান হইয়াছিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায় কিরূপে সহসা শপথ বিস্মৃত হইলাম; তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, রাজেন্দ্রকে রামচন্দ্র এবং উপেন্দ্রও বলা হয়। তখন বকুলা বলিলেন সখি, এই জন্যই তো বলিয়াছিলাম, তুমি রাজেন্দ্রকে আনন্দিত কর।

শ্রীরাধা বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী-বংশীবদন শিখিচন্দ্রিকা-চূড়াধারী শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন হরির অন্য কোনও রূপ কখনও আমার মন চায়না।

বকুলা বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি অতি সরল, যে তোমায় মনে করে না, তুমি সেই কঠোর জনেই আবার অনুরক্ত হইতেছ"। তখন শ্রীরাধা সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, এমন কথা আর বলিও না। শ্যামসুন্দর স্বেচ্ছাচারী পুরুষ; তিনি আমার প্রতি ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করিয়া যদি সহস্র বৎসর কাঠিন্য অবলম্বন করেন,—করুন; কিন্তু আমার দেহ-মন-প্রাণ-জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে জন্মে জন্মেও যেন আমার দাস্য-প্রণয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়। নববৃন্দা বলিলেন, বকুলে, ইনি অত্যন্ত পতিব্রতা; কান্ত ...।

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রেমিক মাত্রেরই উচ্চতম আদর্শ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সন্তাপে ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যদি আশাময়ী নির্দ্দয়া শৃঙ্খলা আমায় আবদ্ধ না রাখিত, তাহা হইলে এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতাম কিন্তু এখন মনে হইতেছে যেন কোন-না-কোন সময় তাঁহার চরণদর্শন করিতে পারিব," এই বলিয়া শ্রীরাধা নীরব হইলেন। বকুলা বলিলেন সখি, শয্যা প্রস্তুত।" শ্রীরাধা শয্যার দিকে গমন করিলেন, কিন্তু প্রাণে তো শান্তি নাই, শয্যায় শয়নে দুঃখ বিনা সুখ নাই। তিনি বলিলেন, এখন আমি কি করি? বকুলা আবার বলিলেন, সখি, শয়ন কর। শ্রীরাধা বলিলেন, নববৃন্দে, নিত্য কর্ম্ম না করিতে পারিয়া দুঃখ হইতেছে।

নববৃন্দা বিস্মিত হইয়া বলিলেলেন, সখি, তোমার আবার নিত্যকর্ম্ম কি?

শ্রীরাধা। আমরা পিত্রালয়ে নারদের উপদেশে প্রত্যহ একটি দেবতার উপাসনা করিতাম। সেই দেবের মাথায় ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া, হাতে মোহন বাঁশী, নেত্র বাম দিকে বক্র, শরীর ত্রিভঙ্গ, আকৃতি কিশোর সজল-জলধর-রুচি শ্যামল কান্তি। প্রত্যহ ইহার উপাসনা ভিন্ন আমরা আহার নিদ্রা করিতাম না। সেই নিত্য কর্ম্ম করিতে না পারিয়া চিত্তে কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না।

নববৃন্দা বুঝিলেন, গোপবেশশালী শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি-দর্শনই ইহার হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং নববৃন্দাবনের অলঙ্কারের নিমিত্ত ইন্দ্র-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা ইন্দ্রনীলমণিময়ী গোবিন্দ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাকে দেখাইব। এই ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমার ইষ্টদেবকে আবির্ভূত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। এই বলিয়া নববৃন্দা চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে নব-কর্ণিকার-তরু শ্যামল শোভায় শোভিত, তাহাতে ফুল গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখা মাত্রই তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন :—

রাসাত্তিরোহিত তনু র্নিশি যস্য পুষ্পৈ
শ্চূড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্ছচূড়ঃ।
কূলে কলিন্দদুহিতু র্ধৃত কন্দলোহয়ং
মাং দন্দহীতি স মুহু র্নব কর্ণিকারঃ॥

রাস হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া শ্রীগোবিন্দ এই কর্ণিকার ফুলে আমার চিকুর কত আদরে সোহাগে চূড়া রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, আজ এই ফুল দেখিয়া সেই অতীতের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল; সেই কথা মনে পড়িয়া চিত্ত দগ্ধ হইতেছে।

অতঃপরে নববৃন্দা আসিয়া বলিলেন, সখি, তোমার ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিবে, এস। বকুলা বাসন্তী গৃহ হইতে পূজার উপকরণস্বরূপ বস্ত্র মাল্যাদি লইয়া আসিলেন। নববৃন্দা হাসিয়া বলিলেন সখি, গন্ধ-ধূপদীপ-নৈবেদ্য-স্তুতিণতি দ্বারা যাহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাহারা অপর শ্রেণীর লোক। তোমাদের ন্যায় গোকুল সুন্দরীদের বক্রদৃষ্টি-সমন্বিত আলিঙ্গনাদিই শ্যামল সুন্দরের পূজার সামগ্রী।

যৈঃ পুষ্পাবলি-গন্ধধূপ-বলিভি র্দামোদরঃ সেব্যতে
কুর্ব্বন্তিঃ স্তুতিপূর্ব্ব মুক্তমনতী স্তেতাবাবদন্যে জনাঃ।

সেবা কোকিলকণ্ঠি গোকুলভুবাং যুষ্মাদৃশীনাং হরৌ
বক্রালোককলা-করম্বিত-পরীরম্ভাদি লীলাময়ী ॥

মণিময়ী প্রতিমা দর্শন করা মাত্রই শ্রীরাধার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হইল, তিনি মণিময়ী প্রতিমাকে মনোময়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি নববৃন্দাকে বলিলেন, ইন্দুমুখি, আজ আমার দেহ-ধারণের সকল ক্লেশ দূর হইল।" তিনি শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন বন্ধু, পূর্ব্বে তোমায় সকল কার্য্যেই বুঝিতে পারিতাম, তুমি আমার। তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ কিন্তু কথা বলিতেছনা কেন? তোমার হৃদয় যে এত কঠিন তাহাতো জানিতাম না। তোমার বক্ষে ধৃত কৌস্তুভমণির সংসর্গেই কি তোমার হৃদয় এমন কঠিন হইল?" এই বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীমূর্ত্তির হাত ধরিলেন কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি নীরব, নিস্পন্দ! শ্রীরাধা দুঃখ করিয়া বলিলেন সখি, এই ধূর্ত্ত-শেখরের ভাব দেখ। মুখে কথা নাই, পরিহাস-বাক্য নাই, আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণের চেষ্টা নাই,—কেবল হাসি মাখা মুখে কুটিল দৃষ্টিতে ইনি আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন মাত্র।

নব বৃন্দা মনে মনে বলিলেন, কৃষ্ণ প্রেমানুরাগ-সাগরের কি অনির্ব্বচনীয় তরঙ্গ! প্রকাশ্যে বলিলেন, ধূর্ত্ত-নাগর-শিরোমণিদিগের ইহাই পরিহাস চাতুরী।

শ্রীরাধা আলিঙ্গন করার জন্য শ্রীমূর্ত্তির বক্ষ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, অমনি সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, চিত্ত-বিভ্রম দূর হইল। তিনি নিজকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, হা ধিক্ হা ধিক্! আমি গাঢ় উৎকণ্ঠায় নীলমণিময়ী পাষাণ প্রতিমাকেই মনোময় নীলমণি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম!

সহৃদয় প্রেমিক পাঠক মহোদয়গণ, এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, প্রেমানুরাগের কি উৎকট আকাঙ্ক্ষা! যতক্ষণ স্বপ্ন,—ততক্ষণই সুখ। বিরহী-জীবনে স্বপ্নটুকুই সম্বল, আর অবশিষ্ট জাগরণের জীবন,—শুধুই হাহাকার, শুধুই দুঃখময়!

বকুলা মাল্য বস্ত্র-চন্দন আনিয়া শ্রীরাধার হাতে দিলেন। শ্রীরাধা তদ্দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি অলঙ্কৃত করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে মাধবী আসিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাধা সজল নয়নে শ্রীমূর্ত্তিটিকে পুষ্পচন্দনে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু হাত কাঁপিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই নববৃন্দা ও বকুলা শ্রীরাধাকে লইয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন। মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় রাধানুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে তাঁহার নিজের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মধুমঙ্গল বলিলেন সখে, শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে কোন অনুরাগিণী এই প্রতিমার সেবা করিয়াছেন।”

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিমা-সেবিকা তরুণীদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়া মধুমঙ্গলকে বলিলেন, তুমি সত্বরে প্রতিমাখানিকে স্থানান্তরিত কর। আমি এই সেবিকাগণের ভাব-নিষ্ঠা পরীক্ষা করি।” প্রতিমা স্থানান্তরিত হওয়া মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ঠিক্ সেই প্রতিমার ন্যায় বেদিকায় অধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। সখীদ্বয় সহ শ্রীরাধা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই প্রতিমা কি সুন্দর ও কি মধুর! ঠিক্ যেন স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ এই তরুণী সেবিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে করিতে লাগিলেন যেন কোথাও দেখিয়াছেন, শেষে ভাবিলেন. ইনি কি আমার প্রাণবল্লভা রাধা? তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সম্বরণ করিয়া ভাবিলেন, আমার সুখার্থে বিশ্বকর্ম্মা বুঝি মায়াময়ী শ্রীরাধা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, নতুবা দুর্গবেষ্টিত দ্বারকায় আমার অন্তঃপুরে শ্রীরাধার অবস্থান সম্ভাবনা কোথায়?

অপর পক্ষে শ্রীরাধারও সেই অবস্থা। তিনি সজল নয়নে বলিলেন, আমার মুগ্ধতাকে ধিক্। আমি গোবিন্দ-প্রতিমাকেই গোবিন্দ বলিয়া মনে

করিতেছি।" তখন উৎকণ্ঠায় ও আবেগে তিনিপ্রকাশ্যে বলিয়া ফেলিলেন, ওগো প্রতিবিম্ব, তোমার স্বীয়বিম্ব নলিন-নয়ন শ্রীগোবিন্দের কুশল তো ?

শ্রীমূর্ত্তি বলিলেন, সর্ব্বপ্রকারে ঊর্দ্ধলোকগামিনী শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া মায়াযন্ত্রময়ী তুমি যখন তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবশ্যই বলিতে হইবে, তিনি ভালই আছেন।

শ্রীরাধা শ্রীমূর্ত্তির মুখে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সর্ব্বভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ • প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ের নয়নজল উভয়ে মুছাইয়া দিলেন। শ্রীরাধিকার হৃদয়ে বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বকুলা ও নববৃন্দা রুক্মিণীর আগমন আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। নববৃন্দা আবার প্রত্যাগত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এই সময়ে চন্দ্রাবলী আসিয়া দেখা দিলেন এবং মাধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রাধানুরাগের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর কথোপকথন আরম্ভ হইল, চন্দ্রাবলী প্রত্যেক কথাতেই অসূয়ারূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী অসূয়ান্বিত হৃদয়ে বলিলেন, আপনি স্বীয় প্রণয়ীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, এই আমি অন্তঃপুরে যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি নিজ পরিজন সহ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। চন্দ্রাবলী এখানে ধীরা নায়িকার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গল সহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এইরূপে সুমধুর সপ্তম অঙ্কের যবনিকা পতন হইল। অষ্টম অঙ্কে অভিমানবতী চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার নব বৃন্দাবনে প্রবেশ, শ্রীরাধার সহিত কথোপকথন, শ্রীরাধার বিশাখার জন্য ব্যাকুলতা, বিশাখা কোথায় আছেন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সেই

বার্ত্তা জ্ঞাপন, নববৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নৈসর্গিক শোভা-বর্ণন, শ্রীবৃন্দাবনের দৃশ্যাবলী নববৃন্দাবনে কোথায় কিরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের তদ্দর্শন এবং পূর্ব্বানুভব সংস্মরণ প্রভৃতি সমুজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশ পাঠ করিয়া ভবভূতি-বর্ণিত আলেখ্য প্রদর্শনের কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখাইতে দেখাইতে রাধিকার শিরোভূষণ নির্ম্মাণার্থ মাধবী ও মালতীপুষ্প চয়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়া মণিভিত্তে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং শ্রীচরিতামৃতে পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত সেই সুপ্রসিদ্ধ "অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী" শ্লোকে মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন।

এই সময়ে চন্দ্রাবলী আগমন করিয়া শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন এবং অসূয়ার সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আমি বন্ধুজনের অধীনা, তাহারা আমাকে আপনাদের গৃহে সমর্পণ করিয়াছেন। এই গৃহের গৃহপতি অতি চঞ্চল, তাঁহার নিকট সতীত্বেয় সতীত্ব রাখা অসম্ভব। এখন আমার সম্বন্ধে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।" চন্দ্রাবলী বলিলেন, তুমি বিশ্বস্তা হও, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিতে পারিবেন না। বিচক্ষণা মাধবী সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" এইরূপে এই অঙ্কের যবনিকা পতন হইয়াছে। এই অঙ্কে রত্নাবলী নাটিকার ছায়ায় ন্যায় একটি চিত্র বিচক্ষণ পাঠকগণের স্মৃতিপথে উদিত হয়।

নবম অঙ্কে সুকণ্ঠি, শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধার কথোপকথনের মধ্যে ব্রজ-লীলার চিত্রপট-দর্শন,—সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা হইতে মথুরা-লীলা পর্যন্ত বহু লীলার স্মৃতি চিত্তে উদিত হয়। ইহাতে শ্রীরাধার উপহাসময়ী রসময়ী বহুল উক্তি পরিলক্ষিত হয়; তাহা পাঠে চিত্তে স্বভাবতঃই আনন্দরস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। চিত্রপট দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর গত হইল দেখিয়া সকলেই প্রস্থান

করিলেন। অতঃপরে নববৃন্দা, চন্দ্রাবলী, মাধবী ও কৃষ্ণের কথোপকথন। চন্দ্রাবলীর চিত্ত তখনও অসূয়ায় আচ্ছাদিত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মাধবী ও চন্দ্রাবলীর যে কথোপকথন হইল তাহাতে অসূয়ার ভাবই পরিলক্ষিত হইল; সেই ভাবেই চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, দেব আপনার চিত্তে আমি সঙ্কোচের ভাব দেখিতেছি;—আমিই আপনার চিত্ত সঙ্কোচের কারণ আপনি নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অন্তঃপুরে চলিলাম। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নবম অঙ্কের যবনিকা-পতন হইল।

দশম অঙ্কে ব্রজ-পরিকর ও দ্বারকা-পুরী-পরিকরের মিলন-মাধুর্য্য বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল, মুখরা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সকল ব্রজপরিকর বিশ্বকর্ম্মার নব নির্ম্মিত নব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ বিহারের পর পরস্পর সন্দর্শন হইলে আনন্দোল্লাসজনিত যেরূপ আহ্লাদজনক আলাপসম্ভাষণাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সকল প্রীতিময় কথোপকথনের দ্বারা এই অঙ্ক পরিপূর্ণ। এখানে কাহারও বিদ্বেষ নাই, বাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, অসূয়া পৈশুন্য নাই, কেবল শুদ্ধ প্রীতির ভাব এবং সম্মিলন জনিত আনন্দই এই অঙ্কের এক সুবিশেষ বিষয়। চন্দ্রাবলীর অনুমোদনে নন্দ যশোদাদির সমক্ষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ-ব্যাপার সম্পাদনও এই অঙ্ক-বর্ণনার একটী বিশিষ্টতা। এই বিবাহে ইন্দ্র-শচী, কুবের-ঋদ্ধি, যম-ধূমোর্ণা, বরুণ-গৌরী, সূর্য্য-সংজ্ঞা, মরুত-শিবা, অগ্নি-স্বাহা, চন্দ্র-রোহিণী, বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী প্রভৃতি দম্পতি বিবাহ-সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বিবাহাদি সম্পাদনের পরে নাটক উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বর দানে ইচ্ছুক হইলেন। শ্রীরাধা বলিলেন, যখন তোমার চরণ পাইলাম, তখন আর অন্য বরের প্রয়োজন নাই; তবে তোমার চরণে এই এক প্রার্থনা আছে, যাহারা তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া

স্থির বুদ্ধিতে এই ব্রজমণ্ডলে বাস করিবেন, তুমি নবকিশোর বংশী-বদন, শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী শ্রীমূর্ত্তিতে তাহাদিগকে দর্শন দিও। তারপর আমার মনের কথা এই যে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দী-তটে লতাবিতান-সমন্বিত তোমার মাধুর্য্য-লীলার চিরনিকেতন ব্রজ-নিকুঞ্জে আমাদের ন্যায় চটুল চপল স্বচ্ছন্দলীলাবিলাস-অভিলাষবতী গোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাঁশরী বাজাইয়া সকলকে আনন্দে প্রমত্ত রখিও এবং চিরমধুর বৃন্দাবনে নিত্য বিহার করিও।”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তথাস্তু”। এই বলিয়া তিনি দক্ষিণদিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন গার্গী ও যশোদাগর্ত্তসম্ভবা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী উপস্থিত হইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, সঁখি রাধে, তোমরা ব্রজের ধন ব্রজেই আছ, গোকুলেই বিরাজ করিতেছ, মনে কোন সংশয় করিও না। আমি কেবল কালক্ষেপণের নিমিত্ত তোমাদের এই লীলাব্যাপার-বোধ প্রপুষ্পিত করিয়াছি। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল আমারই খেলা বলিয়া মনে করিও। কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই ছিলেন, ইহাতে কোন সংশয় করিও না।”

সকল বিভ্রমই ঘুচিয়া গেল। ষোল আনা ললিতমাধবনাটকখানি একটী দীর্ঘ স্বপ্নের মত দর্শক-সর্ব্বজ্ঞকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে স্বর্বণ-রেখা অঙ্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পরিসমাপ্ত হইল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীপাদ গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন—“ব্রজ হৈতে কৃষ্ণ কভু না করিও বাহির” নাটকান্তে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর বাক্যে পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। এই নাটকে মদনমনোমোহন শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্ত নায়কতা প্রকটন করিয়া লীলাদ্বারা ললিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত এই নাটকখানির নাম ললিত মাধব নাটক। শ্রীপাদ রূপের লিখিত এই নাটক দুইখানির শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পদ্য এবং ঘটনার প্রধান প্রধান

বিবরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল। শ্রীরাম রায়ের প্রশ্নে ইহার নাটকীয় লক্ষণগুলি পর্য্যালোচিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস ঠাকুর তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সকলেই ইহাতে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিছিলেন। চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বলিলে, ইহার কে জানে মহিমা॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছু নাহি জানি।
যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী॥

তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে এই নাটকদ্বয় প্রকৃত পক্ষেই আনন্দ লীলা-রস-বিগ্রহ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শিক্ষা উপদেশ। প্রেম-ভক্তি রসের পরিপাক অবস্থায় গোপী-প্রেমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সে সকল বর্ণিত হইয়াছে। বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব সেই সকল শিক্ষার মূর্ত্তিমান আদর্শ। প্রেমরসের বিবিধ ভাবের চরম উৎকর্ষ এই দুই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই নাটকের আলোচনা করিয়াই শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা অতি সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করা হইল। দান-কেলি কৌমুদী ভাণিক চাতুর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণানন্দজনক হইলেও লৌকিকী শিক্ষার বিষয় ইহাতে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তজ্জন্য বেশী আলোচনা করা হইল না। তথাপি ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

এই গ্রন্থখানি নাটকীয় কাব্যের অন্তর্গত ভাণিকা। ভাণের লক্ষণ এই যে :-

ভাণঃ স্যাৎ ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতোবিটঃ॥

ভাণিকার লক্ষণ একটুকু ভিন্ন। ভাণিকা বা ভাণে ধূর্ত্ত নায়িকাটি উদাত্ত-গুণ যুত ইহা; একাঙ্কে রচিত। এই ভাণিকায় ঘট্টপাল শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা শ্রীরাধা প্রভৃতির রসময়ী বিড়ম্বনার হর্ষময় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা,

বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা চম্পকলতা, ইহারা পাত্রী,—শ্রীকৃষ্ণ সুবল ও মধুমঙ্গল এই ভাণিকার পাত্র। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘট্টি-শুল্ক লইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিহাসপূর্ণ বিবাদ ক্রীড়াই এই ভাণিকার বিষয়। স্থান—গোবর্দ্ধন গিরিসান্নবর্ত্তী মানস গঙ্গাতট। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর হইতেই তাঁহার বিরহে শোক-নিমগ্ন হন। ইহার পরে শ্রীপাদ-রূপ কৃত ললিত মাধব নাটকে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ পাঠে তাঁহার শোক-সিন্ধু আবার অভিনবভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। এই অবস্থায় তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে। ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তনের জন্ত শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই গ্রন্থ রচনা করেন। মৎকৃত "শ্রীমদ্দাস গোস্বামী গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"শ্রীরূপ, ললিত মাধব নাটক লিখিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথকে সেই নাটক পাঠ করিতে দেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রলম্ভ-রসের প্রকট মূর্ত্তি। ললিত-মাধব নাটকও বিপ্রলম্ভ রসের বিশুদ্ধ আধার। রঘুনাথ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই নয়নজলে তাঁহার বক্ষ পরিপূত হইয়া যাইত, কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, রঘুনাথের হৃদয় শোকের ভারে অবনত হইয়া পড়িত। তিনি গ্রন্থখানিকে বুকে করিয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন, কখন বা উহা হইতে দূরে সরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত ধাবিত হইতেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, যথা ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে ৫ম তরঙ্গে :—

গ্রন্থ পড়ি রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
কভু দূরে রহে গ্রন্থ পরিহরি।
কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি।

খেনে খেনে নানাদশা হয় উপস্থিত।
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মুর্চ্ছিত॥

এই ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ও এই ভাব উপস্থিত হইত, প্রেমবিলাসে তাহারও বর্ণনা আছে। ইহাতে বৈষ্ণব-মাত্রই নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিলেন,—রঘুনাথের এই রোগের কারণ—ললিত মাধব নাটক। তিনি অচিরেই ইহার ঔষধ আবিষ্কার করিলেন,—সেই ঔষধ দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ। শ্রীরূপ এই গ্রন্থ হাতে করিয়া রঘুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রঘু ভাই, এই নূতন গ্রন্থখানি একবার আস্বাদন কর, ললিত মাধব আমাকে দাও, উহাতে একটু সংশোধন করিতে হইবে।"

ললিত মাধব গ্রন্থ পাঠ করা যদিও রঘুর পক্ষে অসম্ভব, যদিও এই গ্রন্থ তাঁহার নিকট "বিষামৃত একত্র মিলন" বলিয়া প্রতিভাত হইত, যদিও "তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায়" পরিত্যাগ ও আস্বাদন উভয়টী অসম্ভব অথচ উভয়ই পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু শ্রীরূপ যখন সংশোধন করার জন্য গ্রন্থখানি চাহিতেছেন, তিনি অগত্যা ললিত মাধব শ্রীরূপের হস্তে দিয়া শ্রীদানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। ললিত মাধব নাটক পাঠের ক্লেশ দূরীভূত হইল, তিনি মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখ সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর॥

শ্রীমদ্রঘুনাথের শোকাপনোদনের জন্যই দয়াময় শ্রীরূপ, দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপের এই গ্রন্থ-বিরচনের হেতু তিনি এই গ্রন্থেও সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই:—শ্রীরাধাকুণ্ড তটনিবাসী আমার প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীরঘুনাথ দাসের নিদেশে এই ভক্ত সুখদা ভাণিকা-মালা গ্রথিতা হইল। এই গ্রন্থ ক্ষণতরেও আমার সেই প্রিয় সুহৃদের কুণ্ডতটীকে সমলঙ্কৃত করুক।" এই গ্রন্থের উপসংহারে

যে আশীর্ব্বচন পদ্যটি আছে, তাহাতেও বুঝা যায়, শ্রীমদ্দাস গোস্বামীই সেই আশীর্ব্বাদের লক্ষ্য উহার অনুবাদ এই :—

হে মাধব তুমি বৃন্দারণ্যবাসীদিগের সমৃদ্ধিপ্রদানে ক্রীড়াকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাক, আমার প্রার্থনা এই—এই যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী রাধাকুণ্ড তটান্তকুটীরাশ্রয় শ্রীমদ্দাস রঘুনাথ কেবল তোমাদের সেবার জন্যই দিনরজনী উৎকণ্ঠিত হইতেছে, তুমি উহাঁর মনোরথরূপ-তরুকে সত্বরে ফলবান্ কর।" ইহাই এই গ্রন্থের উপসংহার। এই গ্রন্থের উপক্রমে শ্রীরাধার কিল কিঞ্চিত ভাবের পদ্যটী সুবিখ্যাত। গ্রন্থখানি প্রকৃতই আনন্দময়।

অপার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যানন্দ-সিন্ধু এই নাটকরস-সিন্ধু-বিন্দু মাত্রেও স্পর্শকরা মাদৃশ জনের অধিকারযোগ্য নয়। সসম্ভ্রমে নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য লীলারস-বিগ্রহ সপরিকর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণে এবং তাঁহারই আবির্ভাব-বিশেষ সপরিকর শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ-পদারবিন্দে এবং তদীয় অনুচর সহচরগণ সহ তদীয় সবিশেষ কৃপাপাত্র শ্রীপাদ গ্রন্থকার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অতি সংক্ষেপে এই নাটকদ্বয়ের দুই একটী কথা মাত্র করুণাময় পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়া "শ্রীমৎ রূপ শিক্ষা" এই খণ্ডে পরিসমাপ্ত করা হইল। শ্রীমৎ সনাতন শিক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ইতি

প্রথম খণ্ডে

শ্রীমৎ-রূপ-শিক্ষা সমাপ্ত :

মিনতি

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ আদি পরিকর॥
সবার চরণে মন কোটি নমস্কার।
জীব নিস্তারিতে অবতার সবাকার॥
বিষম-বিষয়-বিষ-বিষাদ-সাগরে।
বিঘন বিপদ ব্যাধি সদা বাস করে॥
হাঙ্গর কুমীর মত রোগ-শোক-জ্বালা।
নিরন্তর দেহ মন করে ঝালা পালা॥
একতিল শান্তি নাই তরঙ্গ ভীষণ।
ভয়ে ভয়ে করি সদা জীবন ধারণ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ।
রাধারাণী দাসী যাচে যুগলচরণ॥

(২)

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধা-জীবন।
জয় জয় শ্রীললিতা আদি সখীগণ॥
জয় জয় বৃন্দাবন ধাম মনোহর।
জয় জয় যত নিত্য ব্রজ পরিকর॥
এবে কৃপা করি মোরে দাও ভক্তিধন।
যুগল-ভজনে যেন সদা রহে মন॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা আনন্দের সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দ তার কণা নহে এক বিন্দু॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ।
রাধারাণী দাসে যাচে যুগল চরণ॥

(৩)

সংসার মায়ার খেলা—মোহিনী আশায় ।
ভাবি এক,—হয় আর—শেষে হায় হায় ॥
ভেঙ্গে যায় সুখ-আশা—সুখের স্বপন ।
বিষাদে বিপদে মন হয় নিমগন ॥
কোথা সুখ, কোথা শান্তি নশ্বর ধরায় ।
মহা মোহে মানবের আয়ু চলে যায় ॥
ইহাই মিনতি মম তোমার চরণে ।
থাকে যেন চিত মম তোমার ভজনে ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ ।
রাধারাণী দাসী যাচে যুগল চরণ ॥

(৪)

বুঝিয়াছি,—এ জীবন নিশার স্বপন,
দেহ গেহ সব মিথ্যা শুধু বিড়ম্বন ॥
কিন্তু কাজে বিপরীত,—মোহের ছলনা ।
বিশুদ্ধ ভকতি চিতে কখনো জাগেনা ॥
নিত্য ধন তুমি, নিত্য সাথী দয়াময় ।
তোমার ভজনে সদা স্ফূর্তি নাহি হয় ॥
দয়া করি ভগবান্ দাও শুদ্ধ রতি ।
তোমার চরণে যেন সদা রহে মতি ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ ।
রাধারাণী দাসী যাচে যুগল চরণ ॥

(৫)

সুনীল আকাশ-গায় শোভে চন্দ্র তারা ।
কাননে কাননে ফুল,—মধুগন্ধ ভরা ॥

চাঁদের জোছনা খেলে সাগরের জলে।
কর্ণানন্দী কলধ্বনি পাখীদেরে বোলে॥
শিশুর হাসিটী যেন কত মধু মাখা।
আঁধার নিশায় যেন শশি-হাসি-রেখা॥
শান্তি-হরা দুখে ভরা সংসারের মাঝে।
তোমার হ্লাদিনী শক্তি আভাসে বিরাজে॥
তাতে মনে হয় প্রভো তুমি রসময়।
আছ গো জগতমাঝে সতত নিশ্চয়॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ।
রাধরাণী দাসী যাচে যুগল চরণ॥

(৬)

রোগ শোক পাপ তাপ থাকে যেন দূরে।
সতত থাকিও প্রভো সেবিকা-অন্তরে॥
তোমার সেবায় যেন যায় নিশিদিন।
পাপে তাপে যেন প্রাণ না হয় মলিন॥
শ্রদ্ধা ভক্তি রতি দিও তোমার চরণে।
জপি যেন তব নাম শয়নে স্বপনে॥
তোমার ভক্তের পদে মতি যেন রয়।
এ মিনতি তব পদে ওহে দয়াময়॥
গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র শ্রীরাধারমন
রাধারাণী দাসী যাচে যুগল চরণ

শ্রীমতী রাধারাণী দাসী।

প্রিণ্টার—শ্রীভূতনাথ সরকার
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২১।এ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।